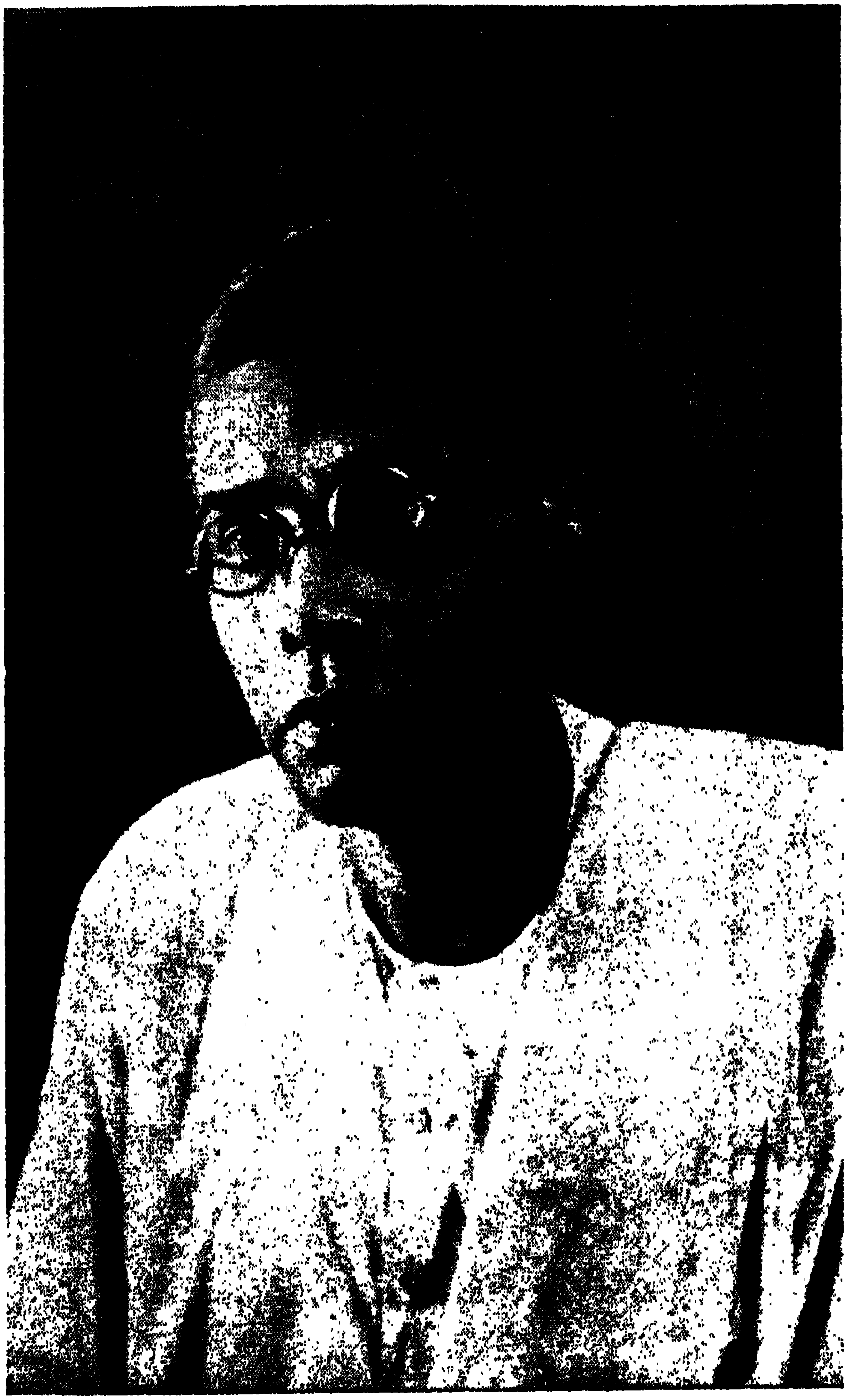

রচনা সমগ্র

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩

সম্পাদনা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

পত্র প্রকাশন ॥ ১৫/১এ, যুগলকিশোর দাস লেন ॥ কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রকাশক : নিতাই মজুমদার, শঙ্কর প্রকাশন
১৫।১এ, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬
মুদ্রক : শ্রীগৌর মজুমদার
শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৬১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ-পত্র

অমলা

পূজনীয় অগ্রজ

শ্রীযুক্ত লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশয়ের হস্তে

এই পুস্তক

ভক্তি সহকারে

উৎসর্গ করিলাম।

যৌতুক

আমার

পরমস্নেহভাজন জ্যেষ্ঠ জামাতা

শ্রীমান সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে—

সাত দিন

শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীমতী বাসনা মুখোপাধ্যায়

জামাতা কন্যাকে উপহার দিলাম

স্মৃতিকথা : ১ম পর্ব

সোদরোপম বৈবাহিক

শ্রীমান সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে

তাঁর জন্মদিনে উপহার

সূচীপত্র

উপন্যাস

অমলা ১

যৌতুক ৯১

গল্প

সাত দিন

প্রেরণা ২১৯

সবুজ মাঠ ২২৭

নতুন লেখক ২৩৩

বেচুলাল ২৪০

অভিনয় ২৫৯

বন্যার জল ২৭৪

রামের সুমতি ২৮৩

লালীর প্রেম ২৯৫

সাত দিন ৩০০

বিবিধ

স্মৃতিকথা (উনবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত) ৩১৭

সম্পাদকীয় ৩৩৭

অমলা

এক

শীতকালের দিন,—পাঁচটা বাজিতে বাজিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসে হরমোহন মুখোপাধ্যায় অফিস হইতে আসিয়া সামান্য জলযোগ করিয়াই গৃহিণী প্রভাবতীকে কহিলেন, "একটা গায়ের কাপড় দাও, একবার বেরোতে হবে।"

স্বামী অফিস হইতে যখন আসেন, তখনই তাঁহার মুখে একটা গভীর চিন্তার রেখা প্রভাবতী লক্ষ্য করিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, হরমোহন জলযোগ করিলে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন। তাহার উপর হরমোহন বাহিরে যাইবেন শুনিয়া প্রভাবতী বুঝিলেন, নিশ্চয়ই একটা কোন অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে; কারণ, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সন্ধ্যার পর হরমোহন গৃহ হইতে বাহির হইতেন না,—বিশেষতঃ শীতের রাত্রে।

চিন্তান্বিত হইয়া প্রভাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখ শুক্নো দেখচি; কী হয়েছে বল দেখি? কোথায় যাবে এখন?"

বিরক্তিবিরূপ মুখে হরমোহন কহিলেন, "একবার অমলার শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে। আজ অফিস যাওয়ার সময় তার শ্বশুরের একটা চিঠি পেয়েছিলাম, তখন আর তোমাকে দেখাই নি। অফিসের কোটের পকেটে আছে, বার ক'রে দেখ।"

প্রভাবতী তাড়াতাড়ি পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিলেন। অমলার শ্বশুর, অর্থাৎ হরমোহনের বৈবাহিক গোবিন্দনাথ, হরমোহনকে পত্র লিখিয়াছেন। পত্রে লেখা ছিল, "যে আপনার বংশগত কলঙ্কের কথা গোপন করিয়া ভদ্রলোকের ঘরে কন্যা সমর্পণ করে, তাহাকে আমি ইতর মনে করি। আমার গৃহে অব্রাহ্মণের কন্যার স্থান কিছুতেই হইবে না। আপনার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিয়া আমি সমাজে পতিত হইয়াছি; যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিব। অদ্য হইতে আপনার কন্যা আমার পুত্রবধূ নহে। যত শীঘ্র সম্ভব আমি আমার পুত্রের বিবাহ দিব। আপনি আজ সন্ধ্যার পর আসিয়া আপনার কন্যাকে লইয়া যাইবেন; নচেৎ তাঁহাকে আজ রাত্রেই ভৃত্যের মারফৎ আপনার গৃহে পাঠাইয়া দিব।"

তিনমাস হইল হরমোহনবাবুর কন্যা অমলার সহিত বিজয়নাথের বিবাহ হইয়াছে। বিজয়নাথের পিতা চতুর্দশ শতাব্দীর এই মহা বিপ্লবের মধ্যেও হিন্দুধর্মের চরম গোঁড়ামিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; এবং সামাজিক খুঁটিনাটির সামান্য ব্যতিক্রমও তিনি সহ্য করিয়া চলিতেন না। তাই কয়েকদিন হইতে একটা কোনও সংবাদ অবগত হইয়া তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য বিশেষরূপে অনুসন্ধান লইতেছিলেন। আজ প্রত্যূষে সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ অবগত হওয়ার পর, আর একদিনও অপেক্ষা না করিয়া, তদ্দণ্ডেই নূতন বৈবাহিক হরমোহনকে পত্র লিখিয়া ভৃত্যের মারফৎ পাঠাইয়া দিলেন। •

গোবিন্দনাথের পত্র পাঠ করিয়া প্রভাবতী চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। হরমোহনের পিতামহের জন্ম সংক্রান্ত একটা কাহিনী বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। এক সময়ে তাহা লইয়া এমন একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহার ফলে হরমোহনের পিতাকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে হয়। কলিকাতায় সমাজ নাই, সুতরাং দলাদলির উপদ্রবও নাই। সমাজের জগন্নাথ-ক্ষেত্র কলিকাতায় আসিয়া হরমোহনের পিতা শান্তিলাভ করিলেন। মধ্যে আর কোনও গোলযোগ ছিল না। হরমোহনের বিবাহের সময়ে একবার সে কথা উঠিয়াছিল,—কিন্তু প্রভাবতীর পিতা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তাহার পর আর কখনও এ প্রসঙ্গ উঠে নাই। গোবিন্দনাথের পত্রে যে সেই প্রসঙ্গেরই উল্লেখ ছিল তাহা বুঝিতে প্রভাবতীর বিলম্ব হইল না।

পত্রখানা মুড়িয়া রাখিয়া চিন্তিত মনে প্রভাবতী কহিলেন, "তুমি কী বলবে ?"

হরমোহন কহিলেন, "দেখি, যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মন থেকে ও কথাটা দূর করতে পারি।

"অমলকে নিয়ে আসবে ?"

"সহজে আনব না। তবে যদি একান্ত না শোনে, তা হলে তো আর ফেলে আসতে পারব না।"

প্রভাবতী কহিলেন, "এনো না। আজ যদি অমলা তোমার সঙ্গে চ'লে আসে, তাহলে ব্যাপারটা পাকা হয়ে দাঁড়াবে, পরে আর পাঠানো শক্ত হবে। আর একটা কথা, রাগারাগি কোরো না, তুমি আবার একটুতেই রেগে ওঠ ! তুমি যখন মেয়ের বাপ, তখন তোমাকে নিচু হ'তে হবে।"

একটু বিরক্তি-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে প্রভাবতীর দিকে চাহিয়া হরমোহন কহিলেন, কেন, মেয়ের বাপ ব'লে আমার আত্মসম্ভ্রমের জ্ঞান থাকতে নেই না কি ?"

প্রভাবতী দেখিলেন, আর কথা বাড়াইলে বিপরীত হইবে, গৃহ হইতেই হরমোহন ক্রুদ্ধ হইয়া যাইবেন। তাই, আর কোনও কথা না বলিয়া, একখান গাত্রবস্ত্র আনিয়া হরমোহনকে দিলেন। দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া হরমোহন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দুই

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অঞ্চলে গোবিন্দনাথের বৃহৎ অট্টালিকা। বৈঠকখানায় সুবিস্তৃত শয্যার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় গোবিন্দনাথ আলবোলার দীর্ঘ নল হস্তে তামাক খাইতেছিলেন, এবং নিকটে বসিয়া প্রতিবেশী বিনোদ পাল চামচ নাড়িয়া উত্তপ্ত চা শীতল করিতেছিলেন।

মুখ হইতে নল সরাইয়া, বিনোদ পালের দিকে অর্ধোন্মীলিত চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "কী হে? এ কথা জেনে শুনে বাড়িতে স্থান দেওয়া যায়? তুমিই বল না। স্থান দেওয়া যায় কি?"

বিনোদ পাল চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়াই, পুনরায় ডিসের উপর নামাইয়া রাখিয়া চামচ দিয়া একমনে চা নাড়িতে লাগিলেন।

"বল না হে? কথ কচ্ছ না কেন? তোমার হ'লে তুমি রাখতে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিনোদ কহিলেন, "তা বটে। তবে কি না মেয়েটার জন্মে বড় দুঃখ হয়!"

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "তা কী করব! সংসারের নিয়মই এই,—একজনের দোষে আর একজন কষ্ট পায়!"

কোন উত্তর না দিয়া বিনোদ চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিলেন।

একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, "বৌদিদির বাপ এসেছেন।"

গোবিন্দনাথ কহিলেন, "এইখানে নিয়ে আয়।" বলিয়া পুনরায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বিনোদ পাল ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আমি তবে উঠি ভায়া।"

গোবিন্দনাথ কহিলেন, "বিলক্ষণ। তোমার সামনে সব কথা হবে ব'লেই তো এই শীতে তোমাকে ডাকিয়েছি। তুমি বোস।"

"আমি থাকলে একটু অসুবিধা হবে না কি?"

"কিছু না।"

ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া হরমোহন গোবিন্দনাথকে নত হইয়া নমস্কার করিলেন। প্রতি-নমস্কার না করিয়া গোবিন্দনাথ অঙ্গুলি সঙ্কেতে একটা চেয়ার দেখাইয়া কহিলেন, "বসুন।"

হরমোহন আসন গ্রহণ করিলে গোবিন্দনাথ কহিলেন, "গাড়ী নিয়ে এসেছেন তো?"

মৃদুকণ্ঠে হরমোহন কহিলেন, "আজ্ঞে না।"

"কেন?"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া হরমোহন একবার বিনোদ পালের দিকে চাহিলেন। সে চাহনির অর্থ বিনোদ সহজেই বুঝিলেন। কহিলেন, "গোবিন্দ, আমি এখন আসি ভাই।" বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন।

ব্যস্ত হইয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "না, না, বোস, বোস। তোমার সঙ্কুচিত হবার কোন কারণ নেই। এ অন্তঃপুরও নয়, আর মন্ত্রণাঘরও নয়,—এখানে কোনও গুপ্ত কথা হবে না।" আলবোলা হইতে কলিকা উঠাইয়া বিনোদের হস্তে দিয়া কহিলেন, "এই নাও, তামাক খাও, তোমার পাশে হুঁকো রেখে গিয়েছে।"

হরমোহনকে লক্ষ্য করিয়া বিনোদ কহিলেন, "আগে উনি খান।" বলিয়া গোবিন্দনাথের আলবোলায় কলিকা রাখিতে গেলেন।

ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "আমার ঘরে শুধু বামুন-কায়েতেরই হুঁকো আছে,—ওঁদের হুকো নেই। তা হলে বাজার থেকে নতুন হুঁকো আনাতে হয়। তুমি খাও।"

গোবিন্দনাথের কথা শুনিয়া হরমোহনের অন্তরে যেন উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা প্রবেশ করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রভাবতীর উপদেশ মনে পড়িয়া গেল—রাগারাগি কোরো না,—মেয়ের বাপকে নিচু হতে হয়। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া হরমোহন নীরবে বসিয়া রহিলেন। বিনোদ পাল অতিশয় সঙ্কুচিত এবং ক্লিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে লাগিলেন।

হরমোহনের দিকে বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া গোবিন্দ কহিলেন, "গাড়ি আনেন নি, তা আপনার মেয়েকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবেন না কি? আপনার যদি তাতে পয়সার সাশ্রয় হয়, আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে পথ অনেকটা, একটা গাড়ির বোধ হয় দরকার হবে।" বলিয়া একজন ভৃত্যের নাম করিয়া হাঁক দিলেন।

ভৃত্য আসিলে তাহাকে কহিলেন, "যা, একখানা ঠিকে গাড়ি নিয়ে আয়। শ্যামবাজার যাবে।"

আঘাতের উপর আঘাত খাইয়া হরমোহনের মন একেবারে বাঁকিয়া বসিয়াছিল। হৃদয়হীন অভদ্র গোবিন্দনাথকে শান্ত করিবার জন্য চাটুক্তি করিতে একেবারেই প্রবৃত্তি হইতেছিল না,—বিশেষতঃ তাহা করিলেও যখন কোন উপকারের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু দুর্ভাগিনী কন্যার স্নেহকরুণ মুখ স্মরণ করিয়া হরমোহন স্থির করিলেন, একবার ভালো করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। বিনোদ পালের উপস্থিতির জন্য একটু সংকোচ বোধ হইতেছিল। কিন্তু আর অপেক্ষা করাও চলে না—গাড়ি আসিয়া পড়িলে তখন আর সুবিধা হইবে না। হরমোহন কহিলেন, "দেখুন, আপনার চিঠি পেয়ে পর্যন্ত আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। এ কথা সর্বৈব মিথ্যা,—আমার কোন পরম শত্রু আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে আপনাকে এ কথা বলেছে। আপনার মতো বিজ্ঞ ব্যক্তি—"

হরমোহনের কথায় বাধা দিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "আমার বিজ্ঞতায় আপনার যদি কোন সন্দেহ না থাকে, তা হলে জানবেন, আমি আমার কোন

কর্তব্য অসমাপ্ত রাখি নি। এ সংবাদ আমি আজ পাইনি,—প্রায় দশ দিন হলো পেয়েছি। যখন প্রথম পাই, তখন এ বিষয়ে আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা সমীচীন ব'লে মনে করিনি, কারণ, সংবাদ ভুল হ'লে, অকারণ আপনার মনে কষ্ট দেওয়া হতো। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করেছি। সে যেমন-তেমন অনুসন্ধান নয়,—অন্ততঃ পাঁচ ছয় জন লোক আপনাদের গ্রামেই গিয়েছে। তারা সকলেই আপনার পিতামহর বিষয়ে একই সংবাদ নিয়ে ফিরেছে।"

হরমোহন কহিলেন, "গ্রামে আমাদের শত্রুর অভাব নেই,—তারা সকলেই মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "এ কথা মন্দ নয়! ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করব না,—আর বিশ্বাস করব আপনাকে।"

আত্মসংবরণ করা হরমোহনের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। কহিলেন, "কেন, আমি অভদ্র না কি?—"

গোবিন্দনাথ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ আছে? যে অব্রাহ্মণ হয়ে এমন ক'রে ব্রাহ্মণের সর্বনাশ করে, তাকেও ভদ্র বলতে হবে নাকি? আপনার বাড়ি থেকে আমি মেয়ে এনেছিলাম ব'লে তবু আমার পরিত্রাণের একটা পথ আছে,—যে আপনার ঘরে কন্যা সমর্পণ করবে, তার কী উপায় হবে বলুন দেখি! হাড়ি মুচি ডোমকেও ভদ্র বলতে পারি, কিন্তু আপনাকে পারিনে।"

গোবিন্দনাথের কথা শুনিয়া বিনোদ পাল মনে মনে সংকুচিত হইয়া উঠিলেন। কড়িকাঠের দিকে উদাস ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ, কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই ভাই। তুমি যা করবে, তা তো করবেই, মিছে ভদ্রলোককে—"

বাধা দিয়া গোবিন্দনাথ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "তুমি ভুল করছ বিনোদ। গোবিন্দ চাটুয্যে ভদ্রলোকের মর্যাদা রাখতে জানে,—ভদ্রলোককে আপনার বৈঠকখানায় বসিয়ে অপমান করবে এত ইতর সে নয়। কিন্তু—"

বিনোদ বিব্রত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "গোবিন্দ, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, আমি তোমাকে চুপ করতেই বলেছিলাম, পুনরুক্তি করতে বলি নি। আমার সে উদ্দেশ্য ছিল না।"

গোবিন্দনাথের দুর্বাক্যের নিষ্ঠুর পীড়নে হরমোহনের মন একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। এক দিকে গোবিন্দনাথের দুর্ব্যবহার, এবং অপর দিকে কন্যার অনিষ্টের আশঙ্কা—এই উভয়ের নিষ্পেষণে হরমোহনের আত্মসম্মান এতক্ষণ উৎপীড়িত অথচ উপায়হীন হইয়া ছিল। সহসা তাহা যখন প্রবলভাবে সাড়া দিয়া উঠিবার উপক্রম করিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই বিনোদচন্দ্র ক্ষীণভাবে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করায় হরমোহন চিত্ত সংযত করিবার অবসর পাইলেন।

বাম্পের অতিরিক্ত চাপে বয়লার ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় তাহার এক পাশে একটি ছিদ্র করিয়া দেওয়ায়, রুদ্ধ বায়ু সেখান দিয়া কিয়ৎ পরিমাণে নির্গত হইয়া সেই চাপ হাল্কা হইয়া গেল। অগ্নির মূর্তি ধরিয়া যাহা জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল,—সহানুভূতির ক্ষীণতম আঘাতেই তাহা অভিমানের আকারে রূপান্তরিত হইল। হরমোহন কহিলেন, "আমি না হয় অভদ্র,—ধরুন, আমি আপনার নিকট কথাটা গোপন রেখে গুরুতর অপরাধ করেছি; কিন্তু আমার মেয়ের তো কোন অপরাধ নেই,—তাকে কেন পায়ে ঠেলবেন? তার প্রতি দয়া করুন।"

গোবিন্দনাথ কহিলেন, "একজন পাপ করে, আর অপর একজনকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়,—এই তো সংসারের নিয়ম। প্রবঞ্চনা ক'রে ভদ্রলোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে, যদি নিজেদের সমাজের মধ্যে দিতেন, তা হলে আর আপনার মেয়ের কষ্টের কোন কারণ হতো না। আপনার মেয়ে কষ্ট পাবে বলে তো আমি ধর্মত্যাগ করতে পারি নে।"

হরমোহন তপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আমার নিরপরাধ কন্যার সর্বনাশ ক'রে ধর্মের নামে আপনি যে মস্ত অধর্ম করছেন, ঠিক জানবেন এর প্রায়শ্চিত্ত আপনাকেও করতে হবে,—আপনিও বাদ পড়বেন না।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিকৃত স্বরে গোবিন্দনাথ কহিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত আমাকে তো করতেই হবে। কিন্তু আপনার যুক্তিটা ঠিক বুঝলাম না তো। আপনার কন্যা যদি নিরপরাধ হয়, তা হলে একজন বেশ্যার মেয়েরই বা অপরাধ কোথায়? তারও তো জ্ঞানকৃত কোন দোষ বা পাপ নেই।"

গোবিন্দনাথের এই তুলনার উক্তিতে হরমোহনের স্ত্রীর উপর প্রত্যক্ষ ভাবে হয় তো কোনও আঘাত ছিল না,—কিন্তু হরমোহন তাহাই মনে করিয়া একেবারে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধৈর্যের উপরে কিছুক্ষণ হইতে প্রবলভাবে যে উৎপীড়ন চলিতেছিল সহসা তাহা যখন এইরূপে নির্মমভাবে সীমা অতিক্রম করিল, তখন হরমোহন কন্যার ইষ্ট-অনিষ্টের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলেন। শত শিখায় যাহা দাবানলের মতো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, আর তাহাকে বৃথা আশা বা আশঙ্কায় চাপিয়া রাখা গেল না। উন্মত্তের মতো হরমোহনের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কহিলেন, "তোমার মতো চামারের বাড়ি থেকে যত শীঘ্র আমার মেয়েকে নিয়ে যাই, ততই মঙ্গল। মনে করব আজ হতে সে বিধবা হয়েছে, আজ নিজ হাতে তার সিঁথের সিঁদুর মুছে দেব। তোমার মতো পাপিষ্ঠের মুখ দর্শন করলেই তার পাপ হবে।"

শুনিয়া গোবিন্দনাথ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। হরমোহনের দিকে তীক্ষ্ণ কুঞ্চিত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "বটে। বিষ নেই,—কিন্তু কুলোর মতো চক্র আছে দেখছি যে। আমার বাড়ী ব'সে আমাকে অপমান? আমার জন-দশবার চাকর আছে,—একবার তাদের হাতে তোমাকে অর্পণ করব না কি? তাতে

অবিশ্যি তোমার মানের ক্রটি হবে না,—কিন্তু শারীরিক ক্লেশ একটু হতে পারে।"
গোবিন্দনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দেবী সিং।"

প্রভুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া দেবী সিং মুহূর্তের মধ্যে কক্ষের ভিতর আসিয়া হাজির হইল, "হুজুর।"

ব্যস্ত হইয়া বিনোদ পাল কহিলেন, "গোবিন্দ, এ কি ছেলেমানুষী তুমি করছ? তোমার কি বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে।" বলিয়া বিনোদ দেবী সিংহকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

বিনোদচন্দ্রের কথায় কর্ণপাত না করিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "নিকালো শুয়ার কো।" বলিয়া হরমোহনকে দেখাইয়া দিলেন।

চাকর দিয়া প্রহারের ইঙ্গিতে হরমোহন অপমানে এবং ঘৃণায় কাঠের মতো শক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। গোবিন্দনাথের আদেশ শুনিয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং বাঁশের মোটা লাঠিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া দেবী সিংএর দিকে আরক্ত নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "খবরদার, এক পা এগোলে মাথা গুঁড়িয়ে দোব।"

বিড়ালের চেয়ে কুকুরের শক্তি অধিক, এ ধারণা বিড়ালেরও আছে, কুকুরেরও আছে; কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় বিড়াল যখন সম্মুখের দুই পা উঁচু করিয়া বিকট মুখভঙ্গীর সহিত ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ শব্দ করিতে থাকে, তখন কুকুরকেও আপনার শক্তির বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইতে হয়। নিরীহ হরমোহনকে গোবিন্দনাথ অসংকোচে আক্রমন করিয়া চলিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা যখন হরমোহন নিজের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন গোবিন্দনাথ বা দেবী সিং কেহই ব্যাপারটা সুবিধার বিবেচনা করিল না। দেবী সিং মনে করিল, প্রভুর আদেশ পালন করিতে গিয়া পৈত্রিক মস্তককে ওরূপ গুরুতর ভাবে বিপন্ন করা কোন ক্রমেই উচিত নহে; এবং গোবিন্দনাথ স্পষ্ট বুঝিলেন যে, বাক্যের ভিতরে যতই ঝাঁজ ভরিয়া দেওয়া যাউক না কেন তাহাতে মানুষের মাথা কাটে না; পরন্তু বাঁশের লাঠি অতিরিক্ত মোটা হইলে অবলীলাক্রমেই কাটে। প্রথমে কাহার মস্তকের উপর বংশ-দণ্ডের পরীক্ষা করিবেন, হরমোহন তাহাই ভাবিতেছিলেন কি না, ঠিক জানি না, এমন সময়ে বাহিরে বারান্দায় পরিচারিকার অনুবর্তিনী একটি বালিকা মূর্তি দেখা গেল। সেই মূর্তি দেখিবামাত্র হরমোহন বেগে ঝড়ের মতো ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়া বালিকাকে দুই বাহুর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "চল মা, চল মা। এ পাপ-পুরী যত শীঘ্র ছেড়ে যেতে পারিস ততই মঙ্গল।" বলিয়া বালিকাকে লইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ যখন মিলাইয়া গেল, তখন গোবিন্দনাথ তাকিয়ায় হেলান দিয়া কহিলেন, "আঃ, পাপ গেল।"

সে কথার অনুসরণে কোনও কথা না বলিয়া বিনোদচন্দ্র প্রস্থানের উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গোবিন্দনাথ কহিলেন, "এরই মধ্যে চললে কেন হে ? তামাক খেয়ে যাও।"
"না, আর বসব না। রাত হয়েছে।" বলিয়া বিনোদ চলিয়া গেলেন।

তিন

অমলা শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পাঁচ ছয় দিন পরে কোন এক অপরাহ্ণে বিজয়নাথ তাহার দ্বিতলস্থ শয়ন কক্ষে শয্যায় শয়ন করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কিয়দংশ তথা হইতে দেখা যাইতেছিল। তথায় নিম্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়া কোনও বিষয় লইয়া তুমুল বচসা বাধাইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের কলহ বা কোলাহলের প্রতি বিজয়নাথের কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। যে দুরন্ত বেদনা এই কয়েক দিন বুকের মধ্যে দপ্ দপ্ করিয়া নিরন্তর তাহাকে ব্যথিত করিয়াছে, তাহারই নিরবশেষ আঘাতে তাহার সমস্ত চেতনা বিকল হইয়া ছিল। সে অসংলগ্ন ভাবে নিজের বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বাল্যকাল হইতেই সে মাতৃহীন। ভ্রাতা ও ভগিনী কেহই তাহার ছিল না। বিপত্নীক পিতার একমাত্র সন্তান হইয়াও সে স্নেহ অপেক্ষা অধিকতর শাসনেরই মধ্যে পালিত হইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়-বিজ্ঞ কঠোর পিতার কর্তব্য পরিচালনার অবকাশে মাঝে মাঝে গোবিন্দনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী বিনোদিনী আসিয়া মরুভূমির মধ্যে বৃষ্টিধারার মতো, কিছুদিনের জন্য বিধি-নিয়ন্ত্রিত সংসারের মধ্যে একটা স্নেহ-সরসতার সৃষ্টি করিত; কিন্তু সে নিতান্তই মাঝে মাঝে। কঠিন পর্বত যেমন গিরি-নির্ঝরিণীর উচ্ছ্বাসকে একটুও নিরোধ করে না, অবলীলাক্রমে নিজের কঠোরতার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দেয়, ঠিক সেইরূপে গোবিন্দনাথ বিনোদিনীর সর্বপ্রকার ইচ্ছা-অভিলাষ কার্য-কলাপের নিম্নে শান্ত হইয়া থাকিতেন। সংসারে অমলা প্রবেশ করিবার পর বিজয়নাথের বৈচিত্র্যহীন জীবন কয়েক দিনের জন্য এক নূতন আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এক অচিন্তিত ঘটনার মধ্য দিয়া দীপ্তিটুকু চিরদিনের জন্য অপসৃত হইয়া গেল, রহিল শুধু অনপনেয় দাহ! শীতকালের দ্রুত-বিলীয়মান অপরাহ্ণের অস্পষ্টতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা অপরিমেয় গ্লানি ও ঘৃণায় সমগ্র বিশ্ব-সংসারের উপর বিজয়নাথ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। মনে হইল তাহার জীবনটা যেন এক বজ্র-বিদীর্ণ মহীরুহ, পত্র-পুষ্প যাহা কিছু সব জ্বলিয়া গিয়াছে, শুধু নিষ্ফল দেহটা মাটির নিম্নের শিকড় অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পদশব্দে বিজয়নাথ ফিরিয়া দেখিল কক্ষে একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়াছে। কোন প্রশ্ন না করিয়া সে নিঃশব্দে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"দাদাবাবু, আপনাকে কর্তামশাই ডাকছেন।"

"কেন? কী দরকার?"

ভৃত্য প্রয়োজন নির্দেশ করিতে পারিল না।

ক্ষণকাল অলস ভাবে পড়িয়া থাকিয়া বিরক্তি সহকারে বিজয়নাথ শয্যাত্যাগ করিল; তৎপরে নিম্নতলে বৈঠকখানায় গোবিন্দনাথের নিকট উপস্থিত হইল।

গোবিন্দনাথ বৈঠকখানায় একাকী অবস্থান করিতেছিলেন, বিজয়নাথকে দেখিয়া কহিলেন, "বোস।"

বিজয়নাথ উপবেশন না করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আর কোনও প্রকার ভূমিকা না করিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছি। পঁচিশে মাঘ তোমার বিবাহ দোব।"

বিজয়নাথের উত্ত্যক্ত বিদ্রোহী মন এই প্ররোচনায় একেবারে সংযমহীন হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কোনও রূপে নিজেকে শান্ত করিয়া লইয়া সে কহিল, "স্থির করবার আগে আমাকে ডাকলে ভাল হতো।"

"কেন?"

বিজয়নাথ একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, "তা হলে যাদের সঙ্গে কথা স্থির করেছেন, তাদের নিকট অপ্রতিভ হবার কারণ ঘটত না।"

গোবিন্দনাথ তামাক টানিতেছিলেন; বিজয়নাথের কথা শুনিয়া আলবোলার নলটা ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া বিজয়নাথের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ঠিক বুঝলাম না। অপ্রতিভ হবার কারণ কেন ঘটবে?"

বিজয়নাথ দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি বিয়ে করব না।

"কেন?"

একটু ইতস্তত করিয়া বিজয়নাথ কহিল, "প্রবৃত্তি নেই।"

উত্তর শুনিয়া গোবিন্দনাথ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "তুমি যখন এতটা প্রবৃত্তিবাজ হয়ে উঠেছ, তখন কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে জানা দরকার। হরমোহনের মেয়েকে কি তুমি ত্যাগ কর নি?"

বিজয়নাথ কহিল, "যে কথা শেষ হয়ে চুকে গেছে, সে কথা আবার নতুন ক'রে তুলে লাভ কী? সে বিষয়ে তো আমার সঙ্গে আপনার সব কথা হয়ে গিয়েছে।"

"তবে বিয়ে করতে প্রবৃত্তি নেই কেন?"

বিজয়নাথ অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "ঠিক সেই জন্যেই প্রবৃত্তি নেই। এবার যার সঙ্গে বিয়ে হবে, বলা যায় না তো দুদিন পরে তাকেও হয়তো আবার ত্যাগ করতে হ'তে পারে। তার চেয়ে বিয়ে না করাই ভালো।"

পুত্রের এ কৈফিয়তে গোবিন্দনাথ কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। বিজয়নাথের কথায় যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও তিরস্কার নিহিত ছিল, তাহা তাঁহাকে তীব্রভাবে দংশন করিল। আরক্ত নেত্রে বিজয়নাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুমি কি

বলতে চাও যে, এখন থেকে তুমি আমার কোন কথা মেনে চলবে না, নিজের স্বাধীন মতে চলবে ?"

বিজয়নাথ কহিল, "না, আমি ঠিক তা বলতে চাইনে, কিন্তু এটুকু আপনাকে জানাচ্ছি যে, দ্বিতীয়বার বিবাহ আমি করব না। অতএব অনর্থক আপনি সে বিষয়ে কারও সঙ্গে কথা ক'য়ে অপদস্থ হবেন না।"

গোবিন্দনাথের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, "তুমি আমাকে এত দুর্বল মনে কোরো না যে, তুমি আমার একমাত্র ছেলে ব'লে তোমার সব রকম উপদ্রব আমি সহ্য ক'রে চলব।"

অমলাকে পরিত্যাগ করিবার বিষয়ে আলোচনার সময়ে গোবিন্দনাথ একবার বিজয়নাথকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন ক'রয়াছিলেন যে, অমলাকে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হইলে তিনি বিজয়নাথকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। পুনরায় গোবিন্দনাথকে সেইরূপ ইঙ্গিত করিতে দেখিয়া বিজয়নাথের চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল এরূপ হীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করাও শ্রেয়। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আপনার সম্পত্তির লোভে আমি সব রকম অত্যাচার সহ্য ক'রে চলব, আমাকেও তত দুর্বল মনে করবেন না। আপনার রক্ত আমার শরীরে আছে, আমি আপনার পোষ্যপুত্র নই !"

এত বড় কথার উত্তরে গোবিন্দনাথ কোনও কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

গোবিন্দনাথের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বিজয়নাথ কহিল, "এ বিষয়ে আপনি যা স্থির করবেন, তা আমাকে জানাবেন। যে বিষয়ে আমি আপত্তি জানিয়ে গেলাম তা ছাড়া আর কোনও বিষয়ে আমার আপত্তি হবে না।" বলিয়া তথা হইতে সে প্রস্থান করিল।

মানুষের আয়ুর শেষ আছে, কিন্তু জ্ঞানের শেষ নাই, সে কথা সেদিন গোবিন্দনাথ কতকটা বুঝিয়াছিলেন।

চার

সময় জিনিসটা এমন যে, তাহার গতিকে আর কিছু না বলিলেও অবাধ বলা নিশ্চয় চলে। সুখ দুঃখ, রোগ শোক, হাস্য রোদন কোন কিছুরই ধাক্কায় তাহার অন্ধ অবিশ্রাম গতি এক মুহূর্তেরও জন্য সংহত থাকে না। তাই হরমোহনের বেদনাপীড়িত সংসার দুঃখের গুরুভার বহন করিয়াও জগতের সহিত তাল রাখিয়া চলিল। চলার অবশ্য প্রভেদ আছে; কেহ সুখের হাওয়া-গাড়িতে

অবলীলাক্রমে চলিয়াছে, কেহ দুঃখের ভগ্নপদে সকাতরে চলিয়াছে। কিন্তু চলা ভিন্ন কাহারও উপায়ান্তর নাই, চলিতেই হইবে।

শ্বশুর গৃহ হইতে অমলার বহিষ্কৃত হওয়ার পর ক্রমশঃ ধীরে ধীরে দীর্ঘ তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হরমোহন ও প্রভাবতীর হৃদয়ের ক্ষতর উপর কালের প্রলেপ পড়িয়া পড়িয়া ক্রমশঃ তাহা অধিক হইতে অল্প হইয়া আসিয়াছে; দুর্ভাগিনী কন্যার দুরদৃষ্ট লইয়া তাঁহাদের যে মনঃকষ্ট এখন তাহার সহিত তাঁহারা অনেকটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের এই স্বামিত্যক্তা কন্যাটিকে তাহার সীমন্তে সিন্দুর এবং হস্তে লৌহবলয় থাকা সত্বেও বিধবারই মতো মনে করিতে হইবে, এবং তাঁহাদের কন্যাও যাহাতে তাহার যথার্থ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া আপনাকে তদতিরিক্ত কিছু মনে না করে, সে বিষয়েও তাঁহারা মনোযোগী হইতেছিলেন।

কিন্তু এ বিষয়ে অমলার চিত্তের গতি তাহার পিতামাতার অনুগামী তো ছিলই না, বরং বিপরীত ছিল। যে-দিন বৈবাহিকের সহিত বচসা করিয়া হরমোহন অমলাকে নিজ গৃহে লইয়া আসেন, সেদিন পিতা-মাতার চাঞ্চল্য দেখিয়া অমলারও মন অধীর হইয়া উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেদিন তাহার বালিকা-হৃদয়ে সে তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই এখন যাহা সময়ে সময়ে তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন তাহার চিত্তে বাসনা-কামনার উন্মাদনা ছিল না, তাই ক্ষতির মাপকাঠিও ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু তাহার পর এই তিন বৎসরে ক্রমশঃ তাহার দেহ ও মনে যৌবনের প্রবল প্লাবন যে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার অনিবার্য উপদ্রব হইতে সে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইবে? পলে পলে ক্রমশঃ যাহা সঞ্চিতই হইয়া উঠিতেছে, অথচ সার্থকতার বিস্তৃত প্রবাহে প্রশান্ত হইয়া বহিয়া যাইবার উপায় নাই, তাহা উদ্দাম না হইয়া আর কী হইবে?

প্রথমে অমলা ব্যাপারটাকে নিতান্ত সামান্যরূপেই গ্রহণ করিয়াছিল। পিতায় শ্বশুরে বচসা, কোনপ্রকার গুরুতর কারণ তাহার অজ্ঞাত, কাজেই অল্প দিনে মিটিয়া যাইতে বাধ্য। স্বামীর নিকট সে যে শুধু নিরপরাধ তাহাই নহে; এই অল্পদিনের মধ্যেই সে যে স্বামীর হৃদয় অনেকখানি অধিকার করিয়া লইয়াছিল সে জ্ঞানও তাহার ছিল। তবে কেন সে স্ত্রীর সহজ এবং ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইবে? কেন সে মনে করিবে যে, পাপ না করিয়াও সমস্ত জীবন তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে? কিন্তু কোনও প্রকার পরিবর্তন না আনিয়া যখন দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, তখন অমলা ব্যস্ত হইয়া বিজয়নাথকে কয়েকখানি পত্র লিখিল। প্রথমে সহজ পত্র, তাহার পর অভিমান, তাহার পর ক্রোধ, সর্বশেষে মিনতি। প্রত্যেক পত্রটি লিখিয়া উত্তরের অপেক্ষায় সে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত; মনে মনে বিজয়নাথের পত্রের মর্ম কল্পনা করিত। অকারণ-নিষ্ঠুর আচরণের জন্য পত্রমধ্যে কত দুঃখ, কত অনুতাপ প্রকাশ;

তাহার পর সেই অসঙ্গত অপরাধ-স্খালনের জন্ত কী ব্যাকুল ও কাতর ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করা! পত্রের প্রতি অক্ষর যেন দুঃখ ও বেদনার এক একটি পর্দা! নিজের অনুযোগ ও ভৎসনা-তীক্ষ্ণ পত্রের উত্তরে বিজয়নাথের করুণ কাতর পত্র পাঠ করিয়া অমলা মনে মনে কুণ্ঠা ও ক্লেশ অনুভব করিত। তাহার পর একদিন বসন্তের কোনও এক অপূর্ব সন্ধ্যায়, যখন প্রকৃতি গন্ধে-বর্ণে, পুষ্পে-গীতে, প্রমত্ত কামিনীর মতো লালসা-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; মলয় পবন, চন্দ্রকিরণ ও পাপিয়ার তান মিশ্রিত হইয়া এক অদ্ভুত রসায়ন প্রস্তুত হইয়াছে; এবং সেই উগ্র আসব পান করিয়া বিশ্ব বিবশ হইয়া টলমল্ করিতেছে; মিলনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে সহসা বিজয়নাথ আসিয়া উপস্থিত হইবে,—ব্যথিত, অনুতপ্ত! চক্ষে আকুল আগ্রহ, বক্ষে ব্যাকুল প্রেম! অমলা মুদ্রিত কলিকার মতো, সংকুচিত শুক্তির ন্যায় আপনাকে আপনার মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া কঠিন হইয়া অবস্থান করিবে,—সংজ্ঞাহীন, শব্দহীন, অসাড়। তাহার পর আবেদন নিবেদন মিনতি বিনতি; তাহার পর সহসা কখন্ চক্ষের পলকে বাহুতে কণ্ঠে, অধরে অধরে বক্ষে বক্ষে নিবিড় মিলন!

কিন্তু হায়, কোথায় সে অধীর উন্মত্ত মিলন! কোথায় পত্র-পত্রোত্তর! কোথায় বসন্তের মদালস সন্ধ্যা! এ যে নিদাঘের দুঃসহ প্রদাহে সমস্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল!

এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া ক্রমশঃ মেঘের মধ্যে বজ্রের মতো অমলার অন্তঃকরণে দুঃখের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হইল। মনের যখন এইরূপ অধীর বিদ্রোহী অবস্থা তখন সহসা একদিন অমলার জীবন-পথে প্রমথ আসিয়া দাঁড়াইল।

পাঁচ

প্রমথ পিতৃমাতৃহীন ধনী যুবক। নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে। উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের সহিত অর্থ সংযুক্ত হইলে মানুষ যে পথের পথিক হয়, প্রমথনাথের নিকট সে পথের কোন সন্ধান-সন্ধি অজ্ঞাত ছিল না। সমঝদার ব্যক্তিরা বলিত, এ বিষয়ে প্রমথ অদ্ভুত কৌশলী; উপমায় ভাষায়, নারী-মৃগয়ায় সে নিপুণ শিকারী। কোন চকিতা ত্রস্তা হরিণীকে ধরিতে হইলে, কখন্ তাহার কর্ণে বংশীর কোন্ রাগিণী বর্ষণ করিতে হইবে, কোন্ পথে তাহার গতি অপ্রতিহত রাখিতে হইবে এবং কোন্ পথে রোধ করিতে হইবে, পদস্খলনের জন্ত কখন্ তাহার পথে প্রচ্ছন্ন গহ্বর প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং কোন্ পরম এবং চরম অবসরে তাহার চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত জাল ধীরে ধীরে কিংবা দ্রুতবেগে

গুটাইয়া লইতে হইবে, সে সকল কৌশল এ ব্যাধের সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল। গতিকে সে এমন মন্দ করিতে জানিত যে, দেখিলে তাহাকে গতিহীন বলিয়া ভ্রম হইত; এবং উদ্দেশ্যকে সে এমন প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিত যে, শিকার তাহার করায়ত্ত হইয়াও তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিত না।

অমলার সহিত প্রমথর একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বটে, কিন্তু তাহা এতই সুদূর যে, সম্পর্ক অপেক্ষা সম্পর্কের অভাবই তাহার দ্বারা অধিক সূচিত হইত। অমলা প্রমথনাথের দূর সম্পর্কিণী মাসীর ননদকন্যা। কিন্তু দূরকে নিকট করিয়া লইবার কৌশল যাহার জানা আছে, তাহার নিকট কোন দূরত্বই দূর নহে। তাই সেদিন যখন হরমোহনের গৃহে উপস্থিত হইয়া অমলাকে সম্মুখে পাইয়া তাহাকে অন্তরালে যাইবার অবসর না দিয়াই প্রমথ বলিয়া উঠিল, "কী অমলা, তোমার প্রমথদাদাকে মনে আছে তো?" তখন অমলার গমনোদ্যত চরণ সহসা গতি হারাইয়া আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। সম্পর্ক ধরিয়া যে ডাক দিয়াছে, তাহাকে লজ্জা করিতে সংকোচ বোধ করে না, এমন নির্লজ্জ অতি অল্পই আছে।

অমলার মুখে কিন্তু প্রমথর প্রশ্নের কোন উত্তর আসিল না; সে লজ্জারক্তিম মুখে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

প্রভাবতী হাস্যমুখে কহিলেন, "মনে নিশ্চয়ই আছে, তবে বছর চার পাঁচ তোমার দেখা তো আমরা পাই নি। প্রমথকে প্রণাম করো, অমলা।"

অমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রমথকে প্রণাম করিল। অবনতা অমলার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া প্রমথ কহিল, "চিরসুখী হও।" অমলা সরিয়া আসিয়া জননীর পার্শ্বে উপবেশন করিল।

প্রমথর আশীর্বাদ শুনিয়া প্রভাবতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। "সুখ আর কোথায় বাবা? সুখের পথে তো বিধাতা চিরদিনের জন্য কাঁটা দিয়েছেন।"

কথাটা প্রমথ ভালোরূপই জানিত, কিন্তু তদ্বিষয়ে যেন সে কিছুই জানে না সেইভাবে সবিস্ময়ে বলিল, "কেন বল দেখি? কী হয়েছে?"

প্রভাবতী সংক্ষেপে কিন্তু ধীরে ধীরে প্রায় সব কথাটাই বলিয়া গেলেন। বসিয়া থাকা অপেক্ষা উঠিয়া যাইতেই বেশি লজ্জা করিতেছিল বলিয়া উঠি উঠি করিয়াও অমলা মাথা নিচু করিয়া বসিয়া নিজের দুরদৃষ্টের কাহিনী শুনিতে লাগিল, এবং সেই সকরুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে ছলনার মধ্যেও প্রমথর মুখে মাঝে মাঝে বিরক্তি ও ঘৃণার সুপরিস্ফুট চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কাহিনী সমাপ্ত হইলে প্রমথ ক্ষণকাল এরূপ নির্বাক হইয়া রহিল যে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়াও প্রভাবতীর এবং তাহার মুখের দিকে না চাহিয়াও অমলার মনে হইল যে, দুঃখে ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। অবশেষে দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া চাপা গলায় প্রমথ যখন কয়েকটা দুর্বোধ্য ইংরাজী বাক্য উচ্চারণ করিল, তখন তাহার মর্ম কিছুমাত্র না বুঝিয়াও প্রভাবতী

ও অমলা বুঝিল যে, গোবিন্দনাথ ও বিজয়নাথের প্রতি সেগুলো কঠোর কটূক্তি।

সমবেদনার প্রভাবে প্রভাবতীর চক্ষে জল আসিল। অঞ্চলের প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "এ যে আমার কী শাস্তি হয়েছে বাবা। এর চেয়ে যদি মেয়েটা —"বাকি কথা মুখেই রহিয়া গেল, এত দুঃখেও কন্যার অকল্যাণের বাক্য মুখ দিয়া বাহির হইল না।

মুখ বিকৃত এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রমথ কহিল, "কী বলব মাসিমা, এর ওষুধ হচ্ছে চাবুক, ঘোড়ার চাবুক!" কিন্তু বক্র কটাক্ষে এক নিমেষে অমলার মুখের ভাবে তাহার মনের ভাব বুঝিয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে, বিজয়ের এর মধ্যে কোনও দোষ নেই, বাপের বর্তমানে সে কী করতে পারে বল? লেখাপড়া শিখে সে যে নিজের ইচ্ছায় এমন জানোয়ারের মতো ব্যবহার করবে, এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তুমি ঠিক জেনো মাসিমা, সময়ে এসব ঠিক হয়ে যাবে।"

ব্যথিত স্বরে প্রভাবতী বলিলেন, "একদিন আমিও এই আশাই করতাম। কিন্তু আর আমার সে আশা নেই। তাই যদি তার মনে থাকত তাহলে এই তিন বৎসরে মেয়েটাকে অন্তত: একখানা চিঠিও তো দিতে পারত? আচ্ছা, তা না-হয় নাই দিলে, কিছুদিন আগে পথে এঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এঁরা কথা কইতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে কথা না কয়ে পাশ কাটিয়ে চ'লে গিয়েছিল। তবে আর ভালো বলি কাকে বলো?"

কথাবার্তার গতি ক্রমশ: যে রূপ ধারণ করিতে লাগিল, তাহাতে আর কোন প্রকারেই অমলার সেখানে বসিয়া থাকা চলিল না। উঠিবার সংকোচ কোনও প্রকারে অতিক্রম করিয়া সে উঠিয়া পড়িতেই প্রভাবতী বলিলেন, "অমলা, প্রমথর জন্যে জলখাবার নিয়ে এস তো মা। এই রোদে বাছার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে!"

জলখাবারের জন্য মৃদু আপত্তি করিয়া প্রমথ পুনরায় পূর্ব কথা পাড়িল। অমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বলিল, "এ সব কথা আমাকে আগে জানাও নি কেন মাসিমা? আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটা এতদূর গড়ান সত্ত্বেও আমি মিটিয়ে দিতে পারব।"

কথাটা শেষ পর্যন্ত শুনিবার একটা অধীর আগ্রহ বহন করিয়া অমলা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। প্রমথর আশ্বাস বচন শুনিয়া তাহার অসাড় বিমুখ হৃদয় সহসা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চকিত হইয়া উঠিল,—আশার আনন্দে নহে, কৌতূহলের উত্তেজনায়; যে পথের লৌহ-দ্বারে অদৃষ্ট কঠিন অর্গল দিয়া দিয়াছে, সেখানে আর ব্যবস্থা করিবার কী বাকি আছে, তাহাই জানিবার আগ্রহে।

প্রভাবতী কিন্তু আশায় ও আনন্দে একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন। কন্যার দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁহার মনে এক মুহূর্তও সুখ ছিল না। কালের প্রভাবে

দুঃখের সে তীব্র ক্লেশ কমিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু একটা বদ্ধ-গভীর বেদনা হৃদয়কে নিরন্তর ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত। তাই এই দুর্বহ পারিবারিক অমঙ্গল হইতে উদ্ধার পাইবার বিন্দুমাত্র আশ্বাস পাইয়াই তাঁহার মন সম্ভাবনা অসম্ভাবনার বিচার না করিয়াই একেবারে নাচিয়া উঠিল।

"তা যদি পার বাবা, তা হলে, তুমি পেটের সন্তানের তুল্য তোমাকে আর বেশি কী বলব, পোড়ারমুখীর একটা কিনারা হয়। তা না হলে, মা হয়েও এ কথা আমার মুখে বাধছে না, ওর থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।"

অমলা যতক্ষণে প্রমথর জন্য জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল, ততক্ষণে প্রমথ আশা ও আশ্বাসের প্রয়োগে প্রভাবতীর মন সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া লইয়াছিল। এই ভাবিয়া প্রভাবতীর অনুশোচনা হইতেছিল যে, মনান্তরের প্রথম সূচনার সময়ে প্রমথ কেন আসে নাই, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই নিদারুণ বিপত্তি ঘটিতেই পারিত না। এত দুঃখের পরও যাঁহার করুণায় পরিত্রাতা রূপে আজ প্রমথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার চরণোদ্দেশে প্রভাবতী শতবার মনে মনে প্রণাম করিলেন।

এক হস্তে একখানা রেকাবে কিছু আহার্য ও অপর হস্তে এক গ্লাস জল লইয়া অমলা প্রবেশ করিল, এবং প্রমথর অনতিদূরে একখানি আসন পাতিয়া আসনের সম্মুখে জল-হাত বুলাইয়া জলখাবারের পাত্র ও জলের গ্লাস রাখিয়া মুখ তুলিতেই প্রমথর দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। সম্পর্কের হিসাবে প্রমথ অমলার দাদা, তা সে সম্পর্ক যত সুদূরই হউক না কেন; এ পর্যন্ত বাক্যে ও আচরণে প্রমথ সেই সম্পর্কেরই হিসাব রাখিয়া আসিয়াছে, এবং গৃহে পদার্পণ করিয়া অবধি সে অমলার জীবনের সর্বোচ্চ ইষ্টসাধন করিবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া অন্তত, বাহ্যতঃ, অমলার একজন পরম শুভানুধ্যায়ী রূপে নিজেকে দাঁড় করাইয়াছে। প্রমথর স্বপক্ষে এ সকল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, মনুষ্য-মস্তিষ্ক-নিহিত আত্মরক্ষার স্বাভাবিক বুদ্ধিবলেই হউক অথবা অপর যে কারণেই হউক, প্রমথকে ততখানি শুভানুধ্যায়ী বলিয়া অমলার মনে হইল না যতখানি প্রভাবতীর মনে হইতেছিল। প্রমথর সহিত চোখা-চোখি হইতেই অমলার মনে হইল যে প্রমথর সেই তীব্র-তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে যে জিনিসটা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, তাহা ঠিক করুণা বা উপচিকীর্ষার মতোই স্নিগ্ধ নহে। সে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নত করিল।

অমলা যখন অবনত হইয়া জলখাবার দিতেছিল, তখন তাহার আনত-আরক্ত মুখের উপর প্রমথ ও প্রভাবতী উভয়েরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া ছিল। মানুষের মন এত সহজে ও সম্পূর্ণ রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে যে, এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী মন এত কাছাকাছি ও পাশাপাশি থাকিয়াও কোনও প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করিল না। প্রভাবতী নিশ্চিন্ত প্রসন্ন মনে যখন বুঝিয়া রহিলেন যে, প্রমথর পরদুঃখকাতর হৃদয়ে সহানুভূতি ও হিতৈষণার সুধা ক্ষরিত হইতেছে, ঠিক তখন তথায় লালসা ও শঠতার রাসায়নিক ক্রিয়া পুরাদস্তুর চলিতেছিল।

হরমোহন অফিস হইতে আসা পর্যন্ত প্রভাবতী প্রমথকে ছাড়িলেন না, এবং প্রমথও সহজেই সে পর্যন্ত থাকিয়া গেল।

প্রমথর মুখে সকল কথা শুনিয়া হরমোহন বলিলেন, "আমার তো একটুও মনে হয় না যে, সে পাষণ্ডকে তুমি কোন রকমে রাজি করাতে পারবে। তবে বিজয় যখন তোমার বন্ধু বলছ, তখন চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো। কিন্তু তার বিষয়েও আমার কোনও আশা নেই, সে-ও তার বাপেরই মতো নির্মম বলে আমার মনে হয়।

কক্ষের বাহিরে দ্বার-পার্শ্বেই যে অমলা ছিল, তাহা প্রমথ, চক্ষে দেখিতে না পাইলেও, অনুমানে বুঝিয়াছিল। ঘরের বাহির হইতেও যাহাতে কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ উচ্চকণ্ঠে সে বলিল, "গোবিন্দবাবুর বিষয়ে আপনি যাই বলুন মেসোমশায়, আমি তাতে আপত্তি করব না; কিন্তু বিজয় আমার বন্ধু, তাকে তো আমি চিনি। সে কখনও নিজের ইচ্ছায় এ ব্যাপার করে নি। সে যখন স্বাধীন ভাবে চলতে পারবে, তখন নিশ্চয়ই তার ত্রুটি শুধরে নেবে।"

প্রমথর কথা শুনিয়া হরমোহন মনে মনে হাসিলেন; মুখে বলিলেন, "তা বেশ তো, তুমি চেষ্টা ক'রে দেখো। যদি সফল হও তো একটা নিরীহ বালিকার ব্যর্থ জীবন সার্থক করবে। কিন্তু দোহাই বাবা, আমাকে যেন এর মধ্যে টেনো না। আমি আর জীবনে গোবিন্দ হারামজাদার সঙ্গে বাক্যালাপ করব না, তা যদি সে এসে আমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চায়, তবুও নয়।"

একটু হাসিয়া প্রমথ বলিল, "না, এর মধ্যে আপনার সাহায্য আমি একেবারেই চাইব না। তা ছাড়া, ঠিক অবসর না বুঝলে আমিও এ বিষয়ে কথা পাড়ব না। দেরি যদি হয়, তাহলে মনে করবেন না যে, আমি নিশ্চেষ্ট রয়েছি, বা চেষ্টা নিষ্ফল হলো।"

হরমোহন বলিলেন, "না না, সে তুমি যেমন ভালো বুঝবে করবে। কখনই যে ঘটনা ঘটবে না ব'লে আমার বিশ্বাস, সে ঘটনা কেন শীঘ্র ঘটছে না ব'লে আমি কখনও অধীর হব না।"

পুনরায় হাসিয়া প্রমথ বলিল, "আপনি যখন আমাকে এমন অবাধ অবসর দিচ্ছেন, আর মনে সফলতার একটুও আশা রাখছেন না, তখন আমার মনে হচ্ছে, আমি নিশ্চয় সফল হব।"

এক পেয়ালা গরম চা নিঃশেষ করিয়া প্রমথ বাহিরে আসিয়া গৃহ-কার্যরতা প্রভাবতীকে বলিল, "মাসিমা, আজ তাহলে চললাম।" তাহার পর অদূরে দণ্ডায়মানা অমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "অমলা, পান থাকে তো দু চারটে দাও, অনেকখানি রাস্তা চলতে হবে।"

ব্যস্ত হইয়া প্রভাবতী বলিলেন, "অমল, শীগ্‌গির তোমার প্রমথ দাদাকে পান দাও; যদি সাজা না থাকে তো সেজে দাও।" প্রমথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রাত হয়ে গেছে, দুটি খেয়ে যাও না বাবা?"

স্মিতমুখে প্রমথ বলিল, "এ ত বাড়ির কথা মাসিমা, দরকার হ'লে চেয়ে খেয়ে যাব। কিন্তু আজ নয়, আজ আমার একটু বিশেষ দরকার আছে।"

"তবে শীগ্‌গির আর একদিন এসো।"

"তা আসব অখন। পান সাজা না থাকলে দরকার নেই অমলা, আমি চললাম।" বলিয়া প্রমথ প্রস্থানোদ্যত হইল।

"না, না, দেরি হবে না; সেজে দিচ্ছে। পান নিয়ে তবে যেয়ো।" বলিয়া প্রভাবতী রন্ধনালয়ের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পাশের একটা ঘরে অমলা তাড়াতাড়ি পান সাজিতে বসিয়াছিল, প্রমথ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল।

"পান সাজতে হলো অমল? মশলা দিলেই তো পারতে? তাই দাও না।"

এই অতি-ঘনিষ্ঠতার সম্বোধনে লজ্জিত হইয়া অমলার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে অবনত মস্তকে বলিল, "দেরি হবে না, একটু দাঁড়ান।"

বিস্ময়াতিশয্যের স্বরে প্রমথ বলিয়া উঠিল, "দাঁড়ান কী রকম কথা অমলা। আপনার লোককে কখনও আপনি বলতে আছে? দাঁড়াও।"

এই আত্মীয়তাসূচক ভর্ৎসনায় অধিকতর লজ্জিত হইয়া অমলা মাথা নত করিয়া রহিল। তৎপরে চার খিলি পান মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে প্রমথর দিকে আগাইয়া ধরিল।

অমলার হস্ত হইতে পান লইয়া স্মিতমুখে প্রমথ বলিল, "আচ্ছা, আজকে ক্ষমা করলাম; কিন্তু ফের যদি কোনও দিন এমন অবিবেচনার কাজ করো, তাহলে সকলের সামনে তোমাকে আপনি ব'লে সম্বোধন ক'রে শাস্তি দোব। আর এমন ভুল হবে না তো?"

অগত্যা অমলাকে মৃদুহাস্য সহকারে বলিতে হইল, "না।"

"বেশ।" বলিয়া প্রমথ প্রফুল্লমুখে প্রস্থান করিল।

ছয়

পর দিন প্রাতে প্রমথ তাহার এক বিশেষ অনুগত বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইল। বন্ধুর নাম মানিকলাল মুখোপাধ্যায়।

মানিক গৃহেই ছিল, বাহিরে আসিয়া প্রমথকে দেখিয়া হাস্যমুখে বলিল, "কী প্রমথ, এত সকালে কী মনে ক'রে?"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তোমাকে মহাজন করতে।"

"মহাজন করতে? কার মহাজন হে?"

ইতস্ততঃ দেখিয়া লইয়া প্রমথ মানিকলালের কর্ণে মৃদুস্বরে কথা বলিল।

"কী রকম ?" বলিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মানিক প্রমথর প্রতি চাহিয়া রহিল।

"সব না শুনলে বুঝতে পারবে না। তোমার সঙ্গে বিশেষ একটু পরামর্শ আছে। কোথায় বসবে বলো ?"

"এইখানেই বোস না। এখানে এখন কেউ আসবে না।"

অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। প্রমথ বলিল, "কী হে, পারবে তো ?"

প্রমথর কথা শুনিয়া মানিক শুধু ঈষৎ হাস্য করিল, প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিল না।

প্রমথ বলিল, "তা হলে আর দেরি ক'রে কাজ নেই, এখনই বেরিয়ে পড়। আমি সন্ধ্যার সময়ে আবার আসব। নাম আর ঠিকানাটা কাগজে লিখে নাও।"

প্রমথ চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মানিক বহুবাজার অঞ্চলের এক গৃহে উপস্থিত হইল।

বহির্বাটিতে একটি বালক পাঠাভ্যাস করিতেছিল। মানিক তাহাকে বলিল, "এই কি প্রিয়নাথবাবুর বাড়ী ?

"হ্যাঁ।"

"তিনি বাড়ি আছেন ?"

"আছেন।"

"একবার ডেকে দাও, আমি দেখা করব। নাম জিজ্ঞাসা করলে বোলো মানিকলাল মুখোপাধ্যায়।"

ক্ষণকাল পরে প্রিয়নাথ বাবু বাহিরে আসিলেন।

মানিক নমস্কার করিয়া কহিল, "মাফ করবেন, আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম।"

মানিকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "কী আপনার প্রয়োজন, বলুন।"

মানিক বলিল, "আমি যা নিবেদন করব, তাতে একটু সময় লাগবে। অমন ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হবে না, একটু বসুন।"

আসন গ্রহণ করিয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, "বলুন। তবে একটা কথা আপনাকে গোড়াতেই ব'লে রাখি, লাইফ-ইনসিওর আমি কিছুতেই করব না, আর কন্যাদায়গ্রস্তের সঙ্গে আমি কোনও সম্পর্ক রাখিনে। অতএব ওদুটো প্রসঙ্গের মধ্যে যদি আপনার কোনটা হয়, তা হলে প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো।"

অল্প হাসিয়া মানিক বলিল, "লাইফ-ইনসিওর আপনার আমি করাব না, সে বিষয়ে অঙ্গীকার করছি; কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্তের সঙ্গে আপনি কোনও সম্পর্ক রাখেন না, সে কথাটা ভুল।"

বিরস মুখে প্রিয়নাথবাবু বলিলেন, "আপনি কি তবে—?"

মানিক প্রিয়নাথের কথা শেষ না হইতেই বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে হাঁ, কন্যাদায়গ্রস্ত ; কিন্তু আশ্বস্ত হোন্‌, সে দায় থেকে আপনার দ্বারা উদ্ধার হ'তে আসি নি। আপনাকেই একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছি।"

"কী রকম?" বলিয়া ঔৎসুক্যের সহিত প্রিয়নাথ মানিকলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"শ্যামবাজারের হরমোহন মুখোপাধ্যায়কে আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যান নি ?"

"না।"

"তিন চার বৎসর আগে তিনি যখন কন্যাদায়গ্রস্ত হয়েছিলেন, তখন বন্ধুত্ব ছাড়া তাঁর সঙ্গে আপনার আর একটা সম্পর্ক হয়েছিল, মহাজন আর খাতকের, —সে কথাও বোধ হয় আপনার মনে আছে ?"

"খুব আছে। তারপর ?"

"তারপর তিন হাজার আসল টাকা, যা আপনি তাঁকে ধার দিয়েছিলেন, এখন সুদে আসলে চার হাজারের ওপর দাঁড়িয়েছে। টাকাটা আপনার এখন বিশেষ প্রয়োজন ; অথচ হাতে-হাতে আদায়ের কোনও সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন না ; কাজেই মনে-মনে ভাবছেন, আদালতের আশ্রয় নিতে হবে ; কিন্তু আদালতের কথা মনে ভেবে গায়ে জ্বর আসছে। প্রথমতঃ, উকিলের বাড়ি দৌড়োদৌড়ি, তারপর আদালতে ছুটোছুটি, তারপর জলের টাকা তোলবার জন্যে হালফেল-ঘরের একরাশ টাকা জলে ফেলা। তারপর সমন ধরাবার জন্যে পেয়াদার কাছে খোশামুদি, তারপর এত কষ্টে যদি মামলা ডিক্রী হ'ল তো ডিক্রীজারীর ব্যবস্থা, বাড়ি ক্রোক করানো, নিলাম করানো। তারপর আপনার হাণ্ডনোটের টাকা, বাড়িখানি যদি কোথাও বাঁধা থাকে, তা হলে—"

চিন্তিত মুখে প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "থামুন মশায়, থামুন! আমি এত কথা না ভেবেই চিন্তিত হয়ে আছি, আমাকে আর বেশি ভয় দেখাবেন না। এখন উপায় কী বলুন দেখি ?"

গম্ভীর মুখে মানিক বলিতে লাগিল, "বাড়ি যদি বাঁধা থাকে তো আপনার টাকা ঘুঘুড়ীর ট্যাঁকে গেল। তারপর আপনি যদি নিতান্ত চক্ষুলজ্জাহীন হন তো বন্ধুর বিরুদ্ধে দেহ গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা, বন্ধুকে জেলে দেওয়া ; তারপর তাকে বসিয়ে ছ' মাস ধরে খাওয়ানো (তর্জনী হেলাইয়া) আপনার নিজের খরচে।"

মানিককে আর অধিক বলিবার অবসর না দিয়া প্রিয়নাথ ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন, "তাহ'লে আপনি বলতে চান কী ? আমি হাণ্ডনোটখানার টিকিট ছিঁড়ে আপনাকে দিয়ে দোব, আর আপনি গিয়ে সেখানা হরমোহনকে ফেরত দেবেন ?"

মুচকিয়া হাসিয়া জিভ কাটিয়া মানিক বলিল, "রামচন্দ্র ঃ। তা'হলে আপনার আর উপকার করলাম কী ? আপনি কতকটা ঠিক বলেছেন, আমি

আপনার হ্যাণ্ডনোটখানা নিয়ে যেতে চাই বটে, কিন্তু সুদে আসলে আপনার সব টাকা শোধ ক'রে দিয়ে তবে।"

"কী রকম ?" প্রিয়নাথের চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

ধীর গম্ভীর স্বরে মানিক বলিল, "ঠিক যে-রকম বলছি। আপনি যদি রাজি থাকেন, আজ বৈকালেই হ্যাণ্ডনোটখানা কিনে নিতে রাজি আছি।"

"কিনে নিতে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সত্যি কথা ?"

"সত্যি কথা।"

"পরিহাস করছেন না ?"

"পরিহাস করছি নে। পরিহাস করবার মতো আপনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আমার নেই।"

প্রিয়নাথের মুখ দিয়া আর কোনও বাক্য বাহির হইল না, শুধু বিস্ময় বিমূঢ়-দুটি চক্ষু মানিকের মুখে নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।

মানিক বলিল, "আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, এত বিপদের ভয় দেখিয়ে এ লোকটি স্বেচ্ছায় সেই বিপদে নিজেকে কেন বিপন্ন করতে চাচ্ছে। কেমন, ঠিক নয় ?"

ইতস্তত: করিয়া দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিলেন, "না, ঠিক তা নয়। তবে হ্যাঁ, আচ্ছা ওই কথাটারই জবাব দিন না।" তাহার পর হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ওরে খোকা! শীগ্‌গির একডিবে পান নিয়ে আয়!"

মনে মনে হাসিয়া, প্রকাশ্যে ঈষৎ চিন্তার ভাব দেখাইয়া, মানিক কহিল, "কথাটা আপনাকে বলতে পারি, যদি এই আশ্বাসটুকু পাই যে, কথাটা আর কেউ জানবে না।"

ব্যস্ত হইয়া প্রিয়নাথ বলিতে লাগিলেন, "আজ্ঞে না, কিছুতেই নয়, কোনো মতেই নয়। তবে যদি আপনার দ্বিধা হয়, কাজ কী, নাই শুনলাম। নিশ্চয়ই একটা সঙ্গত কারণ আছে; আর যদি নাই থাকে, তাতে আমার কী এসে গেল!"

মানিক বলিল, "বিলক্ষণ! আপনি যখন কথা দিচ্ছেন, তখন আবার দ্বিধা কী। তবে আপনি যখন বলছেন, সঙ্গত কারণ আছেই, আর না থাকলেও আপনার কিছু এসে যায় না, তখন না হয় নাই বললাম। কী বলেন ?"

ব্যগ্র হইয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, "বলবেন না, কখনও বলবেন না! নিজের গুপ্ত-কথা কখনও কাউকে বলতে নেই। কখন কার মুখ দিয়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বার হয়ে যায় বলা যায় না তো।" তাহার পর কণ্ঠস্বর সহসা গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "দেখুন মানিকবাবু, কথাটা যখন তুললেন, তখন দেরি না ক'রে সেরে

ফেলাই ভালো। মানুষের মনের কথা তো বলা যায় না। সাত পাঁচ ভেবে যদি পেছিয়েই পড়ি, সে ভাবনাও আছে তো?"

সবিনয়ে মানিক কহিল, "আজ্ঞে হাঁ, সে ভাবনা তো আছেই, তার চেয়ে গুরুতর ভাবনাও আছে।"

চিন্তিত হইয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, "কী বলুন দেখি?"

মানিকলাল তেমনই নিরীহভাবে কহিল, "সাত পাঁচ ভেবে আমরাই যদি পেছিয়ে পড়ি!"

মানিকলালের কথা শুনিয়া মনে মনে বিশেষরূপ চিন্তিত হইয়া প্রিয়নাথ উক্ত বিষয়ে আর কোনও কথা না কহিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে ও খোকা, পান নিয়ে আয় না রে!"

কয়েক দিনের মধ্যে যথাবিধি নোটিশ আদি জারি হইয়া হরমোহনের হ্যাণ্ডনোট মানিকলালের নামে বিক্রয় হইয়া গেল।

সাত

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিবার কোনও উদ্যোগ নাই। ঘনায়মান অন্ধকারে বারান্দায় বসিয়া প্রভাবতী বিমর্ষ মুখে নিজের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিলেন এবং ঘরের ভিতর শয্যার উপরে বালিশে মুখ গুঁজিয়া অমলা অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। আজ গৃহে নূতন মহাজন মানিকলাল আসিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়াছে, পরদিন সুদে আসলে সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিলে নালিশ করিবে।

অমলা আর্ত হইয়া পড়িয়া ছিল, কেবল মাত্র নালিশ হইবার ভয়ে বা ভাবনায় নহে। যে তীক্ষ্ণ বেদনায় তাহার চিত্ত নিপীড়িত হইতেছিল, তাহার জন্য মহাজনের পরিবর্তে খাতকই প্রধানতঃ দায়ী ছিল। টাকার জন্য মানিকলালের নিকট দুঃসহ অপমান-বাণী শুনিয়া ভিতরে আসিয়া হরমোহন অল্প যে দুই একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া অমলার পুনঃ পুনঃ ইহাই মনে হইতেছিল যে, তাহার বিড়ম্বিত জীবন লইয়া সে নিজে যত না কষ্ট পাইয়াছে, তাহার দশগুণ কষ্ট অপরকে দিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে সে তাহার দুরদৃষ্ট লইয়া নিজে যত না অসুখী হইবে, তাহাকে লইয়া অপরে তাহার দশগুণ অসুখী হইবে। মনে হইতেছিল, এমনই অশুভ মুহূর্তে সে এই বহু দিবসের পৈত্রিক গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল যে, গৃহখানি অপরের হস্তে তুলিয়া দিয়া তাহার একমাত্র সহোদরকে গৃহহীন না করিয়া সে নিরস্ত হইবে না।

যাহা হইবার তাহা তো হইয়াই গিয়াছে, তাহার আর কোনও উপায় ছিল না, অমলা ভাবিতেছিল ভবিষ্যতের কথা। এই দুঃখ ও অপমানের হাত হইতে নিজেকে

বাঁচাইবার উপায় সর্ব্বদাই তাহার হাতে রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তো বিপন্ন সংসারের কোনও উপকার হইবে না। তাহারই জন্য যে নিষ্ফল অসার্থক ঋণ কালসর্পের মতো তাহার পিতার বর্তমানকে ও তাহার সহোদরের ভবিষ্যৎকে কঠিন ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, তাহার দৃঢ় পাশ হইতে কী প্রকারে মুক্তি লাভ করা যায়, অমলা তাহাই ভাবিতেছিল। সে বিষয়ে কোনও প্রকার উপায় করা তাহার পক্ষে অসম্ভব সে জ্ঞান মনে মনে সম্পূর্ণ থাকিলেও, নিজের জীবনটাকে তাহার আজ এমনই এক অক্ষম্য অপরাধের মতো মনে হইতেছিল যে, নিজের উপর দিয়া এমন একটা নিদারুণ কল্পনা করিয়াও সে একটু তৃপ্তি পাইতেছিল। বিপদের দিনে মানুষ যেমন শত্রুর হাত চাপিয়া ধরে, আজ এই মহা অপমানের দিনে তেমনি অমলার মুহূর্তের জন্য বিজয়নাথকে মনে পড়িল। পত্র লিখিয়া তাহাকে তাহার এই বিপদের কথা জানাইলে কী হয়? সে তো তাহারই স্বামী। কিন্তু স্বামী কথাটা মনের মধ্যে আসিতেই মুহূর্তের মধ্যে অমলার চিত্ত বিরক্তি ও ঘৃণায় একেবারে বিরূপ হইয়া দাঁড়াইল! ছি ছি! তদপেক্ষা এখনই বাহিরে ছুটিয়া গিয়া মহাজনের পা জড়াইয়া ধরাও ভালো! তাহার মনে করুণা হইতে পারে, সে আরও কিছুদিন সময় দিতে পারে।

বাহিরে তখন হরমোহনের সহিত মহাজনের সেই কথাই হইতেছিল। মানিকলাল বলিতেছিল, "এই কথাটা আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন যে, যে মানুষ তিন বছরের সুদে আসলে এক পয়সা শোধ করলে না, তাকে আরও দু বছর সময় দিলে সে কেমন ক'রে সমস্ত টাকা শোধ ক'রবে?"

কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিবার ইচ্ছা না থাকিলেও অগত্যা হরমোহন বাধ্য হইয়া বলিলেন, "দু বছর পরে আমি লাইফ ইন্‌সিওরের টাকা পাব।"

"কত টাকা?"

একটু ইতস্তত: করিয়া হরমোহন বলিলেন, "প্রফিট নিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার হবে।"

একটু চিন্তা করিয়া মানিকলাল বলিল, "ও সব আমি বুঝিনে মশায়, লাইফ ইন্‌সিওরেন্স বড়ো গোলমেলে ব্যাপার। কোথায় কী গলদ আছে, ঠিক সময়ে পাবেন কি পাবেন না, তা কিছুমাত্র বলা যায় না। টাকা পাওনা হ'লে পাবার জন্যে যে লড়ালড়িটা করতে হয়, তা একটা মামলা মকর্দমার সমান। তারপর, আপনার পলিসি কোথাও বাঁধা আছে, কি না তা জানিনে; না থাকলেও বাঁধা দিতে কতক্ষণ লাগে বলুন? আর কোনও বার যদি প্রিমিয়ম্ না দিলেন তো সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল! ও সব সাত শ হাঙ্গামার মধ্যে আমার যাবার দরকার নেই, আমি সোজাসুজি নালিশ ক'রে ডিক্রী করিয়ে নিই।"

মানিকলালের কথা শুনিয়া হরমোহন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। বায়স্কোপের নিঃশব্দ অভিনয়ের মতো অদূর-ভবিষ্যতের নির্যাতন ও অপমানের দৃশ্যগুলি তাঁহার মানস নেত্রের সম্মুখে মুহূর্তের মধ্যে খেলিয়া গেল। ক্ষণকাল বিমূঢ় ভাবে অবস্থান

করিয়া হরমোহন মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "দেখুন, অফিসে আমার ক্যাশ নিয়ে কাজ, আপনি যদি আমার নামে নালিশ করেন, তাহলে আমার চাকরী পর্যন্ত যেতে পারে। ছা-পোষা গরিবের এত বড় সর্বনাশটা করার চেয়ে আর দু বছর সময় দেওয়া উচিত নয় কি? প্রিয়নাথবাবু তিন বছর অপেক্ষা করেছেন, আপনি কি দু বছরও পারেন না?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শ্লেষ-মিশ্রিত কণ্ঠে মানিক বলিল, "দেখুন হরমোহনবাবু, সব সহ্য হয়, ন্যাকামি সহ্য হয় না। আপনি কি বাস্তবিকই বলতে চান যে, আপনি বুঝতে পারছেন না এ নালিশটা প্রকৃতপক্ষে আমার নাম দিয়ে প্রিয়নাথবাবুই করছেন? আমি কি উন্মাদ হয়েছি যে আপনাকে জানি নে শুনি নে—কতকগুলো পরের টাকা দিয়ে আপনার এই পচা হ্যাণ্ডনোট কিনব? প্রিয়নাথবাবু আপনার বন্ধু, তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাকে আড়াল ক'রে তিনি এই নালিশ করছেন। নালিশ না হয় তাই যদি আপনার ইচ্ছা, বেশ তো টাকাটা ফেলে দিন।"

হরমোহন কহিলেন, "টাকা দিতে পারলে সময়ের জন্য আপনাকে এত পীড়াপীড়ি করব কেন? তা হলে কালকের জন্যে অপেক্ষা না ক'রে আজই আপনার টাকা ফেলে দিতাম।"

এ কথার কোন উত্তর দিবার পূর্বেই প্রমথ ঘরে প্রবেশ করিল, এবং মানিকলালের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া হরমোহনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রমথর সম্মুখে মানিকলালের সহিত দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কোনও কথা যাহাতে না হয় তদুদ্দেশ্যে হরমোহন দুই চারিটা কথার পর প্রমথকে ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

প্রমথ কিন্তু 'হ্যাঁ যাই' বলিয়াই টেবিল হইতে সে দিনের খবরের কাগজখানা উঠাইয়া লইল এবং সহসা এমন একটা কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল যে, তাহার উৎসুক নেত্র সেই সংবাদের দেহে সংলগ্ন রাখিয়াই সে ধীরে ধীরে নিকটস্থ একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

মানিক পুনরায় পূর্ব প্রসঙ্গের অবতারণা করিল। কহিল, "আপনি বলছেন আপনার টাকা নেই। এ কথা যে সত্যি নয়, তা আমি সে দিন প্রমাণ ক'রে দোব, যে দিন ডিক্রীজারীতে দেহ গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হব। তখন আপনি বাধ্য হয়ে যে টাকা বার ক'রে দেবেন সে টাকা আপনি ইচ্ছা করলে আজই দিতে পারেন।"

মানিকলালের কথার উত্তর দিতে হরমোহন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; তিনি ইচ্ছা করিয়াই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, যদি সেই ইঙ্গিতে প্রমথ সেখান হইতে উঠিয়া যায়। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া কাগজের উপর গভীর মনোনিবেশ সহকারে প্রমথ বসিয়াই রহিল, তখন অগত্যা হরমোহন কহিলেন, "আমার কথা বিশ্বাস করা ছাড়া এ বিষয়ে আমি

আপনাকে আর কোনও প্রমাণ দিতে পারি নে। ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস করতে আপনার ভদ্রতায় যদি একটুও না বাধে তা হ'লে আমি নিরুপায়।"

হরমোহনের এই সবিদ্রূপ অপমানসূচক বাক্য শুনিয়া মানিক ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "না, আমার ভদ্রতায় কিছুই বাধে না। কাল আপনার নামে নালিশ করতেও বাধবে না, পরন্তু আপনার অফিস-মাস্টারের মারফৎ সমন ধরাতেও বাধবে না। তারপর ডিক্রী হ'লে মায় খরচা হাজার পাঁচেক টাকা আদায় করবার জন্য ডিক্রীদার যত রকম নির্যাতন করতে পারে, তার কোনটা করতেও বাধবে না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার কথায় অবিশ্বাস করছি ব'লে আপনি আমাকে যথেচ্ছ দুর্বাক্য বলছেন, আপনার লেখা হ্যাণ্ডনোটখানা যদি পকেট থেকে বার ক'রে আপনার সমুখে ধরি, তা হ'লে তার উত্তরে আপনি কী বলবেন? সেখানে শুধু মুখের কথা নয়, আপনি নিজের হাতে লিখে দস্তখত ক'রে দিয়েছেন যে চাইলেই টাকা ফেরত দেবেন। টাকা চেয়ে চেয়ে তো অভদ্র লোকের প্রাণান্ত হয়েছে, কিন্তু ভদ্রলোকের তো তাতে কিছুমাত্র করুণা হ'লো না! ক্ষমা করবেন হরমোহনবাবু, ভদ্রলোকের কথায় আমার একটুও শ্রদ্ধা নেই, বরং আপনারা যাদের ছোট-লোক বলেন তাদের কথায় আছে।"

মহাজনকে অনুরোধ করিবার কথা চিন্তা-সূত্রে মনে হইতেই অমলা শয্যাত্যাগ করিয়া বৈঠকখানার দ্বার-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মহাজনকে কোনও প্রকার অনুরোধ করিতে নিশ্চয়ই নহে,—তাহার পিতার সহিত মহাজনের অবশেষে কী ব্যবস্থা হয় তাহাই শুনিবার আগ্রহে। মানিকলালের কথা শুনিয়া দুঃখে ভয়ে অপমানে অমলা কাঠ হইয়া গেল! কাল হইতে নিগ্রহ ও নিপীড়নের যে অভিনয় আরম্ভ হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। নিজের অবসন্ন দেহকে দ্বারগাত্রে কোন প্রকারে সংলগ্ন রাখিয়া, মানিকলালের অপমান বাণীর উত্তরে হরমোহন কী বলেন তাহা শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এবার কিন্তু কথা কহিল প্রমথ। সংবাদপত্রের উপর হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে মানিকলালের দিকে ফিরিয়া বসিল। তাহার পর দৃঢ় কিন্তু শান্তকণ্ঠে বলিল, "আমি যদি এ বিষয়ে দু একটা কথা কই, তা হ'লে আমাকে মাফ করবেন। আপনার খাতক যদি আমার নিকট আত্মীয় না হ'তেন, তা হ'লে আমি কিছুতেই অনধিকারচর্চা করতাম না।"

অভিনয়ের কৌতুকে সতর্ক মানিকলালেরও অধর-প্রান্ত মৃদু হাস্যরেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার সেইটুকু অসাবধানতা হাতের দ্বারাই সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "বলুন। খাতকের নিকট থেকে তো অভদ্র আখ্যা পেয়েছি; এখন নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে বাকিটুকু লাভ ক'রে বাড়ি ফিরি।"

প্রমথ বলিল, "লক্ষ্মীর দরবারে যাঁর নাম মহাজন, তাঁকে অভদ্র বলবে এমন

দুঃসাহস কারও নেই ; তবে মহাজনেরও ব্যবহারটা এমন হওয়া উচিত, যাতে নিন্দুকেও তাঁকে দুর্জন বলতে না পারে। মহাজনের আচরণ মহৎ না হ'লে শব্দের অর্থ বদলে যায়।"

মানিকলাল একটু ভাবিয়া বলিল, "সে ঠিক কথা। কিন্তু খাতক যদি খাতক হয়ে ওঠেন, তা হ'লে মহাজনকে বাধ্য হয়ে দুর্জন হ'তে হয়। কিন্তু এ সব বাজে কথা-কাটাকাটি ক'রে তো কোনও লাভ নেই, কাজের কথা যদি কিছু থাকে তো বলুন।"

কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রমথ কহিল, "হ্যাঁ, কাজের কথা আছে। আপনার উদ্দেশ্য যদি শুধু টাকা আদায় করাই হয়, আমাদের বিপন্ন করা না হয়, তা হলে আমাদের আরও কিছুদিন সময় দিতেই হবে, কারণ কাল আমরা টাকা আপনাকে দিতে পারি নে। (হরমোহনকে সম্বোধন করিয়া) পারি কি মেসো মশায় ?"

বিহ্বলভাবে হরমোহন কহিলেন, "না।"

মানিকলালকে লক্ষ্য করিয়া প্রমথ বলিল, "তা হলে সময় আপনাকে দিতেই হবে, কারণ, আমাদের পক্ষে যতই ভয়ানক হোক না কেন, নালিশটা আপনার পক্ষেও বিশেষ রুচিকর হবে না।"

মানিকলাল সহসা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "রুচিকর নিশ্চয়ই হবে না। ম্যালেরিয়া রোগীর কাছে কুইনিন রুচিকর নয়। তবুও তাকে কুইনিন খেতেই হয়। আপনাদের যদি কৌতূহল থাকে তো চারু চৌধুরী উকিলের বাড়ী গিয়ে দেখতে পারেন যে, এই অরুচিকর ব্যাপারটা এতদূর এগিয়ে গিয়েছে যে, আপনাদের এখান থেকে গিয়ে প্লেন্টে সই ক'রে হ্যাণ্ডনোটখানা তাঁর জিম্মা ক'রে দিলেই, কাল সাড়ে দশটার পর এটা আদালতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। চারুবাবুর বাড়ি থেকেই এখানে আসছি, আর এসেই এঁকে বলেছি যে, শুধু হাতে আর একদিনও সময় দোব না। দোব না যে তা নিশ্চয়ই, কারণ এঁর সঙ্গে আমার কোনও খাতির বা চক্ষুলজ্জার কারণ নেই। অতএব আপনার যদি আর কিছু বলবার না থাকে তো আমাকে বিদায় দিন ; কারণ খুব কাজের লোক না হলেও, ঠিক এমনি ক'রেও আমি সময় নষ্ট করিনে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রমথ বলিল, "সময় আমাদের চাই-ই, আর আপনি যখন মহাজন তখন যথাশক্তি আপনার আদেশ পালন করতেও আমরা বাধ্য, অতএব—" প্রমথ পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে একখানা নোট বাহির করিয়া মানিকলালের সম্মুখে ধরিল।

প্রসন্ন মুখে নোটখানা হস্তে তুলিয়া লইয়া মানিক বলিল, "মোটে একশ' টাকা?"

প্রমথ বলিল, "হ্যাঁ, মোটে। কিন্তু তবুও তো শুধু হাতে নয়। আমাদের কর্তব্য আমরা করলাম, এখন আপনি এই একশ' টাকার বদলে আমাদের ক'দিন সময় দিতে পারেন বলুন ?"

"কী জন্তে সময় তা প্রথমে শুনি?"

"আপনার টাকা পরিশোধ করবার একটা ব্যবস্থা করবার জন্তে। সে ব্যবস্থা যদি আপনার পছন্দ না হয়, তখন আপনার যা অভিরুচি হয়, করবেন।"

মানিকলাল বলিল, "এ ভালো কথা; এ কথার অর্থ আমি বুঝি। আপনি আমাকে টাকা দিন, আমিও নিশ্চয়ই আপনাকে টাকা শোধ করবার সুযোগ দোব। তা নয়, শুধু মুখের কথায় ক'দিন চলে বলুন? আমি আবার সাত দিন পরে আসব; আপনারা যা ব্যবস্থা করেন, সে দিন আমাকে জানাবেন।"

প্রমথর অনুরোধে মানিকলাল দশ দিন সময় দিতে স্বীকার হইল, এবং হ্যাণ্ডনোটের পশ্চাতে হরমোহনের দ্বারা একশত টাকার উশুল লিখাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মানিকলাল প্রস্থান করিলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া অমলা নিঃশব্দে ত্বরিত বেগে প্রস্থান করিল।

দুই হস্তে প্রমথর দুই হস্ত দৃঢ় বলে চাপিয়া ধরিয়া ভগ্ন কণ্ঠে হরমোহন কহিলেন, "প্রমথ, তোমাকে কী ব'লে আশীর্বাদ করব বাবা, তা বুঝতে পারছি নে। তুমি আজ শুধু আমার মান বাঁচালে না,—এই দরিদ্র অক্ষম পরিবারকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করলে।"

মৃদু হাস্য করিয়া কুণ্ঠিতভাবে প্রমথ কহিল, "আমাকে এই আশীর্বাদ করুন মেসোমশায় যে, আমার প্রতি আপনার স্নেহ যেন এত গভীর হয় যে এই রকম ছোটখাট কথায় এমন ক'রে আমাকে লজ্জিত না করেন। সব টাকা মিটিয়ে দেবার মতো টাকা যদি আমার কাছে আজ থাকত, তা হলে ছোটলোকটা আপনাকে যখন কড়া কথা শোনাচ্ছিল তখন কি তার মন ভিজিয়ে কথা কইতাম? তা হ'লে হাতে টাকা আর গলায় হাত দিয়ে বার ক'রে দিতাম। কী করব, দায়ে পড়লে শত্রুকেও সেলাম করতে হয়!"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরমোহন বলিলেন, "কিন্তু বাবা, একটা কথা তখন থেকে আমি ভাবছি,—টাকাটা চট্ ক'রে তুমি দিয়ে দিলে, তোমার হয়তো দরকারের টাকা—"

প্রমথ তাড়াতাড়ি বলিল, "আমার দরকারের টাকা নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি দরকারে খরচ করেছি। সে জন্তে আমার মনে একটুও পরিতাপ নেই।"

কুণ্ঠিত স্বরে হরমোহন কহিলেন, "কিন্তু টাকাটা তোমাকে দিতে যদি একটু দেরি হয়ে যায়—"

প্রমথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "টাকাটা যদি শীঘ্র আমাকেই দিতে পারেন, তা হ'লে তো আপনার মহাজনকেই সেই টাকাটা দিতে পারতেন। আমি বলি মেসোমশায়, এ সব বাজে কথার কোনও দরকার নেই। টাকাটা আমি আপনার অনুরোধে গু'ছে দিই নি যে শজে সঙ্গে সেটা ফেরত নেবার একটা

ব্যবস্থা ক'রে নোব। আপনি আমার আপনার লোক, আপনার বিপদ ও অপমান দেখে আমি নিজেকে বিপন্ন ও অপমানিত মনে ক'রে দিয়েছি, এবং ভবিষ্যতে যদি এমন আবার দিতে হয় তাও দিতে পারি। এর মধ্যে যদি আপনি ভদ্রতার কথাবার্তা নিয়ে আসেন, তা হ'লে আমার এই কথাই মনে হবে যে, যে অধিকারের জোরে আমি টাকা দিয়েছি, সে অধিকার আমার বাস্তবিক নেই।"

ব্যগ্র কণ্ঠে হরমোহন বলিলেন, "না, না, প্রমথ, সে কথা বোলো না, সে অধিকার তোমার সুরেশের চেয়ে এক বিন্দু কম নেই।"

সুরেশ হরমোহনের সপ্তম বর্ষীয় একমাত্র পুত্র।

হরমোহনকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া প্রমথ বলিল, "তাই যদি, তবে এ বিষয়ে আপনার কোনও ভাবনার দরকার নেই। এখন একমাত্র কথা হচ্ছে, দশ দিন পরে কী ব্যবস্থা করা যাবে।"

চিন্তিত মুখে হরমোহন কহিলেন, "প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখি, যদি এই দশদিনের মধ্যে কোথাও থেকে টাকাটা কর্জ নিতে পারি। কিন্তু তার আশা বড়ই অল্প। শুধু হাতে টাকা ধার পাওয়া আজকাল এক রকম অসম্ভব। সম্পত্তির মধ্যে তো এই বাড়িখানা, তা-ও চাকরীর সিকিউরিটিতে বাঁধা রয়েছে।"

একটু ভাবিয়া প্রমথ বলিল, "সে পরে ভেবে চিন্তে যা হয় একটা উপায় করা যাবে। আজ অনেক ভাবা গেছে, আজ আর থাক।" বলিয়া উঠিয়া পড়িয়া বিদায় প্রার্থনা করিল।

ব্যস্ত হইয়া হরমোহন কহিলেন, "না, সে কিছুতেই হ'তে পাবে না। ভিতরে গিয়ে দেখাশুনা ক'রে না গেলে, তোমার মাসিমা অতিশয় দুঃখিত হবেন, আর আমার ওপর রাগ করবেন।"

প্রমথ বলিল, "আজ রাত হয়ে গেছে, ভিতরে গেলেই দেরি হয়ে যাবে। আজ থাক, পরশু না হয় আবার আসব।"

হরমোহন সে কথা শুনিলেন না। প্রমথকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রভাবতী তখন রন্ধনালয়ে রন্ধনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

স্বামীর আহ্বানে প্রভাবতী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে, হরমোহন বলিলেন, "আজ থেকে তুমি জেনে রাখো যে, সুরেশই তোমার একমাত্র ছেলে নয়, তোমার দুই ছেলে; প্রমথ সুরেশের দাদা।"

কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া একবার প্রমথর মুখের দিকে ও একবার হরমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া প্রভাবতী কহিলেন, "সে তো সত্যি কথাই; কিন্তু এ কথা বলবার কারণ কী হ'লো তা'তো বুঝতে পারছিনে!"

হরমোহন কথা কহিবার পূর্বে প্রমথ সহাস্যমুখে কহিল, "কারণ জেনে কী হবে মাসিমা, কথাটা জেনে রাখো, তা হ'লেই হলো। আমি যে সুরেশের দাদা তার বিরুদ্ধে আমার কিছুমাত্র বলবার নেই।"

তখন হরমোহন প্রভাবতীকে কথাটা সবিস্তারে বলিলেন।

হরমোহনের কথা শেষ হইলে প্রমথ বলিল, এই তো শুনলে মাসিমা, কত সামান্য একটা ব্যাপার, এর জন্যে তখন থেকে মেসোমশায় যা তা কথা ব'লে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন।"

দুরূহ এবং সমূহ বিপদ হইতে অকস্মাৎ এরূপে উদ্ধার পাওয়ার সংবাদ পাইয়া প্রভাবতীর উদ্বেগ-ব্যাকুল হৃদয় আশ্বাসে ও আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া গেল। অমলার দুরদৃষ্ট নিরাকরণের প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রমথ প্রভাবতীর হৃদয়ের অনেকখানিই অধিকার করিয়া লইয়াছিল, অতঃপর এই ঘটনার পর তথায় অধিকার করিবার জন্য আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। উৎকট চিন্তা ও দুর্ভাবনা হইতে সহসা মুক্তিলাভ করিয়া প্রভাবতীর মন এমন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রমথর কথার উত্তরে "বাবা প্রমথ—" মাত্র এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; এবং তৎপরে, মুখ হইতে বাক্যের পরিবর্তে, চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

প্রমথ একটু থমকিয়া গিয়া তাহার পর ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "নাঃ, তোমাদের কারোর সঙ্গে আমার পোষাল না। আমি চললাম সুরেশের সঙ্গে আলাপ করতে।" বলিয়া সে সুরেশের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

সুরেশ তখন দ্বিতলের কোনও কক্ষে উচ্চকণ্ঠে পাঠাভ্যাস করিতেছিল।

আট

প্রমথ বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলে, অমলা পানের সরঞ্জাম লইয়া পান সাজিতে বসিয়াছিল; এবং সাজা হইলে, আজ আর প্রভাবতীর আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই, একটি রূপার ডিবায় কয়েক খিলি পান ভরিয়া, তাহার উপর সুগন্ধি গোলাপ জলের ছিটা দিয়া, প্রমথর নিকট উপস্থিত হইল।

প্রমথ তখন পুলক-প্রফুল্ল মুখে সুরেশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, এবং সুরেশ প্রমথর দেওয়া একরাশ লজেন্সুস মুখে পুরিয়া প্রমথর প্রতি করুণ-ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া নিঃশব্দে চুষিয়া খাইতেছিল। তাহার সেই শিথিল-শান্ত চাহনির মধ্যে অপরিচয়ের বিমূঢ়তা, এবং স্ফীত-বিকৃত মুখের মধ্যে লোভের প্রমাণ, এই উভয় ব্যাপার প্রমথর চিত্তে যথেষ্ট কৌতুক সঞ্চার করিয়াছিল।

পিছন হইতে অমলা আসিয়া একমুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "প্রমথ দাদা, পান নাও।" এবং প্রমথ ফিরিয়া চাহিতেই, সঙ্কীর্ণতার সংকোচ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সুরেশের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ওঃ, তাই সুরেশের মুখে একেবারে কথা নেই!"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তুরেশের মুখে কথার চেয়েও বেশি মিষ্টি জিনিস আছে।" তাহার পর অমলার হস্ত হইতে ডিবা লইয়া দুই খিলি পান মুখে দিয়া, একবার চিবাইয়াই বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তোমার পানে যে তার চেয়েও বেশি মিষ্টি জিনিস রয়েছে অমলা!"

গভীর ঔৎসুক্যের সহিত অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সহাস্য মুখে প্রমথ বলিল, "এ যে লজেঞ্চুসের চেয়েও মিষ্টি লাগছে। তুমি সেজেছ না কি?"

একজন উনিশ বৎসর বয়স্কা দূর-সম্পর্কীয়া যুবতীর প্রতি এ পরিহাস সংগত এবং পরিমিত নহে, এবং সেদিন প্রাতঃকালেও এরূপ পরিহাস করিলে অমলা অন্ততঃ মনে মনেও বিরক্তি বোধ করিত। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে প্রমথ তাহাকে যে দারুণ দুর্ভাবনা ও মনঃকষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছে, সেই উপকারের মূল্য স্বরূপ আজ সে প্রমথকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজের অগোচরে মনে মনে প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং বহুমূল্য দ্রব্যের বিনিময়ে যেমন বহুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, ঠিক সেই রূপে, আজিকার এই প্রভূত উপকারের অনুপাতেই নিজেকে রিক্ত অথবা খর্ব করিতে সে ন্যায়তঃ বাধ্য, এমনই একটা পরিশোধ-কল্পনা স্বতঃই তাহার মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল। তাই সে প্রমথর এই পরিহাস পরিপাক করিয়া কহিল, "লজেঞ্চুসের চেয়ে পান যদি আপনার মিষ্টি লাগে, তাহলে আপনার লজেঞ্চুস মিষ্টি নয়, নোন্‌তা।"

সহাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া প্রমথ বলিল, "না, না, আমার লজেঞ্চুস খুব মিষ্টি। কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি পানে চুনের বদলে চিনি দিয়েছ।"

এ কথায় অমলা হাসিয়া ফেলিয়া উত্তর দিল, "তা হলে নিশ্চয়ই খয়েরের বদলে ক্ষীরও দিয়েছি।"

বিস্ময়ের ভঙ্গিতে প্রমথ বলিল, "তা নইলে এত মিষ্টি লাগছে কেন? যে সেজেছে তার হাতের গুণে? না, যে খাচ্ছে তার মুখের গুণে?"

এবার অমলার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, এবং তাহার মুখের রেখা পাঠ করিয়া বিচক্ষণ প্রমথ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে, প্রথম দিবসের পক্ষে ঔষধের মাত্রা একটু অতিরিক্ত হইয়াছে, তাই প্রতিষেধ ক্রিয়ার জন্য তখনই কথাটাকে ভিন্ন মূর্তি দিয়া বলিল, "আমার বাসার জগন্নাথের সাজা পান কি চমৎকার, তা তো জানো না, তা হলে বুঝতে পারতে! কোন দিন লাগে ঝাল, কোন দিন পোড়ে গাল। একদিন তোমার জন্য দু খিলি পকেটে ক'রে নিয়ে আসব, খেয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, তোমার পান মিষ্টি লাগছে ব'লে অন্যায় করেছি কি-না।"

প্রমথর এই সামান্য একটু দুঃখের কাহিনী অমলার নারী-হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাসায় জগন্নাথ ছাড়া আর কেউ কি নেই, যে একটু ভালো ক'রে পান সেজে দেয়?"

কোন্ স্থান গলিয়া কোমল হইয়াছে, এবং সাবধানে আঘাত দিতে পারিলে ইচ্ছানুরূপ গঠিত করিয়া লওয়া যাইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রমথ মৃদু হাস্যের সহিত কহিল, "আছে; রামভদ্দর ঠাকুর আছে। কিন্তু পানের দুঃখটাও আমি তারই হাতে পেতে চাই নে। দুনেই যে নিত্য পুড়িয়ে মারছে, চূণেও সে-ই পুড়োবে, তা আমার ইচ্ছে নয়।"

অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "ভালো রাঁধে না বুঝি ?"

প্রমথ পুনরায় মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "বল তো একদিন তাকে এখানে নিয়ে এসে রাঁধিয়ে দেখাই। তা হ'লে বুঝতে পারো, কী রকম কদাচারেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।"

ব্যথিত স্বরে অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "বাসায় আর কেউ নেই ?"

"বাড়িতেই বা আর কে আছে যে, বাসায় থাকবে ? শুনেছি, আমার যেদিন ষষ্ঠীপূজো হবার কথা ছিল, সেদিন মার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়েছিল। আর আমার বাবার ইতিহাস শুনবে ? বছর পাঁচেক হলো নৌকো ক'রে চুঁচড়োয় যাচ্ছিলেন আমার জন্যে পাত্রী আশীর্বাদ করতে; পাত্রীর বাড়ি পৌঁছবার আগেই নৌকাডুবি হয়ে মারা যান। এই তো আমার আপনার লোক, বাসাতে আর বাড়িতে। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ অমলা, কত দুঃখে তোমাদের কাছে মাঝে মাঝে ছুটে আসি ? আর কেনই বা তোমার হাতের সাজা পান এত মিষ্টি লাগে ?"

অমলা কোন কথা বলিবার পূর্বেই প্রভাবতী হস্তে জলখাবারের রেকাব লইয়া প্রবেশ করিলেন, এবং টেবিলের উপর তাহা স্থাপন করিয়া অমলাকে বলিলেন, "অমল, প্রমথকে এক গ্লাস জল দাও।"

জলখাবারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমথ সবিস্ময়ে কহিল, "মাসিমা, এত জলখাবার এখন যদি খাই, তা হলে আর বাসায় ফিরে গিয়ে কিছুই খেতে পারব না।"

প্রভাবতী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, একটুও বেশি নয়। বাড়ির তৈরি খাবার, সবটুকু খেয়ে ফেলো।"

অমলা জল আনিতে যাইতেছিল, প্রমথ ও প্রভাবতীর কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ প্রমথ দাদা রাত্রের খাবারও খেয়ে যাবেন মা। ওঁর খাওয়ার যে রকম কষ্ট বলছিলেন, অন্ততঃ আজ রাত্রে রামভদ্দর ঠাকুরের রান্না ওঁর খাওয়া হবে না।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তাতে আমার আরও অসুবিধেই হবে অমলা। আজ মাসিমার হাতের রান্না খেলে, কাল সকালে আর রামভদ্দরের রান্না গলা দিয়া গলবে না।"

"তা হোক!" বলিয়া অমলা জল আনিতে প্রস্থান করিল।

প্রভাবতী বলিলেন, "সেই কথাই ভালো। জল খাওয়ার পর ইনি একবার

তোমাকে ডাকছেন, কথাবার্তা কইতে দেরি হয়ে যাবে। রাত্রে একেবারে খেয়েই যেয়ো।"

অমলা জল আনিলে সামান্য আপত্তি করিয়া প্রমথ জলখাবার খাইতে বসিল। খাইতে আরম্ভ করিয়া কিন্তু তাহার আর আপত্তির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বিনা বাক্যব্যয়ে দুই তিনটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, "মাসিমা, তোমার এ ছেলেটি একটু বিশেষরকম মিষ্টপ্রিয়। কলকাতায় এমন ভালো সন্দেশের দোকান নেই, যেখানে তার যাওয়া-আসা নেই। কিন্তু ভীম নাগই বলো, আর যদু ময়রাই বল, কারও সাধ্য নেই যে তোমার তৈরি সন্দেশের মতো সন্দেশ করে। সন্দেশের বিষয়ে এ সার্টিফিকেট আমার কাছে তুমি পেতে পারো।"

এই প্রচুর এবং পর্যাপ্ত প্রশংসাবাদে মনে মনে বিশেষ প্রসন্ন হইয়া প্রভাবতী ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিছু বলিলেন না।

নারী-প্রকৃতি বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে, যে-সকল পুরুষ আহার-প্রিয়, তাহাদের প্রতি সন্ধদয়া নারীগণের একটু বিশেষ স্নেহ ও পক্ষপাত প্রকাশ পায়। এ তথ্যটুকু প্রমথ বিলক্ষণ অবগত ছিল যে, রন্ধন-প্রিয়া স্ত্রীলোকের হৃদয় জয় করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে আহার বিষয়ে ঈষৎ লোভাতুরতা প্রকাশ করা। তাই সে নিঃশব্দে একে একে সব সন্দেশগুলি পরম পরিতোষ সহকারে নিঃশেষ করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "মাসিমা, লোভের মতো পাপ নেই, তবুও আরোও দুটো সন্দেশ না চেয়ে থাকতে পারছি নে। যদি থাকে—"

"ওমা, আছে বই কি! তুমি একটু বোসো, আমি নিয়ে আসছি"। বলিয়া প্রভাবতী দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন, এবং দুইটার পরিবর্তে চারিটা সন্দেশ আনিয়া প্রমথর পাত্রে দিলেন।

রুচি অনুসারে প্রমথ মাংস-প্রিয়, সন্দেশ রসগোল্লার প্রতি বৈরীভাব না থাকিলেও, তদ্বিষয়ে তাহার আসক্তি ছিল না। কিন্তু তাহার দুরদৃষ্টবশতঃ আজ সন্দেশ দিয়াই তাহার পরীক্ষা চলিতে লাগিল। গলা দিয়া সন্দেশ আর সহজে নামিতেছিল না, কোন প্রকারে তিনটা শেষ করিয়া চতুর্থটা সুরেশের দিকে আগাইয়া দিয়া প্রমথ বলিল, "সুরেশ, একটা তুমি খাও ভাই। আমি এত লোভী যে, ভালো জিনিস তোমাকে ভাগ না দিয়ে নিজেই সব খেয়ে ফেললাম।"

প্রভাবতী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, সুরেশকে দেবার দরকার নেই, সুরেশ সন্দেশ খেয়েছে। তুমি ওটা খেয়ে ফেলো।"

অমলা হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া সুরেশের মুখে সন্দেশের জায়গাই নেই, লজেঞ্চুসে ভরা।"

অমলার কথায় প্রভাবতী টেবিলের উপরিস্থিত লজেঞ্চুসের শিশি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওঃ, তাই সুরেশ এমন লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপ ক'রে রয়েছে! অত লজেঞ্চুস্ ওকে কেন দিয়েছ প্রমথ? ও লজেঞ্চুসের রাক্ষস! আজ বোতলটি শেষ ক'রে তবে ঘুমোবে।"

স্মিতমুখে অমলা বলিল, "মুখের মধ্যে বোধ হয় একেবারে গোটা পঁচিশ পুরেছে।"

অমলার কথা শুনিয়া জিহ্বার এক বিচিত্র কৌশলের দ্বারা নিমেষের মধ্যে লজেঞ্চুসগুলা বাম গালের একদিকে ঠেলিয়া ধরিয়া হাঁ করিয়া সুরেশ বলিল, "কই গোটা পঁচিশ ?"

সুরেশের ভঙ্গি দেখিয়া সকলে উচ্চ স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

প্রমথ বলিল, "তা যদি না থাকে, তাহলে সন্দেশটা তুমি খেয়ে ফেল সুরেশ।"

প্রভাবতী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না, না, সুরেশকে দিতে হবে না, তুমি ওটা খেয়ে ফেলো।"

সুরেশের পক্ষ হইতে সন্দেশ খাইবার বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখা গেল না ; অধিকন্তু, সাত-আটটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করিয়া যেটুকু প্রসার লাভ করিয়াছে, পাছে একটা সন্দেশের জন্য তাহার কোনও হ্রাস হয়, এই আশঙ্কায় প্রমথ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাকি সন্দেশটা কোনও প্রকারে খাইয়া ফেলিয়া জলের গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া একেবারে দুই-তিনটা পান মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, "ডিস্পেপটিক যদি না হতাম, তাহলে মাসিমার সব সন্দেশগুলোই আজ শেষ ক'রে দিতাম। বাস্তবিক এমন চমৎকার হয়েছে !"

নয়

প্রভাবতী প্রস্থান করিলে, অমলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমথ বলিল, "তুমি এই হাঙ্গামটি বাধালে !"

"কী হাঙ্গামা ?"

"এই এত খেয়ে আবার রাত্রে খেয়ে যাওয়া !"

মৃদু হাসিয়া অমলা বলিল, "তাতে আর কী হয়েছে ?"

কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় করিয়া লইয়া প্রমথ কহিল, "তাতে হয় নি কিছুই, শুধু তোমার হৃদয়ের একটু পরিচয় দেওয়া হয়েছে ! আমার খাওয়া-পরার এই তুচ্ছ দুঃখের কথা শুনে তোমার মন গ'লে গেল অমলা, আর আমার সারা দুঃখের কাহিনী যদি তোমাকে শোনাই তা'হলে তুমি যে কী করবে, তা আমি ভেবে পাচ্ছিনে।"

কথাটা এমন কিছুই গুরুতর নহে, কিন্তু হঠাৎ কণ্ঠের স্বর একটু পরিবর্তিত করিয়া লইয়া ঈষৎ ভারি গলায় বলিবার ভঙ্গিতে এই সাদা কথাগুলার অর্থ এমন একটু রঙিন এবং সঙ্গীন হইয়া উঠিল যে, ইহার উত্তরে কী বলিবে তাহা অমলা ভাবিয়াই পাইল না। অথচ কোনও কথা না কহিয়া একেবারে নির্বাক থাকা

উত্তর দেওয়া অপেক্ষাও অশোভন হইবে মনে করিয়া সে হঠাৎ সুরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সুরেশ, তোমার মাস্টার-মশায়ের অসুখ এখনও সারে নি ?"

কিন্তু কথাটা বলিয়াই অমলা বুঝিতে পারিল যে, এক ব্যক্তি যখন সহানুভূতি লাভের প্রত্যাশায় সকাতর কণ্ঠে একটি চিত্তদ্রাবক প্রশ্ন করিয়াছে, তখন সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া অপর কোনও ব্যক্তিকে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন একটি প্রশ্ন করিবার মতো ধরা পড়িয়া যাওয়া আর কিছু হইতে পারে না। তাই সুরেশের মাস্টারের শারীরিক সংবাদ শুনিবার জন্য এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করিয়া, অমলা ঈষৎ আরক্তমুখে প্রমথকে বলিল, "রামভদ্দর আর জগন্নাথকে ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য চাকর বামুন রাখলেই তো হয়।"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ একটু হাসিল। অমলার মনের যথার্থ অবস্থা উপলব্ধি করিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না সে বুঝিল যে, ঔষধ প্রয়োগের মাত্রা পুনরায় কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে তাহার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির বলে নিজের আক্রমণ করিবার শক্তির তুলনায় অমলার প্রতিরোধ করিবার শক্তিকে এমন মাপিয়া লইয়াছিল যে, নিশ্চিন্ত মনে মাত্রা আরও একটু বাড়াইয়াই দিল। সুদক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসক যেমন ক্ষত পরীক্ষা করিবার জন্য লৌহ-শলাকা দিয়া ক্ষত স্থান বিদ্ধ করিয়া দেখে, তেমনি প্রমথ অমলার চিত্ত কী ভাবে পরিণতি লাভ করিতেছে তাহা দেখিবার জন্য, তাহাকে আরও একটু গভীর ভাবে বিদ্ধ করিল।

একটু হাসিয়া সে বলিল, "রামভদ্দর আর জগন্নাথের দুঃখই আমার একমাত্র দুঃখ নয় অমলমণি যে, তাদের ছাড়ালেই আমার সব দুঃখ যাবে। কুমীরে যাকে ধরেছে—দুটো কচ্ছপ তার দেহ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই বা কী, আর না নিলেই বা কী? কুমীরের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারো অমলা ?"

ত্রস্ত হইয়া অমলা শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমীর কাকে বলছ প্রমথ দাদা ?"

অমলার প্রশ্নে ও সন্ত্রাসে হাসিয়া ফেলিয়া প্রমথ বলিল, "রামভদ্দর বা জগন্নাথের মতো কোনও লোককে বলছি নে। কুমীর হচ্ছে আমার দুঃখ আর আমার অভাব, যা আমাকে ক্রমে ক্রমে একেবারে গ্রাস ক'রে ফেলছে।"

অমলার একবার ইচ্ছা হইল যে জিজ্ঞাসা করে, তাহার দুঃখই বা কী, আর অভাবই বা কিসের। কিন্তু উত্তরে প্রমথ পাছে আরও গুরুতর কিছু বলিয়া বসে, এই আশঙ্কায় তদ্বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস হইল না। কোন কথা না বলিয়া প্রমথর দেওয়া লজেঞ্চুসের শিশিটা হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে দেখিতে লাগিল

প্রমথ কিন্তু গুরুতর কথা বলিবার জন্য অমলার প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকিল না। অমলার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নকণ্ঠে সে বলিল, "এই যে সন্দেশটা এত মিষ্টি লাগল,—এ কি শুধু ছানা আর চিনি কৌশলে মেশাবার গুণেই লাগল ? —না, আরও কিছু তার সঙ্গে ছিল ? তোমার সাজা পানে যে চিনি দেওয়া ছিল

বলছিলাম, সে কি বাজারের কেনা চিনি অমলমণি? সে তোমার মুখের মিষ্টি কথার চিনি, মিষ্টি হাসির চিনি! তোমার চোখের মিষ্টি চাহনির চিনি!"

প্রমথর কথাবার্তার এই দুঃসাহসিকতায় অমলার প্রাণের ভিতর কাঁপিতে লাগিল। এ কী ধরনের কথা যে ইহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে না! কথার মধ্যে চিনির ছড়াছড়ি, তবু, মিষ্টি লাগে না! তাহার পর এই অমলমণি বলিয়া সম্বোধন! তাহার এই উনিশ বৎসরের জীবনের মধ্যে যে আদরের সম্বোধন তাহার কোন আত্মীয়ই করিল না, দুইদিনের পরিচয়ের অর্ধ-অপরিচিত ব্যক্তি কোন্ সাহসে কোন অধিকারে তাহা করে? শুধু যে করে তাহাই নয়; এমন অবলীলাক্রমে করে যে তাহাতে কোন প্রকার বাধা দিতে যাওয়ার সুবিধাই পাওয়া যায় না। সহজ ভাবে কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ সে কোনও এক মুহূর্তে আপত্তিকর হইয়া উঠে; কিন্তু আপত্তি করিবার অবসর না দিয়াই পুনরায় সে সহজ ভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করে! কখন্ সে প্রবৃত্ত হইবে তাহা যেমন অনিরূপেয়, কখন সে নিবৃত্ত হইবে তাহাও তেমনই অনিশ্চিত!

প্রমথর হস্ত হইতে, বিশেষতঃ প্রমথর জটিল ও কুটিল কথোপকথন হইতে, কী করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবে, অমলা তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে প্রমথ নিজেই তাহাকে নিষ্কৃতি দিল। রূপক চিনির আলোচনা হইতে সে একেবারে বাস্তব চিনির আলোচনায় আসিয়া পড়িল। সুরেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "সুরেশের রুচি আমার রুচি থেকে কিছু বিভিন্ন হবারই সম্ভাবনা, সে হয়তো হাসির চিনির চেয়ে শিশির চিনিই বেশি পছন্দ করবে। শিশিটা তাকে দাও।"

প্রমথর কথা শুনিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া আরক্ত মুখে অমলা তাহার হস্তস্থিত লজেঞ্চুসের শিশিটা সুরেশের সম্মুখে স্থাপিত করিল; তাহার পর এই প্রসঙ্গ পরিবর্তনে মনে মনে হৃষ্ট হইয়া স্মিতমুখে বলিল, "এরই মধ্যে অতগুলো লজেঞ্চুস্ শেষ হয়ে গেল সুরেশ?"

সুরেশ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "অতগুলো কোথায়? কম তো!"

স্মিতমুখে অমলা বলিল, "কম যদি, তা হলে শিশি অত ক'মে গেল কেন?"

অমলার কথা শুনিয়া সুরেশ ব্যগ্র ভাবে একবার লজেঞ্চুসের শিশি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি বুঝি লজেঞ্চুস্ বার ক'রে নিয়েছ?"

সুরেশের কথা শুনিয়া প্রমথ উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। লজ্জারক্তমুখী অমলার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তোমার ভয় নেই অমলা, তোমার স্বপক্ষে আমি সাক্ষী আছি। কিন্তু তোমার বয়স এখনও এত বেশি হয় নি, যাতে তোমার বিরুদ্ধে সুরেশ এ সন্দেহ করতে না পারে।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া অমলা সুরেশের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে

ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "বেশ ছেলে যা হোক! নিজে ব'সে ব'সে শেষ করেছেন, এখন পরের নামে দোষ!"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ সহাস্যমুখে বলিল, "এ তোমার অন্যায় অমলা! তুমি কি পর?"

অমলা হাসিয়া বলিল, "পর না হলেও অপর তো?"

এইরূপে তাহাদের কথোপকথন ক্রমশঃ সহজ সাধারণ প্রবাহে ফিরিয়া আসিল, এবং সেদিন আর নূতন করিয়া কোন গোলযোগ বাধিল না।

রাত্রে আহার করিয়া প্রমথ তাহার বাসায় ফিরিয়া গেল।

দশ

দশ দিন পরে টাকার জন্য মানিকলালের আসিবার কথা ছিল। তন্মধ্যে দিন দুই হরমোহন নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্বেগে কাটাইলেন; চার পাঁচ দিন ঋণের সন্ধানে বন্ধু, অবন্ধু, আত্মীয় এবং অনাত্মীয়ের পিছনে নিষ্ফল আগ্রহে ঘুরিয়া বেড়াইলেন; এবং বাকি কয়েকটা দিন প্রমথর আসার পথ চাহিয়া এবং বাসার পথ হাঁটিয়া কাটিল। কিন্তু শেষ ভরসা প্রমথ, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পাঁচ ছয় দিন হইল প্রমথ যে হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, জগন্নাথ বা রামভদ্র কাহারও নিকট হরমোহন তাহার সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে প্রমথর বাটীর ঠিকানায় জবাবী তার করিয়াও যখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন দশম দিনে রবিবারের প্রাতে ঠিক দশ দিন পূর্বের অবস্থা হরমোহনের গৃহে ফিরিয়া আসিল। আর কয়েক ঘণ্টা পরে যমদূতের মত মানিকলাল আসিয়া বসিবে, এবং টাকা না পাইলে যেরূপে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিবে, তাহা মনে করিয়া ঘৃণায় ও বিরক্তিতে হরমোহনের চিত্ত ভরিয়া উঠিল; এবং হরমোহনের মনের অবস্থা বুঝিয়া ও মুখের বাক্য শুনিয়া প্রভাবতী ও অমলার পানাহারে প্রবৃত্তি রহিল না।

এ পর্যন্ত প্রমথ যাহা করিয়াছে, ভালোই করিয়াছে; অন্ততঃ একটা দিন সে নিজের বায়ে সামলাইয়া দিয়া দশ দিনের মধ্যে একটা কোনও ব্যবস্থা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ হরমোহন, প্রভাবতী অথবা অমলা, কাহারও সে কথা মনে হইতেছিল না। তাঁহাদের মনে হইতেছিল, প্রমথ যাহা করিয়াছে, অন্যায়ই করিয়াছে—একা দুরূহ দুর্বিপাকের মধ্যে তাঁহাদের টানিয়া আনিয়া অবশেষে বিপদের মুহূর্তে নিজে সরিয়া পড়িয়াছে। প্রমথ ব্যতিরেকে বর্তমান অবস্থা যে কী প্রকারে সুবিধাজনক হইতে পারিত, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মতো কাহারও ধৈর্য বা অবসর ছিল না। কেবলই মনে হইতেছিল যে, প্রমথ তাহাদিগকে মজাইয়াছে,—বিপন্ন করিয়াছে।

তিনজনের মধ্যে অমলার মনের অবস্থা একটু জটিলতর ছিল। সেদিন রাত্রে আহার করিয়া প্রমথ চলিয়া যাওয়ার পর হইতে এ পর্যন্ত অমলা কয়েকবারই কারণে এবং অকারণে প্রমথর কথা মনে মনে ভাবিয়াছে, এবং যতবার ভাবিয়াছে প্রতিবারই তাহার মনে হইয়াছে যে প্রমথ আর না আসিলেই ভালো হয়। বিবাহের পূর্বে সে কয়েকবার প্রমথকে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু সে কথা ভালো করিয়া মনেই পড়ে না। তাহার পর সেদিন যখন প্রমথ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "কী অমলা, তোমার প্রমথদাদাকে মনে পড়ে তো?" তখন হইতে এই কয়েক দিনের মধ্যে এমন হইয়াছে যে, নির্জনে প্রমথর সহিত কথা কহিবার কথা মনে হইলেই আতঙ্কে অমলার বুক কাঁপিতে আরম্ভ করে। প্রমথ যে কী বলে সময়ে সময়ে তাহা একেবারেই বুঝা যায় না। তাহার কথা ভারি গোলমেলে, তাহার দৃষ্টি অতিশয় দুর্বোধ, এবং তাহার কণ্ঠস্বর সময়ে সময়ে অকারণ এমন গাঢ় হইয়া উঠে যে, মনে হয় তৃতীয় কোনও ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকিলে ভারি অশোভন দেখাইত। এই সকল কারণে, অভিযোগের বিশেষ কোনও কথা না থাকিলেও, প্রমথর কথা মনে পড়িলেই অমলার মনে হইত যে, সে না আসিলেই ভালো, তাহার সহিত কথা কহিবার অবসর না ঘটিলেই মঙ্গল। আজ সকাল হইতে কিন্তু তাহার চিত্তের কম্পাস-কাঁটা একেবারে অন্য দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রমথর আসার জন্য এবং তাহাদের এই বিপদের দিনে সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া থাকার জন্য আজ সকাল হইতে অমলা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, এবং বেলা পড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ক্রোধের সহচর হইয়া একটা অতি সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ অভিমান দেখা দিতেছিল। এই অভিমান সঞ্চারের তত্ত্বটুকু কৌতূহলজনক ব্যাপার। অভিমান জিনিসটা কোন স্বতঃসিদ্ধ বস্তু নহে, এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তাও ইহার কিছু নাই। যখনই ইহা উপস্থিত হয়, বাহনের স্কন্ধে চড়িয়া উপস্থিত হয়, অন্যের অভাবে নিজের পায়ের ভরে উপস্থিত হইবার ইহার শক্তি নাই। ব্যাধি-বিজ্ঞানের ভাষায় ইহা একটি রোগ নহে, রোগের লক্ষণ।

অমলার চিত্তের কোন নিভৃত প্রদেশে কী বিকৃতি ঘটিয়াছিল, যাহা হইতে এই অভিমান-রস বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইতেছিল, সে বিষয়ে অমলার নিজেরই কোনও জ্ঞান এমন কি সংশয় পর্যন্ত ছিল না; এবং এই আপাত-তুচ্ছ অভিমান অচিরে যে গুরুতর পরিণতি লাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধেও তাহার মন সম্পূর্ণরূপে নিঃশঙ্ক ছিল। প্রত্যূষে যে তালের রস নির্দোষ সুশীতল পানীয় থাকে, মধ্যাহ্নেই তাহা উগ্র মদিরায় পরিণত হইতে পারে তাহা সে জানিত না। তাই বেলা তিনটার সময়ে সুরেশের হাত ধরিয়া "মাসিমা কোথায়?" বলিয়া প্রমথ অন্দরে প্রবেশ করিতেই যখন সর্বপ্রথমে অমলা সম্মুখে পড়িয়া গেল, তখন অমলার মনের মধ্যে অভিমানটাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। সে কোনও কথা না কহিয়া পাশ কাটাইয়া প্রমথর পথ ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইল।

প্রমথ কিন্তু দেখিবামাত্র অলমার মুখে তাহার অন্তরের কাহিনী পাঠ করিয়া লইল। মৃদু হাসিয়া অমলার গতিপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সে নিম্নকণ্ঠে বলিল, "রাগ করেছ ?"

প্রমথর এই আকস্মিক অহেতুক আচরণে ও প্রশ্নে অমলা চকিত হইয়া উঠিল। অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আরক্ত মুখে সে বলিল, "কেন ? রাগ করব কেন ?"

প্রমথ হাসিমুখে উত্তর দিল, "কেন রাগ করবে তা আমি কী ক'রে বলব বলো ? কারণ যদি কিছু থাকে তো তুমিই বলো, শুনি।"

এই কথোপকথনের ধারাকে একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে অমলা একটু প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, কারণ কিছুই নেই।"

প্রমথ কিন্তু সে উত্তরে কিছুমাত্র প্রতিহত না হইয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কারণ কিছুই নেই ?—একেবারে অকারণ ? শুনে সুখী হলাম অমলা ! সংসারের অকারণ জিনিসগুলোর উপরই আমার শ্রদ্ধা আর লোভ সবচেয়ে বেশি। খাতাপত্রের হিসাবের মধ্যে যে-সব জিনিস চড়ান যায় না, মনের মধ্যেই আমি তাদের স্থান দিই।"

সব কথাটার তাৎপর্য অমলা হয় তো ঠিক গ্রহণ করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। প্রমথর কথার উত্তরে কথা বলিতে গিয়া প্রমথকে এইরূপে পরিহাস করিবার সুযোগ দিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সে মনে মনে অনুতপ্ত হইল। এবং পাছে পুনরায় তাহার কথায় সুযোগ পাইয়া প্রমথ কথা বাড়াইয়া চলে, সেই আশঙ্কায় সে প্রমথর কথার আর কোনও উত্তর না দিয়া পাশ কাটাইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

তখন প্রমথ সুরেশের হাত ধরিয়া হরমোহনের কক্ষে উপস্থিত হইল।

প্রমথকে দেখিয়া হরমোহন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন ; মনে হইল প্রমথ যখন আসিয়া পড়িয়াছে, তখন যেরূপেই হউক এ বিপদের একটা উপায় সে করিবে।

কথাটা প্রমথই প্রথমে তুলিল ; বলিল, "মেসোমশায়, আপনার পাওনাদার তো আর একটু পরেই আসবে ; টাকার কোনও ব্যবস্থা হয়েছে কি ?"

চিন্তিত মুখে হরমোহন কহিলেন, "না, কিছুই হয় নি। অনেক চেষ্টা করেছি প্রমথ ; এই কয়েক দিনে অনেকেরই দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু কেউ দিলে না। এখন একমাত্র তুমিই ভরসা, তুমি যদি কোন রকমে তাকে নিরস্ত করতে পারো ! তোমার বাসায় যে কতবার গিয়েছি তার সংখ্যা নেই। অবশেষে তোমাকে বাড়িতে প্রিপেড্ টেলিগ্রাম করলাম। তার কোন উত্তর পেলাম না। তুমি যে সেই গেলে তারপর তো আর এলে না।"

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে প্রমথ বলিল, "আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম না মেসোমশায়। এখান থেকে যাবার আগে আমি আমার চার পাঁচজন বন্ধুর কাছে চেষ্টা করেছি, কিন্তু উপস্থিত কারও হাতে টাকা নেই। তারপর হঠাৎ একটা জরুরী কাজে

বেনারসে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার কাজ শেষ না ক'রেই আমি ধড়ফড়িয়ে চ'লে এলাম। আমার নিজের হাতে টাকা থাকলে আমি ভাবতাম না; আমারও এ সময়টা বড়ই টানাটানি চলেছে। তা হলে উপায় ?"

হতাশ হইয়া হরমোহন কহিলেন, "কোনও উপায়ই নেই।"

একটু চিন্তা করিয়া প্রমথ কহিল, "আচ্ছা, সে দিন রাত্রে যে আপনার লাইফ ইনসিওর্যান্সের কথা বলছিলেন তা কবে ডিউ হবে ?"

"সে অনেক দেরি,—দু বৎসর পরে।"

কোন কথা না বলিয়া প্রমথ বিরস চিন্তিত মুখে ভাবিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ ব্যগ্র ভাবে কহিল, "আচ্ছা, আপনার পলিসিটা বাঁধা রেখে তো কিছু টাকা তোলা যায় ?"

কুণ্ঠিতস্বরে হরমোহন কহিলেন, "পলিসি কি আমার কাছে আছে প্রমথ ? তা-ও কোম্পানীর কাছেই বাঁধা আছে।"

কিছু পূর্ব হইতে প্রভাবতী আসিয়া নিকটে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া প্রমথ বলিল, "মাসিমা, তুমি কেন এ সব কথার মধ্যে প'ড়ে কষ্ট পাও ? এ সব ব্যাপার আমাদের পুরুষদের ওপর ছেড়ে দাও, যে রকম ক'রে হোক আমরা সামলাব। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রভাবতী বলিলেন, "আমি শুধু এই ভাবছি প্রমথ, হাতে এই সধবার লক্ষণটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই যা দিয়ে এই বিপদের সময়ে তোমাদের একটু উপকার করতে পারি। কিন্তু যে হতভাগীর জন্যে তোমাদের এই কষ্ট তার তো যা হোক দু চারখানা ক্ষুদ কুঁড়ো আছে, তাই না হয় আপাতত নিয়ে—"

প্রভাবতীকে কথা শেষ করিতে না দিয়া প্রমথ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বাপ্‌ রে! তা কখনও করা যায় ? একে ছেলেমানুষের সাধের জিনিস, তারপর হঠাৎ যদি শ্বশুরবাড়ী থেকে নিতে আসে তখন পাঠাবে কী ক'রে ?"

সংসারের এই বিপদানলে দুর্ভাগিনী কন্যার অলঙ্কারগুলি আহুতি দিতে প্রভাবতীরও একান্ত অনিচ্ছা ছিল; এ বিষয়ে প্রমথর দৃঢ় অসম্মতি দেখিয়া বিপদের মধ্যেও তিনি এক দিকে একটু আশ্বস্ত হইলেন।

দ্বারান্তরালে দণ্ডায়মানা অমলা কিন্তু প্রমথর কথা শুনিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। ছেলেমানুষের সাধের জিনিস ? প্রমথ ভাবে কী তাহাকে! সে কি মনে করে সে এতই সামান্য যে, তাহার পিতার এই মহা বিপদের দিনে তুচ্ছ কয়েকটা সোনা রূপার ঢেলার উপর তাহার বিন্দুমাত্রও মমতা আছে ? তাহার ইচ্ছা হইল তখনই তাহার মকরমুখো বালা দুই গাছা হাত হইতে খুলিয়া প্রমথর দেহের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়!

প্রমথর কথা শুনিয়া হরমোহনের এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পাইল। তিনি বলিলেন, "ছেলেমানুষের সাধের জিনিসই বলো আর যাই বলো সে আলাদা কথা; কিন্তু শ্বশুরবাড়ি থেকে হঠাৎ নিতে আসবে সে ভাবনা একটুও নেই। তা ব'লে

আমি অবশ্য গহনা নেওয়ার কথাও বলছিনে, আমি শুধু এই বলছি যে, তোমার ভাবনটা একেবারে অমূলক।"

একটু উত্তেজিত ভাবে প্রমথ বলিল, "না মেসোমশায়, তা নয়। এই টাকার ব্যবস্থা করা আর মানিকলালকে ঠাণ্ডা করা, এ সব সামান্য ব্যাপারগুলো শেষ হয়ে গেলে, আমি সেই আসল কাজেই উঠে প'ড়ে লাগব; আর আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে—"

প্রমথর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, সে সবিস্ময়ে দেখিল আরক্ত মুখে অমলা কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হরমোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা, তুমি প্রমথদাদার ও সব বাজে কথা শুনো না! আমার সব গহনা দিয়ে যদি তোমার একবিন্দুও কষ্ট কমে তাতে আমি খুব খুসী হব। আমি আলমারী থেকে এখনই সব বার ক'রে দিচ্ছি, তার আগে এ দুটো খুলে দিই।" বলিয়া নিজের হাতের বালা দুই গাছা সজোরে খুলিতে আরম্ভ করিল।

আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া প্রভাবতী ছুটিয়া আসিলেন, "ওরে করিস কী, করিস কী! আজ একাদশীর দিনে অকল্যাণ করিস নে!"

কিন্তু ততক্ষণে অমলা দুই গাছা বালাই হস্ত হইতে উন্মোচিত করিয়া হরমোহনের পদতলে রাখিয়া দিয়াছিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে প্রমথর দিকে ফিরিয়া অমলা আর্তস্বরে বলিল, "প্রমথদাদা, তুমি কি আমাকে এতই ছেলেমানুষ মনে করো যে—" আর তাহার কথা বাহির হইল না, সে তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল।

হরমোহন সজল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া "নারায়ণ! নারায়ণ!" করিতে লাগিলেন।

এক মুহূর্ত প্রস্তর-মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া দুঃখার্ত কণ্ঠে প্রমথ বলিল, "আমাকে মাপ করো অমলা, আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়ে অন্যায় করেছি! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যদি অন্য কোনও উপায় না করতে পারি, আমি নিজে এসে তোমার কাছ থেকে গহনা চেয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু এখন তুমি আমার অনুরোধ রাখো, বালা হাতে পরো।" বলিয়া বালা দুই গাছা তুলিয়া লইয়া প্রভাবতীর হস্তে দিয়া বলিল, "মাসিমা তুমি পরিয়ে দাও।"

প্রভাবতী বালা লইয়া অমলার হস্তে পরাইয়া দিলেন।

অমলাকে ডাকিয়া পাশে বসাইয়া সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া হরমোহন বলিলেন, "ছি মা, এত অধীর হ'তে আছে কি? ভয় কী? সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার গহনায় কতটুকু ধার কমবে বলো? তা ছাড়া একেবারে নিঃস্ব হয়ে থাকাও তো ভালো নয়। তেমন দরকার হলে খরচ করতে পারব শুধু এই ভরসাটুকু মনের মধ্যে রাখবার জন্যেও হাতে কিছু বাঁচিয়ে রাখা দরকার।"

অমলা নিঃশব্দে নতমুখে পিতার পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

এমন সময়ে বাহির হইতে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি আসিল, "হরমোহনবাবু বাড়ি আছেন?"

এগার

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া হরমোহন প্রমথর সহিত বাহিরে আসিলেন। মানিকলাল বিনয় সহকারে উভয়কে নমস্কার করিল, এবং দুই তিন মিনিট সাধারণ কথাবার্তার পর টাকার কথা তুলিল।

বিপন্নভাবে একবার প্রমথর দিকে চাহিয়া, একবার ঊর্ধ্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে কুণ্ঠিত ভাবে মানিকলালের প্রতি চাহিয়া হরমোহন বলিলেন, "আপনার টাকার বিশেষ কোন ব্যবস্থা তো করতে পারিনি মাণিকবাবু!"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া মানিকলাল ধীরভাবে বলিল, "অবিশেষ ব্যবস্থা কী করছেন শুনতে পারি কি?"

কী বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া হরমোহন বিমূঢ়ভাবে প্রমথর দিকে চাহিতেই প্রমথ একটু হাসিয়া বলিল, "অবিশেষ ব্যবস্থা আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা ভিন্ন আর বড় বেশি কিছু নয়। দয়া ক'রে কিছু সময় দিতেই হবে!"

প্রমথর কথা শুনিয়া মানিকলাল কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে পকেট হইতে কয়েকখানা কাগজ বাহির করিল, এবং তন্মধ্য হইতে দুইখানা কাগজ বাছিয়া লইয়া হরমোহনের হস্তে দিয়া বলিল, "চারু চৌধুরী উকিল বলেছেন, বিশেষ দরকার না থাকলেও, আপনি দুটো কাগজ মিলিয়ে দেখে নিয়ে একটা আপনার কাছে রাখবেন, আর অপরটা দস্তখত ক'রে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন।"

কিয়দংশ পাঠ করিয়াই হরমোহন বুঝিতে পারিলেন যে তাহা নালিশ করিবার নোটিস্। শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়াই প্রমথর হস্তে তিনি তাহা অর্পণ করিলেন।

নোটিস্ পাঠ করিয়া প্রমথ ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তাহার পর আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিবার জন্ম মিনতিপূর্ণ ভাষায় মানিকলালকে সনির্বন্ধে চাপিয়া ধরিল। তাহার অসামান্য উদ্বেগ এবং আগ্রহ দেখিয়া হরমোহন এবং দ্বারান্তরালে স্থিতা প্রভাবতী ও অমলার কথা তো স্বতন্ত্র, অভিনয়কারী মানিকলালেরই সময়ে সময়ে ভ্রম হইতেছিল যে, প্রমথ হয় তো সত্য-সত্যই তাহাকে নিরস্ত হইতে বলিতেছে। প্রমথর কপট অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া অভদ্রতার অভিনয় করিতে সে মনে মনে পীড়া অনুভব করিতেছিল।

মানিকলালের দ্বিধা-মন্থর ভাব লক্ষ্য করিয়া, প্রমথর ওজস্বী বক্তৃতায় কিছু ফল হইয়াছে ভাবিয়া হরমোহনও এরূপ ভাবে মানিকলালের স্তুতি করিলেন যে, ব্যাপারটা যদি অভিনয় না হইয়া প্রকৃত হইত তাহা হইলে তদণ্ডেই মানিকলাল হরমোহনের সকরুণ প্রার্থনা মঞ্জুর করিত; কিন্তু এ অভিনয়ের সব জিনিসটা নকল হইলেও ইহার বাঁধাবাঁধির মধ্যে নকল করণার স্থান একেবারেই ছিল না। তাই প্রমথ ও হরমোহনের নির্বন্ধ-নিবেদন শেষ হইলে সে শান্ত অবিচলিত ভঙ্গিতে বলিল, "আপনারা দুজনে এই দীর্ঘ সময় ধ'রে যে কাতরতা প্রকাশ করলেন, শুনে দুঃখিত

হোন, তাতে আমার মন একটুও গলে নি। আমি একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ; চক্ষুলজ্জা বা মায়া-মমতার সঙ্গে আমার কারবার নেই। বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার শখ আপনাদের যদি থাকে তা সেটা আমাকে বাদ দিয়েই করবেন। এখন নোটিস্‌খানায় একটা সই ক'রে দেবেন, না অমনই উঠব, অনুগ্রহ ক'রে বলুন।"

প্রমথ বলিল, "যতটা বাজে আপনি আমাদের মনে কচ্ছেন, ততটা বাজে আমরা না হতেও পারি। অতএব এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা কইলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হবে না।"

মানিকলাল বলিল, "কথাবার্তার যদি প্রয়োজন হয় তো আমার উকিল চারুবাবুর সঙ্গেই কথাবার্তা কইবেন। স্টেশন রোডে রাধামাধব জীউর মন্দিরের সম্মুখে তাঁর বাড়ি; আপনাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরের পথ নয়।"

একটু চিন্তা করিয়া প্রমথ বলিল, "কখন তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুবিধা হবে?"

অনুৎসুকভাবে মানিকলাল বলিল, "এখন থেকে আরম্ভ ক'রে ডিক্রিজারি পর্যন্ত যখন আপনাদের অভিরুচি হয়।"

প্রমথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, মশায়, উকিলের সঙ্গে কথা কয়ে সুবিধা করতে পারব না। যে কথা উকিলকে বাদ দিয়ে কইলে সহজ হয়ে আসে, সেই কথাই উকিলের সঙ্গে হ'লে জটিল হ'য়ে যায়। মরতে যদি হয় তো রামের হাতেই মরি; রাবণের হাতে মরলে আর বেশি সুবিধে কী হবে?"

মুখ কুঞ্চিত করিয়া মানিকলাল বলিল, "আচ্ছা, তা হলে বলুন; কী আপনার বলবার আছে শুনেই যাই। কিন্তু দোহাই আপনার, সংক্ষেপে বলবেন।"

প্রমথ বলিল, "লাইফ ইনসিওরের টাকা পেতে মেসোমশায়ের এখনও দু বৎসর দেরি; তার আগে কোনরকমেই আমরা আপনার সব টাকা পরিশোধ করতে পারছি নে। আপনি যখন শুধু হাতে দু বৎসর অপেক্ষা করতে রাজী নন, তখন মাসে মাসে কিছু টাকা নিয়ে আপনাকে দু বৎসর অপেক্ষা করতে হবে।"

একটু নড়িয়া বসিয়া মানিকলাল বলিল, "কত টাকা মাসিক দিতে আপনারা প্রস্তুত আছেন? পাঁচ শ?"

প্রমথ বলিল, "পাঁচ শ হাজার জানিনে মশায়। আপনি ঠিক বুঝে এমন একটা কিছু বলুন যার এক পয়সা কমে আপনি রাজী হবেন না। কাতরতা প্রকাশ ক'রে কমাবার পথ তো নেই, কারণ কাতরতা প্রকাশ করলেও আপনার মন গলে না। আপনি ঠিক বলেছেন,—চক্ষুলজ্জা না থাকার দরুন আপনার প্রকৃতি একটু ভিন্ন হবারই কথা। চক্ষু না থাকলে জীব-বিশেষের বাসস্থান যেমন ভিন্ন হয়।" বলিয়া প্রমথ উচ্চ স্বরে হাসিতে লাগিল।

প্রমথর হাসি থামিলে মানিকলাল বলিল, "দেখুন প্রমথবাবু, আপনি আমাকে গালাগালি দিলেও আমি আপনাকে পছন্দ করি। কী জানেন? হাতীর লাথিও সহ্য হয়। আপনার কথার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, আপনিই বলুন কত

আপনারা দিতে পারেন ; আমার যদি পছন্দ হয় আমি নিশ্চয়ই রাজি হব।"

প্রমথ বলিল, "আচ্ছা তাই ভালো। পঞ্চাশ ?"

মানিকলাল সংক্ষেপে বলিল, "না।"

হরমোহন একটু উস্‌খুস্‌ করিয়া প্রমথর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রমথ, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।"

হস্ত সংকেতে হরমোহনকে নিরস্ত করিয়া প্রমথ কহিল, "আগে এঁর সঙ্গে কথা শেষ করি, তারপর আপনার কথা শুনছি। আচ্ছা, আশি ?"

হরমোহন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "প্রমথ, একবার যদি বাড়ির ভেতর"—

হরমোহনকে কথা শেষ করিবার অবকাশ না দিয়া প্রমথ বলিল, "প্রথমে বাইরের হাঙ্গামাটা চুকোই, তারপর বাড়ির ভিতর যাওয়া যাবে।"

মানিক বলিল, "না, আশিও না।"

প্রমথ বলিল, "তবে পুরোপুরি এক শ ; কিন্তু এবার থেকে আমার 'না' বলবার পালা, তা জানিয়ে দিচ্ছি।"

হরমোহনের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, তিনি হতাশ হইয়া অবসন্ন দেহে বসিয়া রহিলেন।

মানিকলাল বলিল, "আচ্ছা, তবে এক শ-ই। আপনার কথাকে আমি মান্য করি ; আপনি যখন বলেছেন যে এক শ-র বেশি হবে না, তখন বাজে কথায় সময় নষ্ট ক'রে কোন ফল নেই। কিন্তু মাসের পনের তারিখের মধ্যে টাকা না পেলে ষোল তারিখে নালিশ দায়ের করব।"

প্রমথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "ন্যায্য কথা।"

"আর প্রথম মাসের কিস্তিটা আজ দিতে হবে।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "এটা অন্যায় কথা হলো। মাসের পঁচিশ তারিখে চাকুরের কাছে থেকে যিনি টাকা চান তাঁর বিবেচনার সুখ্যাতি আমি করতে পারি নে।"

একটু অপ্রতিভ ভাবে মানিকলাল বলিল, "আচ্ছা, আসছে মাস থেকেই না হয় হবে। আমি তা হলে এখন উঠি।"

"পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।" বলিয়া হরমোহনের দিকে চাহিয়া প্রমথ বলিল, "এবারে চলুন মেসোমশায়, আপনি বাড়ির ভিতর যাবেন বলছিলেন।"

বাড়ীর ভিতর পদার্পণ করিয়াই হরমোহন কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "এ ব্যবস্থা কেন করলে প্রমথ ? মোটে দেড়শ টাকা মাইনে পাই, একশ টাকা কোথা থেকে দোব ?"

দ্বারান্তরাল হইতে শুনিয়া প্রভাবতী ও অমলারও এ ব্যবস্থা ভালো লাগে নাই। মাস-কাবারের পনের দিন পনেরটি টাকাও যে পরিবারে অবশিষ্ট থাকে না, দুই বৎসর ধরিয়া মাসে মাসে একশত টাকা করিয়া ঋণ পরিশোধ সে পরিবারের দ্বারা কেমন করিয়া হইতে পারে ?

প্রমথকে লইয়া হরমোহন এমন স্থানে আসিলেন যেখান হইতে মানিকলাল কোন কথা শুনিতে না পায়। সঙ্গে সঙ্গে অমলা এবং প্রভাবতীও তথায় উপস্থিত হইলেন।

প্রভাবতী বলিলেন, "যা দিনকাল পড়েছে, দেড় শতেই তো কুলোয় না; তার জায়গায় পঞ্চাশ হলে অর্ধেক দিন তো উপোস করতে হবে প্রমথ?"

অমলা নিজে কিছু বলিল না; পিতা ও মাতার প্রশ্নের উত্তরে প্রমথ কী বলে তাহা শুনিবার জন্য সে আগ্রহের সহিত, কিন্তু অপ্রসন্ন মুখে, প্রমথর দিকে চাহিয়া রহিল।

নিমেষের জন্য একবার অমলার মুখ দেখিয়া লইয়া তাহারও মনের ভাব কতকটা উপলব্ধি করিয়া হরমোহনের দিকে চাহিয়া প্রমথ বলিল, "সে তো ঠিক কথা। কিন্তু এমনি একটা ব্যবস্থা না করলে কালকে নালিশটাই বা কী ক'রে আটকানো যায়? সে-ও তো সুবিধের ব্যাপার নয়। নালিশ হ'লে কতকগুলো বিষম রম হাঙ্গামার ব্যাপার উপস্থিত হবে; অথচ পঞ্চাশ টাকাতে আর কিছু না হোক নুন ভাতটাও তো চলতে পারে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরমোহন বলিলেন, "শুধু নুন ভাত নয় প্রমথ, তা হ'লে আর ভাবনা কী ছিল? ওর মধ্যে লাইফ ইনসিওর‍্যান্সের প্রিমিয়ম আর সুদ আছে, প্রভিডেন্ট্ ফণ্ড আছে, স্যাকরা আছে, কাপড়ের দোকান আছে; আরও কত কী যে আছে তা আর তোমাকে কত বলব? আমার বোধ হয় এর চেয়ে নালিশই ভালো ছিল।"

প্রমথ একটু হাসিয়া বলিল, "না, তা ভালো নয়। কেন না তাতে এ সব অসুবিধে তো থাকবেই, অধিকন্তু নালিশের উৎপাতটা বাড়বে। শুনুন মেসোমশায়, শোন মাসিমা, অমলা তুমিও শোন, আমি একটা উপায় মনে মনে ভেবেছি। তোমাদের সকলের যদি মত হয় তাহলে বোধ হয় এ সংকটের একটা ব্যবস্থা হ'তে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থায় আমাদের সকলেরই হয় তো একটু অসুবিধা ভোগ করতে হ'তে পারে,—আপনাদেরও, আমারও। কিন্তু একটা দুরূহ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় যে খুব সহজ হবে না, এ তো আমাদের ভেবে নেওয়াই উচিত।"

প্রমথর এই দীর্ঘ ভূমিকায় বাকি তিনজনেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল; হরমোহন ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "অসম্ভব না হলেই হলো। কী বলো শুনি?"

প্রমথ বলিল, "না, অসম্ভব হয়তো নয়। কাজকর্মের জন্য আমাকে মাঝে মাঝে কলকাতায় থাকতে হয়, কখন মাসে দশ বার দিন, কখন বা ন-মাস ছ-মাস দুচার দিন। তার জন্যে আমাকে একটা চল্লিশ টাকা ভাড়ার বাড়ি আর বামুন চাকর রাখতে হয়। তাতে মাসে মাসে আমার সত্তর পঁচাত্তর টাকা পড়ে। ধরুন, আমি যদি আমার বাসা তুলে দিই তা হলে সেই টাকাটা এ দিকে লাগানো যেতে পারে। আপনাকে মাসে মাসে বাকি পঁচিশ ত্রিশ টাকা দিলেই চলবে। এভাবে ছ-মাসের বেশি চালাতে হবে না। ছ-মাস পরে আমি একটা টাকা পাব, তা থেকে

মানিকলালের দেনাটা চুকিয়ে দিলেই হবে। তারপর আপনার লাইফ ইনসিওরের টাকা পেলে আমার টাকাটা দিয়ে দেবেন। বাসা তুলে দিয়ে আমি একটা মেস্-টেস্ দেখে নিতে পারি। মেসে অসুবিধা হ'লে আমার বন্ধুবান্ধবের বাড়ি আছে, আপনারা আছেন, মাঝে মাঝে দু-চার দিন এক রকম ক'রে চালিয়ে নেওয়া যাবে।"

প্রমথর কথা শুনিয়া হরমোহন ও প্রভাবতীর হৃদয় আশা ও আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। এত সহজে যে এ দুরূহ বিপদের উপায় হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

হৃষ্টচিত্তে হরমোহন বলিলেন, "এ রকম ব্যবস্থা হ'লে আমাদের পক্ষে তো খুবই ভালো হয়। কিন্তু একটা কথা প্রমথ, শুধু তুমিই কি আমাদের আপনার লোক, আর আমরা তোমার কেউ নই? আমাদের জন্যে বাসা তুলে দিয়ে তুমি মেসে বা বন্ধুর বাড়িতে থাকবে, এ কথা তুমি বলছ কী ক'রে?

প্রভাবতী কহিলেন, "আমরা থাকতে তোমার স্বতন্ত্র বাসা ক'রে থাকা শুধু তখনই অন্যায় হবে না প্রমথ, এখন যে আছ, এটাও অন্যায় হচ্ছে!"

মৃদু হাসিয়া প্রমথ বলিল, "এক শ বার, যদি না তোমাদের এ অঞ্চলে থাকলে আমার কাজ কর্মের পক্ষে একটু অসুবিধা হতো। তা সে পরের কথা পরে, যেমন সুবিধা হয় করলেই হবে, এখন তা হলে মাসে এক শ টাকা ক'রে দেবার কথা বলাই ঠিক তো? তুমি কী বলো অমলা? এ ব্যবস্থা মন্দ কী?"

প্রমথর দিকে না চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুকণ্ঠে অমলা বলিল, "মন্দ নয়।" কিন্তু তাহার পরই হরমোহনের দিকে চাহিয়া বলিল, "তার চেয়ে বাবা, এক কাজ করলে তো হয়। আমার গহনা থেকে ছ শ টাকার অনেক বেশি তো হবে; সেই টাকা থেকে ছ মাস, অর্থাৎ যতদিন প্রমথদাদার টাকাটা না পাওয়া যায়, মানিকবাবুকে মাসে মাসে একশ টাকা ক'রে দেওয়া যেতে পারে। তারপর আপনার লাইফ-ইন্সিওরের টাকা পেলে প্রমথদাদার টাকাটা দিয়ে দেবেন। তা হলে আর প্রমথদাদাকে নানা রকমের অসুবিধা ভোগ করতে হয় না।"

শেষোক্ত ব্যবস্থাটির চেয়ে প্রথমোক্ত ব্যবস্থাটি যে কত হিসাবে সুবিধাজনক, তাহা বুঝিবার পক্ষে হরমোহনের কিছু মাত্র বুদ্ধির অভাব ছিল না। সেই নিরতিশয় সুব্যবস্থায় বিবেচনাহীনা কন্যাকে অমনভাবে বাধা দিতে দেখিয়া হরমোহন অন্তরের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রমথর উপস্থিতির জন্য যথাসম্ভব সংযত হইয়া অমলার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া বলিলেন, "তোমার গহনা বিক্রি করবার জন্যে তুমি তখন থেকে এত পীড়াপীড়ি করছ কেন তা তো বুঝতে পারছি নে! তুমি কি মনে কর যে, তোমার বিয়ের ধার ব'লে এটা তোমারই শোধ করা কর্তব্য, আর তোমার গহনা থেকে এটা শোধ গেলে তুমি আমাদের সকলের কাছে একেবারে ঋণ-মুক্ত হবে?"

হরমোহনের সপরিহাস ভৎর্সনার দংশনে অমলার মুখ-মণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল; পিতার কথার উত্তরে আর কোনও কথা বলিবার তাহার বুদ্ধি অথবা ক্ষমতা রহিল না।

অমলার দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া সেই অপরিচ্ছন্ন অভিযোগের গ্লানি হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রমথ বলিল, "তা নয় মেসোমশায়; অমলা মনে করে, আপনাকে সাহায্য করবার অধিকার তার তুলনায় আমার কিছুই নেই। সেই জন্যে সে ভাবছে যে, আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে সে তার সব গহনাগুলো অনায়াসে বিক্রি ক'রে দিতে পারে, কিন্তু আমাকে সামান্য বাসা তুলে দিয়েও সাহায্য করতে দেওয়া যেতে পারে না। তাই সে আমার অসুবিধে নিয়ে এত চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আমার অসুবিধের কথা যদি এতটা ভাবো অমলা, তা হলে প্রমথদাদার অসুবিধে না ব'লে প্রমথবাবুর অসুবিধে বলাই উচিত।" বলিয়া প্রমথ হাসিতে লাগিল।

প্রমথর এই তিরস্কারে অমলা অপ্রতিভ হইল, কিন্তু খুশীও কম হইল না। বিসদৃশ ব্যাপারটাকে এমন করিয়া একটা সঙ্গত আকার দেওয়ায় তাহার মনে যুগপৎ প্রমথর প্রতি সামান্য একটু কৃতজ্ঞতা এবং হরমোহনের প্রতি তদনুপাতে অভিমান উদ্রিক্ত হইল। সে একটু আবেগের সহিত বলিল, "আমার কথার যদি আপনারা এই রকম সব মানে করেন, তাহলে আমার কোন কথা না বলাই উচিত। যা আপনাদের ভালো মনে হয় তাই করুন।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তোমার কথার যদি সে রকম সব মানে না হয়, তাহলে আর কোনও কথা নেই, উপস্থিত মানিকবাবুকে বিদায় ক'রে আসা যাক।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই, প্রমথ ও হরমোহনের নিকট মাসে মাসে একশত টাকা পাইবার কথা পাইয়া, মানিকলাল প্রস্থান করিল।

বার

এক মাস অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রমথ আর একদিনও হরমোহনের বাটিতে দেখা দেয় নাই। কিন্তু মাস শেষ হইতেই দুই তিন দিনের মধ্যে, অর্থাৎ যথাসময়ে তাহার নিকট হইতে পঁচাত্তর টাকা মনিঅর্ডারে হরমোহনের নিকট পৌঁছিয়াছিল, এবং চুক্তি মতো মানিকলালও প্রথম কিস্তির একশত টাকা যথাসময়ে লইয়া গিয়াছে। হরমোহন দুই তিনবার প্রমথর সন্ধানে তাহার বাসায় গিয়াছেন, কলিকাতায় প্রমথ আসিয়াছে সে সংবাদও মাঝে মাঝে পাইয়াছেন, কিন্তু একবারও তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

অসঙ্গত অধিকতর লাভের প্রধানতঃ দুইটি উপায় আছে, বল ও কৌশল। তন্মধ্যে মানব-চিত্ত-অধিকারের পক্ষে শেষোক্ত উপায়টিই বিশেষ উপযোগী। মাছ বঁড়শি-বিদ্ধ হওয়ার পর তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য সুতা গুটাইবার পূর্বে সুতা ছাড়াই কৌশল; অমলার উপর প্রমথ সেই কৌশল প্রয়োগ করিতেছিল। মাসে

মাসে একশত টাকা দিবার প্রসঙ্গে সেদিন যখন প্রমথর বাসা তুলিয়া দিবার কথা হইয়াছিল, তখন, বিশেষ কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও, অমলার মনের মধ্যে এই কথাটাই বারংবার হইয়াছিল যে, পরদিনই প্রমথ তাহার বাসা সমূলে উৎপাটিত করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাই আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ব্যগ্রতায়, প্রমথর সেই সম্ভাবিত পথ রোধ করিবার জন্য অমলা তাহার অলংকার বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল, "তা হলে আর প্রমথদাদাকে নানা রকমের অসুবিধে ভোগ করতে হয় না!" ধূর্ত প্রমথ কিন্তু সে কথা শুনিয়া তখনই বুঝিয়াছিল যে, আসিতে বিলম্ব না করিলেই আসলে বিলম্ব হইয়া পড়িবে, ধরা দিলেই ধরিতে পারিবে না। তাই একমাসের মধ্যেও যখন প্রমথর আসিবার কোনও লক্ষণ বা আগ্রহ দেখা গেল না তখন অমলার মনের সব আন্দাজ একেবারে ওলট-পালট হইয়া গেল। প্রমথকে সে যতটা সহজ এবং সুলভ মনে করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তদ্রূপ সে নয় বুঝিতে পারিয়া একদিকে সে যেমন মনে মনে ঈষৎ অপ্রতিভ বোধ করিল, অপরদিকে প্রমথর উপর তাহার অপহৃত শ্রদ্ধা অনেকটা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তৎসহিত সে মনের নিভৃত প্রদেশে একটা অদ্ভুত রকমের নৈরাশ্যের গ্লানিও বোধ করিল; চিকিৎসক 'জবাব' দিয়া যাইবার পর সমস্ত অনুমান এবং অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া রোগী সহসা বাঁচিয়া উঠিলে আনন্দেরই সহিত চিকিৎসক যেরূপ একটা অপ্রত্যাশার আঘাত অনুভব করে, কতকটা সেইরূপ।

মাস-কাবারের পর আট নয় দিন অতিবাহিত হইয়াছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় কিস্তি দিতে হইবে। টাকার জন্য হরমোহন চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে প্রমথর নিকট হইতে টাকা না আসিয়া একখানা চিঠি আসিল। চিঠি খুলিয়া হরমোহন দেখিলেন একটা নূতন ঠিকানা হইতে প্রমথ পত্র দিয়াছে, এবং মানিকলালের কিস্তির টাকা লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

বৈকালে অফিসের ফেরত হরমোহন প্রমথর নূতন ঠিকানায় উপস্থিত হইলেন। তালতলা অঞ্চলে একটা জীর্ণ দ্বিতল গৃহ, দেখিলে মনে হয় না যে নির্মিত হওয়ার পর কখনও সংস্কার হইয়াছিল। গৃহদ্বারে বসিবার বাঁধানো জায়গায় এক ব্যক্তি বসিয়া ছিল; কৃশকায়, কৃষ্ণবর্ণ, এবং মাথার কাঁচা চুল এবং মুখের পাকা ভাব এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টা তাহার যথার্থ বয়সের পরিচায়ক, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

হরমোহন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, এটা মেস তো?"

হঠাৎ ম্যাজিকের মতো সেই নিকষকৃষ্ণ মুখের মধ্য হইতে দুই শ্রেণী দুগ্ধ-শুভ্র দন্ত বাহির করিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, "মেছ্‌, বলেন কি মশাই? হোটেল! দেখছেন না, ছাইন-বোর্ড দেখছেন না, গেরেট্‌ বেঙ্গল হোটেল?"

হরমোহন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে পাঠ করিয়া দেখিলেন সেই ক্ষুদ্র এবং নগণ্য গৃহের সেই জমকাল নামই বটে।

"আপনি কি এখানে থাকেন?"

আবার সেই দন্তের ম্যাজিক হইল। "থাকি কি? আমি এখানকার মালিক! আর কেউ অংশীদার নেই!"

মৃদু হাসিয়া হরমোহন বলিলেন, "বটে? তবে একেবারে আসল লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে! আমি প্রমথ চাটুয্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি বাড়ি আছেন কি?"

"আছেন। আপনি?"

হরমোহন এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি প্রমথর মেসো হই।"

শুনিবামাত্র সেই ব্যক্তি ত্বরিত-বেগে উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া হরমোহনের পদধূলি লইল। তৎপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি তো তাহলে গুরুজন ব্যক্তি! চলুন ওপরে চলুন। কদিন থেকে চাটুয্যে মহাশয়ের বড় অসুখ করেছে।"

অসুখের কথা শুনিয়া হরমোহন উদ্বিগ্ন চিত্তে প্রমথর নিকট উপস্থিত হইলেন। একটি ক্ষুদ্র, অন্ধকারময় কক্ষ। তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। হরমোহন প্রবেশ করিয়া প্রথমে কিছুই ভালো দেখিতে পাইলেন না। একদিকে একটা খাটের মতো মনে হইল, তাহার উপর হইতে যখন "আসুন মেসোমশায়, এদিকে আসুন" বলিয়া প্রমথ আহ্বান করিল, তখন হরমোহন শয্যার এক প্রান্তে প্রমথর শিয়রে গিয়া বসিলেন।

"কী অসুখ হয়েছে তোমার প্রমথ?"

"বলছি" বলিয়া প্রমথ পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "চকোত্তি, আলোটা জেলে দিয়ে, দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।"

চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া প্রমথর বাতিদানে বাতি জ্বালিয়া দিয়া দ্বার ভেজাইয়া প্রস্থান করিল। হরমোহন বুঝিতে পারিলেন ধনী বলিয়া হোটেলে প্রমথর একটু খাতির আছে।

চক্রবর্তী প্রস্থান করিলে প্রমথ বলিল, "অসুখ তেমন কিছু নয় মেসো মশায়। চার পাঁচ দিন জ্বরে ভুগেছিলাম। কাল থেকে জ্বর আর নেই, কিন্তু ভারী দুর্বল করেছে। নইলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না, নিজে গিয়েই টাকাটা দিয়ে আসতাম। আপনার বড় কষ্ট হলো!"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হরমোহন বলিলেন, "হ্যাঁ, বাস্তবিকই কষ্ট হয়েছে তোমার এই দুর্ব্যবহারে! বাসা তুলে দিয়ে একটা কদর্য জায়গায় প'ড়ে তুমি অসুখে ভুগছ, অথচ আমার বাড়ি যেতে পারোনি, এই তো তুমি আমার আপনার লোক? আমি এখনই একটা গাড়ি নিয়ে আসছি, তুমি আমার সঙ্গে যাও তো ভালোই, নইলে তোমার এক পয়সাও আমি আর হাতে করছি নে, তা আমার যত বড় বিপদই হোক না কেন!"

হরমোহনের কথা শুনিয়া প্রমথ মনে মনে বিশেষ হৃষ্ট হইল; কিন্তু মুখে গাম্ভীর্যের মুখোস পরিয়া হরমোহনের বাড়ি না গিয়া সেই মেসে থাকার পক্ষে এমন সব কারণ দেখাতেই লাগিল, যাহাতে হরমোহনের বুঝিতে একটুও ভুল না হয় যে,

অন্ত কারণ থাকিলেও, যে-গুলো দেখাইতেছিল সে-গুলো সত্য কারণ একেবারেই নয়, নিতান্তই মিথ্যা ওজর-আপত্তি। এমন কি হরমোহনের গৃহে তাহার বাস করিবার আমন্ত্রণের প্রসঙ্গে অপর সকলের নামোল্লেখের মধ্যে অমলার নামটা সে এমন স্পষ্টভাবে বাদ দিয়া গেল যে, হরমোহনের এ কথা মনে হইতেও বাকি থাকিল না যে, তাহার আপত্তির যথার্থ কারণ অমলার সেদিনের রূঢ় আচরণ।

ঘণ্টাখানেক তর্কবিতর্কের পরও প্রমথ যখন বাসা তুলিয়া হরমোহনের গৃহে যাইতে স্বীকৃত হইল না, তখন হরমোহন দুঃখে ও অভিমানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রমথর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও টাকা না লইয়াই প্রস্থান করিলেন।

পথে বাহির হইয়াই কিন্তু হরমোহনের অভিমান আশঙ্কায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। এই সব মান-অভিমানের গোলযোগে পনের তারিখের মধ্যে মানিকলালকে টাকা দেওয়া না হইয়া উঠিলে অবস্থাটা কীরূপ দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং আত্মসম্মান-বোধের সীমাতিরিক্ত অভিনয় করিয়া টাকা না লইয়া চলিয়া আসার জন্য মনের মধ্যে গভীর পরিতাপ উপস্থিত হইল। কিন্তু গৃহে পৌঁছিবার পর প্রভাবতী যখন প্রমথ কেন আসিল না, এবং টাকা আসিয়াছে কি-না জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অদূরে উৎকর্ণ অমলাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হরমোহনের আশঙ্কা ও অনুতাপ মুহূর্তের মধ্যে ক্রোধে পরিণত হইল।

প্রভাবতীর প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হরমোহন কহিলেন, "এবার পাওনাদার এসে যখন আপমান করবে, তখন তোমার মেয়েকে সামলাতে বোলো!"

প্রভাবতী সংকুচিত হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "কেন? ও কী করেছে?"

হরমোহন তেমনই ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "কেন, তুমিও কি ভুলে গিয়েছ? তোমার সাক্ষাতেই তো সেদিন এ বাড়িতে আসা নিয়ে ও প্রমথর সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করলে, তাতে তখনই আমি বুঝেছিলাম যে, প্রমথর যদি কিছুমাত্র আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে তাহলে এ বাড়িতে কখনও সে বাস করতে আসছে না। মাসে মাসে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে এ বাড়িতে কষ্ট করে বাস ক'রে ওর তো ভারি লাভ যে, ওর ওপর তম্বি!"

প্রভাবতী বলিলেন, "প্রমথ কি সে সম্বন্ধে কথা তুলেছিল?"

হরমোহন কহিলেন, "সে কি সেই রকম লোক যে, স্পষ্ট ক'রে সে কথা বলবে?"

"টাকা এনেছ?"

"এখনও আত্মসম্মান-জ্ঞান একেবারে হারাই নি যে, এ অবস্থাতেও হাত পেতে টাকা নেব, তা অদৃষ্টে যত দুঃখই থাক!"

এক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমলা ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। দুঃখে ও বেদনায় তাহার হৃদয় বিগলিত হইতেছিল না, অভিমানে ও অপমানে দগ্ধ হইতেছিল। পাওনাদারকে সে সামলাইবে, এত বড়

অপমানের কথা পিতার মুখ দিয়া বাহির হইল, অথচ বান্ধবগণকে তাহার আর বাকি ছিল কোথায়? প্রমথকে এইরূপে প্রশ্রয় দেওয়া পাওনাদারকে সামলানো ভিন্ন অন্য কিছুই তো নয়! কিন্তু সে কথা বুঝিবে কে, আর বুঝাইবেই বা কে?

তাহার পর, তাহাদের বাটীতে বাস করিলে প্রমথর যদি কোনও লাভ না থাকে তো তাহারই বা ক্ষতি কী? বেশ, তবে তাহাই হউক। কিন্তু পরে যদি কখনও প্রমথকে বাড়ি হইতে তাড়াইবার প্রয়োজন হয়, তখন সে ব্যাপার হইতে সে একেবারে নির্লিপ্ত থাকিবে।

অমলা উঠিয়া বাতি জ্বালিয়া একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিল। তাহার পর হরমোহনের বসিবার ঘরে গিয়া টেবিলের উপর হইতে প্রমথর চিঠিটা লইয়া ঠিকানা দেখিয়া নিজ লিখিত চিঠিখানা একখানা খামে পুরিয়া প্রমথর ঠিকানা লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

তের

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রমথ স্থির করিল যে, দ্বিপ্রহরে হরমোহন যখন অফিসে থাকিবেন, তখন গিয়া প্রভাবতীকে পচাত্তর টাকা দিয়া আসিবে; এবং সেই সময়ে অমলা ও প্রভাবতীর আগ্রহ এবং আচরণ লক্ষ্য করিয়া হরমোহনের গৃহে বাস করা-না-করা স্থির করিবে। এ বিশ্বাস তাহার মনে-মনে বেশ ছিল যে, অন্ততঃ প্রভাবতী তাহাকে তাঁহাদের বাড়িতে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন, এবং এ কথাও সে মনে-মনে এক প্রকার স্থির করিয়া রাখিল যে, এবার একটু পীড়াপীড় করিলেই আর অসম্মত হইবে না।

আহারাদির পর টাকা লইয়া যাইবার জন্য প্রমথ প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময়ে ডাক-পিয়ন একখানা চিঠি দিয়া গেল। খামের উপর অপরিচিত হস্তের লেখা দেখিয়া তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া প্রমথ দেখিল লেখিকা অমলা। ঔৎসুক্যের সহিত সে চিঠিখানা পাঠ করিল। লেখা ছিল,

শ্রীচরণেষু,

একমাসের মধ্যে আপনি একবারও এ বাড়িতে আসেন নাই; এমন কি, অসুস্থ শরীরে কষ্ট করিয়া হোটেলে বাস করিতেছেন, তবুও আমাদের নিকট আসিবার কথা আপনার মনে পড়িল না। আমার কোনও অপরাধের জন্য যদি আপনি রাগ করিয়া থাকেন তো অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন, এবং আমার একান্ত অনুরোধ পত্রপাঠ মাত্র আপনার জিনিসপত্র লইয়া আমাদের বাড়ি চলিয়া আসিবেন। না আসিলে বাস্তবিকই আমি দুঃখিত হইব।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ, এ চিঠিখানা কাহাকেও দেখাইবেন না, এবং কাল আসিয়া চিঠিখানি আমাকে ফেরত দিবেন।

আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি, অমলা

চিঠি পড়িয়া প্রমথর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে হোটেলের ভৃত্যকে ডাকিয়া একখানা ঠিকা গাড়ি আনিতে আদেশ দিল, এবং তৎপরে চিঠির কাগজ বাহির করিয়া নিম্নলিখিতরূপে একটা চিঠি লিখিয়া ফেলিল।

স্নেহের অমলা,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে অতিশয় সুখী হলাম। প্রকাশ ডাক্তারের চার শিশি ঝাঁঝাল ওষুধ খেয়ে যে ফল না হয়েছিল, তোমার এই ছোট্ট হোমিওপ্যাথিক ওষুধের এক ফোঁটার মতো চিঠিখানিতে তার দশগুণ হলো। পাঁচ মিনিট আগে দুর্বলতায় মাথা তুলতে পারছিলাম না, আর এখন একেবারে সোজা হয়ে ব'সে চিঠি লিখছি।

তুমি আমাকে যাবার জন্তে আদেশ করেছ। শরীর যদি নিতান্ত অপটু না হতো তা হ'লে এক মিনিট দেরি না ক'রে তোমার হুকুম তামিল করতাম। যাই হোক, তুমি যখন আমাকে আহ্বান করেছ, তখন তার প্রতিকূলে এমন কোনও শক্তিই নেই যা আমাকে আটকে রাখতে পারে। কাল সকালেই হাজির হব। এই হলো তোমার প্রথম আদেশের কথা।

তোমার দ্বিতীয় আদেশটি আমি আংশিক ভাবে নিশ্চয়ই পালন করব, অর্থাৎ তোমার চিঠিখানা কাউকে কখনই দেখাব না, কিন্তু তোমাকে ফেরতও কিছুতে দোব না। কেন তা জানো? ভেবে-চিন্তে মনে-মনে তুমি যে কারণটা বারংবার সন্দেহ করবে, ঠিক সেই কারণে।

কাল যখন তোমার সঙ্গে দেখাই হচ্ছে, তখন আজ আর থাক। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি,

তোমার প্রমথদাদা

একখানা খামে অমলার ঠিকানা লিখিয়া চিঠিখানা ভরিয়া প্রমথ পকেটে রাখিল, তাহার পর গাড়ি আসিলে একটা ট্রাঙ্ক ও বিছানা গাড়ির মাথায় দিয়া হরমোহনের গৃহে যাত্রা করিল।

সুরেশ স্কুলে গিয়াছিল, প্রভাবতী আহারের পর দৈনন্দিন নিদ্রা যাইতেছিলেন, এবং অমলা নিজের ঘরে শয্যার উপর শয়ন করিয়া একখানা পুস্তক লইয়া নিদ্রা এবং জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল, এমন সময়ে প্রমথর গাড়ি আসিয়া দ্বারে লাগিল। গাড়ির শব্দে সজাগ হইয়া অমলা জানালায় আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল প্রমথ গাড়ি হইতে অবতরণ করিতেছে। প্রথমেই তাহার প্রভাবতীকে উঠাইয়া দিবার কথা মনে হইল, কিন্তু তৎপরমুহূর্তেই মনে হইল প্রভাবতীর সম্মুখে প্রমথ যদি তাহার পত্রের কোনও উল্লেখ করে, তদপেক্ষা তাহারই সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ হওয়া ভালো।

তখন ত্বরিত পদে নামিয়া গিয়া সে দ্বার খুলিয়া দিল। সহিসকে তাহার জিনিস দুইটা বাহিরের ঘরে রাখিতে আদেশ করিয়া সহাস্ত মুখে প্রমথ প্রবেশ করিল। জিনিস রাখা ও ভাড়া দেওয়া শেষ হইলে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল।

দ্বারের বাহির হইতে অমলা বলিল, "তোমার তো অসুখ শরীর প্রমথদাদা, এখানে কষ্ট হবে। ওপরে বাবার ঘরে গিয়ে একটু শুলে ভালো হয় না ?"

এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল, "মাসিমা কোথায় অমলা ?"

অমলা বলিল, "মা ঘুমুচ্ছেন।"

"সুরেশ ?"

"সুরেশ স্কুলে।"

"মেসোমশায় তো অফিসে ?"

"হ্যাঁ।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তবে তুমি ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় গতি নেই ?"

প্রমথর কথা শুনিয়া অমলার মুখখানা প্রথমে লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, "মা ঘুমুচ্ছেন, তাই তোমার আসা টের পান নি। চলো না, ওপরে তাঁর কাছেই চলো।"

প্রমথ বলিল, "ওপরে গেলেও তো টের পাবেন না যদি-না তাঁকে জাগিয়ে তোলা যায়। কিন্তু মাসিমাকে জাগাবার আগে তোমার সঙ্গে একটা জরুরী পরামর্শ আছে। সেটা প্রথমে সেরে নেওয়া যাক।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমলা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী পরামর্শ ?"

প্রমথ তাহার বিচিত্র কৌশলে কণ্ঠস্বরটা সহসা পরিবর্তিত করিয়া লইয়া কহিল, "কাল মেসোমশায় আমাকে নিয়ে আসবার জন্যে অত পীড়াপীড়ি করলেন তাতে এলাম না, আর আজ তোমার দু লাইনের একখানা চিঠি পেয়ে দৌড়ে এলাম, এ কথা শুনলে লোকে কী বলবে বলো দেখি ?"

প্রমথকে পত্র লিখিয়া, এবং সেই পত্রমধ্যে প্রমথর সহিত একটা গুপ্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতা স্থাপিত করিয়া কতটা ভুল ও অন্যায় করিয়াছে, তাহা অমলা বুঝিতে পারিল। সেই তুচ্ছ এবং সামান্য উপাদানটুকুর সাহায্যে প্রমথ একটা কদর্য লুকোচুরির অবস্থা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে বুঝিতে পারিয়া দুঃসহ বিস্ময়ে সে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর সহসা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "এই পরামর্শ ? এ তো অতি সহজ কথা। এ শুনলে লোকে তোমার নিন্দে করবে, বলবে, বাবার অত অনুরোধে না আসা যত না অন্যায় হয়েছে, আমার চিঠি পেয়ে দৌড়ে আসা ততোধিক অন্যায় হয়েছে; আর সব চেয়ে বেশি অন্যায় হয়েছে এ কথা ব'লে ফেলা।"

এই সবল ও সরল উত্তরে অপ্রতিভ হইয়া প্রমথ অসংলগ্ন ভাবে যে কথা বলিল, সে কথার কোনও উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া অমলা তাহার চিঠিখানা প্রমথর নিকট হইতে ফিরিয়া চাহিল।

তদুত্তরে প্রমথ হাসিয়া বলিল, "রামচন্দ্র ! এমন কাজও করে ? সে হলো একখানা দলিল, সে কি হাতছাড়া করতে আছে ? বরঞ্চ দলিলের বদলে

তোমাকে একখানা পাল্টা দলিল দিচ্ছি, রসিদের মতো রেখে দিয়ো।" বলিয়া পকেট হইতে তাহার লিখিত পত্রখানা বাহির করিয়া অমলার হস্তে দিল।

খামে-মোড়া চিঠিখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া অমলা বলিল, "এ কি ?"

স্মিত-মুখে প্রমথ বলিল, "তোমার চিঠির জবাব। প্রথমে ভেবেছিলাম কাল আসব, তাই তোমার চিঠির জবাব লিখলাম; কিন্তু লেখার পরই মন বদলে গেল, ভাবলাম হুকুমটা আজই তামিল না করলে যদি বড় রকম কিছু শাস্তি দিয়ে বসো। তাই তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি ডাকিয়ে চ'লে এলাম।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অমলা বলিল, "বড় ভাইকে ছোট বোন কি আবার শাস্তি দেবে।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তা আমি তেমন-কিছু জানি নে অমলা, কারণ, ছেলেবেলা থেকেই বোনের সঙ্গে আমার কারবার নেই। কিন্তু আমার মনে হয় স্নেহ ভালবাসার যত কিছু অধিকার আর আব্দার, তা তুমি আমার ওপর অবাধে খাটাতে পারো; আমাকে তিরস্কারও করতে পারো, পুরস্কারও দিতে পারো। তোমাদের সেই মান্ধাতার আমলের চামসে পড়া ভাই-বোনের সম্পর্ক আমার পছন্দ হয় না; আমি ভালোবাসি আজ কালকার আদর্শ,—সমান ভালোবাসা, সমান অধিকার। একে তুমি সাহেবিয়ানা ব'লে গাল দিতে চাও দাও, কিন্তু এ আমার খুব মিষ্টি লাগে। সাহেবেরা এই ভাই-বোনের সম্পর্কটা এমন সমান ক'রে দেখে যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন-কি বিয়ে পর্যন্ত হ'তে পারে যদি না একেবারে সহোদর ভাই বোন হয়।"

প্রমথর এই দীর্ঘ ও কূট বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া অমলা প্রমথর দিক মুখ ফিরাইয়া তীব্র স্বরে বলিল, "সে যাই হোক, আমি কিন্তু সেই সেকেলে ভাবকেই বড় মনে করব—তা সে যত পচাই হোক;—আর এই একেলে ভাবকে, যাকে তুমি বলছ প্রমথদাদা"—সহসা অমলা অসমাপ্ত কথার মধ্যে থামিয়া গেল। হয় তাহার মুখ দিয়া অতি-কটু কথা বাহির হইল না, নয় গভীর উত্তেজনায় সহসা কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

মাত্রা অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া মুহূর্তের মধ্যে মুখে চক্ষে একটা করুণ-কাতর ভাব আনিয়া প্রমথ বলিল, "আমি যদি কোনও অন্যায় কথা ব'লে তোমাকে বিরক্ত ক'রে থাকি তো আমাকে ক্ষমা করো অমলা; কিন্তু একটা কথা ভুলে না গেলে তুমি আমার ওপর রাগ করতে না। সংসারে আমার আপনার লোক এত অল্প আছে, তোমরা দুচার জন ছাড়া, যে আমি তাদের সকলকেই ষোল আনা পেতে চাই। স্নেহ ভালোবাসার বিষয়ে আমি এত গরিব যে, তা থেকে ফেলবার আমার কিছুই নেই। দুর্ভিক্ষের দেশে গিয়ে যদি একবার দেখে এস সেখানকার লোক খাবার পেলে কী রকম হাঁউ হাঁউ করে খায়, তা হলে আমার এই বাড়াবাড়ি আব্দারে ভাবটা ক্ষমা করতে পারবে। যদি এ তোমার ভালো না লাগে তো উপায় তো তোমার নিজের হাতেই রয়েছে, কাঙালকে

ধানের ক্ষেত দেখিয়ো না; দেখালেই সে উঞ্ছবৃত্তি করবে।"

প্রমথর এই সকাতর কৈফিয়ৎ শুনিয়া অমলা মনে মনে ব্যথিত ও অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি তো তোমাকে রূঢ় কোনও কথা বলি নি প্রমথ দাদা?"

স্মিত মুখে শান্ত-কণ্ঠে প্রমথ বলিল, "না, তা তুমি বলো নি। রূঢ় কথা বলবার তুমি অনেক ওপরে। সে কথা যাক, আমার তো সব কথাই তোমাকে বলা হয়ে গেল, এবার চল মাসিমার কাছে যাওয়া যাক।" তাহার পর অমলার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল, "সশরীরে যখন এসে হাজির হয়েছি, তখন আর চিঠির কী দরকার? ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।"

ফিরাইয়া দিতে গিয়া অমলার বিগলিত করুণায় একটু বাধিল। বলিল, "প'ড়ে ফিরিয়ে দোব অখন।"

"ফিরে পাবার জন্যে আমি ব্যস্ত নই; পড়াতেই আমার আপত্তি।"

"কেন?"

মৃদু হাসিয়া প্রমথ বলিল, "সেটা পড়লেই বুঝতে পারবে।"

একবার অমলার চিঠিখানা ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু বৃন্ত যেমন করিয়া ফলকে ধরিয়া রাখে, কৌতূহল তেমনি করিয়া চিঠিখানা আটকাইয়া রাখিল।

প্রমথকে দেখিয়া প্রভাবতী যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং বিস্তারিত ভাবে তাহার শারীরিক অবস্থার সংবাদ লইতে লাগিলেন। তৎপরে, অবশেষে মেস ছাড়িয়া তাঁহাদের নিকট আসিবার সুমতি যে তাহার হইয়াছে, তজ্জন্য বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কাল তোমার মেসোমশায়ের অত অনুরোধ না রেখে আজ হঠাৎ তোমার এ সুমতি কেমন ক'রে হ'লো প্রমথ?"

পলকের জন্য প্রমথ ও অমলার দুজনের দৃষ্টি মিলিত হইল। পর মুহূর্তে মৃদু হাসিয়া প্রমথ বলিল, "কালকের দুর্মতির প্রায়শ্চিত্তই আজ এ সুমতি হলো মাসিমা। কাল মেসোমশায়ের কথায় না আসা অন্যায় হয়েছিল, তা আজ বেশ বুঝতে পেরেছি।" এই দুইমুখী কথার দুই দিকে দুই রকম অর্থ;—প্রভাবতীর দিকে সরল, অমলার দিকে গূঢ়।

আবার অমলার সহিত প্রমথর চোখাচোখি হইল। এবার সে দেখিতে পাইল অমলার ওষ্ঠাধর মৃদু হাস্যের ক্ষীণ রেখায় কুঞ্চিত। মনের সন্ধান পাইলে বুঝিতে পারিত, অতি তরল কৃতজ্ঞতার রসে সে-স্থল সিক্ত হইয়া গিয়াছে।

চোদ্দ

অফিসের ছুটির পর হরমোহন পুনরায় প্রমথর হোটেলের উদ্দেশে চলিলেন। সহকর্মচারীদের নিকট একশত টাকা ঋণের জন্ত বহু প্রকারে চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হওয়ার পর, তাঁহার মনে পূর্বদিনের আত্মমর্যাদা অথবা আত্মাভিমানের জন্ত কোনও স্থানই আর ছিল না। কিস্তির টাকা যথাসময়ে না পাইলে মানিকলাল যে মূর্তি ধারণ করিবে তাহা কল্পনা করিয়া হরমোহন স্থির করিলেন যে, আজ যে প্রকারেই হউক, প্রমথকে গৃহে লইয়া যাইবেন; এবং সে কার্য একান্ত করিতে না পারিলে অগত্যা যে কার্য করিবেন, মনের নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া লুকাইয়া তাহাও এক প্রকার স্থির করিয়া লইলেন।

পথে যাইতে যাইতে যাচনা সম্বন্ধে একটা পুরাতন শ্লোক মনে পড়িয়া গেল—

বেপথুর্মলিনং বক্ত্রং দীনবাক্ গদ্‌গদস্বরঃ।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচনে॥

কিন্তু স্বভাবের উপর অভাবের উৎপীড়ন এমনই প্রবল যে, উপরোক্ত শ্লোকটি মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে হরমোহন প্রমথর হোটেলের দিকেই উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

হোটেলের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে চক্রবর্তীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। চক্রবর্তীকে নমস্কার করিয়া হরমোহন প্রমথর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রমথর আকস্মিক হোটেল-ত্যাগের সহিত হরমোহনের গতকল্যকার আগমনের কোন প্রকার যোগ ছিল মনে করিয়া হরমোহনের প্রতি চক্রবর্তী বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। রুক্ষস্বরে বলিল, "তিনি এখান থেকে উঠে গেছেন।"

বিস্মিত হইয়া হরমোহন বলিলেন, "উঠে গেছেন? একেবারে না-কি?"

"একেবারে কি দুবারে তা বলতে পারিনে মশায়; উঠে গেছেন তাই জানি।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেছেন বলতে পারেন?"

উত্তর দিতে গিয়া সহসা চক্রবর্তীর উভয় দন্তপঙ্‌ক্তি বাহির হইয়া পড়িল। আনন্দ, বিস্ময় অথবা ক্রোধ—যে কোনও মানসিক উত্তেজনার কালে এ ব্যাপার ঘটিত।

"কোথায় গেছেন আপনিই তো তা জানেন মশায়। আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

বারংবার এরূপ দুর্বিনীত উত্তরে হরমোহন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "রসিকতা করবার জন্তে জিজ্ঞাসা করছি! সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর ঠাট্টা হবার জন্তে আপনাকে খুঁজে বার করেছি কি না? তাই!"

হরমোহন কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া পুনরায় চক্রবর্তীর দন্তোচ্ছ্বাস হইল,—এবার

কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন উত্তেজনায়। অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "রাগ করবেন না মশায় ; নানান লোকের সঙ্গে কথা ক'য়ে ক'য়ে আমার বাক্যি একটু তিরিক্ষি হ'য়ে গেছে। চাটুয্যে মশায় কোথায় গেছেন, তা ব'লে যান নি ; বোধহয় বাড়ি গিয়েই থাকবেন।"

হরমোহনেরও মনে হইল, পুনরায় অসুস্থ হইয়া প্রমথ বাড়ি গিয়াই থাকিবে ; বলিলেন, "আজ সকালে কি তার জ্বর ছিল ?"

"দেহে তো কাঁচ লাগিয়ে দেখি নি, কেমন ক'রে বলব বলুন ?" সঙ্গে সঙ্গে নিমেষের জন্য বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত একবার দন্ত-স্ফুরণ হইয়া গেল।

চক্রবর্তীর প্রতি অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, এবং মনে মনে তাহাকে অভিসম্পাত দিয়া, হরমোহন পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে যাইতে যাইতে এক একবার মনে হইতে লাগিল, হয়তো প্রমথ তাঁহারই গৃহে গিয়া থাকিবে। কিন্তু অতটা আশা বেশিক্ষণ সাহসের সহিত করিতে পারিতেছিলেন না।

গৃহে পৌঁছিয়া প্রমথকে দেখিবামাত্র হরমোহনের মন হইতে সমস্ত চিন্তারাশি অপসৃত হইয়া গেল। তিনি যে প্রমথর হোটেল হইয়া আসিতেছেন সে কথা লুকাইলেন ; কিন্তু প্রমথকে দেখিয়া মনের অধীর আনন্দ লুকাইবার কোনও চেষ্টা করিলেন না।

অদূরে দাঁড়াইয়া অমলা পিতার এই পরিপুষ্ট প্রসন্নতার অন্তর্নিহিত কঙ্কাল-মূর্তি দেখিতে পাইয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই মাত্রাতিরিক্ত অভিনিবেশ ও আতিথেয়তার মূলে, এক পক্ষের কতখানি উপায়বিহীনতা এবং অপর পক্ষের কতখানি যথেচ্ছাচারিতার শক্তি রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া সে একটা অননুভূতপূর্ব অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। অপরিমেয় অধিকার লইয়া তাহাদের গৃহে আজ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও প্রমথ অধিকার পরিচালনার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে না দেখিয়া অমলা কিছুমাত্র আশ্বাস পাইল না। কোষ-নিবদ্ধ তরবারি যে কোনও মুহূর্তে কোষ হইতে বাহির হইয়া সংহার করিতে পারে, তাহা সে জানিত। প্রমথর অস্ত্রের একদিকে ছুরি এবং অপর দিকে চামর ; এবং এই অদ্ভুত অস্ত্র সে এমন ক্ষিপ্রতার সহিত পরিচালনা করিতে জানে যে কখন যে সে ছুরি চালায় এবং কখন যে সে চামর ঢুলায়, তাহা বুঝিতেই পারা যায় না।

প্রমথ কোন ঘরে থাকিবে সন্ধ্যার পর তাহা লইয়া বিবাদ বাধিয়া গেল। প্রভাবতী দ্বিতলের একটা ঘর পরিষ্কার করিয়া প্রমথর থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন ; কিন্তু প্রমথ তাহাতে সজোরে আপত্তি করিয়া বসিল।

সে বলিল, "অত হাঙ্গামা করবার প্রয়োজন নেই মাসিমা, আমি বাইরের ঘরে থাকব। রাস্তার ধারে ঘর, সে আমার বেশ সুবিধে হবে।"

কথাটা যে সর্বৈব উপেক্ষণীয়, সেই ভাবে প্রভাবতী ও হরমোহন হাসিতে লাগিলেন ; এমন কি অমলারও মনে হইল যে, সকলে দ্বিতলে থাকিয়া একমাত্র

প্রমথ নিচে শয়ন করিলে ব্যাপারটা একটু দৃষ্টি-কটু হইবে।

হরমোহন কহিলেন, "ওপরে চারখানা ঘর থাকতে তোমার নিচে থাকবার কোন কারণ নেই।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "সেই জন্তেই আমাকে নিচে থাকতে অনুমতি দেওয়ারও কোন বাধা নেই। ওপরে ঘরের যদি অভাব থাকত, তাহলে আমাকে নিচে থাকতে দিতে ইতস্তত: করতে পারতেন। কিন্তু সে অসুবিধে যখন একেবারেই নেই, তখন বুঝতে পারছেন, নিচে থাকাটাই আমি বেশি রকম সুবিধা মনে করছি।"

হরমোহন ও প্রভাবতী এ বিষয়ে অনেক জিদ করিলেন, কিন্তু সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রমথর এমন প্রচুর পরিমাণে ছিল যে, অবশেষে বাহিরের ঘরেই তাহার শয়নের ও থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইল।

পরদিন প্রাতে অমলা একটু সহজ ভদ্রতা করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "কাল রাত্রে গরমে হয়তো খুব কষ্ট হয়েছিল? বাইরের ঘরে হাওয়া তেমন আসে না, ওপরের ঘরেই থাকলে হতো।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, মেস থেকে তো টেনে এনেছ বাড়িতে, আরও কাছে নিয়ে যেতে সাহস হয় তোমার?"

প্রমথর কথা শুনিয়া অমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কেন, সাহস হবে না কেন? তুমি তো আর ভূত নও প্রমথদাদা যে, তুমি কাছে এলে ভয় হবে।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

এক মুহূর্ত প্রমথ চুপ করিয়া থাকিল, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভূত হলে তো ভয়ের কথা ছিল না অমলা,—আমি তোমার ভবিষ্যৎ, সেই জন্তেই যে ভয়।"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে অমলা বলিল, "কিন্তু সে জন্তেও আমার তো ভয় হবার কথা নয় প্রমথদাদা? যার কাছে তুমি কড়ার ক'রে রেখেছ যে, ভবিষ্যতে আমার একটা বড় রকমের উপকার করবে।"

প্রমথ তাহার কৌশল মতো কণ্ঠস্বরটা সহসা গাঢ় করিয়া লইয়া বলিল, "তোমার উপকার করি, কি আমারই উপকার করি, তার ঠিক কী? ভবিষ্যৎটা এমন অনিশ্চিত যে, তার ওপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই।"

অমলা কিন্তু পূর্বের মতো শান্তকণ্ঠে বলিল, 'বিশ্বাস না করলেই হলো। আমি যে বিশ্বাস করব, তা তোমাকে কে বললে?"

"অতটা শক্ত হ'তে পারবে?"

"এমন কিছু বেশি শক্তির দরকার হবে কি? আমার তো মনে হয় এমনই সহজ ভাবে থাকলেই চলবে।"

বিস্মিতনেত্রে ক্ষণকাল অমলার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া প্রমথ বলিল, "তা থাকতে পারবে?"

তরল মিষ্ট হাস্তের সহিত অমলা বলিল, "মনে তো হয়, পারব।"

এ কথার কোন উত্তর প্রমথর মুখ দিয়া বাহির হইল না; মনে মনে বলিল, "তা যদি পারো, তাহলে বুঝব তোমারই সঙ্গে খেলাটা সেরা খেলা হলো।"

কথাগুলা কিছু অস্পষ্ট ভাবে হইলেও, অমলার বক্তব্যটা মোটামুটি বুঝিতে প্রমথ ভুল করিল না। তাহার সহিত একটা সংঘর্ষ অনুমান করিয়া অমলা যে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সে বুঝিল; এবং অমলার কথোপকথন করিবার সহজ ভঙ্গি দেখিয়া এ কথাও বুঝিল যে, অমলাকে পরাজিত করা তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ হইবে না। বিদ্যুৎ-প্রবাহ বাধা পাওয়ায় সূক্ষ্ম তার যেমন দীপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি প্রমথর মন সম্ভাবিত বাধার কল্পনায় জ্বলিয়া উঠিল। দুর্লভ মনে হইবামাত্র লোভের মাত্রা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল।

কিন্তু লাভ করিবার একটা কৌশল হইতেছে, লোভটাকে যথাসম্ভব লুকাইয়া রাখা। মাছ-তরকারীর বাজারের দর-দস্তুর করিবার কন্দি মানসিক বাজারের কেনা-বেচার ব্যাপারে অনেক সময়ই প্রয়োগ করা চলে। তদনুসারে, প্রমথ তাহার আগ্রহকে একেবারে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া চলিল। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই সে গৃহের বাহিরে কাটাইতে লাগিল, এবং যতটুকু সময় গৃহে থাকে, বাহিরের ঘরে তাহার নানা-প্রকার কাজকর্ম এবং হিসাব-পত্র লইয়াই ব্যস্ত থাকে। প্রতিদিন অন্ততঃ দুই তিনবার করিয়া অমলার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় বটে, কিন্তু প্রতিবারই কোন-না-কোন কারণে তাহার কাছে অমলারই যাইবার প্রয়োজন হয় বলিয়া। সাক্ষাৎ হইলে কথাবার্তা যাহা হয় তাহাও নিতান্ত মামুলি ধরনের।

অমলা বলে, "প্রমথদাদা, আর নাইতে দেরি করলে অসুখ করবে।"

কাগজ-পত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রমথ বলে, "এই উঠলাম বলে, আমার তেলটা বারান্দায় রেখে দাওগে।"

আহারের সময়ে অমলা বলে, "রামভদ্দর ঠাকুরের রান্নার চেয়ে এ বাড়ির রান্না ভালো, তা তো তোমার খাওয়া দেখে একটুও বোঝা যায় না প্রমথদাদা?"

প্রমথ হাসিয়া বলে, "সেটা বুঝতে হ'লে মেসের খাওয়ার পরিমাণটাও তোমার দেখা দরকার ছিল।"

সকালে চা হস্তে অমলা আসিয়া দাঁড়াইলে প্রমথ অন্যমনস্ক ভাবে তাহার হস্ত হইতে চায়ের বাটি লইয়া ধীরে ধীরে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখে; এবং বৈকালে জলখাবারের রেকাব লইয়া প্রবেশ করিলে প্রমথ হয়তো বলে, "মাসিমার কাছে রেখে দাওগে অমলা, যখন দরকার হবে চেয়ে নোব।"

এই ভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন সকালে জানা গেল যে, প্রমথ পুনরায় অসুস্থ হইয়াছে।

হরমোহন আসিয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হয়েছে তোমার, প্রমথ?"

প্রমথ একটা ফিকা আসমানী রং-এর আলোয়ানে পদদ্বয় আবৃত করিয়া শয্যার উপর বসিয়া ছিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "বিশেষ কিছু নয়; কাল রাত্রে বোধ হয় সামান্য জ্বর হয়েছিল, আর হাঁটু দুটোয় একটু বেদনা হয়েছে। বোধহয় বাতের মতো কিছু হবে।"

চিন্তিত স্বরে প্রভাবতী বলিলেন, "ওমা এত অসুখ, আর বলছ বিশেষ কিছু নয়? থার্মোমিটার লাগিয়ে জ্বর আছে কি না দেখ।"

হরমোহন কহিলেন, "এ অসুখটা হলো শুধু তোমার ছেলের জন্যে প্রমথ। একতলার ঘরে শুয়ে বাত টেনে আনলে।"

মৃদু হাসিয়া প্রমথ বলিল, "না, তার জন্যে নয়, আমার একটু বাতের ধাতই আছে।" তাহার পর কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কেন, এ ঘর তো তেমন কিছু ঠাণ্ডা নয়, বেশ খটখটে।"

"আচ্ছা বেশ, খটখটে ঘর খটখটেই থাকুক, তুমি এখনই ওপরে চলো।"

অদূরে অমলা দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার দিকে চাহিয়া হরমোহন বলিলেন, "অমল, দক্ষিণ দিকের ঘরটা প্রমথর জন্যে পরিষ্কার করিয়ে ফেলো।"

ব্যস্ত হইয়া প্রমথ কহিল, "না, না, এখন পরিষ্কার করবার দরকার নেই। পায়ে যে রকম ব্যথা, সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যেতেও পারব না। ব্যথা একটু কমলে, পরে যেমন হয় করলেই হবে।"

কিন্তু পর দিন প্রমথকে দেখিতে আসিয়া ডাক্তারও যখন একতলার ঘরে থাকায় আপত্তি করিলেন, তখন হরমোহন আর কোন আপত্তিই শুনিলেন না, জোর করিয়া প্রমথকে উপরে লইয়া গেলেন।

অমলা বলিল, "পা-টাকে খোঁড়া না ক'রে আগে ওপরে এলেই ভালো হতো।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "অনেক সময়ে খোঁড়া পায়ে এমন সব দুর্গম জায়গায় যাওয়া যায়, যেখানে ভালো পায়ে যাওয়া যায় না।"

মৃদু হাসিয়া অমলা বলিল, "কিন্তু ওপরের ঘর কোন দিনই তো তোমার পক্ষে দুর্গম ছিল না।"

"না থাকলেও, ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়ায় আরও একটু সুগম হলো না কি?" বলিয়া প্রমথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

প্রসঙ্গটাকে প্রমথ জটিল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া অমলা প্রসঙ্গান্তরে গমন করিল। তৎপরে, তাহাতেও অব্যাহতি না পাইয়া, অগত্যা কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

প্রমথকে আসিবার জন্য চিঠি লিখিবার পর অমলা মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল সত্য; তথাপি, ব্যাঘ্রের পিঞ্জর হইতে ব্যাঘ্রকে নিজের পিঞ্জরে আসিতে দেখিয়া খেলোয়াড় যেমন প্রথমটা ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠে, তেমনি কয়েক দিন পূর্বে প্রমথ আসার পর তাহাকে দেখিয়া অমলা ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত

হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তৎপরে তাহার মন হইতে সে উৎকণ্ঠা ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। আজ প্রমথকে অধিকতর নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া অমলা পুনরায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। একবার মনে হইল, প্রভাবতীকে সব কথা খুলিয়া বলে। কিন্তু অভিযোগের কারণ তখন পর্যন্ত এমন কাল্পনিক ছিল যে, অভিযোগ করিবার যথোপযুক্ত ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহা ছাড়া মনে হইল, অর্থ দ্বারা পিতাকে এবং আশা দিয়া মাতাকে প্রমথ এমন প্রবলভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিনা অনুসন্ধানেই খারিজ হইয়া যাইবে।

পনের

রোগ হইতে মুক্ত হওয়ার কয়েক দিন পরে প্রমথ বিশেষ কোনও কাজে কাশী যাত্রা করিল।

রওয়ানা হইবার কিছু পূর্বে অমলার হস্তে একটা চাবির রিং দিয়া সে বলিল, "আমার ট্রাঙ্ক আর ক্যাশ বাক্সর চাবি ছুটো তোমার কাছে রইল অমলা; ফিরে এসে নোব।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অমলা বলিল, "তোমার সঙ্গেই রাখো না কেন প্রমথদাদা?"

মৃদু হাসিয়া প্রমথ বলিল, সঙ্গে রেখে তো কোনও লাভ নেই, যখন বাক্স ছুটোই সঙ্গে রাখছিনে। লাভের মধ্যে শুধু হারিয়ে আসবার একটা ভয় আছে। তা ছাড়া, একটা কারণে চাবিটা তোমার কাছে থাকাই দরকার।"

উৎসুক নেত্রে প্রমথর দিকে চাহিয়া অমলা বলিল, "কী কারণে?"

একখানা মনিঅর্ডারের ফরম্ অমলার হস্তে দিয়া প্রমথ বলিল, "এ ফরম্‌টায় সবই ভরা আছে। কাশী পৌঁছে আমি যদি তোমাকে চিঠি লিখে জানাই, তা হ'লে ক্যাশ বাক্স থেকে ছশো টাকা বার ক'রে মেসোমশাইকে দিয়ে আসছে সোমবারে মনিঅর্ডারটা করিয়ে দিয়ো। আর, আমার চিঠি যদি না পাও, তা হ'লে বুঝবে যে, মনিঅর্ডার করবার দরকার নেই।"

একটু চিন্তা করিয়া অমলা বলিল, "এ তুমি তা হ'লে বাবাকে দিয়ে যাও না প্রমথদাদা?"

ব্যস্তভাবে প্রমথ কহিল, "না, না, মনিঅর্ডার করতে হবে কি হবে না, তার যখন ঠিক নেই, তখন আগে থাকতে মেসোমশায়কে ফরমাস ক'রে যাওয়া ঠিক হবে না। তা ছাড়া, তোমার পক্ষে এটুকু ভার নিতে আপত্তির কারণ কী হচ্ছে?"

এমন স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে আপত্তির কারণ কী হইতেছে বলা চলে না, অগত্যা অমলাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

প্রমথ বলিল, "ক্যাশবাক্সে দুশর চেয়ে অনেক বেশি টাকা আছে ; যদি দরকার মনে ক'রো নিজের ঘরে নিয়ে রেখো।"

অমলা বলিল, "মার লোহার সিন্দুকে রাখিয়ে দোব।"

স্মিতমুখে প্রমথ বলিল, "তা যা হয় কোরো, তবে লোহার সিন্দুকে রাখবার মতো অত টাকা নেই।"

গাড়িতে উঠিবার পূর্বে প্রমথ প্রভাবতীকে প্রণাম করিলে, প্রভাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক দিনে ফিরে আসছ বাবা ?"

প্রমথ বলিল, "সম্ভবতঃ সাত আট দিনের মধ্যে।"

কিন্তু সাত আট দিনের দ্বিগুণ সময় কাটিয়া গেল তথাপি প্রমথ ফিরিল না।

পরবর্তী কিস্তির তারিখ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মানিকলাল যথানিয়মে প্রত্যহ তাগাদায় আসিয়া হরমোহনকে নিপীড়িত করিতেছে, এবং হরমোহন প্রমথর ওজুহাতে একদিন একদিন করিয়া তিন চার দিন সময় লইয়াছেন ; এমন সময়ে হরমোহনের জবাবী তারের উত্তরে কাশী হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রমথ কয়েকদিন হইল কার্যোপলক্ষে জৌনপুর গিয়াছে।

তার পাঠ করিয়া হরমোহন অর্ধভুক্ত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার পর মানিকলাল আসিয়া টেলিগ্রামের সংবাদ শুনিয়া যে মূর্তি ধরিবে, তাহা কল্পনা করিয়া তাঁহার আর পানাহারে প্রবৃত্তি রহিল না।

শঙ্কিত বিষণ্ণ মুখে প্রভাবতী বলিলেন, "এত ভাবনা-চিন্তের ওপর এ রকম ক'রে খাওয়া বন্ধ হ'লে শরীর থাকবে কী ক'রে ?"

চলিয়া যাইতে যাইতে প্রভাবতীর কথায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হরমোহন উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "না থাকলেই যে বেঁচে যাই। এ রকম চিন্তার আগুনে দিবারাত্র পুড়ে মরার চেয়ে চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাওয়া ঢের ভালো। কিন্তু তোমার সে ভাবনা নেই,—থাকবে, আরও তাজা হয়ে এ শরীর থাকবে ! এ আগুনে-পোড়া মাটির কলে পোকা লাগবার কোনও ভয় নেই।"

দুঃখার্দ্র নেত্রে প্রভাবতী বলিলেন, "হ্যাগা, তুমি পুরুষমানুষ হ'য়ে এ সব কথা বলছ কী ক'রে ? আমাদের কথাও তো তোমার ভাবা উচিত।"

উন্মত্তের ন্যায় হরমোহন বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের কথা ভেবে ভেবেই তো পাগল হ'তে বসেছি। এবার তোমাদের কথা না ভুললে আর গতি নেই ! আমার মতো হতভাগা, যে স্ত্রী পুত্র পালন করতে পারে না, তার মৃত্যু হলেই স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল হয়। এর ওপর সমস্ত দিন ধ'রে কী শাস্তি ভোগ করতে হয় তা জান ? যে টাকার জন্যে এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি,—অফিসে পাঁচ ছ ঘণ্টা হাজার হাজার সেই টাকা রোজ আমার হাত দিয়ে আনাগোনা করে। পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে এমন সময়ে নদীর তীরে ঢেউ গুনতে বসিয়ে দিলে যে অবস্থা হয়, আমার ঠিক সেই অবস্থা। এক এক সময়ে বেশি দামের নোটগুলো আঁকড়ে ধ'রে পাগলের মতো তাদের দিকে চেয়ে থাকি। ইচ্ছে হয় দু চারখানা

চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে আসি। আজ মনে করছি তবিল ভেঙে কিছু টাকা নিয়ে আসব। তার পর যা হয় হবে। কিছু বিশ্বাস নেই। ঋণে যাকে ধরেছে সে সব করতে পারে; মরতেও পারে, মারতেও পারে।"

হরমোহনের সুদীর্ঘ বিলাপ শুনিতে শুনিতে অমলার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইতেছিল। এ কয়েক দিন নিরন্তর তাহার মনের মধ্যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের যে ভীষণ ঝটিকা বহিয়াছে, তাহার সংবাদ শুধু সে-ই জানে। প্রমথকে দুইশত টাকার মনিঅর্ডার করিতে হয় নাই; তাহা ছাড়া আরও অনেক টাকা তাহার বাক্সে আছে, এ কথা প্রমথ নিজেই তাহাকে বলিয়া গিয়াছে। চাবি তাহার নিজের হাতে। ইচ্ছামাত্র বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া লইয়া সে পিতাকে বিপন্মুক্ত করিতে পারে। অবস্থা হিসাবে এ টাকা লওয়া চুরি নহে। কিন্তু প্রমথর স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে টাকা লওয়া যে কতখানি তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করা, কতখানি তাহার অধীন হইয়া পড়া, তাহা মনে করিয়া অমলা নিজেকে এ পর্যন্ত কঠিন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার পিতার মুখে এরূপ ভীষণ কথা শুনিয়া আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না।

"বাবা।"

হরমোহন কোন কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে অমলার দিকে চাহিলেন।

"বাবা, আমার গয়নাগুলো কি এমনই দরকারি জিনিস যে, তুমি তবিল থেকে টাকা নিয়ে আসবে অথচ সে গুলোয় হাত দেবে না?" অমলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া প্রভাবতীও বলিলেন, "তাই না হয় এখন করো; একটা কোন গহনা রেখে শ খানেক টাকা নিয়ে এস, তার পর সুবিধা মতো টাকাটা শোধ দিয়ে ছাড়িয়ে আনলেই হবে।"

প্রভাবতীর কথা শুনিয়া হরমোহন হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "সে সুবিধা আর এ জন্মে হবে না, যা আজ যাবে তা চিরকালের মতোই যাবে।"

গহনা লইতে হরমোহন অস্বীকৃত হইতেছেন মনে করিয়া অমলা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তা যাবে না বাবা, প্রমথদাদা এসে জানতে পারলেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন।"

কোন দিক দিয়া কেমন করিয়া হরমোহনের মনে প্রমথর প্রতি অপরিমিত ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছিল; অমলার কথায় সহসা তাহা দপ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"তা কিছুতেই হবে না। সমস্ত গহনা বিক্রি হ'য়ে যাবে তাও ভালো, তবু প্রমথ রাস্কেলের টাকায় তোমার গহনা ছাড়ানো হবে না। তার কাছ থেকে মাসে মাসে কিস্তির টাকা নেওয়াতেই তো সেদিন আপত্তি করছিলে, আর এরই মধ্যে তার টাকায় ছাড়ানো গহনা গায়ে দিতে তোমার প্রবৃত্তি হচ্ছে?"

প্রচ্ছন্ন অপমানের গ্লানিতে অমলার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

একবার ইচ্ছা হইল বলে, প্রবৃত্তি তাহার আরও অনেক বিষয়েই হয় না; কিন্তু পিতার বর্তমান মানসিক অবস্থা স্মরণ করিয়া সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "না, আমার একটুও প্রবৃত্তি হচ্ছে না বাবা। তুমি গহনা বাঁধা না রেখে একেবারে বিক্রি ক'রে টাকা নিয়ে এস। তাতে টাকাও বেশি পাওয়া যাবে, সুদও লাগবে না। তার পর যখন সুবিধা হবে নতুন ক'রে গড়িয়ে দিয়ো।"

ক্রোধের গতি অনেক সময়েই যুক্তি ও সংযমের লৌহবর্ত্ম দিয়া চলে না। তাই অমলার এই নির্বিরোধ উত্তরের পরেও হরমোহন উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "প্রমথর সঙ্গে আমার তেমন কোনও সম্পর্কই নেই। মাসে মাসে গোটা কতক টাকার জন্য আমি তাকে বাড়ির ভেতর স্থান দিতে পারব না, তা আমার যত অর্থাবধাই হোক না কেন। সে এবার এলে তাকে যেন তার আগের ব্যবস্থা করতে বলা হয়।" বলিয়া সবেগে আচমন করিতে প্রস্থান করিলেন।

এই সম্পূর্ণ বিপরীত অভিযোগের কথা শুনিয়া প্রভাবতী বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রমথকে গৃহে আনিবার জন্য স্বয়ং এত উদ্যোগী হইয়া ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া, এখন অন্যের প্রতি তদ্বিষয়ে এরূপ দোষারোপ করিবার অর্থ ও অভিপ্রায় কী, তাহা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

অমলার মনে বিস্মিত বা দুঃখিত হইবার মতো অবসর ছিল না; সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মা, তুমি আমার পুষ্পহারটা বাবাকে দিয়ে এস। এখনই বাবা অফিস চলে যাবেন।"

অমলাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে প্রভাবতী বলিলেন, "তুই মনে কিছু করিসনে অমল; জানিস তো কী রকম অবুঝ লোক।"

"কিছু মনে করব না মা। তুমি আর দেরি কোরো না, হারটা দিয়ে এসো।"

সান্ত্বনা অনেক সময়ে মূল দুঃখকে জাগাইয়া তুলে এবং বাড়াইয়া দেয়। প্রভাবতীর 'কিছু মনে করিসনে' বলার পরে অমলা যতটা মনে করিতে লাগিল, পূর্বে সে ঠিক ততটা মনে করে নাই। হরমোহনের উচ্চারিত বাক্যের অন্তরাল হইতে যে কথাটা অনুচ্চারিত থাকিয়াও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার একটা দিক অমলার মনে একটা অপরিমেয় লজ্জা ও হীনতার গ্লানি জাগাইয়া তুলিল; কিন্তু অপর দিক হইতে সে এই ভাবিয়া একটু আশ্বাস লাভ করিল যে, কোন কোন বিষয়ে প্রমথর নিকট হইতে টাকা লওয়া হীনতাজনক সে কথা তাহার পিতা এখনও কোনও কোনও সময়ে মনে করেন।

অফিসের তহবিল ভাঙিয়া টাকা আনার চেয়ে কন্যার অলঙ্কার বাঁধা রাখিয়া টাকা আনা শ্রেয়, এ কথা মনে মনে স্বীকার করিয়া হরমোহন পুষ্পহারটা সন্তর্পণে বুক পকেটে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অফিসের ছুটির পর টাকার পরিবর্তে পুষ্পহারটি লইয়াই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

অদূরে অমলা দাঁড়াইয়া ছিল; হরমোহন তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ রুক্ষ স্বরে কহিলেন, "আমাকে অতটা কষ্ট দিয়ে আর অপমানিত করিয়ে তুমি কি খুব আনন্দ পাচ্ছিলে?"

হরমোহনের কথায় বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া অমলা বলিল, "এ তুমি কেন বলছ বাবা?"

"তোমার কাছে প্রমথর টাকা রয়েছে, আর টাকার জন্যে মানিকলাল রোজ আমাকে অপমান ক'রে যাচ্ছে, তা তুমি ব'সে ব'সে দেখছ?"

হরমোহনের কথা শুনিয়া অমলার মুখ শুকাইয়া গেল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে কহিল, "প্রমথদাদার টাকা তো আমার কাছে নেই বাবা, তাঁর ক্যাশবাক্সই আমার কাছে রয়েছে।"

"ক্যাশবাক্সের চাবি কার কাছে আছে?"

"চাবি আমার কাছেই আছে।"

"বাক্সয় টাকা আছে?"

"আছে।"

"কত?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অমলা বলিল, "ঠিক জানিনে, বোধহয় আড়াই শ, তিন শ হবে।"

"এ সব কথা আমাকে জানাও নি কেন?" তুমি কি মনে কর, তুমিই প্রমথর আপনার লোক, আর আমরা পর?

আরক্ত মুখে অমলা বলিল, "তা নয় বাবা, আমি মনে করেছিলাম যে, প্রমথদাদার বিনা অনুমতিতে আমরা তাঁর ক্যাশবাক্সের টাকায় হাত দিতে পারিনে। তাই তোমাকে ক্যাশবাক্সের কথা বলি নি।"

হরমোহন পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া অমলার হস্তে দিয়া বলিলেন, "অফিসে গিয়া প্রমথর এই চিঠি পেলাম। চিঠিখানা প'ড়ে বিচার ক'রে দেখ যে, এখন তার টাকায় হাত দেবার অনুমতি পাওয়া গেছে কি-না।"

ব্যথিত করুণ-দৃষ্টিতে হরমোহনের দিকে চাহিয়া অমলা বলিল, "তুমি থাকতে আমি কী করব বাবা? তুমি মুখ হাত ধুয়ে জল খেয়ে নাও, তারপর আমি বাক্স আর চাবি এনে দিচ্ছি।" বলিয়া প্রমথর চিঠিখানি হরমোহনকে প্রত্যর্পণ করিল।

"চিঠিখানা একবার প'ড়ে নিলেই তো ভালো হতো?"

অমলা তাহার আর্দ্রকরুণ নেত্র উত্তোলন করিয়া বলিল, "কোনও দরকার নেই বাবা।"

হরমোহন চিঠিখানি পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন; কন্যার সকাতর মূর্তি দেখিয়া আর কোনও কথা বলিলেন না।

প্রমথর ক্যাশবাক্স খোলা হইলে হরমোহন মোট কত আছে অমলাকে দেখিতে বলিলেন।

অমলা টাকা ও নোট হিসাব করিয়া দেখিয়া বলিল, "পাঁচশ সাতচল্লিশ টাকা বারো আনা।"

নোট ও টাকার উপর দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হরমোহন বলিলেন, "আচ্ছা, আমাকে দেড় শ টাকা দিয়ে বাক্সটা বন্ধ ক'রে রেখে দাও।"

"তোমার যা দরকার হয়, তুমিই নাও না বাবা ?"

"না, তোমার জিম্মায় যখন রয়েছে, তখন তোমার হাত দিয়ে নেওয়াই ভালো।"

আর কোনও কথা না বলিয়া অমলা দেড় শত টাকা বাহির করিয়া হরমোহনের সম্মুখে স্থাপিত করিল।

প্রভাবতী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "পঁচাত্তর টাকা ক'রে মাসে মাসে নাও, তাই নিলেই তো হতো।"

ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া হরমোহন বলিলেন, "তোমরা কি মনে কর শুধু মানিকলালকে ঠাণ্ডা করলেই আমার সব জ্বালা ঠাণ্ডা হলো ? এ মাসে লাইফ্ ইনসিওরের সুদ দিতে হয়েছে, সে কথা মনে আছে ? বাকি খরচ চলবে কী ক'রে ? আসছে মাসে প্রমথর কাছ থেকে পঁচাত্তর টাকা না নিলেই হবে।"

আগামী মাসে প্রমথর নিকট হইতে পঁচাত্তর টাকা না লইলে কী প্রকারে চলিবে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রভাবতীর সাহস হইল না।

"বাবা !"

অমলার রুদ্ধ-গভীর স্বরে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিয়া হরমোহন বলিলেন, "কী ?"

"আমার একটা অনুরোধ রাখবে বাবা ?"

"কী অনুরোধ ?"

"প্রমথদাদার চিঠি না এলে পুষ্পহারটা রেখেই তো টাকা আনতে হতো। তা প্রমথদাদার বাক্সেই হারটা রেখে দিইনে ?"

অমলার কথা শুনিয়া একটা আসন্ন বিবাদ আশঙ্কা করিয়া প্রভাবতী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। হরমোহন কিন্তু শান্তভাবে এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা মন্দ নয়; বেশি টাকা যখন নিলাম, তখন তার বদলে একটা কিছু রেখে দিলে দেখতে শুনতে ভালোই হয়। কিন্তু সে যদি এসে হারটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চায় ?"

অমলা দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল, "কখনই ফেরত নোব না। যত দিন না তুমি টাকা শোধ দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে, তত দিন ও হার স্পর্শ করব না।"

হরমোহন সচিন্ত হইয়া কহিলেন, "ছাড়িয়ে তো আমি নোবই; কিন্তু ফেরত দেবার জন্যে সে যদি পীড়াপীড়ি করে, তা হলে ফেরত না নেওয়াটাও অভদ্রতা হবে। ও-বেলা আমি প্রমথর উপর রেগে উঠেছিলাম বটে, কিন্তু এখন দেখছি ব্যবহারে যে আপনার, সে-ই যথার্থ আপনার।" তাহার পর প্রভাবতীর দিকে

চাহিয়া বলিলেন, "চিঠিটা কী রকম লিখেছে একবার প'ড়ে দেখো।" এবং তৎপরে অমলার দিকে ঈষৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "ও-বেলা প্রমথর বিষয়ে আমাদের যে-সব কথা হয়েছিল, তার একটি বাক্য যেন তার কানে না যায়। শুনলে মনে কষ্ট পাবে।'

ও বেলা যতটা ব্যথা পাইয়াছিল, তাহার দশগুণ ব্যথায় ব্যথিত হইয়া অমলা তাহার নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। দারিদ্র্য রোগে পীড়িত হইয়া তাহার সবল পিতা কিরূপ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার দুই চক্ষু বিদীর্ণ হইয়া অশ্রু নামিয়া আসিল। একটা অনিশ্চিত অন্ধকারাবৃত ভবিষ্যতের কল্পনায় শঙ্কিত হইয়া সে নিজের মনের মধ্যে সর্বপ্রদেশ হইতে শক্তি সঞ্চিত করিয়া নিজেকে দৃঢ় ও সবল করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, হে সর্বশক্তিমান, তোমার অসীম শক্তির একটি কণা এই দুর্বল নারী হৃদয় নিহিত ক'রে তাকে লোহার মতো শক্ত আর পাথরের মতন কঠিন ক'রে দাও। বাইরের যত শক্তি, যত আঘাত তার দেহে লেগে যেন ব্যর্থ হয়ে যায়।

কয়েক দিন পরে প্রমথ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বাক্স খুলিয়া তন্মধ্য হইতে অমলার হারটি বাহির করিয়া সে স্মিতমুখে অমলাকে বলিল, "অমলা, আমার বাক্সটি তোমার হাতে প'ড়ে অত্যাশ্চর্য ম্যাজিক শক্তি লাভ করেছে! যে জিনিস তার মধ্যে রেখে যাই নি, সে জিনিসও তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি!"

অমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "শুধু তাই নয়; আবার উল্টো ম্যাজিক-শক্তিই লাভ করেছে। যে জিনিস তার মধ্যে রেখে গেছলেন, সে জিনিস তার মধ্যে আর খুঁজে পবেন না। লুপ্ত হ'য়ে গেছে।"

দেড়শত টাকা লওয়ার ও পুষ্পহার রাখার কথা ইতিপূর্বেই হরমোহনের নিকট হইতে প্রমথ শুনিয়াছিল। সে সহাস্যমুখে কহিল, "অত হিসাব-করা ম্যাজিক আমার পছন্দ নয়। লুপ্ত হ'য়ে যাওয়ার ম্যাজিকটাই আমি বেশি পছন্দ করি। অতএব এই অকারণ লাভের জিনিসটি থেকে আমি বঞ্চিত হ'তে চাই। তুমি এটা তোমার বাক্সে তুলে রেখে দাও।" বলিয়া অমলার সম্মুখে হারটা প্রমথ স্থাপন করিল।

কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে অমলা বলিল, "পছন্দ অপছন্দ তো আমারও আছে। সেইজন্যে এই অন্যায় লাভের জিনিসটা আমার বাক্সে তুলে রাখা তো দূরের কথা, আমি স্পর্শ পর্যন্ত করব না। তুমি ওটা যেখান থেকে বার করেছ, সেখানেই তুলে রাখো।"

অমলার বাক্য শুনিয়া ও আকৃতি দেখিয়া প্রমথ বুঝিল যে, পরিহাসের পথে এ ব্যাপারে মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। তখন স্পষ্টভাবে রীতিমতো বাদানুবাদ আরম্ভ হইল।

অর্ধঘণ্টাকাল বৃথা তর্ক ও বিতণ্ডার পর প্রমথ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমার টাকা যথেচ্ছ ব্যয় করবার অধিকার তোমার যদি না থাকে তো আমার টাকা নিয়ে মহাজনী করবার অধিকারই বা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছ ? গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার দেওয়ার অধিকার কি তোমাকে আমি দিয়ে গেছলাম ? আত্মসম্মানের অনেক কথা তুমি বলছিলে অমলা ; কিন্তু সে আত্মসম্মান তো আমারও থাকতে পারে ? স্ত্রীলোকের গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার দেওয়ার অভ্যাস আমার আছে. এ কি তুমি জানো ?"

এ অভিযোগের কোন উত্তর না পাইয়া অমলা করযোড়ে বলিল, "আমি যদি অন্যায় ক'রে থাকি প্রমথদাদা, তা হ'লে তুমি দয়া ক'রে আমাকে ক্ষমা কোরো— কিন্তু আমার একান্ত মিনতি, আমার এ অনুরোধটা তুমি রাখো !"

রুষ্টমুখে প্রমথ বলিল, "অনুরোধ নয় অমলা, অত্যাচার ! জুলুম ! আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা, এ সব বড় বড় জিনিসের জ্ঞান তোমার খুব আছে দেখছি ; কিন্তু শিষ্টাচারের জ্ঞানটা আরও একটু থাকলে বোধ-হয় ভালো হতো ! হার দিয়ে টাকা শোধ করা যায় বটে, কিন্তু হার দিয়ে টাকার ওপরের অনেক জিনিসই শোধ করা যায় না। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে এর বেশি আর কী বলব !"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রমথ বলিল, "আচ্ছা, তোমার হার আমার কাছেই রইল, কিন্তু মনে মনে আমার কাছে এই অঙ্গীকার ক'রে যাও যে, যখনই বুঝতে পারবে এই হারের ব্যাপার নিয়ে আমার প্রতি গভীর অত্যাচার করেছ, তখনই আমার কাছ থেকে হার চেয়ে নিয়ে যাবে। তখনও যেন আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে আত্মসম্মানের দোহাই দিয়ো না। আত্মপ্রবঞ্চনার চেয়ে খারাপ জিনিস আর নেই। আচ্ছা, এখন তা হ'লে এসো।"

এক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমলা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। ব্যাধেরও জন্ম বিহঙ্গমী সময়ে সময়ে দুঃখিত হয় !

ষোল

কিছুকাল সহজে সহজে কাটিয়া গেল। প্রমথ কখনও কলিকাতায় থাকে, কখনও অন্যত্র যায়। কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার সময়ে সে ক্যাশবাক্সর চাবি অমলার হাতে দিয়া যায়, এবং প্রয়োজন হইলে বাক্স হইতে টাকা লইয়া যথাবশ্যক এবং যথেচ্ছ ব্যয় করিবার অধিকার যে তাহার কাছে সে কথা প্রতিবারেই তাহাকে স্পষ্টভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। অমলা প্রথম প্রথম ইহাতে আপত্তি করিত ; কিন্তু, পরে যখন ক্রমশঃ সে দেখিল যে কখনও কখনও মানিকলালের কিস্তির টাকা দেওয়া ভিন্ন অধিকার প্রয়োগের আর কোনও হেতু উপস্থিত হয় না, তখন হইতে সে আর আপত্তি করিত না ; ভাবিত, যে-ব্যাপারে তাহার দিক হইতে লাভ-লোকসানের কোনও কথা নাই, সে বিষয়ে প্রমথর

অনুরোধ লঙ্ঘন করিলে অনর্থক তাহার মনে কষ্ট দেওয়া হইবে। প্রমথ কিন্তু অমলার মনে এই শুষ্ক প্রয়োগবিহীন অধিকার-স্বত্বের কথা জাগাইয়া রাখাও আবশ্যক ও উপকারী বলিয়া মনে করিত। মৃত্তিকা-গর্ভে বীজ নিহিত থাকিলে একদিন অঙ্কুর বাহির হইবে, ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস।

বন-বিহঙ্গমী ব্যাধের গৃহে আসিয়া সেবা-যত্ন পাইয়া নিজেকে যেরূপ নিরাপদ মনে করে, অমলার অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইয়াছিল। সে ক্রমশঃ মনে করিতে লাগিল যে, প্রমথর ব্যবহার চিরদিনই এমনই সরল এবং সহজ থাকিবে; তলতলে ফলের মধ্যে শক্ত আঁটির মতো তাহার এই নির্দোষ আচরণের মধ্যে দুষ্ট উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, সে আশঙ্কা তাহার মন হইতে ক্রমশঃ অপসৃত হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু একেবারে অপসৃত হইবার পূর্বে কেমন করিয়া তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিল, এইবার সে কথা বলিব।

সমস্ত রাত্রি টিপ্ টিপ্ করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িয়াছে। সকাল বেলা কিছুক্ষণ হইতে বৃষ্টি বন্ধ আছে বটে, কিন্তু সমস্ত আকাশ ধূসর-বর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন। একটা কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ ফুট-পাথ হইতে উঠিয়া দ্বিতলের জানালা ছাড়াইয়া গিয়াছে, তাহার শাখায় বসিয়া বর্ষণসিক্ত দুইটি কাক দুর্দিনের দুঃখে ত্রস্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি আর্তস্বরে চিৎকার করিতেছিল। প্রমথ তাহার শয়ন-কক্ষে বসিয়া আর্দ্র উদাস প্রকৃতির দিকে চাহিয়া নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তায় মগ্ন ছিল, এমন সময়ে চা ও খাবার লইয়া অমলা কক্ষে প্রবেশ করিল।

অমলার হস্ত হইতে চা ও খাবার লইয়া প্রমথ বলিল, "অমলা, তোমাকে একটা কথা বলবার ছিল; একটু বসতে পারবে?"

প্রমথর দিকে চাহিয়া অমলা কহিল, "কী কথা? বেশি সময় লাগবার মতো কিছু কি?"

"হ্যাঁ, একটু সময় লাগতে পারে।"

"তা হ'লে আধঘণ্টা-টাক পরে এলে যদি কোন ক্ষতি না হয় তো মার রান্নার যোগাড়টা ক'রে দিয়ে আসি।"

ব্যস্ত হইয়া প্রমথ বলিল, "না, না, আধঘণ্টা পরে এলে কোন ক্ষতি হবে না; তোমার কাজ-কর্ম সেরে তারপর এসো।"

আর কোন কথা না বলিয়া অমলা প্রস্থান করিল, এবং নিচে গিয়া মাতার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু যতক্ষণ সে গৃহ-কার্যে ব্যাপৃত রহিল, প্রমথ কী বলিবে সেই চিন্তা তাহাকে আক্রমণ করিয়া রহিল। কথাটা আর যাহাই হউক, একেবারে যে সহজ এবং সাধারণ নহে, তাহা প্রমথর কথা কহিবার ভঙ্গী হইতেই সে বুঝিয়াছিল। তথাপি কৌতূহলের বশে ব্যস্ত না হইয়া ধীরে ধীরে কার্যগুলি শেষ করিল। এবং অবসর পাওয়ার পরও কিছু সময় অন্য কার্যে অতিবাহিত করিয়া আধ ঘণ্টার অনেক পরে প্রমথর নিকট উপস্থিত হইল।

"কী কথা বলবে বলছিলে, প্রমথদাদা?"

প্রমথ তখন তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখিতেছিল; অমলার দিকে চাহিয়া বলিল, "দু মিনিট বোসো, বলছি।"

অদূরবর্তী একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া অমলা বাহিরে বৃষ্টি-ধারার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন পুনরায় আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া প্রমথ অমলার দিকে চাহিয়া বলিল, "কথাটা কাল সন্ধ্যা থেকে বলব বলব মনে করছি, কিন্তু তোমাকে বলব কি মেসো-মশায় মাসিমাকে বলব ঠিক করতে পারছিলাম না। ভেবে দেখলাম কথাটার সঙ্গে তুমিই যখন প্রধানতঃ জড়িত, তখন প্রথমে তোমাকেই বলা ভাল। তারপর যদি দরকার মনে হয় তখন তাঁদের বললেই হবে।"

"আচ্ছা, তা হলে আমাকেই বলো" বলিয়া অমলা প্রমথর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

কী ভাবে কথাটার অবতারণা করিবে প্রমথ তাহা মনে মনে একবার চিন্তা করিল; তাহার পর কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া বলিল, "কাল বৈকালে আমি বিজয়নাথের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।"

শুনিয়া অমলার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "এ সব কথা বোধ হয় মার সঙ্গে হলেই ভালো হয়; তাঁর সঙ্গেই তোমার"—কথাটা শেষ না করিয়াই অমলা থামিয়া গেল; বোধহয় যে কথা বলিবার ছিল—যথোপযুক্ত ভাষার পরিচ্ছেদে সহসা তাহা দেখা দিল না।

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রমথ বলিল, "তাঁর সঙ্গেই আমার কথা হওয়া উচিত ছিল তা ঠিক, কিন্তু তাই ব'লে তোমার পক্ষেও তো কথাটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। তা ছাড়া, তোমাকে শোনাবার আমার যেটুকু কথা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি তোমার কাছ থেকে শোনাবার আছে।"

প্রমথর কথা শুনিয়া অল্প হাসিয়া অমলা বলিল, "তবেই হয়েছে। আমার কিন্তু এ বিষয়ে কিছুই বলবার নেই।"

অমলার দিকে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া প্রমথ বলিল, "বলবার কিছু আছে কি নেই তা কথাটা না শুনে আগেই এমন ক'রে ব'লে কোনও লাভ নেই তো। আমার যা বলবার আছে তা একটু ধৈর্য ধ'রে শোন; তারপর সে বিষয়ে তোমার যদি কিছু বলতে ইচ্ছে হয় তো বোলো।"

প্রসঙ্গটা জানিতে পারিয়াই অমলার সমস্ত আগ্রহ অন্তর্হিত হইয়াছিল; ব্যাধের মুখে অহিংসা-তত্ত্ব শুনিবার কোনও প্রবৃত্তি তাহার মনের মধ্যে ছিল না। কিন্তু প্রমথর নির্বন্ধাতিশয্যে অগত্যা তাহাকে বলিতে হইল, "আচ্ছা, তা হ'লে কী বলবার আছে বলো।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রমথ বলিল, "কাল বিজয়ের কাছে তোমার কথাটা একটু একটু ক'রে তুলেছিলাম, কিন্তু সে একেবারেই কোনও কথা কইতে চাইলে না; বললে, বাপ থাকতে এ বিষয়ে কোনও কথা বলবার তার অধিকার নেই। যদি কিছু বলবার থাকে তো তার বাপকে বলতে বললে। আমি তো তার

আচরণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ রকম আমি একেবারেই মনে করিনি। স্ত্রীর বিষয়ে কথা শুনতে স্বামীর যে, কোনও অবস্থায় অধিকার না থাকতে পারে, এ একেবারে আমার ধারণার অতীত। তারপর ভাবলাম, একবার না হয় গোবিন্দবাবুকেই কথাটা ব'লে দেখি ; কিন্তু ওদের বাড়ির একজন কর্মচারীর মুখে যে কথা শুনলাম, তাতে আমার আর কোনও কথা বলতে প্রবৃত্তি হলো না।" বলিয়া প্রমথ উত্তরের অপেক্ষায় অমলার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

প্রমথর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া অমলা মৃদুস্বরে বলিল, "সে কথাটাও কি তোমার শোনা দরকার ?"

"একান্ত দরকার। তারপর তুমি আমাকে যা করতে বলবে তা করতে আমি প্রস্তুত আছি।"

অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অমলা বলিল, "তা হলে সে কথাটাও বলো।"

একটু কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া প্রমথ বলিল, "গোবিন্দবাবু বিজয়ের বিয়ের সব ঠিক করেছেন, অগ্রাণ মাসের প্রথমেই তার বিয়ে।"

মস্তিষ্কে সহসা প্রচণ্ড আঘাত লাগিলে মাথাটা যেমন ঘুরিয়া যায়, দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসে, অমলার অবস্থা প্রথমটা তেমনই হইল। মনের কোন্ গুপ্ত প্রদেশে আশাহীনতার মধ্যেও আশার একটি কণিকা অগোচরে জীবিত ছিল, যাহা এই দুঃসংবাদে আহত হইল, তাহা বলা কঠিন ; কিন্তু জীবিত যে ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ রহিল না। তথাপি তাহার মানসিক অবস্থা যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সহজভাবে সে কহিল, "তা আমি আর কী করব, প্রমথদাদা ? আমার এ বিষয়ে কিছুই বলবার বা করবার নেই!"

আগ্রহভরে প্রমথ বলিল, "তুমি কেন করবে ? যা করতে হয় বলো, আমি করতে প্রস্তুত আছি।"

প্রমথর মুখের উপর বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া অমলা বলিল, "আমি তোমাকে কিছুই করতে বলব না, প্রমথদাদা। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ, তুমি এ বিষয়ে কোনও রকম হস্তক্ষেপ ক'রো না। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাইতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব, তুমি আর কেন তার মধ্যে প'ড়ে কষ্ট পাও!"

এই অংশতঃ অকারণ ভর্ৎসনায় মনে-মনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রমথ বলিল, "আমার কষ্টের কথা ছেড়ে দাও অমলা, আমার কষ্ট তুমি বুঝতে পারবে না, কিন্তু তুমি চিরদিন এমনই কাটাতে পারবে তো ?"

অমলা দৃঢ়ভাবে বলিল "হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব। এত দিন তো কাটালাম ; চিরদিন আর কত দিন ? দুশ বছরও নয়, তিনশ বছরও নয়। তা ছাড়া, তুমি কি বিশ্বাস করো প্রমথদাদা, তিনি আবার বিয়ে করবেন ? আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস, এ কাজ তিনি কখনও করবেন না।"

ক্ষণকাল প্রমথ চুপ করিয়া রহিল, তারপর ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "না করুন তা-ই ভালো। কিন্তু তোমার এ দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি কী শুনি ?"

"বিশ্বাসের আবার ভিত্তি কী প্রমথদাদা ? বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি থাকে না।"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ তীক্ষ্ণভাবে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে রুক্ষস্বরে বলিল, "তা নয় অমলা, এ তা নয়। বিজয়ের বিয়ে করার চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা সংসারে নিত্য হাজার হাজার ঘটছে। এ তা নয়! এ হচ্ছে তোমাদের সেই পুরোনো পচা স্বামীভক্তি, যার, অন্ততঃ তোমার ক্ষেত্রে, কোনও অর্থ কোনও মূল্য নেই। এ একেবারে বাজে! একেবারে ফাঁকা!"

শুনিয়া অমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "তা হ'তে পারে প্রমথদা, কিন্তু স্বামীভক্তির মূল্যের বিচারও কি তুমি করবে ? স্বামী-ভক্তির সঙ্গে তোমার তো কোনও দিক থেকেই কোনও সম্পর্ক নেই।" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এই সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ আঘাতে আহত হইয়া প্রমথ পুনরায় রুষ্ট হইয়া উঠিল; উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সঙ্গে কী আর তর্ক করব, কিন্তু এইটে জেনে রাখো যে, নিঃসম্পর্ক লোকেই ঠিকমতো বিচার করতে পারে। একজন স্বামী বা একজন স্ত্রী স্বামীভক্তির যে মূল্য ধার্য করবে, তা যথার্থ মূল্যের চেয়ে হয় বেশি নয় কম হবেই। স্বামীর কাছ থেকে এ পর্যন্ত ভালোবাসা অথবা কর্তব্যের কোনও পরিচয় না পেয়ে স্বামীর প্রতি তোমার এই যে ভক্তি অথবা বিশ্বাস, আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি অমলা, এর কোনও অর্থ কোনও মূল্য নেই! একে যদি তুমি খুব জমকালো ক'রে সতীত্ব নাম দাও, তা হ'লেও নেই!

এতদিন এবং এতক্ষণ অমলা প্রমথর বিষয়ে যে ধৈর্যধারণ করিয়াছিল, সতীত্বের প্রতি এরূপ মন্তব্য প্রকাশে তাহা একেবারে লোপ পাইল। রাজ্যচ্যুত হইয়াও রাজা যেমন রাজ-সম্মানের অপমান সহ্য করিতে পারে না, স্বামী প্রেমে বঞ্চিত হইয়াও অমলা তেমনই সতীত্বের প্রতি এই অমর্যাদা সহ্য করিতে পারিল না। দলিত সর্পীর মতো সে তীব্র রোষে আস্ফালন করিয়া উঠিল—"আমার এ সতীত্বের যদি কোনও মূল্য না থাকে প্রমথদা, তা হলে, আমার কাছ থেকে কিছুমাত্র সাড়া না পেয়েও, আমার প্রতি তোমার যে নানারকম জুলুমজবরদস্তি, নানা রকম ছল-ছুতো ক'রে আমাদের বাড়িতে এসে বাস করা, কথায় কথায় আমাদের জন্যে জলের মতো পয়সা খরচ করা, এ সবের মূল্য কী তা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারো ?" বলিয়া অমলা শুষ্ক দীপ্ত নেত্রে প্রমথর প্রতি কঠোরভাবে চাহিয়া রহিল।

এমন গুরুতর কথাগুলা অমলা যে এরূপ স্পষ্টরূপে বলিতে পারে, সেই বিস্ময়ের আঘাতে প্রথমটা প্রমথর মুখ পাংশু হইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন তাহার মনে হইল যে, যে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার জন্য সে আজ অমলাকে আহ্বান করিয়াছিল, তাহা অমলা নিজেই উত্থাপিত করিয়াছে, তখন তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দুর্ধর্ষ দুরন্ত ব্যাঘ্রীকে সহসা সম্মুখে পাইয়া

পরাক্রান্ত শিকারী যেমন মনের মধ্যে একটা বিশেষ প্রকারের উল্লাস এবং উত্তেজনা অনুভব করে, অমলার কঠিন কঠোর ভঙ্গি দেখিয়া প্রমথ মনের মধ্যে সেইরূপ উল্লাস ও উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিল। মুখে সবিস্ময় পরাভবের ভাব আনিয়া বলিল, "এ সব তুমি বুঝতে পেরেছিলে ?"

বিজয়দৃপ্ত-কণ্ঠে অমলা বলিল, "প্রথম দিন থেকেই !"

প্রমথর অধরোষ্ঠে একটা নিষ্ঠুর বক্র হাস্য ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল ; বলিল, "বেশ ! বেশ ! প্রথম দিন থেকেই সমস্ত বুঝতে পেরেও তোমরা আজ পর্যন্ত আমার প্রতি যে সদয় ব্যবহার ক'রে এসেছ, তার জন্যে প্রথমে তোমাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তার পরে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে এমন একটা দুর্বৃত্ত জেনেও আমার প্রতি তোমাদের এই যে সদয় ব্যবহার, তার অর্থ আর মূল্য কী ? এ কি শুধু তোমাদের নিছক সহৃদয়তা, না, তা ছাড়া আরও অন্য কিছু ?"

এত বড় কঠিন কথায় অমলার মুখ শিশার মতো ফিকা হইয়া গেল, এবং উত্তরে কেমন করিয়া কী বলিবে তাহা সত্বর স্থির করিতে না পারিয়া বিব্রত-বিহ্বল দৃষ্টিতে সে প্রমথর দিকে তাকাইয়া রহিল।

অমলার এই দুঃস্থ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে ব্যথিত হইয়া প্রমথ শান্ত স্বরে বলিল, "মিছিমিছি পরস্পরে এমন খোঁচাখুঁচি ক'রে ব্যথা দিয়ে আর ব্যথা পেয়ে কোনও লাভ নেই অমলা। আমার মনে হয়, আমাদের পরস্পরের ব্যবহার ততটা হীন নয়, যতটা হীন আমরা দাঁড় করাচ্ছি ! হীরেকে কাঁচ ব'লে গাল দিলেই হীরে কাঁচ হ'য়ে যাবে না।"

তাহার পর তাহার চিরাভ্যস্ত কৌশলের দ্বারা কণ্ঠস্বর সহসা প্রগাঢ় করিয়া লইয়া ব্যগ্রভাবে কহিল, "কথাটাকে তুমি যখন আজ এমন সোজাসুজি টেনে বার করলে, তখন আমিও অকপটে তার যথাযথ উত্তর দিই। তোমার অনুমান একটুও ভুল হয় নি ; এতদিন ধ'রে তোমাদের সঙ্গে যে ছল-চাতুরী করেছি, তোমাদের জন্যে যে নানাপ্রকার শারীরিক কষ্ট স্বীকার করেছি, পয়সা খরচ করেছি, কত রকম কৌশল ক'রে তোমাদের বাড়িতে এসে যে বাস করছি, তা একমাত্র তোমারই জন্যে ! কিন্তু জুলুমজবরদস্তির কথাটা তুমি অন্যায় বলছ অমলা ! জুলুমজবরদস্তির ওপর আমার একটুও আস্থা নেই। জুলুমজবরদস্তি যদি করতাম, তা হ'লে কখনই তোমার পাশের ঘরে এসে বাস করতে পারতাম না ; তার অনেক আগেই তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে।"

উত্তরের অপেক্ষায় প্রমথ নীরব হইয়া ক্ষণকাল অমলার প্রতি আগ্রহভরে চাহিয়া রহিল ; কিন্তু এবারও যখন অমলা কোনও কথা না বলিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তখন সে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—"তোমার প্রতি আমার এই আসক্তির মূল্য কী তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে তুমি ! রাগ ক'রো না অমলা, আর কিছু না হোক, তোমার প্রতি বিজয়নাথের নির্মম উপেক্ষার চেয়ে এ অনেক মূল্যবান ! এর প্রাণ আছে, অস্তিত্ব আছে, তাই একে

তুমি এমন ক'রে অপমান করতে পারছ; কিন্তু বিজয়নাথ আর তোমার মধ্যে এমন কোনও বস্তু নেই, যাকে তুমি কোনও দিক দিয়ে স্পর্শ করতো পারো। একজন, তার ধনসম্পদ মান-ইজ্জৎ সমস্তর বিনিময়ে, তোমার জন্তে উদ্যত হয়ে উঠেছে, তোমার জীবনের এ একটা সার্থকতা। এ এমন-একটা সামান্ত জিনিস নয়, যা তুমি অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারো।"

এবার অমলা কথা কহিল। প্রমথর প্রতি অকুণ্ঠনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তা পারি, শুধু অনায়াসে নয়, অবহেলার সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারি! তুমি যে আমার প্রতি আসক্ত হয়েছ, এতে আমার জীবন একটুও সার্থক হয়েছে ব'লে আমি মনে করি নে!"

উত্তেজনায় অমলার সমস্ত দেহ—আপাদমস্তক—কাঁপিতে লাগিল।

অমলা সহসা যে এমন রূঢ় অপমানসূচক কথা বলিতে পারে, সে আশঙ্কা প্রমথ একবারও করে নাই। তাই প্রথমটা সে বিস্ময়ের বিহ্বলতায় মূক হইয়া গেল; তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার ওষ্ঠাধর ক্রূর হাস্তের কঠিন রেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সবিদ্রূপ তীব্রকণ্ঠে সে বলিল, "এ একরকম মন্দ অভিনয় হচ্ছে না অমলা! ষ্টেজে দাঁড়িয়ে এমনই ক'রে এই জমকালো কথাটা বললে খুব বড় রকম একটা হার্ততালি লাভ করতে! আর সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে পারলে একজন মস্ত সতী ব'লে তোমার নাম র'টে যেত! কিন্তু তোমাদের এই দুর্গন্ধ পচা সতীত্বের ওপর আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। এই বহুদিনের অর্জিত কুসংস্কারের আর একটা নাম পাগলামী! কেন, তা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। যে তোমাকে স্ত্রী ব'লে স্বীকার করে না, যার কাছ থেকে তুমি স্বামীর কোনও ব্যবহার পাচ্ছ না, তার স্মৃতির সম্মানে তুমি আমার, অর্থাৎ যে তোমার জন্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তার ভালোবাসার প্রমাণে অপমানিত বোধ করছ, তোমার সতীত্বে আঘাত পড়ছে! বিশ্লেষণ ক'রে দেখো, এ সতীত্ব কী! এ হচ্ছে, যে জিনিস নেই, তা স্বীকার ক'রে যা আছে তা অস্বীকার করা! এ পাগলামী নয় তো অন্ত আর কী তা তো জানি নে!"

প্রমথর কথা শুনিয়া অমলা ক্ষণকাল সুগভীর ঘৃণা এবং বিরক্তিতে নির্বাক হইয়া রহিল; তাহার পর সুস্পষ্ট অবজ্ঞার সহিত বলিল, "এই রকম বোধ হয় তুমি আরও অনেক জিনিস জানো না প্রমথদাদা! তুমি বোধ হয় ঈশ্বর জানো না, ধর্মাধর্ম জানো না, পাপ-পুণ্য জানো না, কিছুই জানো না।" জলন্ত নেত্রে অমলা প্রমথর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

প্রমথ কিন্তু বিচলিত না হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তাহার পর মাথা নাড়িয়া সে বঙ্ক-গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "না, জানিনে; কিন্তু তুমিই কি জানো অমলা? ঈশ্বরকে দেখেছ কখনও? ধর্ম কোন্‌টা, অধর্ম কোন্‌টা, তা বুঝতে পারো? পাপ-পুণ্য সত্য-মিথ্যার ভেদ নির্ণয় করতে পারো?"

এতগুলা প্রশ্নের মধ্যে একটারও উত্তর না দিয়া অমলা তেমনই বিরক্তি-বিদ্রূপ

মুখে অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তখন প্রমথ নিজেই পুনরায় বলিতে লাগিল—"কখনই অসংকোচে বলতে পারবে না যে, পারো। কিন্তু আমার কথা শোনো অমলা, আমি তোমাকে বলছি,—ঈশ্বর নেই, ধর্মাধর্ম নেই, পাপ-পুণ্য নেই। ও-সব শুধু সমাজ-রক্ষার জন্যে কৌশল; একেবারে ফাঁকিবাজি। যে তোমাকে একেবারেই চায় না, তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকায় কী সতীত্ব আছে আর কী পুণ্য আছে, সহজ বুদ্ধিতে তা বোঝা কঠিন। কত ভালো লোক দুঃখ পাচ্ছে, কত মন্দ লোক সুখে আছে। মৃত্যুর পরে কী হয় তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না, অথচ পৃথিবী এত পুরনো হ'য়ে গেল। পরলোকের কল্পনা শুধু ইহলোকের চালাকি, ভয় দেখানো। স্বর্গ হচ্ছে পুরস্কার, আর নরক হচ্ছে দণ্ড। কিন্তু মৃত্যুর পরে কোন লোক এ পর্যন্ত এ দণ্ড-পুরস্কার পেয়েছে কি না, তার কোন প্রমাণ নেই। এই সব কল্পিত ব্যাপারগুলো দিয়ে জীবন চালানো, আর যা প্রত্যক্ষ, যা রক্ত-মাংসের মধ্যে সত্য, সেগুলোকে উপেক্ষা করা যে কত বড় আত্মপ্রবঞ্চনা, তা তোমাকে আমি বলতে পারি নে অমলা! ধর্ম আর সমাজের দোহাই দিয়ে আমাদের জীবন ক্রমশঃ একটা বিরাট আত্মপ্রবঞ্চনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্র দিয়ে আমাদের মন অভিভূত, আর বিধি দিয়ে আমাদের দেহ বাঁধা। পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসের ফলে যে সব ব্যাপারগুলো আমরা মানি ব'লে মনে করি, মনের মধ্যে তলিয়ে দেখে বল তো অমলা, বাস্তবিকই সেগুলো আমরা মানি কি-না? অকপটে বল দেখি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, স্বর্গ-নরক —এ সব নিঃসন্দেহে মনের মধ্যে তুমি মানো কি-না?"

প্রমথ তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করিয়া বিজয়-দৃপ্ত নেত্রে অমলার দিকে চাহিয়া রহিল; এবং অমলাকে নিশ্চল, নির্বাক দেখিয়া মনে করিল যে তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের যাথার্থ্য ও যুক্তির বিরুদ্ধে বলিবার কোন কথাই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

অমলা কিন্তু এক মুহূর্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং প্রমথর মুখের উপর পরিপূর্ণ সহজ দৃষ্টিপাত করিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "সে সব আমি মানি কি মানিনে, সে কথা তোমাকে বলবার কোনও দরকার নেই। তবে তোমার কথা যে আমি ভুল-ভ্রান্তিতেও মানিনে, সে কথা আমি স্পষ্ট ক'রে তোমাকে ব'লে যাচ্ছি! তুমি যে-সব ব্যাপারকে কুসংস্কার বলছিলে, সে-গুলো কুসংস্কার কি না, তা নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমার প্রবৃত্তি নেই; কিন্তু তুমি যে নীতি এখন প্রচার করছিলে, কোন দিন যে আমার জীবনে তা সংস্কার হবে সে প্রত্যাশা ক'রো না। আর বোধহয় তোমার কোন কথা নেই, এখন আমি চললাম।" বলিয়া অমলা প্রস্থানোদ্যত হইল, তাহার অব্যবহিত পরেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি আমাদের বাড়িতে অতিথি—তোমাকে আমি যাও বলতে পারি নে, তুমি থাকো; কিন্তু যে ভাবে থাকা উচিত, সেই ভাবেই থেকো।"

অমলার উত্তর শুনিয়া বিস্ময়ে ও নৈরাশ্যে প্রমথ ব্যথিত হইয়াছিল ; কিন্তু পরবর্তী কথায় অপমানের আঘাতে সে সহসা কঠোর হইয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আর তা যদি না থাকি তা হলে তুমি আমাকে তাড়াতে পারো না-কি ?"

চৌকাঠের দুই দিকে দুই হাত দিয়া দাঁড়াইয়া অমলা স্থির ভাবে বলিল, "পারি। দেহের মধ্যে অসুখ হ'লে তাড়াবার ওষুধ আছে, আর একজন মানুষকে বাড়ি থেকে তাড়ানো যায় না ? কিন্তু তুমি কি তোমার টাকার জোরে এ কথা বলতে সাহস করছ ?

প্রমথর মুখ সহসা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল ; বলিল, "আমাকে অনেক অনেক দোষ দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ কথা কেউ বলে নি অমলা ! আমি দুশ্চরিত্র, দুর্বৃত্ত হ'তে পারি, কিন্তু ছোটলোক নই। তুমি বিজয়নাথের মূর্তি গড়িয়ে পূজো ক'রো, কারণ সে তোমার স্বামী ; কিন্তু তাই ব'লে আমাকে অতটা অপমান ক'রো না ; আমার একমাত্র অপরাধ আমি তোমাকে ভালোবাসি !"

অমলার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না, এমনি কি স্থান ত্যাগ করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত তাহার রহিল না। সে আরক্ত মুখে চিত্রার্পিতের মতো তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অমলা কোনও কথা বলিল না দেখিয়া প্রমথ বলিতে লাগিল, "আমি আজ তোমার কাছে সম্পূর্ণ হার স্বীকার করছি অমলা, আর সেজন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এতদিন পেয়ে-পেয়ে আমার মনে একটা দুঃসাহস জন্মেছিল যে, সব জিনিসই পাওয়া যায় ; কিন্তু দুর্লভ জিনিসও যে সংসারে আছে, সে জ্ঞান আজ আমি তোমার কাছ থেকে পেলাম ! সে যাই হোক, আজকের এ ঘটনার পর এ বাড়িতে আমার আর বাস করা চলে না, এ ঘটনার পর তুমিও তা স্বীকার করবে। আজ বোধহয় হ'য়ে উঠবে না, আজ একটা বাসা স্থির ক'রে কাল আমি চ'লে যাব।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "চলে যাবার আগে মানিকলাল-ঘটিত সব গোলযোগ আমি শেষ ক'রে দিয়ে যাব। হ্যাণ্ডনোটের টাকার সঙ্গে মানিকলালের কোনও সম্পর্ক নেই ; সে আমার সাজানো মহাজন। তোমাদের বাড়িতে প্রতিপত্তি লাভের জন্য প্রিয়নাথবাবুর কাছ থেকে মানিকের নামে হ্যাণ্ডনোট কিনে নিয়ে এ ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। কিন্তু আর যখন তার কোনও প্রয়োজন রইল না, তখন মানিকলালের হ্যাণ্ডনোটে পুরো উশুল লিখিয়ে দিয়ে, আমি মেসোমশাইকে সেখানা ফিরিয়ে দিয়ে যাব। তারপর যখন সুবিধে হবে, মেসোমশাই আমার টাকা শোধ করবেন।"

কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে অমলা তাহার নতদৃষ্টি ধীরে ধীরে প্রমথর প্রতি উত্থিত করিল, কিন্তু মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না, পুনরায় সে দৃষ্টি নত করিল। বোধহয় তখন তাহার মনের মধ্যে পাপ হইতে পাপী পৃথক হইয়া ঘৃণা ও বিরক্তির পরিবর্তে করুণা এবং সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইতেছিল।

প্রমথর নিকট কিন্তু অমলার অন্তরের সে অব্যক্ত অজ্ঞাত রহিল না। সে ব্যথিত আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আমার শেষ কথা অমলা, তোমার কাছ থেকে যত দূরেই আমি থাকি না কেন, তোমার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ রইল যে, যদি কখনও কোনও প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এই অধম ব্যক্তিকে দরকার হয়, একবার স্মরণ করলেই সে তোমার কাছে এসে উপস্থিত হবে। তোমাকে হাতের মধ্যে না পেয়ে আমার মনের মধ্যে তুমি যে কত বড় হয়ে রইলে, তা তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। আচ্ছা, তা হ'লে এসো; আর এখন আমার কোনও কথা বলবার নেই।"

নানাবিধ বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ ভাবের উত্তেজনায় অমলার চক্ষু সজল হইয়া আসিতেছিল। সে নতনেত্রে গাঢ়স্বরে বলিল, "আমি যদি তোমার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, তা হলে আমাকে ক্ষমা ক'রো প্রমথ-দাদা, কিন্তু তুমি বোধ হয় এ কথা স্বীকার করবে যে, আমি কোনও অপরাধ করিনি।"

"না, তা তুমি করনি।"

এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমলা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। আকাশ তখন প্রগাঢ় ধারায় বর্ষিত হইতেছিল।

সতের

বৃষ্টি একটু কমিলেই প্রমথ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময়ে প্রভাবতীকে বলিয়া গেল যে, কার্যানুরোধে সেবলা সে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে না—অন্যত্র আহার করিবে।

তাহার কিছুক্ষণ পরেই হরমোহনের নিকট অমলার ডাক পড়িল। নিজ কক্ষে বসিয়া হরমোহন অফিসের কাজ দেখিতেছিলেন।

অমলা উপস্থিত হইয়া বলিল, "কী বাবা?"

নাসিকা হইতে চশমা খুলিয়া হরমোহন ধীরে ধীরে কথাটা অমলাকে জানাইলেন। অমলার বিবাহের অলঙ্কারের হিসাবে প্রায় সাড়ে চারিশত টাকা স্বর্ণকারের নিকট বাকি আছে। কয়েক দিন পূর্বে সেই টাকার দাবী করিয়া স্বর্ণকারের উকিল নোটিশ দিয়াছিল যে, সাত দিনের মধ্যে টাকা না দিলে হরমোহনের নামে নালিশ হইবে। স্বর্ণকারের উকিলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হরমোহন বহু অনুরোধ উপরোধ করিয়া ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন যে, উপস্থিত আড়াই শত টাকা দিলে বাকি টাকার জন্য স্বর্ণকার আরও ছয় মাস অপেক্ষা করিবে। এই আড়াই শত টাকা হরমোহনের কোন বন্ধু ধার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু কাল সহসা তিনি জানান যে, যে-টাকা তিনি অপরের নিকট হইতে পাইবার আশা করিতেছিলেন, সে টাকা না পাওয়ায় উপস্থিত তিনি টাকা দিতে পারিবেন না। কালই স্বর্ণকারকে টাকা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। তখন অগত্যা নিরুপায় হইয়া অফিসের তহবিল হইতে আড়াই

শত টাকা লইয়া হরমোহন স্বর্ণকারের উকিলকে দিয়া আসিয়াছেন। এখন, অফিসের তহবিল পূরাইবার জন্য সেই আড়াই শত টাকা অমলাকে প্রমথর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।

শুনিয়া অমলা ত্রাসে এবং অপমানে কাঠ হইয়া গেল। প্রমথর সহিত বচসায় বিক্ষুব্ধ তাহার হৃদয়ের স্পন্দন এখনও সম্পূর্ণ থামিবার অবকাশ পায় নাই, ইহারই মধ্যে পিতার নিকট হইতে এই আদেশ পাইয়া সে কী বলিবে অথবা করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। ক্ষণকাল পূর্বে অর্থ সম্পর্কে সে সদর্পে যে-কথা প্রমথকে বলিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া, আজই অর্থের জন্য প্রমথর নিকট প্রার্থীরূপে দাঁড়ানো অপেক্ষা মৃত্যুও তাহার শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইল।

প্রথম আঘাত কতকটা সামলাইয়া লইয়া অমলা বলিল, "প্রমথদাদার কাছ থেকে টাকা ধার না নিয়ে, আমার গহনা বাঁধা রেখে বা বিক্রি ক'রে টাকার ব্যবস্থা করো না বাবা?"

অমলা যে অলঙ্কারের কথা তুলিবে, তাহা হরমোহন জানিতেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুতও ছিলেন; বলিলেন, "বেশ তো, প্রমথর কাছেই কিছু গহনা বাঁধা রেখে দাও; তাও তো এর আগে রেখেছ। প্রমথ এখন বাড়ি আছে?"

"না, বেরিয়েছেন। সন্ধ্যার পর ফিরবেন।"

"তবে ফিরে এলেই তার সঙ্গে এ কথা শেষ ক'রে নিয়ো। কাল রবিবার, পরশুই অফিসের টাকা পূরিয়ে রাখতে হবে।" বলিয়া হরমোহন অফিসের কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, কঠিন শুষ্ক মুখে অমলা বলিল, "প্রমথদাদাকে টাকার জন্যে আমি বলতে পারব না বাবা!"

সবিস্ময়ে হরমোহন বলিলেন, "কেন?—পারবে না কেন?"

এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া অমলা নীরবে আরক্ত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

অমলার আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া হরমোহন বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, গলবস্ত্র হয়ে বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি অর্থ ভিক্ষা ক'রে ঘুরে বেড়াতে আমিই খুব পারি, না পছন্দ করি?"

কাতর স্বরে অমলা বলিল, "আমি তো তা বলছিনে বাবা! আমি না ব'লে তুমি তো প্রমথদাদাকে টাকার কথা বলতে পার।"

সক্রোধে হরমোহন বলিলেন, "কাকে কে বললে ভালো হয়, সেটা তোমার চেয়ে আমি কম বুঝি ব'লে মনে করো না। আমার বন্ধুর কাছে টাকার জন্যে চেষ্টা করতে তোমাকে তো কখনও অনুরোধ করি নি!"

হরমোহনের কথার অদৃশ্য আঘাতে অমলা বিমূঢ় হইয়া গেল।

"প্রমথদাদাকে টাকার কথা তুমি না ব'লে আমি বললে ভালো হয়, তাই কি তুমি বলছ বাবা?"

উগ্রভাবে হরমোহন বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, হাঁ, তাই বলছি। ইঙ্গিতে

যে-কথা বোঝা উচিত, সে কথা নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কী তোমার লাভ হচ্ছে ?"

গভীর আঘাতে আহত হইয়া অমলা ক্ষণকাল নিঃশব্দে হরমোহনের দিকে চাহিয়া রহিল ; তাহার পর বিহ্বল ভাবে বলিল, "কিন্তু এ কথা তুমি কেন বলছ বাবা ? কেন বলছ এ কথা !"

কন্যার এ প্রশ্নে হরমোহন অগ্নিমূর্তি হইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন।

"কেন বলছি, তার কৈফিয়ৎও তোমাকে দিতে হবে নাকি ? কোথাও যাবার সময়ে ক্যাশবাক্সর চাবি প্রমথ আমাকে না দিয়ে তোমাকে কেন দিয়ে যায়, তার কৈফিয়ৎ আমাকে দিতে পারো ?"

এ কথা শুনিয়া অমলার মুখ প্রথমে মৃত ব্যক্তির মুখের মত সাদা হইয়া গেল, তাহার পর দেখিতে দেখিতে জবাফুলের মত আরক্ত হইয়া উঠিল ; কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না।

তৎপরে হরমোহন কিছুক্ষণ ধরিয়া যে সকল কথা বলিলেন, তাহার অর্থ এবং ইঙ্গিত এইরূপ :—নানাপ্রকার দুঃখে এবং কষ্টে হরমোহনের জীবন অসহ্য হইয়াছে, মৃত্যু হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। তদুপরি এই সকল দুঃখ কষ্টের যে একমাত্র কারণ, তাহার এ বিষয়ে কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই ! হরমোহনকে কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার সময়ে অমলার আত্মসম্মানবোধ সবলে সাড়া দিয়া উঠে ; কিন্তু প্রমথর হস্ত হইতে ক্যাশবাক্সর চাবি লইবার সময়ে সে আত্মসম্মানবোধের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পূর্বে প্রমথর সহিত যে-সকল কথা হইয়াছিল, অমলা মনে মনে তাহা স্মরণ এবং পর্যালোচনা করিতেছিল ; হরমোহনের কথা কতক সে শুনিল এবং কতক শুনিল না।

হরমোহন চুপ করিলে সে বলিল, "আচ্ছা বাবা, আমি কালকের মধ্যেই এ টাকার ব্যবস্থা ক'রে দোব।"

তখন হরমোহন শান্ত এবং সন্তুষ্ট হইলেন ; এবং ক্রুদ্ধ হইয়া অমলার প্রতি যে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ কিছু প্রবোধ বাক্য বলিলেন। কিন্তু তিরস্কারের মধ্যে অমলা বোধহয় ততটা আঘাত পায় নাই, যতটা সে সান্ত্বনার মধ্যে পাইল। হরমোহন বলিলেন যে, নিজেকে অসংসক্ত রাখিয়া কার্যোদ্ধারকারী শক্তি প্রয়োগ করা জীবনের সকল অবস্থাতেই চলে। তাহাতে সুনীতির কিছু মাত্র অপচার হয় না।

অন্তর বহ্নি বহন করিয়া অমলা প্রস্থান করিল।

প্রভাবতী তখন গৃহকর্মে রত ছিলেন ; তাঁহার অবকাশ হইলে অমলা সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল।

প্রভাবতী বলিলেন, "তুমি যা বলছ সব বুঝলাম। কিন্তু কী করবে বলো ? এ রকম বিপদে টাকার ব্যবস্থা না করলেও তো নয় ? আজ যদি চাকরিটি যায়,

কাল তাহলে আর উনুনে হাঁড়ি চড়বে না। এই তো অবস্থা।"

"কিন্তু মা, তাই ব'লে কি টাকার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে? সেকবার ধার আমার জন্যে হয়েছিল ব'লে আমিই কি এ ধারের জন্যে দায়ী? তা যদি না হয়, তা হলে তুমিও তো মা, প্রমথদাদার কাছে টাকা চাইতে পার?"

অমলার কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়া প্রভাবতী বলিলেন, "কথায় কথায় তোমার অভিমানটা আজকাল বড় বেশি হয়েছে, বাপু। কে তোমাকে বলেছে যে, ধারের টাকার জন্যে তুমি দায়ী, যে, এত কথা তুমি শোনাচ্ছ? তুমি চাইলে টাকাটা সহজে পাওয়া যাবে, আমরা চাইলে হয়তো ওজর আপত্তি ক'রে কাটিয়ে দিতে পারে—এই জন্যেই তোমাকে দিয়ে চাওয়ানো। এতে আর এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? তা ছাড়া, প্রমথ কি তোমার সঙ্গে কোনও অন্যায় ব্যবহার করেছে যে, তার কাছে টাকা চাইলে তোমার অপমান হবে?"

দীপ্ত নেত্রে অমলা বলিল, "আমি চাইলে প্রমথদাদা সহজে টাকা দেবেন, আর তোমরা চাইলে না-ও দিতে পারেন, এইটেই কি যথেষ্ট অন্যায় ব্যবহার নয়? এর চেয়েও কি বেশি অন্যায় ব্যবহার তুমি চাও মা?"

এবার প্রভাবতী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আমি কিছুই চাইনে। কিন্তু তুমি কি চাও যে আমরা সপরিবারে অনাহারে মারা যাই?"

অমলা বলিল, "আমি তা চাইনে; কিন্তু তাই ব'লে তো আমি কথায় কথায় এমন ক'রে আত্মসম্মান বলি দিতেও পারি নে!"

সবিদ্রূপে প্রভাবতী বলিলেন, "সবাই তো তোমার আত্মসম্মান বড় রেখেছে যে, প্রমথর কাছে টাকা ধার চাইলেই তোমার আত্মসম্মান বলি দেওয়া হবে। এটা তুমি ঠিক জেনো যে, অনেকের চেয়ে প্রমথ তোমার আপনার লোক; তার ওপর তোমার যেমন জোর খাটে, তেমন অনেকের ওপরই খাটে না।"

এই 'সবাই' এবং 'অনেকের' দ্বারা প্রভাবতী যে বিজয়নাথকে উদ্দেশ্য করিলেন, তাহা বুঝিতে অমলার বিলম্ব হইল না। সে ক্রোধে এবং অপমানে আহত হইয়া বলিল, "না না, মিথ্যা কথা। প্রমথদাদা কারুর চেয়ে আমার আপনার নয়, আর সেই জন্যে তাঁর ওপর জোর খাটাতে আমি অপমানিত মনে করি। কিন্তু—মা হয়ে তুমি যখন আমার দুঃখ বুঝলে না, তখন আমার আর উপায় নেই। আমি জানি যে, টাকা চাইলেই আমি টাকা পাব, সে জোর খাটাতে আমি আর দ্বিধা করব না। তোমাদের টাকার ব্যবস্থা আমি কালই ক'রে দোব।" বলিয়া অমলা প্রভাবতীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া প্রস্থান করিল।

একবার প্রভাবতীর মনে হইল যে, অমলাকে ডাকিয়া দুই একটা মিষ্ট কথা বলেন, এবং উপস্থিত তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া তিনি নিজেই প্রমথকে টাকার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট একবার কোনও কারণে প্রমথ অস্বীকার করিলে পরে অমলা অনুরোধ করিলেও যদি ফল না হয়, তাহা হইলে হরমোহন কিরূপ বিপন্ন এবং ক্রুদ্ধ হইবেন, তাহা কল্পনা করিয়া প্রভাবতী নিরস্ত হইলেন।

আঠার

সমস্ত দিন ধরিয়া অমলার অন্তরে বহ্নি জলিয়া জলিয়া বিস্তার লাভ করিল। অবশেষে এমন একটু স্থান রহিল না, যেখানে তাহার চিরপোষিত সংস্কারসমূহ, যাহা লইয়া আজ প্রাতঃকালেই সে প্রমথর সহিত বচসা করিয়াছে, আশ্রয় লাভ করিয়া রক্ষা পায়। মনে হইল, অর্থ ই সংসারের একমাত্র প্রবল, আর সকলই দুর্বল। এমন কি মাতৃহৃদয়ে কন্যার মঙ্গলচিন্তা পর্যন্ত তাহার নিকট পরাভূত!

অভাব কষ্টকর বটে; কিন্তু অর্থের অভাব সর্বাপেক্ষা কষ্টকর বলিয়া অমলার মনে হইল। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, করুণা এ সকলেরই অভাব সহ্য হয়; কিন্তু অর্থের অভাব অসহ্য! স্বামী-প্রেমের অভাবে তাহার সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু অর্থের অভাবে তিন দিন কাটে না।

ক্ষুধা রাক্ষসী। অন্ন পাইলে সে অন্ন জীর্ণ করে। অন্নের অভাব মানুষের দেহ এবং মন জীর্ণ করে। পুণ্য-প্রেম, সততা-সংযম পরিপাক করা চলে; কিন্তু অন্ন পরিপাক না করিলে চলে না! প্রভাবতী বলিয়াছেন, উনানে হাঁড়ি না চড়ার মতো বিপদ আর কিছুই নাই। অমলার মনে হইল, মানুষের দেহে এ পাপ পাকস্থলীটা যদি না থাকিত!

সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবসন্ন হইয়া সন্ধ্যার পর প্রমথ বাড়ি ফিরিল। তাহার অর্ধ ঘণ্টা পরে অমলা তাহার নিকট উপস্থিত হইল।

অমলাকে দেখিয়া প্রমথ বলিল, "আমি বাসা ভাড়া ক'রে এসেছি অমলা। বাড়ির চাবি নিয়ে এসেছি। বামুন চাকরও ঠিক হয়ে গিয়েছে। কাল খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা আমি বাসায় উঠে যাব।" তাহার পর টেবিলের উপর হইতে একটা কাগজ লইয়া অমলার হস্তে দিয়া বলিল, "এটা মানিকলালের হ্যাণ্ডনোট; এতে মানিকলাল সমস্ত টাকার উশুল লিখে দিয়েছে। এটা তুমি মেসো মশায়কে দিয়ে দিয়ো। তাঁর যখন সুবিধা হবে আমাকে টাকাটা দেবেন। তার জন্যে ব্যস্ত হবার কোনও দরকার নেই।"

হ্যাণ্ডনোটের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অমলা বলিল, "আর যদি একেবারেই টাকাটা না দিতে পারেন?"

অমলার দিকে চাহিয়া সহজ ভাবে প্রমথ বলিল, "না দিলে টাকাটা উশুল করবার কোন উপায়ই তো আমার হাতে আমি রাখি নি। অতএব বুঝতে পারছ, টাকাটা একেবারে না পেলেও আমার কোন অভাব হবে না।"

অমলা প্রমথর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "এতটা ত্যাগ স্বীকার তুমি কেন করছ প্রমথদাদা? বিনিময়ে আমাদের কাছ থেকে তো তুমি কিছুই পাবে না।"

প্রমথ একটু হাস্য করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "যে কথা তুমি বিশ্বাসও করতে পারবে না, ধারণাও করতে পারবে না, সে কথা শুনে কী লাভ

হবে বলো? পৃথিবীতে কত খেয়ালী লোক আছে, কত পাগল আছে,—ধর আমিও তাদের মধ্যে একজন।"

এ কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া অমলা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর হ্যাণ্ডনোটখানা প্রমথকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "এর মধ্যে আর আমাকে জড়িয়ো না প্রমথদাদা, এ তুমি বাবার সঙ্গে যা করতে হয় কোরো। আমি এসেছি তোমার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে।"

"ভিক্ষা চাইতে? কী ভিক্ষা বলো?"

অমলা বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটা মূল্যবান অলঙ্কার বাহির করিয়া প্রমথর টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "এই গহনাটার বদলে তুমি আমাকে আড়াই শ টাকার ব্যবস্থা ক'রে দাও। টাকাটার আমার বড় দরকার হয়েছে।"

মৃদু হাস্য হাসিয়া প্রমথ বলিল, "এ কিন্তু ভিক্ষা নয় অমলা, এ ভিক্ষা চাওয়াও নয়। এ মহাজনী।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তা হোক তুমি যেমন বলবে তাই হবে; কিন্তু গহনাটা কি না রাখলেই নয়?"

অমলা কাতর কণ্ঠে কহিল, "না, প্রমথদাদা, আমার এ প্রার্থনাটা তুমি অগ্রাহ্য ক'রো না। গহনা রেখে টাকা দিলে মনে ক'রো না, আমি তোমার কাছে কম ঋণী হব।"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, "সংসারে ভুল বোঝাটাই বেশি অমলা! তুমি আমাকে শেষ পর্যন্ত ভুল বুঝেই রইলে। তোমাকে ঋণী করবার প্রবৃত্তি কখনও আমার ছিল না, এখনও নেই। মেসোমশায়কে মাসিমাকে ঋণী করবার প্রবৃত্তি ছিল, কারণ, তাঁরা ছিলেন আমার উপলক্ষ্য।"

অমলা সেইরূপ কাতর ভাবে বলিল, "হয় তো তোমাকে আমি ভুল বুঝেছি প্রমথদাদা, কিন্তু তবুও আমার অনুরোধ—এ কথাটা তুমি রাখো। গহনাটা এখন তোমার কাছে থাক, আর তোমার কাছে উপস্থিত যদি টাকা না থাকে তো গহনাটা বিক্রি ক'রে আমাকে টাকা দাও।"

"তা ক'রে আর কাজ নেই, গহনাটা আমার কাছেই থাক।" বলিয়া ক্যাশবাক্স খুলিয়া প্রমথ আড়াই শত টাকা হিসাব করিয়া অমলার হস্তে দিল। তাহার পর অমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি অমলা—এখনই তো তুমি ঋণ, বিনিময়, এই সব কথা বলছিলে; কিন্তু কোন্ ঋণের পরিশোধে, কিসের বিনিময়ে তুমি আমার সকালবেলাকার অপরাধ এমন ক'রে ক্ষমা করলে, তা বলতে পারো? সংসারে দোকানদারী আর মহাজনীই কেবল নেই—তা ছাড়া অন্য জিনিসও আছে।"

নতদৃষ্টি হইয়া গম্ভীর স্বরে অমলা বলিল, "আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করতে আসিনি প্রমথদাদা, আমি নিজের স্বার্থে তোমার কাছে এসেছিলাম।"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিল।

"তা নয়, অমলা, তা নয়। আমি তোমাকে বেশ চিনি। নিজের স্বার্থে

আমার কাছে আসবার মতো দুর্বল তুমি নও। কত শক্তি তুমি ধারণ করো, তাই আজ সকালবেলার ঘটনার পর টাকার জন্যে আমার কাছে তুমি আসতে পেরেছ, তা বোঝবার শক্তি আমার আছে। এ শুধু তুমিই পারো। আগুন নিয়ে সে-ই খেলা করতে পারে—আগুনের চেয়েও যে প্রবল।"

অমলা ক্ষণকাল নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সহসা তাহার মুখে-চক্ষে একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্য দেখা দিল। নিঃশাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল এবং দেহ অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল।

তাহার আকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া প্রমথ বলিল, "তোমার কি অসুখ করেছে অমলা ?"

"না।"

"তবে ?"

"একটা কথা বলব।"

"কী কথা, বলো।"

অদূরে একটা খালি চেয়ার ছিল, তাহাতে বসিয়া পড়িয়া, একটা হাতলের উপর যুক্তকরে ভর দিয়া, অমলা একমুহূর্ত প্রমথর দিকে শুষ্ক নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল; "যদি দরকার হয়, তুমি আমার ভার নিতে পারবে প্রমথদাদা ?"

সবিস্ময়ে প্রমথ বলিল, "কিসের ভার ?"

"একজন মানুষের যা কিছু ভার, সব। খাওয়া, পরা, থাকার।"

বিহ্বল হইয়া প্রমথ নিঃশব্দে অমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"পারবে ?"

বিমূঢ় ভাবে প্রমথ বলিল, "পারব। কিন্তু এ সব কথা তুমি কেন বলছ অমলা ?"

অমলা সে প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া বলিল, "যদি দরকার হয়, কাল রাত্রে আমাকে তোমার বাসায় নিয়ে যেতে পারবে ?"

অপরিসীম বিস্ময়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল, "মেসো মশায়ের অমতে ?"

"শুধু অমতে নয়, অজ্ঞাতে। বলো ! বলো ! শীঘ্র বলো ! আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে রেখো না।"

প্রমথ বলিল, "পারব। শুধু পারব না অমলা, চিরদিন—"

প্রমথকে বাধা দিয়া উঠিয়া পড়িয়া অমলা বলিল, "ও-সব বাজে কথা বলতে হবে না। পারবে, তাই যথেষ্ট। কাল তুমি তোমার বাসায় উঠে যেয়ো, আর সন্ধ্যেবেলা এসে আমার সঙ্গে দেখা করো, তখন ঠিক ক'রে বলব।"

টলিতে টলিতে অমলা প্রমথর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হরমোহনের কক্ষে প্রবেশ করিল।

নোটগুলা হরমোহনের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "এই আড়াই শ টাকা।"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে হরমোহন বলিলেন, "আজই পেলে ? দেখ দেখি, এই জন্যেই

তো তোমাকে চাইতে বলেছিলাম। গহনা-টহনা কিছু রাখ নি তো ?"

চলিয়া যাইতে যাইতে অমলা বলিল, হ্যাঁ, রেখেছি।"

শুনিয়া হরমোহনের মনের মধ্যে হর্ষের দীপ্তি ঈষৎ ছায়ামণ্ডিত হইল।

নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া অমলা শয্যায় শুইয়া পড়িল। তাহার পর ছিন্নমস্তক ছাগের মতো নিঃশব্দে সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে, অমলা বহুক্ষণ জাগিয়া বিজয়নাথকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিল—

শতকোটি প্রণাম পূর্বক নিবেদন,

জীবনে বোধহয় আর কখনও আপনাকে চিঠি লেখবার কারণ ঘটত না, যদি না এত বড় বিপদে আজ আমি বিপন্ন হতাম। আজ আমার লজ্জা সংকোচ মান অপমানের কথা ভাবা চলে না; কারণ, জীবন মরণের চেয়েও বড় সংকট আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাদের একজন দূর-আত্মীয়। তিনি বলেন যে, আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে; আর দু তিন দিন আগে তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছিলেন। এই প্রমথদাদাই কিছুদিন থেকে আমার জীবনে মহা সংকটের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

প্রমথদাদাকে আমি একটুও ভয় করিনে: অবহেলার সঙ্গে তাঁকে রোধ করবার শক্তি আমার আছে, তা আমি জানি। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে আমার জীবন দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে।

প্রমথদাদা বড়মানুষ, আর আমার বাবা দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত। যখন-তখন যথেষ্ট ভাবে বাবাকে অর্থ সাহায্য ক'রে প্রমথদাদা বাবাকে আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু এই অর্থ পাওয়ার চাবি হচ্ছি আমি; আমি চাইলেই প্রমথদাদা টাকা দেন। সেই জন্যে আমাকেই প্রতিবার টাকা চাইতে হয়।

এই যে টাকা চাওয়া আর টাকা দেওয়ার তলে তলে একটা অন্যায় উদ্দেশ্য রয়েছে, এ সকলেরই জানা আছে; এ প্রমথদাদা জানেন, বাবা জানেন, আমি জানি এমন কি মা পর্যন্ত জানেন। অথচ এ বিষয়ে আমাদের পক্ষ একেবারে নিরুপায়!

এই যে অল্প অল্প ক'রে প্রমথদাদার হাতে নিজেকে বিক্রি করা এ আমাকে পাগল ক'রে দেবার মতো করেছে! প্রমথদাদার টাকা আত্মসাৎ ক'রে কোন রকমে প্রমথদাদার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, প্রমথদাদার হাতে যাওয়ার চেয়েও আমার মন্দ ব'লে মনে হয়। বাবা মা জানেন আমি ঠিক আছি, প্রমথদাদাও জানেন আমি ঠিক আছি। কিন্তু আমি একে ঠিক থাকা মনে করি নে। মেয়েমানুষের মর্যাদা নিয়ে জুয়াচুরী খেলার চেয়ে মেয়েমানুষের পক্ষে মহাপাতক আর কিছুই হ'তে পারে না।

প্রমথদাদার পক্ষ থেকে আমার উপর জুলুম-জবরদস্তি কিছু নেই; তিনি ত্যাগের

তারা আমাকে আয়ত্ত করতে চান। কিন্তু তা'তে কী আসে যায়? নরকের পথ প্রশস্ত হলেও নরক যা তা'-ই।

প্রমথদাদা বলেন; স্বর্গ-নরক নেই, পাপ-পুণ্য নেই, ধর্ম-অধর্ম নেই, এমন কি ঈশ্বর পর্যন্ত নেই। তিনি বলেন, এ সব শুধু সমাজরক্ষার জন্যে মানুষের ফাঁকিবাজি। আমি তাঁকে বলেছি যে, আমি তাঁর এ কথা একেবারেই মানি নে।

প্রমথদাদা চিরদিনের জন্যে আমার সব ভার নিতে প্রস্তুত আছেন। আমার জন্যে সব রকম ত্যাগ স্বীকারও তিনি করবেন ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু সেইটেই যে আমার পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ! আমি সতী, আমি সাধ্বী—আমি ধর্ম বিশ্বাস করি, ঈশ্বর বিশ্বাস করি,—আমি ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী,—আমার কোন্ পাপে এ সব কথা আমাকে কানে শুনতে হয়!

কিন্তু এ দোটানা জীবনও আমার অসহ্য হয়েছে! স্বর্গের কল্পনা মনের মধ্যে বহন ক'রে নরকের বিভীষিকা সহ্য করা বড় কষ্টকর!

তাই আমি আজ আমার এ মহাবিপদে মান অপমান অভিমান সমস্ত ভুলে আপনার শরণাগত হয়েছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন! আপনি আমার স্বামী, আপনার কর্তব্য আমাকে রক্ষা করা, বিশেষতঃ এ রকম বিপদে। আপনার স্ত্রী ব'লে আমার যে অধিকার আছে, আমি স্পষ্ট ভাবে আজ সে অধিকারের সম্পূর্ণ আশ্রয় চাচ্ছি। এর পরেও আপনি যদি উদাসীন থাকেন, তা হলে প্রত্যবায়ের দায়ী আপনি হবেন।

আমি আজ, রবিবার, রাত্রি বারোটার সময়ে বাড়ির সদর দরজা খুলে ফুটপাথে এসে দাঁড়াব, আপনি পূর্ব থেকে সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং আমাকে সঙ্গে ক'রে যেখানে নিয়ে যেতে হয় নিয়ে যাবেন। সে সময়ে প্রমথদাদাও আমার জন্যে পথে অপেক্ষা ক'রে থাকবেন। স্বর্গ অদৃষ্টে না থাকলে, অগত্যা নরকেই প্রবেশ করতে হবে।

আমি ধর্মে বিশ্বাস করি ব'লে আমার বিশ্বাস যে, আমি আপনার আশ্রয় পাব। পরকালে বিশ্বাস করি ব'লে ইহকালের যন্ত্রণা এতদিন এক-রকম ক'রে সহ্য করে এসেছি। আমার সমস্ত বিশ্বাস আর ধারণা ওলট-পালট ক'রে দেবেন না।

আমার আর কিছু বলবার নাই। আপনি স্বামী, তাই অকপটে সমস্ত কথা আপনাকে জানালাম, আর আমার জীবন মরণের সমস্যা আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ইতি

শ্রীচরণাশ্রয়প্রার্থিনী
শ্রীমতী অমলবালা দেবী

রাত্রি তিনটা পর্যন্ত জাগিয়া অমলা দুইখানি চিঠি অনুলিপি করিল এবং প্রত্যূষে তন্মধ্যে একখানি ডাকযোগে বিজয়নাথের নামে পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর পুরাতন বিশ্বস্ত পরিচারিকা যশোদাকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অমলা তাহার দুই হস্ত চাপিয়া ধরিল।

"যশোদা, তুই আমাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিস, আমার একটা কাজ তোকে ক'রে দিতেই হবে!" তাহার পর একখানা পাঁচ টাকার নোট যশোদার হস্তে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "এখন তোকে পাঁচটাকা দিলাম; কাজ হয়ে গেলে আরও পাঁচ টাকা দোবো।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যশোদা বলিল, "কী কাজ দিদিমণি?" একটা কাজের জন্যে দশটাকা পুরস্কার লাভ তাহার ইহজীবনের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত।

অপর চিঠিখানা যশোদার হস্তে দিয়া অমলা বলিল, "এই চিঠিখানা যেমন ক'রে পারিস আজ দুপুরবেলার মধ্যে বউবাজারে গিয়া তাঁর হাতে তোকে নিজে দিয়ে আসতে হবে।"

"জামাইবাবুকে?"

"হাঁ। পারবি নে।"

"এ আর পারব না! কিন্তু এ টাকা আমি কখনই নোব না দিদিমণি! জামাইবাবু যখন তোমাকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবেন, তখন আমাকে যা দেবে তাই নোব।" বলিয়া নোটখানা যশোদা ফিরাইয়া দিল।

অমলা কিন্তু কিছুতেই শুনিল না; অবশেষে জোর করিয়া যশোদার অঞ্চলে নোটখানা বাঁধিয়া দিল।

"বাড়ি চিনতে পারবি তো যশোদা?"

যশোদা বলিল, "কতবার তত্ত্ব নিয়ে গেছি, বাড়ী চিনতে পারব না? কী বলো গো?"

"তাঁকে চিনতে পারবি?"

"না! সেইটেই ভুল ক'রে তোমার শ্বশুরের হাতে চিঠিখানা দিয়ে আসব!" বলিয়া হাসিতে হাসিতে যশোদা প্রস্থানোদ্যত হইল।

যশোদাকে অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া ফিরাইয়া অমলা বলিল, "এ কথা যেন আর কেউ টের না পায় যশোদা। আর, চিঠিখানা তুই নিজের হাতে তাঁকে দিবি, আর দিয়ে এসে আমাকে বলবি, তবে হবে।"

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তবে হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।" বলিয়া যশোদা প্রস্থান করিল।

বৈকালে আসিয়া যশোদা অমলাকে জানাইল যে, যথাদেশ কর্তব্য পালন সে করিয়াছে।

বারংবার নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া অবশেষে অমলা সন্তুষ্ট হইল যে, তাহার চিঠি বিজয়নাথের হস্তে ঠিক পৌঁছিয়াছে।

কম্পিত হৃদয়ে অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোকে কিছু বললেন?"

"চিঠিখানা পকেটে রেখে বললেন, আচ্ছা তুমি যাও।"

"চিঠি তোর সমুখে পড়েছিলেন?'

"হ্যাঁ, তা পড়েছিলেন।"

আহারের পরেই প্রমথ তাহার বাসায় উঠিয়া গিয়াছিল। হরমোহন এবং

প্রভাবতী অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই সে নিবৃত্ত হয় নাই। যাইবার পূর্বে তাহার নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোটখানা অমলা নিজেই চাহিয়া লইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর প্রমথ আসিল এবং সুবিধামতো অমলার সহিত সাক্ষাৎ করিল। অমলা তাহাকে রাত্রি বারটার সময়ে গৃহ-সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে বলিল।

অসীম উল্লাস বক্ষের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া প্রমথ বলিল, "নিশ্চয় যাবে তো অমলা?"

আরক্ত কঠিন মুখে অমলা বলিল, "বললাম তো যদি দরকার হয়।"

অমলার আকৃতি দেখিয়া এবং কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রমথর অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না; শুধু বলিল, "আচ্ছা। আমি নিশ্চয় অপেক্ষা ক'রে থাকব।"

উনিশ

প্রমথর সহিত কথার পর অমলা ক্ষণকাল বুদ্ধিহতের মতো চুপ করিয়া একলা বসিয়া রহিল। সে যে এ পক্ষে কী করিয়াছে এবং অতঃপর কী করিবে, তাহা ভালো করিয়া ধারণা করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত তাহার লোপ পাইবার উপক্রম করিল। কয়েক ঘণ্টা পরেই যে মহা সমস্যার সময় আসিবে, তাহার কথা মনে করিবার সাহসও তাহার রহিল না। সে নিজেই জীবন ও মৃত্যুকে একই সময়ে আহ্বান করিয়াছে,—অদৃষ্টে কী আছে, কাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, কে জানে!

কিন্তু স্বল্পাবশিষ্ট সময়টুকু যতই হ্রস্ব হইতে লাগিল, ততই অমলা তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা অনুভব করিতে লাগিল। আসন্ন সম্ভাবনার সমাধান পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্য তাহার রহিল না। রাত্রে ছায়া দর্শন করিয়া ভীত হইয়া মানুষ যেমন কম্পন-কম্পন ভ্রম নিরাকরণের জন্য ছুটিয়া গিয়া তাহা স্পর্শ করিয়া দেখে, তেমনিই অমলার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, তখনই কোনরূপে রাত্রি বারটার অবস্থায় উপস্থিত হইয়া তাহার ভয়াবহ ভবিষ্যতের অদৃষ্ট মূর্তি দেখিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হয়। কিছুক্ষণ পরে যখন সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই হইবে, তখন ক্ষণকালের জন্য তীরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়া কী ফল! মানুষের মনে ভয়াবহের প্রতি যে দুরতিক্রমণীয় আকর্ষণ আছে, অমলা মনের মধ্যে সেই প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল। এই অধৈর্যতার মধ্য হইতে ক্রমশঃ সে মনের মধ্যে একটা শক্তিও লাভ করিল।

সুরেশ বাহিরের ঘরে মাস্টারের নিকট পড়া করিতেছিল। সে উপরে আসিলে অস্বাভাবিক আগ্রহের সহিত অমলা তাহাকে ক্ষণকাল আদর করিল। তাহার পর যে-সব জিনিস বহুদিন হইতে সুরেশের লোভ এবং প্রশংসা উদ্রিক্ত করিয়া আসিতেছিল, অথচ পাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, অমলা দুই হস্তে সে সব জিনিস সুরেশকে দান করিতে লাগিল।

দানের অমিতত্তা সুরেশকে পীড়ন করিল।

সে সবিস্ময়ে বলিল, "এ সব দিয়ে দিচ্ছ কেন, দিদি? তোমার আর দরকার নেই?"

"আমি যে এখন বড় হয়েছি, ভাই! এ সবে আমার আর দরকার নেই। কিন্তু খবরদার, আজ যেন মাকে বাবাকে এ-সব দেখাস নে।"

"কেন?"

কোনও কারণ নির্দেশ না করিয়া অমলা কহিল, "আজ দেখাতে নেই।"

"কাল সকালে দেখাতে আছে?"

"তা আছে।" বলিয়া অমলা তাহার উদ্বেল অশ্রু চাপিবার জন্য তাড়াতাড়ি জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

হরমোহনের সহিত অমলা কিছুক্ষণ কথা কহিল। কিন্তু প্রভাবতীর নিকট গিয়া বসিতেই, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ এবং চক্ষু সজল হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

ঈষৎ বিস্মিত হইয়া প্রভাবতী বলিলেন, "এসেই চ'লে যাচ্ছিস যে অমলা? কোনও কথা ছিল?"

কোনও প্রকারে একটি মাত্র "না" বলিয়া অমলা প্রস্থান করিল। মনে মনে বলিল, 'মা, তোমার পাপিষ্ঠা মেয়েকে ক্ষমা ক'রো! হয়তো আর এ জীবনেই তোমার সঙ্গে কথা কওয়া হয়ে উঠবে না! আজ তোমার সঙ্গে কথা কইতে গেলে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারব না!'

সকলে শয়ন করিলে, অমলা নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার পিতা মাতাকে দুইখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিল। কোথায় যাইতেছে, কাহার সহিত যাইতেছে, কিছুই লিখিল না,—শুধু লিখিল, কেন যাইতেছে। "এ জীবন অসহ্য হয়েছে—তাই এ জীবন ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি।" তাহার পর ক্ষমা প্রার্থনা এবং প্রণাম। লিখিল, "আমি যে তোমাদের মনের মতো হ'য়ে থাকতে পারলাম না, তার জন্যে আমিই অপরাধী, আমাকে ক্ষমা ক'রো।"

পত্র লেখা শেষ হইলে, পত্র দুইখানি এবং মানিকলালের হ্যাণ্ডনোট টেবিলের উপর রাখিয়া তদুপরি চাবির রিং স্থাপন করিয়া অমলা দেখিল, ঘড়িতে সাড়ে এগারটা বাজিয়াছে।

আর আধ ঘণ্টা!

অমলার দেহের মধ্য দিয়া একটা তড়িৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল, এবং তাহার পরেই একটা গভীর অবসন্নতায় সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া আসিল। মনে হইল, যে শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল, তথায় রক্ত জমিয়া বরফ হইয়া আসিতেছে! সমস্ত শরীরটা ভার বোধ হইতে লাগিল এবং শীত-শীত করিতে লাগিল।

দেহ পাছে বিকল হইয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায় অমলা উঠিয়া পদ-চারণা করিতে

গেল ; কিন্তু মনে হইল, দুই পায়ে কেহ যেন পাথর বাঁধিয়া দিয়াছে ! অতি কষ্টে পা টানিয়া টানিয়া সে কোন মতে তাহার গতিশক্তি বাঁচাইয়া রাখিল।

তৎপরে সে যখন বারান্দায় আসিয়া ঘড়ি দেখিল, তখন বারটা বাজিতে দশ মিনিট বাকি। আর দেরি করা চলে না ! দেহের এই নিরবলম্ব অবস্থায়, উপর হইতে নামিয়া পথে বাহির হইতে কত সময় লাগিবে, কে জানে !

ঘর হইতে বাহির হইতে গিয়া অমলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একবার ঘরের চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল। কী যে তাহার দেখিবার ছিল, এবং কী যে সে দেখিল, তাহা সে নিজেই বুঝিল না ! ঘর-ভরা সামগ্রী উদাস অবগাঢ় ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

অমলার ঘর হইতে সিঁড়ির পথে যাইতে মধ্যে হরমোহনের ঘর পড়ে। তথায় একবার দাঁড়াইয়া, অমলা দ্বারে মস্তক ঠেকাইয়া তাহার নিদ্রিত পিতামাতাকে প্রণাম করিল। তাহার পর নিগড়বদ্ধ বন্দীর মতো সিঁড়ির হাতল জড়াইয়া জড়াইয়া নিচে নামিয়া গেল। বাকি রহিল, সদর দরজার অর্গল খুলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়া ! অর্গলে হাত দিয়া অমলার মাথাটা ঘুরিয়া গেল,—মনে হইল, চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সে তাহার তন্দ্রাহত শক্তিকে ক্ষণকালের জন্য জাগ্রত রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কোনো প্রকারে দেহটাকে দ্বারের অপর দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেই হইবে ! তাহার পর অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না কেন ! কিন্তু দ্বারের এদিকে আর নয়,—আর নয় !

কুড়ি

রাজপথ তখন জনশূন্য, নিস্তব্ধ। পথের দুই ধারে গ্যাসের বাতি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, এবং উপরে নক্ষত্র-খচিত স্তব্ধ আকাশ আসন্ন-অভিনয়-দৃশ্যের উপর নিঃশব্দে চাহিয়া রহিয়াছে।

উপরে বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিতে লাগিল। খট্ করিয়া দ্বারের শব্দ হইল, এবং পরমুহূর্তেই অমলা ফুটপাথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। দরজাটা খোলাই থাকিয়া গেল, ভেজাইয়া দিবার কথা পর্যন্ত তাহার মনে রহিল না।

অদূরে একটা বৃহৎ মোটরকার উদ্যত হইয়া ছিল ; অমলাকে দেখিবামাত্র সবেগে ছুটিয়া আসিয়া অমলার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণস্বরে অমলা চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে ?—কে তুমি ?"

"আমি বিজয়নাথ !"

"আমাকে ধর ! তুলে নাও !"

মুহূর্তের মধ্যে বিজয়নাথ নামিয়া আসিয়া, বাহু-বন্ধনে অমলাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, মোটরকারে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া লইল।

পথের অপর দিকে একটা সেকেণ্ডক্লাস বন্ধ গাড়ী হইতে প্রমথ লাফাইয়া পড়িয়া

মোটরের নিকট ছুটিয়া আসিল।

"অমলা! অমলা! আমি এখানে!"

কিন্তু তখন মোটর চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

প্রমথকে দেখিয়া মুখ বাহির করিয়া বিজয়নাথ উচ্চ স্বরে বলিল, "বন্ধু, সুবিধামতো আমার সঙ্গে দেখা ক'রো, কথা আছে।"

তাহার পর ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, অমলা অচৈতন্য সংজ্ঞাহীন হইয়া নত মস্তকে সীটের পার্শ্বে হেলিয়া রহিয়াছে। দুই হস্তে তাড়াতাড়ি তাহার মস্তক তুলিয়া লইয়া নিজ বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বিজয়নাথ বলিল, "অমলা! অমলা! কী করছ?—শক্ত হও।"

সম্ভবতঃ অমলা বিজয়নাথের ডাক শুনিতে পাইল। তাহা ছাড়া, তাহার মুখে-চক্ষে নিশীথের শীতল বায়ুও সবেগে লাগিতেছিল,—সে ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিল!

বিজয়নাথ তেমনি বক্ষের উপর অমলার মস্তক ধরিয়া রাখিয়া তাহার মুখের উপর গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "শান্ত হও! আর ভয় কী?"

কোনও কথা না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া অমলা বিজয়নাথের বক্ষের উপর পড়িয়া রহিল।

অনতিবিলম্বে মোটর একটা বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকার গাড়ি-বারান্দায় প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ মনে পড়িল, অমলা দেখিল, এ তাহার বউবাজারের শ্বশুরালয় নহে।

গাড়ি-বারান্দার সম্মুখে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া একজন পুরুষমানুষ এবং একজন স্ত্রীলোক অপেক্ষা করিতেছিল।

বিজয়নাথ গাড়ির ভিতর হইতে বলিল, "দিদি, তুমি এসে ধ'রে নিয়ে যাও।"

এ কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না; কারণ, বিনোদিনী আপনিই নামিয়া আসিতেছিল। গাড়ির দ্বার খুলিয়া অমলাকে হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া বিনোদিনী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "এস, ভাই, এস। চিনতে পারছ না? তোমার দিদির বাড়ি। এসেছিলে তো দুবার।"

অমলা বুঝিতে পারিয়া নত হইয়া দুই হস্তে বিনোদিনীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল।

বিনোদিনীর স্বামী ব্রজবিলাস সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া প্রফুল্লমুখে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছিল। অমলা নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতেই, তাহার পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া সে বলিল, "সাবাশ! সাবাশ! তোমার মতো তেজী আর দু'চারটি মেয়ে বাংলাদেশে থাকলে, এই বিজয়ের মতো সম্বন্ধীরা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়! তোমার চিঠি প'ড়ে আমি যে আজ কত খুশী হয়েছি, তা বলতে পারি নে! এই রকমই তো চাই! আমি তোমাকে সসম্মানে আমার বাড়িতে আহ্বান করছি! আজ সন্ধ্যা থেকে আমি নিজের হাতে তোমার ঘর সাজিয়েছি। এসো!"

ব্রজবিলাসের কথা শুনিয়া অমলার চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; বিজয়নাথের চক্ষুও সজল হইয়া আসিল।

যৌতুক

এক

রায়চৌধুরীদের এবং চাটুয্যেদের বাড়ির মধ্যবর্তী বিঘা দেড়েক খোলা জমির স্বত্ব নিয়ে বহুকাল হ'তে উভয় পরিবারের মধ্যে একটা বিবাদ প্রচলিত ছিল। রায়চৌধুরীরা ও অঞ্চলের বহু পুরাতন জমিদার বংশ। পল্লীগ্রামের পক্ষে দেড় বিঘা জমি এমন কিছু মূল্যবান বস্তু নয়, কিন্তু বিবাদটার মূলে একটা আক্রোশ-অপমানের প্রবল হেতু বর্তমান ছিল ব'লে কুলকাঠের আগুনের মতো সেটা সহজে নির্বাপিত হচ্ছিল না।

চব্বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই বিবাদটার উৎপত্তি হয় একটা বিবাহ-প্রস্তাবের চুক্তি-ভঙ্গ নিয়ে। রায়চৌধুরীদের একটি মেয়ের সহিত চাটুয্যে পরিবারের একটি ছেলের বিবাহের কথা প্রায় স্থির হ'য়ে এসেছিল; বিবাহের দিন পর্যন্ত কতকটা নির্ণীত হয়ে গিয়েছে, এমন সময়ে রায়চৌধুরী বংশের তদানীন্তন কর্তা বৃদ্ধ বিজয়শঙ্কর তীর্থপর্যটনের পর গৃহে পদার্পণ করবামাত্র একান্ত অবলীলার সহিত কথাটা ভেঙে দিলেন। আত্মীয়-পরিজনের কাছে বিজয়শঙ্কর বললেন, (বোধহয় কতকটা পরিহাসেরই সহিত বলেছিলেন) হ'লেই বা ছেলের বাপ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, শেষ পর্যন্ত সাধারণ লোক ছাড়া আর কিছুই নয় তো; রায়চৌধুরীদের মেয়ের সঙ্গে চাটুয্যেদের ছেলের বিবাহ হ'লে কৌলিক আচারে সিংহ-ছাগ দোষ হয়। এ রকম বিবাহ কিছুতেই সুখের হয় না।

কথাটা অবিকৃতভাবে, শুধু চাটুয্যেদের কর্ণেই নয়, সমস্ত গ্রামবাসীদের কর্ণে প্রবেশ করলে। সকলের কাছে চাটুয্যেদের মাথা হেঁট হলো; কিন্তু অপমানটা তারা নির্বিবাদে পরিপাক করলে না, প্রতিবেশীদের কাছে বললে, কৌলিক আচারে দোষ হয় বটে, কিন্তু সে তো সিংহ-ছাগ দোষ নয়: সিংহ হ'লে হয়তো সেই দোষই হতো, কিন্তু এ যে সিংহের চামড়া মোড়া গর্দভের ব্যাপার, আওয়াজেই তা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে ছাগ-গর্দভের দোষ। এরূপ অবস্থায় সত্যই বিবাহ হ'তে পারে না। গর্দভদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া ছাগদেরও পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়।

কথাটা যথাস্থানে উপনীত হ'তে কিছুমাত্র বিলম্ব হলো না। ইতর চাকুরিজীবীর স্পর্ধার প্রকাশে অভিজাত জমিদার রক্তে রোষ ও বিরক্তি আগুন ধরিয়ে দিলে। সেই দিনই উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হলো এবং গভীর রাত্রে রায়চৌধুরী এবং চাটুয্যে পরিবারদ্বয়ের আমলা এবং পরিচারকবর্গের মধ্যে ছোটখাটো এক দফা দাঙ্গা হ'য়ে গেল। বহুদিন ধ'রে বিবাদটা নানাভাবে এবং নানাদিকে প্রকাশ পেয়ে অবশেষে দুই বাটির মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডের মধ্যে মৌরসী বাসা বাঁধলে। এই ভূমিকে উপলক্ষ ক'রে সর্বদাই ছলে-ছুতায় বচসা, বিবাদ, গালিগালাজ এমন কি লাঠালাঠি বাধতে লাগল, কিন্তু প্রকৃত অভিপ্রায়টা ভূমি নয়, পরন্তু বিবাদ ব'লে

কোনও পক্ষই বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেনি। কালক্ষয়ের প্রভাবে এই দেড় বিঘা জমির উপরও বিবাদটা ক্রমশঃ বিশীর্ণ হ'য়ে এসেছিল, এমন সময়ে একটা ঘটনায় ব্যাপারটা হঠাৎ সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়াবার উপক্রম করলে।

রায়চৌধুরী বংশের বর্তমান জমিদার উমাশঙ্কর সাধারণত তাঁর কলিকাতার গৃহেই বাস করেন। মাতৃহারা একমাত্র সন্তান সুধীরা স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী। কিছুদিন থেকে উমাশঙ্কর বাত রোগে পঙ্গু হ'য়ে অতিকষ্টে দিনযাপন করছিলেন। উপস্থিত একটু ভালো আছেন, নিজ শক্তির সাহায্যে চ'লে ফিরে বেড়াবার অবস্থা এখনও প্রত্যাবর্তন করেনি, এমন সময়ে দেশের বাটি থেকে পুরাতন আমলা কানাই হালদার এসে উপস্থিত হলো। প্রাতঃকালে চা পানের পর চাকাওয়ালা চেয়ারের উপর বসে শয্যা থেকে বারান্দায় এসে উমাশঙ্কর সংবাদপত্র পাঠ করছিলেন, এমন সময় কানাই এসে কাছে দাঁড়াল।

কানাইয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে উমাশঙ্কর বললেন, "কাল রাত্রে আপনি এসেছেন তা আমি শুনেছি, কিন্তু হঠাৎ আবার এর মধ্যে এলেন কেন? বিশেষ দরকারী কোনও খবর আছে না-কি?"

কানাই বললে, "আজ্ঞে, আছে।"

"কী খবর? ওই বেঞ্চটায় বসুন।"

নিকটে একটা চওড়া বেঞ্চ ছিল, উপবেশন ক'রে কানাই বললে, "বড় পুকুরের দক্ষিণ দিকের জমিটা নিয়ে চাটুয্যেরা আবার শয়তানি আরম্ভ করেছে।"

কানাইয়ের কথায় বিস্মিত হ'য়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে উমাশঙ্কর বললেন, "এতদিন চুপচাপ থেকে আবার কী শয়তানি আরম্ভ করলে?"

কানাই বললে, "এবারকার শয়তানিটা একটু বেয়াড়া রকমের, লাঠি-সোটার মধ্যে ঠিক আসে না, তাই একটু বিপদে পড়া গেছে। দিন দশ বারো হলো বিনোদ চাটুয্যের মেজ ছেলে বীরেন চাটুয্যে পলতাডাঙায় গিয়ে বাস আরম্ভ করেছে। রোজ সন্ধ্যাবেলা একখানা ডেক-চেয়ার নিজের হাতে ক'রে নিয়ে গিয়ে বকুল গাছের তলায় বসে। রাত নটা সাড়ে নটা পর্যন্ত চুপচাপ নিঃশব্দে সেখানে প'ড়ে থাকে, তারপর নিজেই চেয়ারটা মুড়ে নিয়ে বাড়ি চ'লে যায়। নিজের একটা চাকর-বাকরকেও জমি মাড়াতে দেয় না, কাজেই দাঙ্গা করতে হ'লে শুধু তার সঙ্গেই করতে হয়।"

উমাশঙ্কর বললেন, "শুধু সে-ই যখন প্রতিদিন একা জমি চড়াও হ'য়ে বেদখল করবার পালা গাচ্ছে তখন শুধু তারই সঙ্গে দাঙ্গা করতে দোষ কোথায় পাচ্ছেন? বারো বৎসর ধ'রে প্রতিদিন যদি সে এই রকম ভাবে জমিতে গিয়ে ব'সে বসে দখল চালাতে থাকে, তা হ'লে কি শেষ পর্যন্ত জমি থেকে স্বত্বহারা হ'তে হবে বলেন?"

একটু ইতস্তত ভাবে কানাই বললে, "এত লোকজন রয়েছে আমাদের, একটা

তেইশ চব্বিশ বছরের ছোকরাকে ঠাণ্ডা করতে কতক্ষণ লাগে ? কিন্তু ভয় হয় বাবু। বাপ আমাদের জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ছেলেও এম-এ পাশ করেছে, শুনছি এ বৎসর ডেপুটি হবে,—তার দেহের ওপর একটা জুলুম জবরদস্তি করতে ভয় হয়।"

"প্রথমে নিষেধ করেন নি কেন ?"

কানাই বললে, "তাই কি করিনি,—তিন দিন করেছি। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা কওয়া অপমানজনক মনে করে। ভাবটা, যদি একান্তই কথাবার্তা কইতে হয় তো মালিকদের সঙ্গে, চাকরবাকরদের সঙ্গে নয়।"

উমাশঙ্কর বললেন, "বুঝলাম। কিন্তু আপাতত অন্তত তিন চার মাস তার সে সৌভাগ্য হবার কোনও সম্ভাবনা নেই ; এ পঙ্গু দেহ নিয়ে আমার পক্ষে পলতাডাঙায় যাওয়া একেবারে অসম্ভব। সুতরাং আপনারাই যা ভালো মনে হয় করুন।"

চিন্তিত হ'য়ে কানাই বললে, "তাই না-হয় করব। কিন্তু ঐটুকু তো ছেলে, ভারি বাশভারি চাল। আপনারা উপস্থিত থেকে আদেশ-পরামর্শ দিলে সাহস পেতাম।"

উমাশঙ্কর বললেন, "কিন্তু আমি তো উপস্থিত কিছুতেই যেতে পারছি নে হালদার মশাই।"

ঘরের ভিতর সুধীরা সমস্ত কথোপকথন মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, বেরিয়ে এসে বললে, "তোমার হয়ে আমাকে পাঠিয়ে দাওনা বাবা, আমি গিয়ে এর ব্যবস্থা ক'রে আসি।"

বিস্মিতকণ্ঠে উমাশঙ্কর বললেন, "সে কি মা ! তুমি ছেলেমানুষ, তুমি গিয়ে এর কী করবে ?"

সুধীরা বললে, "শুধু ছেলেমানুষ নয় বাবা, মেয়েমানুষও। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ তোমার হাতেই মানুষ। তুমি দেখো এর উচিত প্রতিকার আমি নিশ্চয় করতে পারব। তাঁর বাপ না-হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি নিজেও না-হয় তাই হবেন, কিন্তু তাই বলে তাঁর এতটা দম্ভ সহ্য করা যায় না। লোকজন নিয়ে লাঠালাঠি করার চেয়ে চেয়ার নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন আমাদের জমিতে এই রকম নিঃশব্দে বসে থাকা ঢের বেশি অপমানজনক। এ কিছুতেই উপেক্ষা করা উচিত নয় বাবা, আমাকে তুমি পাঠিয়ে দাও।"

উমাশঙ্কর বললেন, "কিন্তু আমি না গেলে একা তুমি কী করে যাবে সুধীরা ?"

সুধীরা বললে, "একা কেন বাবা ? সেখানে বাড়িতে পিসিমা রয়েছেন। এখান থেকে মোক্ষদা ঝিকে নিয়ে হালদার মহাশয়ের সঙ্গে যাব। একা বলছ কেন ?"

"তোমার পিসিমারও তো শরীর ভালো নয়।"

"কিন্তু তার সঙ্গ আর পরামর্শ তো পাব।"

এ বিষয়ে উমাশঙ্কর এবং সুধীরার মধ্যে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো, কিন্তু কিছুই স্থির হলো না। অবশেষে উমাশঙ্কর বললেন, "আচ্ছা হালদার মশায়, আপনি এখন যান। আমরা বাপ-বেটিতে পরামর্শ ক'রে যেমন হয় আপনাকে জানাব।"

"যে আজ্ঞে" ব'লে নত হ'য়ে নমস্কার ক'রে কানাই প্রস্থান করলে।

সুধীরার নিরতিশয় আগ্রহ বশত পরামর্শটা কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করলে না, কানাই হালদারের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হ'লো, এবং শেষ হ'য়েও গেল সঙ্গে সঙ্গে। ব্যাপারটা যা হলো তা খুবই সংক্ষিপ্ত, এবং পরামর্শ বললে তার যথোচিত আখ্যা দেওয়া হয় না। এক পক্ষ থেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ, এবং আর পক্ষ কর্তৃক শনৈঃ শনৈঃ সেই অনুরোধের বশীভূত হওয়া আর যাই হোক-না কেন, পরামর্শ নিশ্চয়ই নয়।

উমাশঙ্কর যখন বিপত্নীক হন তখন সুধীরার মাত্র আট বৎসর বয়স। সে আজ প্রায় এগার বার বৎসরের কথা। এই দীর্ঘকাল পিতা এবং মাতা উভয়ের স্থান গ্রহণ করে লালনপালন করবার জন্য সুধীরার প্রতি তাঁর স্নেহটা ক্রমশ এমন প্রবল মাত্রায় উপনীত হয়েছিল যে, শক্তি প্রয়োগের কালে সেই স্নেহকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার ক'রে উমাশঙ্করকে পরাভূত করতে সুধীরাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'তো না।

এ ক্ষেত্রেও হ'লো তাই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সুধীরা যখন বললে, "আমি যে তোমার ছেলে নই বাবা, আমি যে তোমার মেয়ে, এ আমাদের বংশের পক্ষে একটা মস্ত দুর্ভাগ্য। মেয়ে না হ'য়েও আমি যদি তোমার ছেলে হ'তাম তা হ'লে আজ এ মোর কর্তব্য পালন করবার জন্যে আমাকে পাঠাতে তুমি নিশ্চয় রাজি হ'তে।" তখন উমাশঙ্কর রাজি তো হ'লেনই, অধিকন্তু কন্যার মনে যে অভিমানটুকু অপসৃত করবার জন্য বললেন, "এ কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তুমি যে আমার ছেলে নও, এটা আমার দুর্ভাগ্য একথা আমি ভুলেও মনে করিনে। তুমি যে আমার ছেলের অভাবও পূর্ণ কর তা কি তুমি জান না সুধীর?" উমাশঙ্কর অনেক সময়ই সুধীরাকে সম্বোধন করতেন আ-কারটি বাদ দিয়ে। হয়ত আকার-হীন সুধীরার মধ্যে পুত্রের অভাব খানিকটা পূর্ণ হ'তো বলেই করতেন।

পিতার স্নেহ ব্যঞ্জনায় সুধীরার চক্ষু সজল হ'য়ে এল, বললে, "তা আমি জানি ব'লেই তো তোমার কাছে ছেলের মতো আব্দার করি বাবা।" এক মুহূর্ত কী চিন্তা ক'রে বললে, "তুমি একটুও চিন্তিত হয়ো না, আমি সেখানে এমন কিছুই করব না যার জন্যে আমি তোমার ছেলে নই ব'লে তোমাকে পরিতাপ করতে হবে।"

উমাশঙ্কর বললেন, 'তোমার বুদ্ধি বিবেচনার উপর সে বিশ্বাস আছে ব'লেই তো তোমাকে যেতে দিতে রাজি হ'লাম মা।"

উমাশঙ্করের কথা শুনে সুধীরা হাসতে লাগল, বললে, "শুধু আমার বুদ্ধি-বিবেচনারই উপর নির্ভর করতে হবে না বাবা। হালদার মশায় যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক, শুধু তাঁর একটু সাহসের দরকার। তোমার হ'য়ে আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তিনি সে সাহস পাবেন।"

স্থির হ'লো তিন দিন পরে পলাশডাঙায় যাওয়া হবে, এবং যথাসময়ে স্টেশনে লোক-লস্কর, পাল্কী, গোযান ইত্যাদি হাজির থাকবার জন্য আদেশ-রোকা চ'লে গেল।

দুই

পলতাভাঙ্গা যাওয়ার পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ রাখাল ঘটক এসে হাজির।

রাখাল উমাশঙ্করের দূরসম্পর্কীয় শ্যালিকার ভাশুর-পুত্র। সম্পর্কের তুলনায় এ সংসারের সহিত তার ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশি। বছর তিনেক গ্লাসগোয় একটা এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যথাসাধ্য চেষ্টা-চারিত্র ক'রেও কোনও প্রকার সুবিধা করতে না পেরে, কোথাকার একটা নাম গোত্রহীন এঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা সার্টিফিকেট জোগাড় ক'রে বছর খানেক হলো সে দেশে ফিরেছে। সার্টিফিকেটটার উপর বিলাতী শিলমোহরের ছাপ থাকলেও তার বস্তুভাগ এমনই অকিঞ্চিৎকর যে, এ পর্যন্ত চাকরির বাজারে তার দ্বারা কোনও প্রকার সুরাহা সম্ভবপর হয় নি। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে গিয়ে তিন বৎসর পরে যারা এই রকম সার্টিফিকেট নিয়ে ফিরে আসে তাদের যোগ্যতার পরিচয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট অস্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেটের সহিত আর যে সামগ্রী নিয়ে রাখাল বিলেত থেকে ফিরেছিল তা হচ্ছে পয়লা মার্কা একটা তৃতীয় শ্রেণীর চটুলতা, —যে সকল কলস জলে পূর্ণ না হ'য়ে বায়ুর দ্বারা পূর্ণ তাদেরই মতো হাল্‌কা আর খ্যান্‌খেনে। এই চটুলতা প্রকাশ পেতে পোশাকে পরিচ্ছদে, ইংরাজি ভাষার শস্তা বকুনিতে, সময়ে অসময়ে অযথা জোরে হঠাৎ শিস দিয়ে ওঠার মধ্যে হয়তো বা স্ফূর্তির প্রাবল্যে কম্পিত মোটা গলায় এক কলি ইংরাজী গান গাইতে গাইতে এক পা তুলে খানিকটা নেচে দেওয়ার অশ্লীলতায়। এই চটুলতায় কোন্ শ্রেণীর লোক মুগ্ধ হতো তা বলা সহজ না হলেও যে শ্রেণী হতো না তাদের অগ্রণীর দলে ছিল সুধীরা। ঠিক বিদ্বেষ বহন না করলেও মনে মনে সে যে রাখালের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যা আগত-প্রায়। সুধীরা তাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের বাগানে একটা বেঞ্চে ব'সে বই পড়ছিল। অনুজ্জ্বল আলোকে পড়া সবে মাত্র অসুবিধাজনক হ'তে আরম্ভ করেছে, উঠবে ভাবছে, এমন সময় রাখাল এসে উপস্থিত হলো।

বইখানা বন্ধ করে রাখালের দিকে চেয়ে সুধীরা বল্‌লে "কী, রাখাল দাদা হঠাৎ কী মনে করে?"

কুর্নিশের ভঙ্গি সহ রাখাল বল্‌লে, "তোমার কাছে একটা আবেদন পত্র নিয়ে এসেছি।"

"কিসের আবেদন?"

"শুনলাম কাল তুমি একটা expeditionএ যাচ্ছ, তোমার অধীনে ফার্স্ট লেফ্‌টেনান্ট্ হয়ে আমি সঙ্গে যেতে চাই।"

রাখালের কথা শুনে সুধীরার মুখে একটুখানি হাস্য স্ফুরিত হলো। তার মধ্যে বিরক্তিজনিত খানিকটা অংশও যে ছিল না তা নয়, বললে, "ও এমন সামান্য

ব্যাপার যে ওর জন্যে আমার লেফ্‌টেনান্টের দরকার হবে না।"

"তা হ'লে তোমার বডিগার্ড হ'য়ে যেতে চাই।"

সুধীরা বললে, "আমি রাজাও নই, রাণীও নই যে, আমার বডিগার্ডের দরকার।"

রাখালের মুখে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল; বললে, "রাজা তুমি নও তা নিশ্চয়ই কিন্তু ভবিষ্যতে কোনও ভাগ্যবান রাজার তুমি যে 'রাণী সুধীরা' হবে না তা তো বলতে পারিনে।" তারপর সুধীরার মুখভঙ্গিতে এই পরিহাস-প্রসূত কোন উৎসাহোদ্দীপক লক্ষণ দেখতে না পেয়ে বললে, "আচ্ছা, সে ভবিষ্যতের কথা না হয় ভবিষ্যতের গর্ভেই আপাতত ডোবানো থাক, এবার আমার তৃতীয় আবেদন পেশ করি।" ব'লে সুধীরার দিক থেকে যা-হয়-কিছু উত্তরের প্রত্যাশায় ক্ষণকাল তার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

সুধীরা কিন্তু রাখালের কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে বন্ধ বইটা আবার খুলে অস্পষ্ট আলোকে মাথা নিচু ক'রে অহেতুক পাতা ওল্টাতে লাগল।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে কপট কাতরতার ভঙ্গিতে রাখাল বললে, "তা হলে কি আমার তৃতীয় আবেদন না শুনেই নামঞ্জুর?"

রাখালের নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতা এবং অধ্যবসায় দেখে সুধীরা হেসে ফেললে, বললে, "অত ভনিতা করছ কেন রাখালদাদা?—যা বলবে সোজাসুজি বল না।"

রাখাল বললে, "অভয় যখন দিচ্ছ তখন সোজাসুজিই বলি। ইচ্ছে ক'রে নিয়ে যেতে যখন চাচ্ছ না তখন না-হয় একটা আপদ মনে ক'রেই নিয়ে চল না।"

সুধীরা বললে, "ক্ষেপেছ রাখালদাদা! আপদ মনে ক'রে নিয়ে গেলে বিপদে পড়তে হয় তা বুঝি তুমি জান না?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে রাখাল বললে, "সব সময়েই তা হয় না সুধীরা! এখানে যে তোমার আপদ, সেখানকার বিপদে সে তোমার সম্পদ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।" তারপর কপট খেদ এবং অভিমানের ভঙ্গিমায় বললে, "ছোটকে সব সময়েই ছোট ব'লে ঘৃণা কোরো না সুধীরা। জান তো রামচন্দ্র কাঠবিড়ালীকেও উপেক্ষা করেন নি।"

রাখালের কাতরতা প্রকাশে সুধীরার মনে একটু দয়া হলো; বললে, "না, না রাখাল দাদা, তোমাকে ছোটই বা ভাবব কেন, আর উপেক্ষাই বা করব কেন? অনর্থক সেই অজপাড়াগাঁয়ে গিয়ে কষ্ট পাবে, সেইজন্যে বলছিলাম। তা ছাড়া, আমাকে সেখানে গিয়ে কতদিন যে থাকতে হবে তাও ঠিক নেই। তুমি কাজের লোক, মিছিমিছি সেখানে কেন আটকে থাকবে তা বল?"

রাখাল বললে, "আমি আর কিছুই বলব না, স্পষ্টই যখন বুঝতে পারছি যে, যাই বলি না কেন, কিছুতেই কোনও ফল হবে না—এমন কি আমার এই আবেদনের পিছনে কোনও বড় উপরিওয়ালার সাপোর্ট (support) আছে তা বললেও যখন হবে না।"

রাখালের কথায় কৌতূহলী হ'য়ে সুধীরা বললে, "কোন্ উপরিওয়ালার সাপোর্ট আছে?"

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রাখাল বললে, "সে কথা শুনে আর লাভ কী বল?"

সুধীরা বললে, "তবু শুনিই নে কেন?"

"মেসো মশায়ের।"

"বাবার?"

"সম্পূর্ণ।"

"বাবার সঙ্গে তোমার এ বিষয়ে কথা হয়েছে?"

"সবিস্তারে।"

সুধীরা চুপ ক'রে একটু কী ভাবলে, তারপর বললে, "বাবার কথার ওপর তো আমার কোনও কথা নেই। তবে চল।"

"অগত্যা?"

রাখালের কথা শুনে সুধীরা হেসে ফেললে, মনে মনে বললে, অগত্যা—তাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে?

কিছুক্ষণ পরে উমাশঙ্করের সঙ্গে যখন কথা হলো, সুধীরা বললে, "বাবা রাখালদাদাকে আমার সঙ্গে কেন জুটিয়ে দিলে বল তো?"

উমাশঙ্কর বললে, "নাছোড়বান্দা হ'লে কী আর করি বল? পেড়াপিড়িতে নিমরাজি হ'তেই হলো।"

সবিস্ময়ে সুধীরা বললে, "নিমরাজি? তবে যে সে বললে সম্পূর্ণ রাজি হয়েছ?"

উমাশঙ্কর বললেন, "বললে কে আর তাকে আটকাচ্ছে বল। এ তো মানুষের মনের কথা, ঘটিতে ঢেলে দেখাবার উপায় তো নেই যে সম্পূর্ণ নয়, সত্যিসত্যিই নিম।" ব'লে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, "যাচ্ছে যাক। নোংরা কাজের প্রয়োজন হ'লে গালিগালাজ দিতে হ'লে রাখালের চেয়ে উপযুক্ত লোক সেখানে খুঁজে পাবে না।"

সুধীরা বললে, "কিন্তু প্রয়োজন না হ'লেও নোংরা কাজ করবেন, সেই ভয়ই তো করছি।"

"না, তা সহজে করবে না,...ও তোমাকে বেশ একটু ভয় করে।

সুধীরা আর কিছু বললে না, চুপ ক'রে রইল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আসাম মেলে কানাই হালদার, মোক্ষদা ঝি এবং রাখাল ঘটকের সহিত সে পলতাডাঙার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। আসাম মেলে নাটোর পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে মোটরে বগুড়ার পথে মাইল দশেক, এবং সেখান থেকে মাইল দুয়েক কাঁচা রাস্তা দিয়ে পাল্কী এবং গোযানে পলতাডাঙা। পলতাডাঙা হ'তে আত্রাই নদী আধ মাইলটাক উত্তরে।

গৃহে যখন তারা উপনীত হলো তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। দোতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় সুধীরাকে নিয়ে গিয়ে কানাই হালদার বললে, "ঐ দেখ, এত রাত্তেও বকুলগাছ তলায় চেয়ারে শুয়ে রয়েছে।"

কৃষ্ণ প্রতিপদের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে সুধীরা দেখলে যুক্ত পদদ্বয় প্রসারিত

ক'রে একজন যুবক ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। হাতে একটা ধূমায়িত মোটা চুরুট, মাঝে মাঝে তাতে টান দিচ্ছে। কানাইয়ের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে সুধীরা বললে, "ঐ আপনাদের বীরেন চাটুয্যে ?"

কানাই বললে, "ঐ।"

"ওর অত দম্ভ, অত প্রতাপ ?"

এ কথার কানাই কোন উত্তর দিলে না।

এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা ক'রে সুধীরা বললে, "আচ্ছা, আজ থাক্। কাল সকালে সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে সন্ধ্যাবেলা যা করবার করলেই হবে।" ব'লে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করবার জন্য প্রস্থান করলে।

তিন

সকালবেলা চা পানের পর দক্ষিণ দিকের বারান্দায় ব'সে বীরেন অভিনিবেশ সহকারে পল্ আইন্‌ৎসিগের "এক্সচেঞ্জ কণ্ট্রোল" নামক অর্থনীতি বিষয়ের পুস্তক পাঠ করছিল। "আর্বিট্রেজ অপারেশনের" দুশ্ছেদ্য জটিলতায় মনটা গভীরভাবে ব্যাপৃত রয়েছে এমন সময় রতন বাঁড়ুয্যের কন্যা প্রভা এসে উপস্থিত হলো।

উপমার ভাষা দিয়ে যদি প্রভাময়ীকে বর্ণিত করতে হয় তাহ'লে সে যেন বসন্ত সন্ধ্যার খানিকটা অনিশ্চিত দমকা হাওয়া,—হঠাৎ কখন আসে আর হঠাৎ কখন যায় তার কিছুই স্থিরতা নেই। তার বয়স যখন পনের বৎসর তখন সে একবার বাতশ্লেষ্মা বিকারে মরণাপন্ন হয়। আয়ুর কাছে হার মেনে ব্যাধি যখন বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্ককে পরিত্যাগ ক'রে গেল, তখন দেখা গেল প্রভাময়ীর প্রকৃতির মধ্যে সে একটা স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে—এমন একটু উচ্ছলতা অস্থিরতা যার অস্তিত্ব রোগের পূর্বে কোনও দিনই দেখা যায় নি। সে-ও হলো আজ প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে উপশমের কিছুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ায় প্রভাময়ীর প্রকৃতির এই চপলতাকে লোকে ক্রমশঃ মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রথম অবস্থা ব'লে স্থির ক'রে নিয়েছে। এই রকম একটা অপবাদের জনশ্রুতি থাক্‌লে কন্যার বিবাহ দেওয়া, বিশেষত রতন বাড়ুয্যের মতো অর্থ হীন এবং সামর্থ্যহীন অলস পিতার পক্ষে কী রকম কঠিন ব্যাপার সে কথা না বললেও চলে। তা ছাড়া, সংসারে আপনার জন বলতে রতনলালের এই মেয়েটি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেউ নেই। গৃহিণী অনেক দিন হলো গত হয়েছেন, এবং একমাত্র পুত্র রামলাল এমন হুঁশিয়ার ব্যক্তি যে, উপার্জনহীন বৃদ্ধ পিতা এবং অনূঢ়া বয়স্থা ভগ্নী জীবনযাত্রার পথে শুধু অনাবশ্যকই নয় পরন্তু গুরুভার বস্তু বিবেচনায় পত্নীসহ সে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সেখানকার আর্থিক অবস্থা এরূপ যে খানিকটা কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে এবং খানিকটা তুষ্টিসাধনের সহায়তায় দুটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করা খুব কঠিন নয়।

এই সকল কারণে কুড়ি বৎসর বয়সেও পলাশডাঙার মতো পল্লী গ্রামেও প্রভার বিবাহ হ'য়ে ওঠেনি। তা ছাড়া, অন্ধের একমাত্র যষ্টি অপসৃত হ'লে পথ চলার কী উপায় হবে তার দুশ্চিন্তা রতনলালের গোপন মনে বোধ করি এই কর্তব্য বিচ্যুতি অপরাধের একটা কৈফিয়ৎ স্বরূপ বর্তমান ছিল।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বীরেনের পিছন দিকে উপস্থিত হ'য়ে প্রভা ডাক দিলে, "বীরুদা!"

পুস্তকের মার্জিনে পেন্সিল দিয়ে নিবিষ্ট মনে নোট লিখতে লিখতে অবনত মুখে বীরেন বললে, "কী বল?"

"আমি এলাম।"

তেমনি অবনত মুখেই বীরেন বললে, "বেশ করলে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে মিনিট পাচেক একটু চুপ ক'রে বোসো।"

"বসবার আমার সময় নেই।"

"তা হ'লে দাঁড়াও।"

"দাঁড়াবারও সময় নেই।"

অগত্যা বইটা বন্ধ ক'রে টেবিলের উপর রেখে প্রভার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বীরেন বললে, "তা হ'লে কী বলবে বল।"

এবার চেয়ারখানা বীরেনের কাছে টেনে নিয়ে উপবেশন ক'রে প্রভা বললে, "জমিদার বাড়ির টাটকা খবর কিছু জান?"

মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "না। তুমি না বললে কেমন ক'রে জানব?"

প্রভাময়ীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল; বললে, "কী আশ্চর্য! আমি ছাড়া কি তোমার আর কেউ বলবার নেই?"

প্রসন্নস্মিতমুখে বীরেন বললে, "নেই, তা' তো তুমি নিজেই জান প্রভা। তোমাদের জমিদার বাড়ির গোপন খবর জানবার আর আমাকে জানাবার তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বল? আমার নামে জমিদারের কাছে নালিশ করতে কানাই হালদার কলকাতায় গিয়েছে, সে খবরও তো তুমিই আমাকে দিয়েছিলে।"

প্রভা বললে, "কানাই হালদার কাল সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে,—কিন্তু একা নয়।"

বিস্মিত কণ্ঠে বীরেন বললে, "একা নয়? সঙ্গে গুণ্ডা নিয়ে এসেছে না-কি?"

বীরেনের কথা শুনে প্রভা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল; বললে, "গুণ্ডাই বটে। তবে, এ গুণ্ডার মাথায় খোঁপা, হাতে চুড়ি, পরণে শাড়ি।"

শুনে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বীরেন বললে, "সর্বনাশ! তোমার বিবরণ শুনে প্রাণে যে কাঁপুনি ধরে গেল! এ-ও তো গুণ্ডাই দেখছি! দেহে হানা না দিয়ে এ একেবারে মনের মধ্যে হানা দেবে!"

বিরক্তি ও বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে প্রভা বললে, "মনের মধ্যে হানা দেবে বলছ?"

"দেবে না?—মাথায় খোঁপা, হাতে চুড়ি, পরণে শাড়ি যদি চুল ছাঁটা, গায়ে

পাঞ্জাবী, পরণে ধুতির মনে হানা না দেয় তো কে দেবে শুনি ?"

"ওমা ! তা হ'লে তোমার স্বভাব তো ভাল নয় দেখছি।"

প্রভার কথা শুনে বীরেন উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বললে, "আমার স্বভাব যে ভালো নয়, তা কি তুমি আজ দেখছ প্রভা ?"

বীরেনের মন্তব্যে প্রভা একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। তীক্ষ্ণ খন্‌খনে কণ্ঠে বললে, "মিথ্যে অপবাদ দিয়োনা বলছি। তুমি আমার ওপর কী অন্যায় ব্যবহার করেছ শুনি, যাতে তোমার স্বভাব ভালো নয়, এর আগে আমি দেখেছি ?"

অপ্রতিভ হ'য়ে বীরেন ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "না, না প্রভা, আমি কি তোমার মতো লক্ষ্মীমেয়ের উপর অন্যায় ব্যবহার করতে পারি ? ---ও মিছিমিছি বলছিলাম।"

বীরেনের অনুতাপ প্রকাশে প্রভা খানিকটা নরম হ'লো বটে, কিন্তু তবুও গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে বল্‌তে লাগল, "মিছিমিছিই বা বলবে কেন ? একে তো যখন-তখন তোমার কাছে আসি ব'লে লোকে কত কথা শোনায়—তার ওপর তুমি যদি নিজেই বল যে তোমাব স্বভাব ভালো নয়, তা হ'লে ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়ায় বল দেখি ?"

মুখের মধ্যে একটা কপট গাম্ভীর্যের রেখাপাত ক'রে বীরেন বললে, "খুবই খারাপ দাঁড়ায়। কিন্তু তুমি যখন-তখন আমার কাছে আস ব'লে লোকে তোমাকে কী বলে প্রভা ?"

প্রভার মুখের উপর একটা ক্ষীণ বক্রিম আভা দেখা দিলে; বললে, "তা-ও শুনতে হবে না-কি ?"

মুখে অঞ্চল চাপা দিয়ে বীরেনের প্রতি পুলককুঞ্চিত কটাক্ষপাত করে প্রভা বললে, "বলে, আমি তোমার কাছে আসি ঘটকালি করবার জন্যে।"

বিস্ময়বিমূঢ়কণ্ঠে বীরেন বললে, "ঘটকালি করবার জন্যে ? কার ঘটকালি প্রভা ?"

"আমার নিজের গো !" ব'লে প্রভা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

"উত্তরে তুমি কী বল ?"

"উত্তরে ?—উত্তরে আমি ব'লি পাগল বলে সত্যিসত্যিই তো আমি এমন পাগল নই যে বীরুদার সঙ্গে নিজের ঘটকালি করতে যাব।"

অসন্তোষসূচক মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "না, ও-রকম কথা ব'লে নিজেকে খাটো কোরো না, আর আমাকেও অযথা বাড়িয়ে তুলোনা,—অন্য কথা বোলো।"

"কী কথা বলব তবে ?" সবিস্ময়ে প্রভা জিজ্ঞাসা করলে।

বীরেন বললে, "কী কথা বলবে, তা ভেবে-চিন্তে তোমাকে আমি অন্য সময়ে বলব অখন। এখন জমিদার বাড়ির কী খবর বল ? কানাই হালদার কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে ?"

প্রভা বললে, "জমিদারের মেয়ে সুধীরাকে, আর রাখাল নামে আর একটা লোককে।"

"এই রাখাল লোকটি কে? জমিদারের ভাবী জামাই?"

সজোরে মাথা নেড়ে প্রভা বললে, "না গো না! রাখাল হচ্ছে সুধীরার দূর সম্পর্কের দাদা।"

বীরেন বললে, "তা হবে। কিন্তু অনেক সময়েই বড় লোকদের বাড়ির এই দূর সম্পর্কের দাদারা পরে নিকট সম্পর্কের স্বামী হয়, তা জান?"

প্রভা বললে, "তা আমি জানিনে। কিন্তু তুমি একটু সাবধানে থেকো বীরুদা; ওই রাখাল লোকটাকে আমার ভারি ভয় করে।"

মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "রাখালকে তেমন ভয় করিনে প্রভা,—হাজার হোক সে পুরুষ মানুষ, তাকে কতকটা বুঝি। বড় জোর সে না হয় লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসবে। কিন্তু সত্যি ভয় করি তোমার ওই সুধীরাকে। মেয়ে-মানুষ, বিশেষত বিয়ে হ'য়ে যে মেয়েমানুষের মুখে লাগাম পড়ে নি, সে যে কি বিষম উৎপাত তা তুমি একটুও জান না। যে-সব প্রাণী হেরে কাঁদে আর কেঁদে জেতে, তাদের কী ক'রে হারাতে হয় তা আমি একেবারেই বুঝিনে।"

প্রভা বললে, "তোমার এ-সব কথাও আমি ঠিক বুঝিনে বীরুদা, কিন্তু মোট কথা, তুমি একটু সাবধানে থেকো। রাখাল লোক ভালো নয়।"

"কী করে জানলে? তুমি আজ তোমাদের মন্দাকিনী পিসীর কাছে গিয়েছিলে না-কি?"

"আজ নয়, কাল সন্ধ্যার পর গিয়েছিলাম। তার একটু আগে ওরা এসেছে। তুমি তখনও বকুল গাছ তলায় চেয়ারে ব'সে আছ। জানালা দিয়ে রাখাল তোমাকে দেখে এসে বললে, 'আচ্ছা আজকের দিনটা যাদুমনি থাকুন, কাল একেবারে চেয়ার শুদ্ধ তুলে পুকুরে ফেলে দেবো।' শোন কথা!"

বীরেন বললে, "কথা শুনে রাখালকে তো খানিকটা বোঝা গেল, কিন্তু সুধীরাকে একটুও বুঝতে পারছিনে। সে আমাকে কোথায় ফেলে দেবে?— একেবারে আত্রাই নদীর গর্ভে না-কি? তুমি তাকে কিছু বুঝলে কি-না বল।"

প্রভা বল্লে, "সুধীরাকে তো এই নতুন দেখছিনে, অনেকবারই দেখেছি। আর যাই হোক, সে যে রাখালের মতো অভদ্র হবে না তা নিশ্চয়।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বললে, "রাখালটা কী ছোটলোক জান বীরুদা? কাল রাত্রে যখন চ'লে আসছি তখন একলা পেয়ে আমাকে বলছে, এরই মধ্যে চললে কেন? আর একটু থাক না, আমি পৌঁছে দিয়ে আসব অখন।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বীরেন বললে, "তোমাকে তুমি ব'লে সম্বোধন করলে?"

প্রভা বললে, "তা তো করলেই, পরে যা করলে তা আরও বিশ্রী।"

"কী করলে?"

প্রভাময়ী বলতে লাগল, "আমি যখন বললাম যে, এ গ্রামের পথ-ঘাটে আমাকে কারও এগিয়ে দেবার দরকার হয় না, তা যত রাত্রিই হোক না কেন, তখনি বললে, 'তা না হ'লেও ঐ ছল করে তোমার বাড়িটা তো আমার দেখা হয়ে থাকত।'

ব'লে নিঃশব্দে এমন একটা কুৎসিত হাসি হাসলে যা মনে ক'রে এখনও আমার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করছে! ওরা মনে করে বীরুদা, ওরা জমিদার পক্ষের লোক ব'লে আমাদের মতো গরিব লোকদেব ওপর ওরা যা খুশি তাই দুর্ব্যবহার করতে পারে।"

প্রভাময়ীর কথা শুনে বীরেনের সমস্ত অন্তরটা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে অবস্থান ক'রে সে বললে, "আচ্ছা, এর শাস্তি আমার হাত থেকে শীঘ্রই হয়তো সে পাবে, কিন্তু ও হতভাগা গ্রামে থাকতে তুমি আর জমিদার বাড়ি যেয়ো না প্রভা।"

সহাস্যমুখে প্রভা বললে, "তা কী ক'রে হবে বীরুদা? তোমার বিষয়ে খবর নেবার জন্যে আমাকে দিনে অন্তত একবার ক'রে জমিদার বাড়ি যেতেই হবে। কিন্তু তুমি ভয় ক'রো না একটুও,—সাধ্য কী রাখালের আমার কোনও অনিষ্ট করে, বিশেষত ও বাড়িতে যতক্ষণ মন্দাকিনী পিসি আছেন।" ব'লে আর বীরেনের কথার জন্য অপেক্ষা না ক'রে ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান করলে।

চার

এই মন্দাকিনী পিসী সুধীরার পূর্বোক্ত মেজ পিসীমা। এঁরই সহিত বছর পঁচিশেক পূর্বে বীরেনের পিতা বিনোদবিহারীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছিল। কিন্তু কী কারণে সে সম্বন্ধ চৌধুরী বংশের তদানীন্তন কর্তা বিজয়শঙ্কর অর্থাৎ উমাশঙ্করের জ্যেষ্ঠতাত, নাকচ ক'রে দিয়েছিলেন, সে কথা এই আখ্যায়িকার সূত্রপাতেই কথিত হ'য়েছে। ব্যাপারটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু কৌলিক প্রশ্নের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। একটা ফৌজদারী মকর্দমায় বীরেনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ পিতামহ ফরিয়াদি বিজয়শঙ্করকে অসঙ্গতভাবে সাহায্য করতে স্বীকৃত না হওয়ায় বিজয়শঙ্করের মনের মধ্যে একটা আক্রোশ বর্তমান ছিল। বাহিরের লোক অবশ্য একথা কিছুই অবগত ছিল না, সেজন্য তারা বিজয়শঙ্করের কৌলিক মর্যাদা বিষয়ে অত্যধিক নিষ্ঠা দেখে একটু বিস্মিত হয়েছিল।

বিনোদবিহারীর সহিত সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েই বিজয়শঙ্কব পলতাডাঙা হ'তে ক্রোশ দশেক দূরবর্তী চণ্ডীতলা গ্রামের এক জমিদার-পুত্রের সহিত মন্দাকিনীর বিবাহ স্থির ক'রে ফেললেন। বিবাহের পর স্বামীগৃহে উপনীত হ'য়ে মন্দাকিনীর বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, এই বিবাহের দ্বারা চৌধুরী বংশের আভিজাত্য যদি বা একান্তই রক্ষিত হ'য়ে থাকে তো দুশ্চরিত্র মদ্যপ স্বামীর যূপকাষ্ঠে তাঁকে নিবেদিত ক'রেই তা হয়েছে।

সে যাই হোক, কোথাকার কোনও একটা স্থূল বিচারবোধের অনুগ্রহেই বোধকরি, মন্দাকিনীকে তাঁর গ্লানিকর সধবা-জীবনের সৌভাগ্য বেশিদিন বহন করতে হয়নি; নিঃসন্তান বৈধব্যের পরম সম্পদ মাথা পেতে নিয়ে চরিত্রহীন দেবরের অবৈধ আচরণে উত্যক্ত হ'য়ে তিনি একদিন পলতাডাঙার জমিদারগৃহে ফিরে এলেন। সেই যে প্রবেশ করলেন, তারপর একদিনেরও জন্য সে গৃহ হতে নির্গত

হননি ; এমন কি চিকিৎসার্থে কলিকাতা যাবার জন্য উমাশঙ্করের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও নয়। এই দুরপনেয় একগুঁয়েমির মূলে বোধ হয় সেই দলের উপর একটা দুশ্ছেদ্য অভিমান ছিল, যে দল শুধু তাদের কুলমর্যাদার দিকেই দৃষ্টি রেখেছিল, একটি অসহায়া কুলকন্যার ব্যক্তিগত শুভাশুভের প্রতি রাখেনি।

প্রভা চ'লে যাওয়ার পর 'আরবিট্রেজ' সমস্যার মোহ গেল কেটে, 'এক্স্‌চেঞ্জ্‌ কন্‌ট্রোলে'র বন্ধ করা পাতা আর খুলতে ইচ্ছা হলো না। বই, খাতা, পেন্সিল টেবিলের দেরাজের মধ্যে পুরে বীরেন দ্বিতলের বারান্দায় উপস্থিত হলো। উত্তরের বারান্দা থেকে চৌধুরীবাড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। বীরেনদের বাড়ির কিছু উত্তরেই বিবাদী জমি, তার উত্তরে চৌধুরীদের বিখ্যাত রুইপুকুর, এবং পুষ্করিণীর অপর পারে আর কিছু দূরে জমিদারদের সুবৃহৎ অট্টালিকা।

রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হলো চৌধুরী বাড়ির দ্বিতলের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শয়ন ক'রে একটি তরুণী বই পড়ছে। সে-ই বোধ হয় সুধীরা। আর এক ব্যক্তি চঞ্চলভাবে চেয়ারের আশে-পাশে ইতস্তত বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। সে নিশ্চয় রাখাল।

রাখালকে বীরেন ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি, কিন্তু সুধীরা তার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। বৎসর দুই পূর্বে কলিকাতার কয়েকটি কলেজের ছাত্রছাত্রী কর্তৃক অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় সুধীরা চৌধুরী প্রবন্ধ পাঠ করেছিল। প্রবন্ধের মধ্যে রচনা-শক্তির অসংশয়িত প্রমাণ লাভ ক'রে বীরেন খুশি হয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু সুন্দরী কিশোরী রচয়িত্রীর অপরূপ মূর্তি এবং সুমধুর কণ্ঠস্বর যে তন্মধ্যে অনেকখানি মাধুর্যের সঞ্চার করেছিল সে বিষয়েও সন্দেহ ছিল না। বীরেন তখন জানত না যে সুধীরা চৌধুরী তাদের গ্রামের জমিদার-দুহিতা সুধীরা রায়চৌধুরী। জানলে হয়তো অতটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সে করত না, আলোচনায় আহূত হ'য়ে যতটা সেদিন করেছিল ; হয়তো বা আলোচনা থেকে একেবারে নিরস্তই থাকত।

পরিচয় জানবার একটা আগ্রহ ছিল ব'লেই বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যেই একজন সহপাঠীর নিকট হ'তে পরিচয়টা জানতে পারলে। জেনে কিন্তু মনটা দমে গেল। মনে হলো, শীতল বলিয়া ও চাঁদে সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি! পুরাতন বংশবিদ্বেষের স্মৃতিটা আবার নূতন ক'রে আলোড়িত হ'য়ে মনটাকে ঘুলিয়ে দিলে।

আজ কিন্তু দীর্ঘকাল পরে দূর থেকে সুধীরার অস্পষ্ট আকৃতি দেখে স্পষ্ট মনে পড়ে গেল সেই সাহিত্য-সভার দিনের তার প্রশংসাবিমূঢ় মুখের শোভা,—আনন্দে আরক্ত, কিন্তু সঙ্কোচে বিহ্বল,—মনে প'ড়ে গেল বীরেনের প্রতি তার চকিত-কৃতজ্ঞ চক্ষের কয়েকবারের ঘনঘন দৃষ্টিপাত এবং ঘনঘন দৃষ্টি নত করা। মোহ সেদিন হ'য়েছিল তা অস্বীকার করা চলে না, এবং একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, পরিচয় অবগতির পর সে মোহের প্রায় সবটাই কেটেও গিয়েছিল। কিন্তু আজ যখন এই উপলব্ধি মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হল যে, একটা আসন্ন সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে দুরতিক্রম্য বংশবিদ্বেষগত ব্যবধানটা সহসা বিলুপ্ত হবার উপক্রম করেছে, তা সে

বিলুপ্তির যথার্থ মূল্য যাই না কেন, তখন মনের এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যলোকে নূতন ক'রে একটা মোহ উৎপন্ন হলো। মনে হল সংঘর্ষ তা হ'ল মিলনেরই রুদ্রমূর্তি, বিরোধ তা হলে বৈরাগ্য নয়।

রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে বীরেন সকৌতুক চিত্তে তার একটি মাত্র দিবসের চিত্তজয়িনীকে জয় করবার উপায় নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হলো। আসন্ন বৈরাচরণের কথা মনে হ'তেই মনের মধ্যে কেমন ক'রে কোথা দিয়ে একটা করুণার অনুভূতি জেগে উঠল। মনে হলো, সংগ্রামে যখন অবতরণ করতে হচ্ছে তখন আঘাত দিতেই হবে, কিন্তু সংগ্রামের কোনও অবস্থাতেই তা যেন অযথা কঠোর না হয়। সুকুমার শিকারকে ব্যাধের জাল যেন আবদ্ধই করে, আহত না করে। এ কথা তাকে সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে, এ পর্যন্ত সে শুধু বিদ্যালয়ের সব কটা পরীক্ষাই খ্যাতির সহিত পাশ ক'রে আসেনি, মোহনবাগান ক্লাবের একজন শ্রেষ্ঠ ফুটবল, হকি ও টেনিস খেলোয়াড়রূপে সব খেলাতেই সে প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের নীতি অনুসরণ ক'রে এসেছে। সুতরাং, জয়-পরাজয় যে একই মালার দু'টি ফুল, এ কথা তার কোনও সময়েই ভুললে চলবে না।

বৈশাখের রৌদ্র প্রখর হ'য়ে উঠেছে। বিবাদী জমির বকুল গাছের উপর একটা দোয়েল বহুক্ষণ ধ'রে শিস দিচ্ছিল। অদূরে নোনা বনে গোটা দুই হাঁড়িচাচা পাখি ঝপ্ ঝপ্ ক'রে এ গাছ থেকে ও গাছ উড়ে বেড়াচ্ছে। বাড়ির কাছেই একটা কলমের আমগাছে কড়াই বেরিয়েছে, কিন্তু তখনও সমস্ত মঞ্জরী ঝ'রে পড়েনি ব'লে শাখায় শাখায় মৌমাছির ভন্‌ভনানি। বীরেন তার চিন্তাস্বপ্ন থেকে জাগ্রত হ'য়ে নিচে নেমে এল।

রান্নাঘরে উপস্থিত হ'য়ে সে পাচককে জিজ্ঞাসা করলে, বামনঠাকুর, রান্নার কত দেরি ?"

পাচকের নাম হরিরাম চক্রবর্তী। নিবাস বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মহকুমায়। হরিরাম গত দশ বৎসর চাটুজ্যে পরিবারে পাচকের কাজ করছে। অধ্যয়ন কালে বীরেন যখন কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাসা ক'রে বাস করত, তখন হরিরামই বরাবর তথায় পাচকের কার্যে নিযুক্ত ছিল। এখনও বীরেন একাকী কোথাও গেলে সে-ই তার সঙ্গে যায়।

হরিরাম বললে, "আর দেরি নেই দাদাবাবু, আপনি চান করতে করতে রান্না শেষ হ'য়ে যাবে।"

বীরেন বললে, "আচ্ছা, আমি তা হ'লে স্নান করতে চললাম।" মনে মনে বললে, সকাল সকাল আহার সেরে দিব্যি একটা নিদ্রা দেওয়া, নিদ্রাভঙ্গে বৈকালিক চা-পান শেষ ক'রে মোটা একটি চুরুট ধরানো, তারপর ডেক্-চেয়ারটি মুড়ে নিয়ে বকুলতলায় অবতীর্ণ হ'য়ে যুদ্ধ ঘোষণা করা। তারপর হার জিত,—সে রইল ভাগ্যদেবীর অঙ্কুলে বাঁধা। হারলেও যেখানে জিত, জিতলেও যেখানে হার, সেখানে কোন্ মূর্খ হার জিত নিয়ে মাথা ঘামায়।

"গণ্‌শা!"

প্রবল চিৎকারে সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠ্‌ল। অদূরে শ্রীমান গণেশ মনের সুখে বৃহৎ তাম্রকূট সেবনে নিযুক্ত ছিল, প্রভুর হুঙ্কার শুনে কলকে ফেলে ছুটে এল।

"দাদাবাবু!"

"স্নানঘর্‌ ঠিক?"

"ঠিক দাদাবাবু!"

"অল্‌ রাইট্‌! থ্যাঙ্ক ইউ গণেশ!"

ইংরাজি কথার বুকনি শুনে কথোপকথন সাঙ্গ হয়েছে মনে ক'রে গণেশ পরিত্যক্ত কলকের দিকে পা চালিয়েছিল, এমন সময়ে বীরেন পুনরায় ডাক দিলে, গন্‌শা!"

একটু অপ্রসন্ন চিত্তে ফিরে এসে গণেশ বললে, "দাদাবাবু!"

"তোর শুঁড় গেল কোথায়?"

সবিস্ময়ে গণেশ বললে, "শুঁড়?"

"শুঁড়?"

"শুঁড় কোথায় পাব গো? শুঁড় ছিল না-কি যে যাবে?"

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে বীরেন বললে, "না গেলেই যদি না থাকে, তা হ'লে নেই কেন শুনি?"

গণেশের মুখমণ্ডলে উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখা দিলে; বললে, "এই দেখ, কথার ফের দিয়ে মাথা গুলিয়ে দেবার মতলব। ভালো করে আবার বল, বুঝে দেখি।"

বীরেন বললে, "আর বুঝে দেখতে হবে না। যা পালা, আজকে আমার সময় নেই।"

"তা আমারই আছে না-কি?" ব'লে গণেশ প্রস্থান করলে। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে দাঁড়াল; বললে, "চান্‌ করতে গেলে না যে? আবার পাছু ডাকবে না তো?"

বীরেন হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, "এঁহ্‌, ভারি তো তিথি করতে চলেছেন, যে, পাছু ডাকবে না-তো। এদিকে আয়!"

নিকটে উপস্থিত হ'য়ে গণেশ বললে, "কী বলবে বল।"

"এই সকাল বেলা তোর মুখে কিসের গন্ধ বেরুচ্ছে বল্‌।"

গণেশের মুখে বিমূঢ়তার চিহ্ন ফুটে উঠল; চুলকোতে চুলকোতে বললে, "বোধহয় নেবু পাতারই হবে।"

কষ্টে হাস্য দমন ক'রে বীরেন বল্‌লে, "নেবুপাতার গন্ধ কি মড়া-পোড়া গন্ধের মতো হয়?"

"তবে বোধ করি কম হ'য়ে থাকবে, বলতো আর কিছু পাতা চিবিয়ে আসি।"

বীরেন বললে, "ওই পাতকুয়োর ধারের বাতাবি নেবু গাছের সমস্ত পাতা মুড়িয়ে চিবোগে যা।"

"শোন কথা! তাই কখনও কোনও মনিষ্যি পারে!" ব'লে গণেশ প্রস্থান করলে। বীরেনও সহাস্যমুখে স্নানঘরে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

পাঁচ

"পিসিমা!"

অপরাহ্নে খিড়কির পুষ্করিণী থেকে স্নান ক'রে এসে মন্দাকিনী সবেমাত্র শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করেছেন, সুধীরার আহ্বান শুনে দ্বারের সমুখে এগিয়ে এসে বললেন, "আয় সুধা, ঘরের ভেতর আয়।"

মন্দাকিনীর সম্বোধন শুনে সুধীরার পরলোকগতা জননীর কথা মনে প'ড়ে গেল। পদান্তের আকারটিকে 'ধ'-র পশ্চাতে টেনে এনে তিনি সুধীরাকে সংক্ষিপ্ত ক'রে সুধা বলে ডাকতেন। মন্দাকিনী কিন্তু চিরদিনই সুধীরাকে সুধীরা ব'লেই সম্বোধন করেন; আজ হঠাৎ কী কারণে বহু-পুরাতন দিনের ডাকটি মনে পড়ল এবং সেই ডাকই অবলীলাক্রমে মুখের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল, তা তিনি নিজেও হয়তো ঠিক বুঝতে পারলেন না। আজকের সন্ধ্যাকাল কোন্ দুর্ঘটনার পথে কী ভাবে পরিণতি লাভ করবে তার দুশ্চিন্তায় সমস্ত দিন তাঁর মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ বাসা বেঁধে আছে। পাছে তার পঙ্ক কোনও প্রকারে সুধীরাকে মলিন করে সেই মাতৃজনোচিত উৎকণ্ঠাবশতই বোধকরি এই বিস্মৃতপ্রায় মাতৃ ব্যবহৃত সম্বোধনের স্বতঃপ্রকাশ।

ভয় সুধীরাকে নিয়ে তত নয়, যত রাখালকে নিয়ে। তার বচনে-আচরণে এমন একটা ইতরতার পরিচয়, যার দ্বারা রায়চৌধুরী পরিবারের আভিজাত্য খর্ব হবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। তবে এ কথাও মন্দাকিনীর কয়েকবার মনে হয়েছে যে, গত সন্ধ্যা হ'তে আজ সমস্ত দিন যে ব্যক্তি অবিরত কদর্য প্রস্তাব এবং উৎকট আস্ফালন ক'রে বেড়াচ্ছে, কার্যকালে তার বক্তৃত্ব হয়তো দেখা যাবে না। কিন্তু নির্মল ক্ষেত্রের উপর পঙ্কলেপনের জন্যে তেমন-কিছু শক্তিরও তো প্রয়োজন হয় না।

মন্দাকিনীর আহ্বানে দ্বারের দিকে খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে সুধীরা বললে, "তোমার ঘরের ভেতর ঢুকতে কিন্তু ভয় করে পিসিমা।"

সহাস্যমুখে মন্দাকিনী বললেন, "কেন, ভয় কিসের শুনি? আমার ঘরে বাঘ আছে, না ভালুক আছে?"

সুধীরা বললে, "না, সে-সব কিছু নেই। কিন্তু এমন সব ধোয়া মোছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, ভয় হয় কোথায় কী নোংরা ক'রে দেব।" বলে মৃদুস্মিতমুখে হাসতে লাগল।

এক ধমক দিয়ে মন্দাকিনী বললেন, "ঢের হয়েছে। আর ভদ্রতা করতে হবে না, ঘরে এসে বোস্।" তারপর হাসতে হাসতে সুধীরা ঘরে প্রবেশ ক'রে আসন গ্রহণ করলে বললেন, "আজ না হয় কলেজ-পড়া মেয়ে হ'য়ে খুব কায়দা ক'রে কথা

বলতে শিখেছিস্ ; কিন্তু তোর মা মারা যাওয়ার পর ক্রমান্বয়ে তিন বছর যখন আমার কাছে ছিলি, তখন আমার বিছানা যে তোর ঘর-বাড়ি ছিল সে-কথা ভুলে গিয়েছিস্ ?"

সুধীরা বললে, "একটুও ভুলিনি পিসিমা। আর, আদর-যত্নের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে মার কথা কতখানি আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিলে সে-কথাও একটু ভুলিনি। মনে হতো একজনকে হারিয়ে আর-একজনকে পেয়েছি।" মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে বললে, "পিসিমা !"

"কী মা ?"

"তুমি আজ আমাকে সুধা ব'লে ডাকলে কেন ? কোনও দিন তো আমাকে ও নামে ডাকোনি।"

এক মুহূর্ত নীরবে থেকে মন্দাকিনী বললেন, "ও নামে তোকে কে ডাকত তা জানিস্ ?"

"জানি। মা ডাকতেন।"

"তোর মা বেঁচে থাকলে আজ যে-ভাবে তোকে ডাকতেন সেই ভাবে তোকে ডাকবার দরকার আছে ব'লে হয়তো আমার মনে হয়েছিল সুধীরা।"

আবদারের সুরে সুধীরা বললে, "আর সুধীরা নয় পিসিমা, এবার থেকে তুমি আমায় সুধা ব'লেই ডেকো।"

"ভালো লাগবে ?"

"লাগবে। কিন্তু তুমি অকারণে বড্ড বেশি ভাবছ পিসিমা। কী এমন পরাক্রান্ত লোক বীরেন চাটুয্যে যে, এত লোক-লস্কর আমলা-কর্মচারী নিয়ে তাকে জব্দ করতে আমাদের বেগ পেতে হবে।"

মন্দাকিনী বললেন, "পরাক্রান্ত কি-না জানিনে, কিন্তু নিতান্ত সহজ লোক নয় ওই বীরেন চাটুয্যে। রূপে-গুণে বিদ্যা-বুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্যে মানে-মর্যাদায় ওর মতন আর একটি ছেলে শুধু পলতাডাঙায় কেন, সারা বগুড়া জেলায় নেই। লাঠির চোটে ওকে জব্দ করা খুব সহজ হবে না সুধা। আর, তাই কি লাঠিতেই ও কারুর চাইতে কম ? হাতে যদি একখানা লাঠি কোনও রকমে জোটে তা হ লে একাই সে পঁচিশটে লেঠেলের রোক সামলাতে পারে।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুধীরা বললে, "ও লাঠি খেলতেও পারে না-কি ?"

মন্দাকিনী বললেন "কী যে ও পারে না, তা তো জানি নে। কেন, ও তো তোদের কলকাতারই মোহনবাগান ক্লাবের বীরেন চাটুয্যে—ওর নাম তোরা শুনিস্ নি ?"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরার বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললে, "ও মা, তাই না-কি ? সেই বীরেন চাটুয্যে ?"

দুই বৎসর পূর্বে সাহিত্য-সভায় যে তরুণ সমালোচক তার প্রবন্ধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল সে যে মোহনবাগান ক্লাবেরই বীরেন চাটুয্যে এ কথা তার জানা

ছিল। দৈবক্রমে তারই সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত! অপরিমিত প্রশংসা প্রাপ্তির ফলে সেদিন মনের মধ্যে যে সুমিষ্ট কৃতজ্ঞতা উদ্ভূত হয়েছিল তার কথা স্মরণ ক'রে সুধীরা মনে মনে একটু বিমূঢ়তা বোধ করলে। কিন্তু সে মুহূর্তেরই জন্যে; পরমুহূর্তেই নিজের দুর্বলতাকে অপসৃত ক'রে দিয়ে সে বল্‌লে, "কিন্তু পিসীমা, তোমার পরামর্শ মতো আজকে হবে মুখে মুখে বাক্‌যুদ্ধ, লাঠির যুদ্ধ তো আজ নয়।"

একটু চুপ ক'রে থেকে মন্দাকিনী বল্‌লেন, "সেই জন্যে তো আজকেই বেশি ভয়। মুখ যত সহজে ভদ্রলোকের মান নষ্ট করতে পারে, লাঠি তত সহজে পারে না।"

সুধীরা বললে, "কিন্তু যে লোক পরের জমিতে চড়াও হ'য়ে দখল-জারি করতে আসে তার কি বিপক্ষ পক্ষের কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার প্রত্যাশা করা উচিত?"

এ প্রশ্নের কতখানির উত্তর দেওয়া সমীচীন হবে ঠিক নির্ণয় করতে না পেরে একটু ইতস্ততভাবে মন্দাকিনী বললেন, "কিন্তু এর মূলে কতখানি ভদ্রব্যবহারের কথা আছে তা জানা থাক্‌লে তুই হয়তো এত জোরের সঙ্গে এ কথা বলতে পারতিসনে সুধা।"

সুধীরা বললে, "আমি সব জানি পিসিমা। যেটুকু ভালো ক'রে জানতাম না, পলতাডাঙায় আসবার আগে বাবার মুখ থেকে তাও শুনে এসেছি। কিন্তু সে তো অনেক দিনের কথা চুকে-বুকে গেছে, এতদিন পরে আবার সেই পুরোনো বিবাদটা জ্বালিয়ে তোলা উচিত হচ্ছে কি ওদের?"

মন্দাকিনী মনে মনে বললেন, আক্রোশ আর বিদ্বেষ নিয়ে যারা একদিন মাতামাতি করেছিল তাদের হয়তো চুকে বুকে গিয়েছে, কিন্তু সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ পর্যন্ত যে বুকের রক্ত দিয়ে পলে পলে শোধ করছে তারও চুকে গিয়েছে কি? প্রকাশ্যে বললেন, "সব জিনিস অত সহজে চুকে যায় না সুধা। কোথাকার জল কতদূরে গড়িয়ে আসে তা কি কেউ বলতে পারে। কিন্তু সে কথা যাক, আমাদের হচ্ছে জমিদারের ঘর, একবার যা গেলে জমিদার সহজে তা ওগরায় না। ও জমি বীরেন চাটুয্যেকে কিছুতেই দখল করতে দেওয়া হবে না, জমি থেকে তাকে তাড়াতে হবেই। সেই কাজের ভার নিয়ে তুই দাদার কাছ থেকে এসেছিস তা জান্‌তে এ গ্রামের আর কারও বাকি নেই। যা করবি, এই পুরানো জমিদার বংশের মর্যাদার মতন ক'রেই করিস। এমন কোন নোংরা কাজ যেন না হয় যাতে তোর গায়ে তার কাদা ছিট্‌কোয়। তোর প্রতি আমার এই একান্ত অনুরোধ সুধা।"

সুধীরা বললে, "অনুরোধ কেন বলছ পিসিমা, আদেশ বল। কিন্তু আমার ওপর কি সেটুকু বিশ্বাস নেই তোমার?"

মাথা নেড়ে মন্দাকিনী বললেন, "তোকে নিয়ে আমার একটুও ভয় নেই মা। কিন্তু, কিন্তু—"

মন্দাকিনীর বিমূঢ় অপ্রতিভ ভাব দেখে সুধীরা হেসে ফেললে; বললে "যার নাম করতে তোমার অত কিন্তু হচ্ছে পিসিমা, স্বচ্ছন্দে তার নাম ক'রে যা খুশি বলতে

পার, কারণ তোমার চেয়ে আমার তার ওপর একবিন্দুও বেশি শ্রদ্ধা নেই।"

"তবে নিয়ে এলি কেন ওকে ?"

সুধীরার ওষ্ঠে মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বললে, "নিয়ে আসিনি পিসিমা, জোর ক'রে এসেছে।"

মন্দাকিনী বললেন, "তা হ'লে জোর ক'রে ওকে আটকে রাখিস—বীরেনের কাছে যেতে দিসনে। তোর তো একপাল লেঠেল আছে, তাদের লেলিয়ে দিস্, আমি কিছু বলব না; কিন্তু মেথরের হাঁড়ি, কেরাসিন তেলের পিচকিরি—এ সব কী ব্যাপার সুধা ? এতখানা বয়সে এই রায় চৌধুরীদের ঘরে বিবাদ-বিসংবাদ তো কম দেখলাম না, কিন্তু সব সময়েই সামনা-সামনি লাঠালাঠি দিয়ে তার আরম্ভ আর শেষ হয়েছে। এ রকম হাঁড়ি আর পিচকিরির ইতরোমি তো কখনও শুনিনি !"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; বললে, "এ সব কথা তুমি কার কাছে শুনলে, পিসিমা ? রাখাল দাদার মুখে ?"

মন্দাকিনী বললেন, "না, ঠিক এ কথাগুলো তার মুখে শুনিনি; ঘণ্টাখানেক আগে হালদার মশায় এসে বলছিলেন যে এই সব ব্যবস্থা তৈরি রাখবার জন্যে রাখাল হুকুম জারি করেছে।"

"হালদার মশায় হুকুম তামিল করতে রাজি হয়েছেন ?"

"রাজি হওয়া তো দূরের কথা, অতিশয় বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু কুটুম্বের ছেলে, কিছু বলতেও পারছেন না। শুধু কি হালদার মশায়ই বিরক্ত হয়েছেন ? রাখালের ইতর বুদ্ধি আর তম্বিতম্বার জন্যে পাইক-বরকন্দাজ থেকে আরম্ভ ক'রে সরকার-গোমস্তা পর্যন্ত কেউ তার ওপর সন্তুষ্ট নয়।"

ক্ষণকাল মনে মনে কী চিন্তা ক'রে সুধীরা বললে, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো পিসিমা, এসব কিছুই আমি হ'তে দেব না। কিন্তু একটা কথা যদি জিজ্ঞাসা করি, রাগ করবে না তো ?"

মৃদু হেসে মন্দাকিনী বললেন, "বলনা কী বলবি। রাগ করব কেন ?"

পুনরায় অল্প একটু ইতস্ততভাবে সুধীরা বললে, "বীরেন চাটুয্যের জন্য তোমার মনে একটু সহানুভূতি আছে,—না ?"

মন্দাকিনী এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন; তারপর মৃদুস্বরে বললেন "সহানুভূতি বলতে তুই কী মনে করছিস তা আমি ঠিক জানিনে; কিন্তু তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

মন্দাকিনীর উত্তর শুনে সুধীরার চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল। বীরেনের প্রতি সামান্য একটু সহানুভূতি হয়ত সে সহজেই সহ্য করতে পারত, কিন্তু শ্রদ্ধার কথা শুনে সে শুধু বিস্মিত নয়, একটু বিরক্তও হলো; বললে, "শ্রদ্ধা কর তুমি তাকে ?—যে আমাদের সঙ্গে এমন ক'রে শত্রুতা করছে তাকে তুমি শ্রদ্ধা কর ?"

মন্দাকিনীর ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিলে; শান্তকণ্ঠে বললেন, "শত্রু যদি মহৎ হয় তা হ'লে তাকেও শ্রদ্ধা না ক'রে উপায় নেই, এ কি তুই জানিসনে সুধা ?

বেশ তো আমার চেয়ে তোর সঙ্গে তার বিবাদ তো কম হবে না, দেখি কেমন তুই তাকে শ্রদ্ধা না ক'রে রক্ষে পাস।" ব'লে হাসতে লাগলেন।

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরাও হেসে ফেললে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের সমস্ত শক্তি এবং দৃঢ়তাকে কেন্দ্রিত ক'রে নিয়ে বললে, "না, পিসিমা, উপস্থিত মহত্ত্বকে আমার শ্রদ্ধা করলে চলবে না, ঔদ্ধত্যকে শাসন করতেই হবে। বাবাকে আমি কথা দিয়ে এসেছি যে, ছেলের মতো তাঁর কাজ শেষ ক'রে আমি ফিরে যাব। সে কথা আমাকে রাখতেই হবে। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে আমার চলবে না।"

সুধীরার নিকটে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে নাড়া দিয়ে মন্দাকিনী বললেন, "কিন্তু দুর্বলতা তুই কাকে বলছিস, সুধা? শত্রু হ'লেও শ্রদ্ধার পাত্রকে শ্রদ্ধা না করাই দুর্বলতা, এ কথাও কি তোকে বোঝাবার দরকার আছে আমার?"

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, "না, পিসিমা, না; ও সুর তুমি আমার কানে দিয়ো না। আগে বীরেন চাটুয্যেকে জব্দ করা, তারপর তাকে সহানুভূতি করা, শ্রদ্ধা করা—যা বলবে তাই করব। আগে কিন্তু কিছু নয়।"

সুধীরার বাক্যের মধ্যে মন্দাকিনীর কানে বাজল পুরাতন রায় চৌধুরী বংশের পুরুষানুক্রমভুক্তিত মদগর্বের সুর—তবে নারীসুলভ কোমলতা বশত হয়তো কিছু স্তিমিত। মুখ দিয়ে কথাটা প্রকারান্তরে বেরিয়েও গেল; সহাস্যমুখে বললেন, "হাজার হোক, দেহের মধ্যে রায় চৌধুরী বংশেরই রক্ত বইছে তো!"

মন্দাকিনীর মন্তব্য শুনে সুধীরা হেসে ফেলল; বললে, "সে রক্ত কি তোমারও দেহে বইছে না পিসিমা?"

মন্দাকিনী মাথা নেড়ে বললেন, "সে রক্ত আমার দেহে নেই। অদৃষ্ট শিরা কেটে সে রক্ত আমার দেহ থেকে বার ক'রে নিয়েছে।"

অদূরে রাখালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সুধীরা বললে, "যে মানুষ, কাণ্ডজ্ঞান নেই তো, হয়তো জুতো পরেই তোমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে।" ব'লে ব্যস্ত হ'য়ে ঘর থেকে দ্রুতপদে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

সুধীরাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রাখাল বললে, "Hello সুধা, তুমি এখানে আন্টির সাথে গল্প লাগিয়েছ, আর আমি সারা বাড়ি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!"

রাখালের চলনে-বলনে একটা হাল্কা উল্লাসের পরিচয়।

সুধীরা বললে, "আন্টির সঙ্গে গল্প করছিলাম না, পিসিমার সঙ্গে গল্প করছিলাম। তোমাদের দেশের আন্টিকে আমাদের দেশে পিসিমা বলে।"

"I know,—কিন্তু তোমাদের দেশের জেঠি খুড়ি মাসি পিসী মামীর universal term হচ্ছে আমাদের দেশের আন্টি। Isn't it? সুতরাং ঢের বেশি convenient। কিন্তু সে কথা যাক্, তোমাদের মহাবীর চাটুয্যের আবির্ভাবের সময় তো হয়ে এল। এখন, কীভাবে তার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছ বল? বীর

রস দিয়ে অভ্যর্থনা হবে, না বীভৎস রস দিয়ে ?"

সুধীরা বললে, "আমাদের বংশে বীভৎস রসের কারবার নেই, সুতরাং যা কিছু হবে বীর রস দিয়েই হবে।"

"কিন্তু যেমন কুকুর তেমনি মুগুর বলেও তো একটা কথা আছে সুধীরা। শুনছি তোমাদের কানাই হালদার দশজন লাঠিয়ালকে তৈরী থাকতে বলেছে। কিন্তু যে really চাবুক deserve করে, লাঠি মেরে তাকে সম্মানিত ক'রে লাভ কী ?"

"কিন্তু কে তাকে চাবুক মারবে রাখাল দাদা ?—তুমি ?"

"অনায়াসে,—তোমার যদি আপত্তি না থাকে।"

মন্দাকিনীও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ; বললেন, "না বাবা রাখাল, ওর আপত্তি না থাকলেও আমার আছে। তুমি কুটুমের ছেলে, দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছ, তুমি আমোদ-আহ্লাদ করে ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও, এই আমি কামনা করি। লড়ালড়ির মধ্যে তুমি যেয়ো না। বীরেন চাটুয্যেকে তুমি চেনো না,—সহজ লোক ও নয়।"

এ যে তার শারীরিক অনিষ্টের আশঙ্কায় আন্তরিক উদ্বেগ প্রকাশ নয়,—এর মধ্যে যে শূন্যগর্ভ দম্ভের প্রতি বিদ্রূপেরও প্রচ্ছন্ন দংশন আছে, বুঝতে না পেরে রাখাল মন্দাকিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "Pooh, Pooh ! পিসি, তোমার ওই পাড়াগেঁয়ে বীরেন চাটুয্যেকে আমি আমার কড়ে আঙুলের সমানও মনে করিনে। আমোদ-আহ্লাদের কথা বলছ, তা ওকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি করেও তো বেশ একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যেতে পারে।" ব'লে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

সুধীরা বললে, "ও কিন্তু শুধু পাড়াগাঁয়েরই বীরেন চাটুয্যে নয় রাখালদাদা,—ও তোমার কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবেরও বীরেন চাটুয্যে—একজন নামজাদা Sportsman।"

"নামজাদা Sportsman ? The idea !—মাত্র ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এম্-এ পাশ করা একটা ছোকরা, যার অস্ত্র হলো ষ্টিলের কলম আর শস্ত্র হলো কালির দোয়াত, সে একজন নামজাদা Sportsman ? Dear, dear me ! —কিন্তু সে-কথা যাক সুধীরা, তুমি যদি আমাকে তোমার war office-এ Secretary ক'রে আটকে না রেখে Field Marshal ক'রে ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দাও, তা হ'লে দুর্বৃত্তকে আজকেই কান ধ'রে তোমার পায়ের তলায় হাজির করতে পারি।"

মৃদু হেসে সুধীরা বললে, "দোহাই রাখালদাদা, জয়টা অত হুড়মুড় ক'রে এলে রসভঙ্গ হবে। তার চেয়ে পিসিমা যে স্কীম্ ক'রে দিয়েছেন সেইটেই আমরা মেনে চলব।"

"পিসি স্কীম্ করে দিয়েছে ?"

"হ্যাঁ পিসিমা, স্কীম্ ক'রে দিয়েছেন।"

"পিসি স্কীম্ করতে পারে ?"

স্পষ্টতর স্বরে সুধীরা উত্তর দিলে, "হ্যাঁ পিসিমা স্কীম্ করতে পারেন।"

এবার রাখালের খেয়াল হলো। বললে, "আচ্ছা, পিসিমা কী স্কীম্ ক'রে দিয়েছেন শুনি।"

মন্দাকিনীর সহিত চোখাচোখি হ'য়ে সুধীরা হেসে ফেললে, বললে, "আমার ঘরে চল, বলছি।" যেতে যেতে পিছন ফিরে বললে, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো পিসিমা, লাঠি ছাড়া আর কিছুই যখন তোমার স্কীমে নেই তখন লাঠি ছাড়া আর কিছুই চলবে না।"

বিস্মিত হয়ে রাখাল বললে "পিসিমা স্কীম্ বোঝেন?"

"বোঝেন।" ব'লে সুধীরা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

মন্দাকিনী তখন ঘরের ভিতর প্রবেশ করেছেন।

ছয়

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। সবেমাত্র সূর্য অস্ত গেছে। সমস্ত দিন প্রখর তাপে দগ্ধ হ'য়ে দিনান্ত হ'য়ে এসেছে সুশীতল। বৈকালিক চা দ্বিতীয়বার শেষ করে একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে বীরেন উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিলে, "করিম বক্স্!"

"হুজুর!"

আহূত ব্যক্তি নিকটেই কোথাও ছিল, বীরেনের আহ্বান শুনে দ্রুতবেগে দৌড়ে এসে এক লাফে আড়াই ফুট উঁচু বারান্দার উপর উঠে দাঁড়াল। দীর্ঘ ছয় ফুট আকৃতি, কৃশ-কঠিন দেহের সর্বত্র দৃঢ় পেশীর পাক। দীর্ঘ-বিলম্বিত বাহু যেন শক্তির প্রয়োগের আগ্রহে সর্বদা চঞ্চল হ'য়ে রয়েছে। চক্ষু ঈষৎ রক্তাভ, সুর্মার অবলেপের জন্য গভীর এবং অস্পষ্ট। মূর্তি দেখলে আতঙ্ক হয়; মনে হয়, এর পশু-শক্তি একবার উজ্জীবিত হ'লে একটা কিছু সর্বনাশ না ঘটিয়ে নিবৃত্ত হবে না।

বীরেন বললে, "ওস্তাদ, অব্ হম চলতাহুঁ।"

"ময় ভি সাথ চলুঁ?"

"অভি তো কুছ দরকার দেখাই নেহি পড়তা হায়। হম সিটি দেনে সে তুরন্ত পঁহুছ যানা; নহি তো নহি। সমঝা?"

"বহুৎ খুব! মেরে কান ঔর আঁখ হুজুরকা উপর মোতায়েন রহেগা।

কলিকাতার সুবিখ্যাত গুণ্ডা করিম বক্সের নাম বোধকরি অনেকের কাছেই অবিদিত নেই। দাঙ্গা-বিবাদ কালে করিম যেখানে কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে সেখানে কোনও প্রতিপক্ষই সুবিধা করতে পারেনি। প্রমত্ত হ'য়ে সে যখন লাঠি চালাতে আরম্ভ করে তখন সে গুণ্ডাদেরও পক্ষে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই করিম বক্সের নিকটেই বীরেনের লাঠি শিক্ষা। কানাই হালদার কলিকাতা গমন করলে, দাঙ্গা হাঙ্গামার সম্ভাবনা আশঙ্কা ক'রে বীরেন লোক পাঠিয়ে কলিকাতা থেকে করিম বক্সকে আনিয়ে রেখেছে। প্রয়োজন হ'লে কাজে লাগবে।

দেরাজ খুলে একটা জোরালো হুইস্‌ল বার ক'রে বীরেন পকেটে রাখলে, চামড়ার খাপে আবদ্ধ একটা কোনও বস্তু জামার অন্তরালে কটিতটে বেঁধে নিলে, তারপর টেবিলের উপর থেকে রবীন্দ্রনাথের একখানা 'ক্ষণিকা' সংগ্রহ ক'রে সেটাও পকেটে পুরে যথানিয়ম ডেক্‌-চেয়ারটা মুড়ে নিয়ে ধীর মন্থর পদে বকুলতলার দিকে অগ্রসর হলো। ওষ্ঠাধরে আবদ্ধ মোটা বর্মা চুরুট, মাঝে মাঝে নিঃশব্দে ধুম ত্যাগ করছে।

বকুলতলায় উপনীত হ'য়ে বীরেন জমিদার বাড়ির দিকে পিছন ক'রে চেয়ারটা রেখে উপবেশন করলে, তারপর 'ক্ষণিকা'টা বার ক'রে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অনুচ্চকণ্ঠে একটা কবিতা পড়তে আরম্ভ করলে,—

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখি
তাহার গানে আমার নাচে বুক।
তাহার দুটি পাগল-করা ভেড়া
চ'রে বেড়ায় মোদের বট-মূলে,—

আচ্ছা, 'বটমূলে'টা না-হয় সহজেই 'বকুল-মূলে' ক'রে নেওয়া যেতে পারে। তারপর দেখা যাক্‌,

যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া,
কোলের পরে নিই তাহারে তুলে।
আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,—

মাথা নেড়ে কবিতার সুরেই বীরেন বললে, একবারেই মিলল না! আমাদের এই গ্রামের নামটি পলতাডাঙা, আমাদের এই নদীর নামটি আত্রাই, আর আমাদের সেই তাহার নামটিও রঞ্জনা নয়; সুতরাং অন্য কবিতা দেখা যাক্‌। কয়েক পাতা উল্টে সে পড়তে লাগল—

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে করিও ক্ষমা।
এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস—"

"বীরেন বাবু!"

পিছন ফিরে বীরেন দেখ্‌লে, 'আষাঢ়ের প্রথম দিবস' নয়, চৌধুরীদের কানাই হালদার। পশ্চাতে অনতিদূরে জনদশেক লাঠিয়াল লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে।

চেয়ারটা একটু ফিরিয়ে নিয়ে বীরেন বললে, "ব্যাপার কী হালদার মশায়! একেবারে ফৌজ নিয়ে সেনাপতি হ'য়ে বেরিয়েছেন দেখছি। তা, যুদ্ধটা আমারই সঙ্গে না-কি?"

কানাই হালদার বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারই সঙ্গে।"

বীরেন বললে, "কিন্তু আপনাদের দলে অতগুলো লাঠি, আর আমার একহাতে

চুরুট আর অন্য হাতে কবিতার বই—এ যুদ্ধ কি ন্যায় যুদ্ধ হবে? হয়, কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে একটা লাঠি ধার দিন; নয়, একটু অপেক্ষা করুন, বাড়ি থেকে একটা যা হয়-কিছু জোগাড় ক'রে আনি।"

বীরেনের কথা শুনে কানাই হালদারের মুখ কালো হ'য়ে উঠল; কঠোর স্বরে বললে, "আপনি যে পরিহাস করছেন তা বুঝতে পারছি; কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পরিহাসের মতো হবে না, এ কথাও আপনাকে ব'লে রাখলাম। আজ অবিশ্যি লাঠালাঠি হবে না, কারণ মনিব-পক্ষ থেকে আজকের জন্যে সে বিষয়ে নিষেধ আছে; কিন্তু এখনও আপনি অবুঝ হ'লে ভবিষ্যতে লাঠালাঠি করতে ইতস্তত করব না, এ কথা আপনাকে জানাবার আদেশ পেয়ে এসেছি।"

বীরেন বললে, "তা তো এসেছেন; কিন্তু আপনি আমাকে ভারি বিপদে ফেলেছেন হালদার মশায়।"

তীক্ষ্ণ কুঞ্চিত চক্ষে বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কানাই হালদার বললে, "অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আপাততঃ আপনার মনিব পক্ষ তো স্ত্রীলোক?"

"হাঁা, তিনি আমার প্রভুকন্যা।"

"একজন স্ত্রীলোককে এই লাঠালাঠির মধ্যে এনে ফেলে আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন।"

কানাই হালদারের চক্ষু আরও কুঞ্চিত হয়ে উঠল; তীব্র কণ্ঠে বললে, "কেন, শুনি?"

"একজন স্ত্রীলোককে শিখণ্ডী ক'রে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার প্রতি অবিচার হবেনা কি?"

উত্তেজিত কণ্ঠে কানাই হালদার বললে, "না, নিশ্চয়ই হবে না; তাঁকে শিখণ্ডী করা হবে, এ কথা আপনাকে কে বললে?" তারপর হঠাৎ মনে পড়ল সুধীরা বাপের কাছে দম্ভ ক'রে এসেছে যে, বীরেনকে শাসন করবার ব্যাপারে সে তাঁর একজন ছেলের মতো আচরণ করবে। খুশি হ'য়ে কথাটা উমাশঙ্কর নিজেই কানাই হালদারের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। মনে হলো কথাটা প্রয়োজনের আকারে প্রয়োগ করতে পারলে বীরেনের অনুযোগের উপযুক্ত উত্তর দেওয়া হবে; বললে, "আর, তা ছাড়া আমার প্রভুকন্যাকে একজন স্ত্রীলোক ব'লেই বা আপনি মনে করবেন কেন? আপনার এই ব্যাপারের পক্ষে তাঁকে একজন পুরুষের মতোই বিবেচনা করবেন।

কানাই হালদারের কথা শুনে বীরেনের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটে উঠল; বললে, "আপনি কিন্তু সত্যি-সত্যিই হাসালেন হালদার মহাশয়! আমাকে বলছেন আপনার প্রভুকন্যাকে একজন পুরুষের মতো বিবেচনা করতে, আবার তাঁকে হয়তো গিয়ে বলবেন আমাকে একজন স্ত্রীলোকের মতো বিবেচনা করতে। আচ্ছা, এ আপনার কী রকম বিবেচনা বলুন দেখি? আপনার প্রভুকন্যা আপনার কাছে যাই

হোক না কেন, আমার কাছে তিনি স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কিছুই নন।"

এমন সময়ে অকস্মাৎ অতর্কিতে একটা ব্যাপার ঘ'টে সকলকে একেবারে চমকিত ক'রে দিলে। নিকটবর্তী একটা আমগাছের অন্তরাল থেকে এক ব্যক্তি পলতেয় আগুন ধরানো ছুঁচো বাজির মতো চোঁ ক'রে বেরিয়ে এসে বীরেনের সামনে দাঁড়িয়ে তর্জনী আস্ফালন ক'রে কম্পিত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "না, আমি বলছি স্ত্রীলোক নন্!" হাতে তার একগাছা লিকলিকে বেত।

গভীর বিস্ময়ে এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে বীরেন বললে, স্ত্রীলোক যদি নন, তা হ'লে কী তিনি? পুরুষ?"

"Shut up you fool! মহিলা।—স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক! জান তুমি কত বড় মহীয়সী মহিলার সম্পর্কে কথা বলছ?"

সহসা বীরেনের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর আকৃতি ধারণ করলে; গভীর স্বরে সে বললে, "হঠাৎ চিনতে পারি নি!" তারপর কানাই হালদারের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "এ ব্যক্তি কে হালদার মশায়?—আপনাদের সেই রাখাল ঘটক না-কি?"

রাখাল ঘটকের এইরূপ নাটকীয় আবির্ভাবে এবং বীরেনের সহিত অমর্যাদাসূচক কথাবার্তায় কানাই হালদার একটু বিশেষ রকম বিমূঢ়তা অনুভব করছিল; স্খলিতকণ্ঠে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি আমাদের দিদিমণির সম্পর্কীয় দাদা মিষ্টার রাখালচন্দ্র ঘটক "

দৃঢ়স্বরে বীরেন বললে, "দেখুন, আমি আপনাদের মনিবপক্ষকে বুঝি, তাঁদের আমলা পক্ষকেও বুঝি। কিন্তু যে ব্যক্তি আপনাদের মনিবপক্ষেরও কেউ নয়, আমলা পক্ষেরও কেউ নয়, সেই বাজে তৃতীয় পক্ষকে আমি একটুও বুঝিনে, এবং সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করি!"

এই নিষ্করুণ তাচ্ছিল্যের অপমানে রাখাল একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল! সরু ক্যাঁক্কেঁকে গলায় উচ্চৈস্বরে বললে, "মনিব পক্ষের কেমন কেউ নই তা দেখাচ্ছি তোমাকে! এখনি যদি এখান থেকে দূর না হও তা হ'লে এই বেত তোমার পিঠে ভাঙব!" তারপর সহসা সক্রোধে খানিকটা এগিয়ে এসে চিৎকার ক'রে উঠল, "Get you out, you damn swine!" হাতের বেতটাও একবার আকাশের দিকে আস্ফালিত হলো। যদিও আসল ভরসা তার দশজন লাঠিয়ালের লাঠির উপরই ছিল। ।

ধীরে ধীরে বীরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, অর্ধদগ্ধ চুরুটটা সবেগে একদিকে নিক্ষেপ করলে, 'ক্ষণিকা'টা পাক দিয়ে ঘুরিয়ে চেয়ারের ক্যানভাসের উপর ফেললে, তারপর অকস্মাৎ অকারণ এমন একটা বিকট চিৎকার ক'রে উঠল যে, নিকটবর্তী লোকদের তো কথাই নেই, দূরে একতলার বারান্দায় সমবেত হয়ে সুধীরা প্রভৃতি যারা বকুলগাছ তলার ঘটনা-পরিণতির জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল, তারা পর্যন্ত চমকে উঠল।

সেই চিংকারের মধ্যেই চক্ষের পলকে কোথা দিয়ে কেমন করে কী যে হলো তা বোঝা গেল না। দেখা গেল নিমেষের মধ্যে বীরেন রাখালের পিছন দিকে উপস্থিত হয়েছে এবং পর মুহূর্তেই দেখা গেল রাখালের হস্তচ্যুত হয়ে বেতটা সপাং করে রুইপুকুরের জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাখাল সুড়ুৎ করে বীরেনের দুই বাহুর উপর স্থানান্তরিত হয়ে প্রতিবাদ স্বরূপ সবেগে হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে। রাখালের দুই হাঁটুর তলায় বীরেনের বাম বাহু, গলার তলায় দক্ষিণ বাহু।

অকস্মাৎ অচিন্তিত ভাবে মোড় নিয়ে ব্যাপারটা যেরূপ দাঁড়াল তার মধ্যে কৌতুক এবং করুণ রসের এমন সাম্মিশ্রণ যে, লাঠির কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হ'য়ে লাঠিয়ালরা কী যে করবে তা ভেবে পেলে না, এবং কানাই হালদার অতিমাত্রায় বিপন্ন বোধ ক'রে হতাশভাবে একবার জমিদার বাড়ির দিকে এবং একবার বীরেনের বাহু-আবদ্ধ হতভাগ্য রাখালের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিক্ষেপ করতে লাগল। এ কিল নয়, চড় নয়, গালিগালাজ নয় যে, সোজাসুজি এর কোনও প্রকার প্রত্যাঘাত করা চলে। বাহুবদ্ধ ক'রে কোনও ব্যক্তিকে বুকের উপর চেপে ধ'রে দুলিয়ে নিয়ে বেড়ানোকে সাধারণ প্রচলিত অপরাধ-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি-না, তা কানাই হালদার বা তার দলের কেহই নির্ণয় করতে পারলে না।

এদিকে রাখাল বীরেনের বজ্রবেষ্টনের মধ্যে বন্দী হ'য়ে সমানে দুই পা ছুঁড়ে চলেছে আর মুখে বলছে, "নাবিয়ে দাও!—ভালো হবে না বলছি! নাবিয়ে দাও আমাকে!"

অপদার্থ দুর্বৃত্তের পীড়নে সমবেদনা তো কারও মনে নেই-ই, উপরন্তু যেন অচেতন মনে মজা দেখার আনন্দের উৎস খুলেছে।

রুইপুকুরের জলের ধারে গিয়ে বীরেন বার তিন চার রাখালকে দোল দিয়ে বললে, "বলেছিলে না চেয়ার শুদ্ধ তুলে আমাকে জলে ফেলে দেবে?—কী রকম মজাটা হয় একবার ফেলে দিয়ে দেখাব না-কি?"

প্রস্তাব শুনে রাখাল আতঙ্কে কম্পিতকণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠল, "হালদার মশায়, মেরে ফেললে!"

তখন কানাই হালদার ছুটে গিয়ে বীরেনের দুই হাত চেপে ধরলে; বললে, "করেন কী! কলকাতার লোক, সাঁতার জানেন না হয়তো।"

কানাই হালদারের কথা শুনে প্রাণের ভয়ে রাখাল প্রায় কেঁদে ফেললে, বললে, "হয়তো নয়, একটুও জানিনে!"

বীরেন বললে, "ভয় নেই, কাচক বধ করব না। শুধু ভয় দেখাচ্ছিলাম।"

তারপর পুকুরের অপর পাড়ে জমিদার বাড়ির দিকে চেয়ে দেখে বললে, "ঐ দেখুন, আপনার প্রভুকন্যারাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। চলুন, একে ওঁর কাছেই ফেলে দিয়ে আসি, উনি যা ভালো বোঝেন, করবেন।" ব'লে রাখালকে বহন ক'রে ধীর পদক্ষেপে জমিদার গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হলো।

এ অবস্থায় আর কী করা যেতে পারে ভেবে না পেয়ে নিরুপায় কানাই

হালদার এবং তার লাঠিয়ালের দল বীরেনের পিছনে পিছনে খানিকটা ব্যবধান রেখে চলতে লাগল, এবং নিরতিশয় গোলযোগের জটিল ব্যাপারটা ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে তাদেরই মধ্যে এসে পড়বার উপক্রম করেছে দেখে জমিদার গৃহের বারান্দায় সুধীরা এবং তার দলবল উৎকট কৌতূহলে এবং উদ্বেগে চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

পুষ্করিণীর একটা দিক প্রদক্ষিণ ক'রে বীরেন যখন অর্ধাধিক পথের শেষে বারান্দার কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন তার বাম দিকে সহসা একটা প্রাণখোলা কৌতুকের উচ্চ হাসি খিল্ খিল্ ক'রে উচ্ছলিত হ'য়ে উঠল। একটা মাধবী লতার পাশে দাঁড়িয়ে প্রভাময়ী হেসে আকুল হচ্ছিল।

ধীরে ধীরে প্রভাময়ীর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বীরেন বললে, "এ ভালো নয় প্রভা, কারও সর্বনাশ আর কারও পৌষ মাস,—এ কিন্তু ভালো নয়।" তারপর প্রভার দিকে বার দুই রাখালকে ধীরে ধীরে দুলিয়ে দিয়ে আবার সুধীরাদের দিকে অগ্রসর হলো।

সুপ্রশস্ত বারান্দা; দুইখানা হেলান দেওয়া চওড়া বেঞ্চ এবং কতকগুলা চেয়ার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বীরেন যখন সিঁড়ি ভেঙে রাখালকে বহন ক'রে বারান্দায় প্রবেশ করল তখন উদগ্র উত্তেজনায় সকলে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

পুষ্করিণী থেকে দূরে এসে এবং আপন জনের নিকটবর্তী হ'য়ে রাখালের সাহস কতকটা ফিরে এসেছিল,—পুনরায় সজোরে হাত পা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল, "নাবিয়ে দাও, বলছি! শীগগীর নাবিয়ে দাও! নইলে মজা দেখিয়ে দেবো!"

নিঃশব্দে কিন্তু সজোরে রাখালকে টিপে ধ'রে বীরেন বললে, "দুষ্টুমি কোরোনা, তা হলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাব।" তারপর সুধীরার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মাথা একটু নত ক'রে স্মিতমুখে বললে, "নমস্কার। প্রথম সাক্ষাতে দু'হাত জোড় ক'রে যে একবার নমস্কার ক'রে নেব সে সৌভাগ্য হলো না, দু'হাতই জোড়া।"

যুক্তকরে সুধীরা বললে, "নমস্কার। কিন্তু এ কী ব্যাপার বলুন তো। এ আপনি কেন করলেন?" এ ছাড়া আর কী ব'লে প্রতিবাদ করবে, তা ভেবে পেলে না।

বীরেন বললে, "কেন করলাম তা বলছি। তার আগে বন্ধুকে ভালো করে শুইয়ে দিই।" বলে একটা ইজিচেয়ারের ক্রোড়ে রাখালকে শুইয়ে দিয়ে বললে, "লক্ষ্মী হয়ে চুপটি করে শুয়ে থাক, দুষ্টুমি করেছ কি, আবার তুলে নিয়েছি।" তারপর সুধীরার সম্মুখে এসে বললে, "আচ্ছা, আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন, বেশ করেছেন;—একটা লাঠালাঠির ব্যবস্থা ক'রে দিন, আমরা দুই পক্ষ উৎসাহের সঙ্গে মাথা-ফাটাফাটিতে লেগে যাই। কিন্তু দেহে শক্তি নেই, মুখে ময়লা কথা,—এমন একটা নোংরা লোককে কেন সঙ্গে এনেছেন বলুন তো?"

বীরেনের কথা শুনে সুধীরার মুখমণ্ডলে উদ্বেগ ঘনিয়ে এল; ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "কী আপনাকে বলেছেন উনি?"

"এমন বিশেষ কিছু বলেন নি, শুধু বলেছেন, তাঁর হাতের বেতটা আমার পিঠের উপর ভাঙবেন, আর damn swine বলে আমার প্রতি মধুর সম্ভাষণ করেছেন। মাত্র এই পর্যন্ত,—আর বেশি কিছু নয়।" ব'লে বীরেন হো হো করে হেসে উঠল। নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত কৌতুক-পরিহাসের মধ্য দিয়ে ষোল-আনা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তার মন হাল্কা হয়ে গিয়েছিল।

বিরক্তি এবং ক্রোধে সুধীরার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্যে রাখালের উপর তীব্র ভ্রুকুটি করে বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, "অন্যায়। ভারি অন্যায়। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি বীরেনবাবু।"

বীরেন কিছু উত্তর দেওয়ার পূর্বেই চেয়ারের উপর সোজা হয়ে উঠে বসে রাখাল বললে, "তুমি ওর কাছে ক্ষমা চাইছ সুধীরা? আর ও তোমাকে কী বলেছে জান? ও তোমাকে স্ত্রীলোক বলেছে, আর আমাকে বলেছে তৃতীয় পক্ষ!"

রাখালের অভিযোগ শুনে এত বিরক্তির মধ্যেও সুধীরার মুখে অতি ক্ষীণ একটা হাস্যরেখা মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল।

বীরেন বললে, "এ অপরাধ আমি সত্যিই করেছি। আপনাকে স্ত্রীলোক বলেছি, আর যে প্রথম পক্ষও নয়, দ্বিতীয় পক্ষও নয়, তাকে বলেছি তৃতীয় পক্ষ। এ'তে যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে তো দণ্ড দিন, গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি বলি মিস্ চৌধুরী, স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোক না বললেই অপরাধ করা হয়। সেই জন্যে হালদার মশায় আপনাকে পুরুষ ব'লে বিবেচনা করতে আমাকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমি আপনাকে স্ত্রীলোক ব'লেই বিবেচনা করব স্থির করেছি।"

কানাই হালদার এতক্ষণ অনেকটা নিশ্চিন্ত চিত্তে একদিক দাঁড়িয়ে আপন মনে কৌতুক উপভোগ করছিল; বীরেনের কথা শুনে ব্যস্ত হ'য়ে হাঁ হাঁ করে এগিয়ে এসে বললে," আরে, কী কথায় কী কথা বলছেন বীরেন বাবু। আমি কি ছাই ঐ অর্থেও কথা বলেছিলাম? আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিল"—

কিন্তু উদ্দেশ্যটা প্রকাশ ক'রে বলবার সময় পাওয়া গেল না,—বীরেনের জামার হাতায় হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় সুধীরা চমকে উঠল; বললে, "ইস্। আপনার জামায় এত রক্ত কিসের? হাত কেটে গেছে না-কি? হাতাটা সরান তো, দেখি।"

জামার হাতাটা বীরেন সরিয়ে দিতে একটা বেশ বড় রকম ক্ষত দৃষ্টিগোচর হলো। আর্ত কণ্ঠে সুধীরা বললে, "তাই তো, এ যে অনেকটা কেটে গেছে। কেমন ক'রে কাটল?"

বীরেনের মুখে নিঃশব্দ হাস্য দেখা দিলে; বললে, "এ কাটা নয় মিস্ চৌধুরী, এ কামড়। আপনার রাখালদাদার শুধু জিভই চলে না, দাঁতও চলে।" ব'লে হাসতে লাগল।

বীরেনের কথা শুনে ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে সুধীরার মুখ মলিন বর্ণ ধারণ

করলে, অর্ধাবরুদ্ধ কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হ'লো, "ছি, ছি, লজ্জার কথা।" তারপর ইতস্তত দৃষ্টিপাত ক'রে মোক্ষদা ঝিকে দেখতে পেয়ে বললে, "শীগগির আমার ঘর থেকে টিঞ্চার আয়োডিনের শিশিটা নিয়ে আয় মোক্ষদা।"

বীরেন বললে, "কেন? টিঞ্চার আয়োডিন কী হবে? হাইড্রো-ফোবিয়ার ভয় করছেন না-কি?" ব'লে হো হো ক'রে হেসে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হ'য়ে বললে, "আমি অন্যায় করেছি মিস্ চৌধুরী,—আমার এই অসঙ্গত মন্তব্যের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, "ক্ষমা করবার কথা তো আমার নয়। অপরাধ যখন আমাদের দিকে প্রথম, তখন আপনার সব-কিছু বলাই শোভা পায়।"

বীরেন বললে, "কিন্তু আপনার ক্ষমা চাওয়ার পর আর একটা কথাও বলা শোভা পায় না, মিস্ চৌধুরী। অপরের অপরাধের জন্যে আপনি নিজে ক্ষমা চেয়েছেন,—একথা আমার এত শীঘ্র ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি।"

এ কথার আর কোনও উত্তর না দিয়ে একটা চেয়ার বীরেনের দিকে একটুখানি ঠেলে দিয়ে সুধীরা বললে, "ততক্ষণ বসুন।"

"ধন্যবাদ। এখন আর বসব না, চললাম।"

"টিঞ্চার আয়োডিনটা লাগিয়ে যান।"

বীরেন বললে, "আপনি দয়া ক'রে টিঞ্চার আয়োডিন আনতে পাঠিয়েছেন সে জন্যে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু টিঞ্চার আয়োডিন আমার নিজের কাছেও আছে, গিয়ে লাগিয়ে নোব অখন। আপনারা লাঠির ব্যবস্থা করেছেন সন্দেহ ক'রে একেবারে আট আউন্স আয়োডিনের বোতল আনিয়ে রেখেছি।" ব'লে হাসতে লাগল। তারপর রাখালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "যদি তেমন কিছু অপরাধ ক'রে থাকি ক্ষমা কোরো রাখাল দাদা।"

উত্তরে রাখাল অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় ক'রে কী বললে,—ক্ষমাই করলে, না অভিসম্পাত দিলে—তা ঠিক বোঝা গেল না।

সুধীরার দিকে ফিরে যুক্তকর উত্তোলিত ক'রে বীরেন বললে "আচ্ছা, নমস্কার।"

মৃদুস্বরে সুধীরা বললে, "নমস্কার।"

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুতপদে মোক্ষদা উপস্থিত হ'য়ে সুধীরার হাতে তাড়াতাড়ি টিঞ্চার আয়োডিনের শিশিটা দিলে।

সুধীরা বললে, "এসেই যখন পড়ল, তখন না-হয় একটু লাগিয়ে যান।"

"আচ্ছা দিন। শাস্ত্রেও যখন আছে লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ।" ব'লে তার দক্ষিণ বাহুটা সোজাসুজি সুধীরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, "দু-চার ফোঁটা ফেলে দিন, তা হ'লেই হবে।"

তাকে যে ঔষধও প্রয়োগ করতে হ'তে পারে, একথা সুধীরার পূর্বে খেয়াল হয়নি। কিন্তু ঘটনার সহজ গতিতে শিশিটা যখন তার নিজের হাতেই এসে পড়ল, এবং

সঙ্গে সঙ্গে আহত ব্যক্তিও তার দিকে হাত বাড়িয়ে ধরলে, তখন নিতান্ত সামান্য এই কাজটুকুর জন্য অপর কাহারও হস্তে শিশিটা অর্পণ করতে সে সংকোচ বোধ করলে। ছিপি খুলে শিশির মুখে লাগিয়ে সে সন্তর্পণে ফোঁটা ফেলতে লাগল—

এক ফোঁটা,
দু' ফোঁটা,
তিন ফোঁটা,
চার ফোঁটা।

টাটকা ক্ষতর মুখে টিঞ্চার আয়োডিন প্রয়োগ করলে কীরূপ ভীষণ জ্বালা উপস্থিত হয় তা সুধীরার অবিদিত ছিল না। ফোঁটা ফেলতে ফেলতে একবার সে বীরেনের মুখের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করলে। দেখলে সে মুখে জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই, শান্ত প্রসন্ননেত্রে সে তার সুন্দরী সেবিকার দিকে তাকিয়ে আছে, যেমন তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ নিশীথিনী পূর্ণিমার চন্দ্রের দিকে।

ছ' ফোঁটা,
সাত ফোঁটা,
আট ফোঁটা,
ন' ফোঁটা।

শিশিটা তুলে ধ'রে সুধীরা জিজ্ঞেস করলে, "হয়েছে ?"

"আমার তো মনে হয় হয়েছে।"

"এই দিকের কোণটায় আর একটু দিই।"

"দিন।"

পুনরায় শিশির মুখে ছিপিটা ধ'রে সুধীরা সযত্নে ফোঁটা ফেলতে লাগল,—

দশ ফোঁটা,
এগার ফোঁটা,
বার ফোঁটা।

শিশির মুখে ছিপি এঁটে শিশিটা মোক্ষদার হাতে দিয়েই সুধীরা দেখলে একখণ্ড পরিষ্কার ন্যাকড়া আর খানিকটা বোরিক উল হাতে নিয়ে মন্দাকিনী পাশে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ মন্দাকিনী অন্দর মহলে নিজের কাজকর্মে রত ছিলেন, প্রভাময়ীর মুখে দংশনের সংবাদ অবগত হ'য়ে তাড়াতাড়ি এই দু'টি দ্রব্য নিয়ে বাহিরে এসে দেখেন সুধীরা বীরেনের ক্ষততে টিঞ্চার আয়োডিন প্রয়োগ করছে। তুলা এবং বস্ত্রখণ্ড সুধীরার হাতে দিয়ে বললেন, "ভালো ক'রে বীরেনের হাতটা বেঁধে দে সুধা।"

সজোরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "না, না পিসিমা, বাঁধবার কোনও প্রয়োজন নেই। টিঞ্চার আয়োডিন দেওয়া হয়েছে, তাই যথেষ্ট।"

মন্দাকিনী কিন্তু বীরেনের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে বললেন, "ধুলো-টুলো পড়লে বিষিয়ে উঠতে পারে। যতক্ষণ না বেশ শুকিয়ে যায় বেঁধে রাখাই ভালো।

দে সুধা, ভালো করে বেঁধে দে।"

ফোঁটা ফেলা একরকম চলেছিল, কিন্তু ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে সত্যই একটু কুণ্ঠার উদয় হ'ল। তুলা এবং ফালিটা মন্দাকিনীর দিকে এগিয়ে ধ'রে সুধীরা বললে, "তুমিই বেঁধে দাও না পিসিমা।"

মন্দাকিনী বললেন, "না, না,—দে না বাপু বেঁধে। তোর চেয়ে কি আমি ভালো বাঁধতে পারব ?"

বাঁধতে কুণ্ঠা হয় বটে, কিন্তু বারংবার আপত্তি করার কুণ্ঠাও তদপেক্ষা কম নয়। অগত্যা তুলাটা সামান্য একটু পিজে নিয়ে ক্ষতর উপর স্থাপিত ক'রে সুধীরা ধীরে ধীরে কাপড়ের ফালিটা তার উপর জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধলে, তারপর হাতের কাছে অপর কোন জিনিসের অভাবে আপন ব্লাউজ থেকে একটা সেফটিপিন্ খুলে নিয়ে ব্যাণ্ডেজের আলগা মুখটা এঁটে দিলে।

সুধীরার মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টিপাত করে বীরেন বললে, "অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা, এখন তাহলে চললাম।" মন্দাকিনীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, "চললাম পিসিমা!"

মন্দাকিনী বললেন, "এস বাবা।"

রাখালের চেয়ারের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বীরেন বললে, "একি ! রাখাল দাদা গেল কোথায় ? ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সুযোগে বন্দী পলাতক !"

সকলের মুখে একটা অস্ফুট হাস্যধ্বনি উত্থিত হলো।

সিঁড়ি বেয়ে প্রাঙ্গণে অবতরণ করে কয়েক গজ অগ্রসর হয়ে বীরেন ফিরে দাঁড়াল; সুধীরাকে সম্বোধন করে বললে, "দেখুন, আপনার সঙ্গে সামান্য একটু কথা ছিল। অনুগ্রহ করে একটু যদি নেবে আসেন।"

কথাটা বীরেন জনান্তিকে বলতে ইচ্ছা করে বুঝতে পেরে সুধীরা তার সহিত আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে এমন স্থানে দাঁড়াল যেখান থেকে তাদের সুস্পষ্ট কথোপকথনও অপরের শ্রুতিগম্য হবে না।

বীরেন বললে, "লাঠালাঠি যে অনিবার্য তা বুঝতেই পারছি। আপনার লাঠিয়ালদের আজকের এই শান্ত কুচকাওয়াজের গোপন অর্থও অস্পষ্ট নয়। কিন্তু আমি বলি, উপস্থিত যখন আমাদের ভারতবর্ষে মহাত্মাজীর অহিংস নীতি প্রবল হয়ে বর্তমান রয়েছে তখন মাথাফাটাফাটির আগে একবার non-violent methodটা পরীক্ষা করে দেখলে হয় না ? লাঠি তো আর সত্যিসত্যিই কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।"

"Non-violent method-এর দ্বারা আপনি আমাকে নিরস্ত করতে পারবেন বলে মনে করেন ?"

"আশা তো করি। কিন্তু তাই বলে গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়। একটু সময় আর দুখানা চেয়ারের প্রয়োজন।" বলে বীরেন হাসতে লাগল।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে সুধীরা বললে, "আমার তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু এর

জন্মে আমি বেশি বিলম্ব করতে পারব না।"

বীরেন বললে, "বিলম্ব করতে আমিও চাইনে। আজ এই মুহূর্তেই হতে পারে—এখনি।"

"না, আজ আর নয়। আজ আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।"

সুধীরার কথা শুনে বীরেনের চক্ষু বিস্ফারিত হলো; সবিস্ময়ে বললে, "এইটুকু কামড়ের জন্যে বিশ্রাম? সাপেও কামড়ায় নি, বাঘেও কামড়ায় নি,—মাত্র রাখাল দাদা কামড়েছে, তার জন্মে আমার বিশ্রামের একটুও প্রয়োজন নেই।"

সুধীরা বললে, "আপনার না থাকে, আমার আছে।"

বিস্ময়ের সুরে বীরেন বললে, "আপনার আছে?" পরমুহূর্তেই কিন্তু হেসে ফেলে বললে, "ও!—আচ্ছা। কিন্তু কাল সকালেই তা হলে আসব, বেলা আটটার সময়ে। কেমন? অসুবিধে হবে না তো?"

"না, হবে না।"

"আর একটা অনুরোধ আছে।"

"কী বলুন?"

"আমাদের কথাবার্তার সময়ে আপনি আর আমি ছাড়া তৃতীয় কোনও ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে না।"

একটু চিন্তা করে সুধীরা বললে, "আচ্ছা, তাই না-হয় হবে।"

সুধীরার দ্বিধাগ্রস্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে বীরেন স্মিতমুখে বললে, "আপনার চিন্তিত হবার কোনও কারণ নেই মিস্ চৌধুরী। সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় কাল আমি আপনার কাছে উপস্থিত হব। এমন কি, আমার আজকালকার নিত্য সঙ্গীটিকে পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে আসব না।"

কৌতূহল সহকারে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কে আপনার আজ-কালকার নিত্যসঙ্গী?—প্রভাময়ী?"

সুধীরার কথা শুনে বীরেন হেসে উঠল; বললে, "প্রভাময়ী নয়, তবে প্রভাময় বটে।" ব'লে জামার তলায় চামড়ার খাপে আবদ্ধ একটা সুবৃহৎ ছোরা মুহূর্তের জন্মে নিষ্কাশিত ক'রে সকলের দৃষ্টির অগোচরে সুধীরাকে দেখিয়ে পুনরায় খাপের মধ্যে রেখে দিলে। গোধূলি আলোকের স্তিমিত কিরণেও সেই ভয়াবহ রক্ত-পিপাসু অস্ত্র উজ্জ্বল প্রভায় চকচক করে উঠল। বীরেন বললে, "কাল কিন্তু আপনার কাছে আসব একেবারে নিরস্ত্র হয়ে।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, "না, তা আপনি আসবেন না। শত্রুপুরীতে আসবেন, কখন কী প্রয়োজন হয় বলা যায় না তো, অস্ত্র আপনি সঙ্গে রাখবেন।"

বীরেনের মুখে নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল; বললে, "এটা যদি আপনার নিজের পুরী হয় তা হলে এটাকে ঠিক শত্রুপুরী বলে মনে হচ্ছে না মিস্ চৌধুরী।" বলে হাসতে হাসতে প্রস্থান করলে।

সাত

ঘণ্টা দুই পরে দ্বিতলের বারান্দার এক প্রান্তে নির্জনে একটা ইজি-চেয়ারে শয়ন করে সুধীরা বীরেনের ঠিক এই শেষোক্ত কথাটাই মনের মধ্যে তন্ন তন্ন করে ভেবে দেখছিল। সহজ স্বল্পতম ভদ্রতার অতিরিক্ত এমন কোন বস্তু বীরেন তার আচরণের মধ্যে আজ খুঁজে পেলে যে-হেতু এই গৃহকে শত্রুপুরী বলে মনে হলো না, তা সে কিছুতেই নির্ণয় করতে পারছিল না। অথচ এই গৃহেই সে আজ রাখাল কর্তৃক কুৎসিতভাবে অপমানিত হয়েছে, এবং তার নিপীড়নের জন্য উৎক্ষিপ্ত বংশদণ্ডের সংক্রুদ্ধ আস্ফালন স্বচক্ষে দেখে গিয়েছে। তবে সে কী কারণে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হলো?

রাখালের অভদ্র আচরণের জন্য তার ক্ষমা প্রার্থনা, অথবা বীরেনের ক্ষতস্থানে তার পরিচর্যা যদি এই ধারণা উৎপন্ন করে থাকে তা হলে বীরেন যৎপরোনাস্তি ভুল করেছে। বৈরসাধনের প্রখরতম মুহূর্তেও উপযুক্ত কারণে শত্রু সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা চলতে পারে, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত শত্রুপক্ষীয় সৈনিকের সাধারণ নীতিগত শুশ্রূষা মূল বিরোধব্যাপারে অবৈরিতার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নয়,—বীরেনের মতো শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণায় এই ধরনের বস্তু-বিচার শক্তির পরিচয় থাকা উচিত ছিল। শত্রুতা এবং ভদ্রতার মধ্যে এমন দুশ্ছেদ্য অসঙ্গতি নেই যে, কোন অবস্থাতেই উভয়কে একত্র করা চলে না। সুতরাং সুধীরার গৃহকে বীরেনের শত্রুপুরী মনে না করবার সপক্ষে কোনও যুক্তি নেই।

বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না, তবুও সুধীরা তার নিজ মনের অন্তঃপুরে একবার দৃষ্টি প্রসারিত করলে। সুদূর দিগন্তেও সেখানে কোনও আবছা নেই। এমন কোনও ঝোপ-ঝাপ আড়াল-অন্তরাল চোখে পড়ল না যেখানে কোনও প্রকার দুর্বলতার অগোচর বসবাস সন্দেহ করা যেতে পারে। তবু মনে হলো অবস্থাটা একবার নিরপেক্ষ কোনও ব্যক্তিকে দিয়ে যাচাই করে নিলে মন্দ হয় না। তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিতে তার আচরণ কীরূপ ঠেকছে জানবার জন্যে মনের মধ্যে একটা কৌতূহল জেগে উঠল।

আসন ত্যাগ করে দুই তিনটা বারান্দা পার হয়ে সুধীরা পূর্বদিকের একটা কক্ষের সম্মুখে এসে ডাক দিলে, "পিসিমা!"

ঘরের ভিতর থেকে মন্দাকিনী বললেন, "আয় সুধা, ঘরে আয়।"

কক্ষে প্রবেশ করে সুধীরা দেখলে মন্দাকিনী শয্যায় শয়ন করে আছেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, "তুমি তো এমন সময়ে শোও না পিসিমা, শরীর খারাপ হয়েছে না কি?"

মন্দাকিনী বললেন, "কোমরটা কেমন কন্‌কন্‌ করছিল, তাই একটু শুয়েছি, বিশেষ কিছু নয়।" তারপর পাশের দিকে একটু সরে গিয়ে বললেন, "বোস্ মা, আমার কাছে এসে বোস।"

"বিছানায় কেন পিসিমা, আমি এই চেয়ারটায় বসছি।" বলে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সুধীরা মন্দাকিনীর নিকটে উপবেশন করলে।

মন্দাকিনী কিন্তু সে কথা শুনলেন না, বাহু ধরে টেনে নিয়ে সুধীরাকে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, "না, তোর চেয়ারে বসতে হবে না, তুই আমার কাছে বোস।"

মন্দাকিনীর কোমরের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করে সুধীরা বললে, "একটু টিপে দেব পিসিমা? আস্তে আস্তে একটুখানি?"

সুধীরার হাত টেনে নিয়ে মন্দাকিনী বললেন, "না, না, টিপে দিতে হবে না। টিপে দিলে আমার কন্‌কনানি আরও বেড়ে যাবে।"

অভিমানের ক্ষুণ্ণ স্বরে সুধীরা বললে "তোমার সেবা করে একটু যে পুণ্যি অর্জন করব, সে সুবিধেটুকুও তুমি দেবে না পিসিমা।"

সহাস্যমুখে মন্দাকিনী বললেন, "তোর শাশুড়ীর কোমর কন্‌কন্ ক'রলে সেবা করে পুণ্যি অর্জন করিস। কিন্তু আমাকে দিয়েও আজ তোর পুণ্যি অর্জন বাদ যায় নি সুধা,—আজ তুই ভারী খুশি করেছিস আমাকে।"

"কিসে পিসিমা?"

"বীরেনের সঙ্গে তোর ব্যবহারে।"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরার মুখমণ্ডলে উৎকণ্ঠার ছায়াপাত হলো। ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে সে বললে, "আমি কিন্তু খুশি হতে পারছিনে পিসিমা,—আমার ভয় হচ্ছে বীরেন বাবু আমাকে ভুল বুঝে না থাকেন।"

বিস্মিত কণ্ঠে মন্দাকিনী বললেন, "কেন, ভুল তোকে কিসে বুঝবে সে?"

এক মুহূর্ত স্থির নেত্রে মন্দাকিনীর দিকে চেয়ে থেকে সুধীরা বললে, "আমার আজকের ব্যবহার থেকে তিনি না মনে করে থাকেন আমি এমন একজন শান্ত-শিষ্ট মানুষ যে, শুধু ক্ষমা চাইতেই জানে, আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধতেই পারে।"

মন্দাকিনীর মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য দেখা দিল। বললেন, "এ ভয় তোর করবার দরকার নেই সুধা, তুই যা মনে করছিস তার চেয়ে বীরেন অনেক বুদ্ধিমান। কোন্ জিনিসের কী অর্থ তা বোঝবার শক্তি তার আছে।"

সুধীরা বললে, "তা হয়তো আছে, কিন্তু আজ যাবার সময় তিনি যে কথা বলে গেলেন তাতে আমার মনে হচ্ছে, আজ আমাকে তিনি ভুল বুঝেছেন।"

মন্দাকিনী বললেন, "কিন্তু তুই-ই যে তাকে আজ ভুল বুঝিসনি, তা-ই বা কী করে জানলি?

সুধীরা বললে, "সমস্ত কথাটা শুনলে তুমি বুঝতে পারবে আমি ভুল বুঝেছি, না তিনি ভুল বুঝেছেন। যাবার সময়ে তিনি বলে গেলেন, লাঠালাঠি তো আছেই, তার আগে তিনি একবার দেখতে চান বিনা লাঠিতে এ বিবাদের নিষ্পত্তি হয় কি না। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কাল সকাল আটটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।"

"বেশ তো, ভালো কথা। কিন্তু বিনা লাঠিতে কী ভাবে নিষ্পত্তি হবে তা কিছু বলেছে?"

"এখনও স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি। বোধ হয় তর্ক করে, যুক্তি দেখিয়ে, ধর্মের দোহাই দিয়ে।" বলে সুধীরা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

মন্দাকিনী নীরবে ক্ষণকাল কী চিন্তা করলেন; তারপর সুধীরার দিকে শান্ত দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "কিন্তু তর্ক ক'রে, যুক্তি দেখিয়ে সে যদি তোকে হার মানায়? ধর্মের দোহাই সত্যিসত্যিই যদি সে তার দিক থেকে দিতে পারে,—তা হ'লে?"

"তা হ'লে, সে কথার মীমাংসার জন্যে তাঁকে বাবার কাছে যেতে বলব,—সে কথার বিচার বাবা করবেন,—আমি নয়। কিন্তু উনি যদি মনে করে থাকেন যে, আমি মেয়েমানুষ বলে মিষ্টি কথায় আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কার্যোদ্ধার করবেন, তা হলে ভুল করেছেন। রুই-পুকুরের জমি থেকে ওঁকে বোল আনা বেদখল না ক'রে আমি কলকাতায় ফিরছিনে।"

"তবে তাকে কাল সকালে আসতে মানা করলিনে কেন? লাঠালাঠি ভিন্ন আর যদি কোনও উপায় না থাকে তবে তার এসে তো কোনও লাভ নেই।"

সুধীরা বললে, "কিন্তু পিসিমা, বীরেন বাবু যদি অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে নিজে থেকে সমস্ত জমির দখল ছেড়ে দেবার কথা বলেন? এ সুবুদ্ধিও তো তাঁর হতে পারে?" এক মুহূর্ত নীরব থেকে হাসতে হাসতে বল্‌লে, "যুদ্ধের ভাষায় বলি,—বিনা যুদ্ধে বীরেন বাবু যদি আত্মসমর্পণ করেন?"

মন্দাকিনী বললেন, "বিনা যুদ্ধে বীরেন যদি আত্মসমর্পণ করে তা হ'লে সেটা লাঠালাঠির চেয়ে সহজ হবে না। আত্মসমর্পণ করলে ওকে সামলাতে সামলাতে তুই অস্থির হয়ে উঠবি, এ আমি বলে রাখলাম। খুব সাধারণ মানুষ সে নয়।"

মহাত্মাজীর অহিংস নীতির উল্লেখ বীরেন করেছিল, সে কথা সুধীরা বিস্মৃত হয়নি; বললে, "সত্যাগ্রহ করবেন না-কি তিনি?"

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "কী করবে তা সে-ই বলতে পারে। এমনও বলতে পারে যে, ও জমি ওদেরও হবেনা; আমাদেরও হবে না, ও জমির ওপর গ্রামের লোকের ব্যবহারের জন্যে লাইব্রেরী, হরিসভা বা ঐ ধরনের কিছু হবে।"

সুধীরা বললে, "এমনই কোনও প্রস্তাব যদি তিনি করেন, তা হ'লে তারও বিচার হবে বাবার কাছে। আমি এখানে কোনও মাঝামাঝি রফা-নিষ্পত্তি ক'রতে আসিনি পিসিমা।"

সহাস্যমুখে বিস্ময় ও বিরক্তি মিশ্রিত হয়ে মন্দাকিনী বল্‌লেন "কী জ্বালা! তুই কি তা হ'লে এখানে শুধু লাঠালাঠি করতেই এসেছিস্!"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরাও হেসে ফেল্‌লে; বল্‌লে, "তাও আসিনি পিসিমা। এসেছি রুইপুকুরের জমি থেকে বীরেন চাটুয্যেকে বেদখল করতে। কিন্তু তার জন্যে আমাদের যদি লাঠালাঠি করতে তিনি বাধ্য করেন তা হ'লে

অপরাধ কোথায় বল ?"

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "তা বলতে পারিনে, কিন্তু বীরেনদের সঙ্গে লাঠালাঠিটাও খুব সহজ হবে না সুধা। সে নিজে একজন পাকা লাঠিয়াল, তার ওপর কলকাতা থেকে করিম নামে একজন নামজাদা গুণ্ডা এনেছে। দশটা লোককে ভূমিশায়ী করবার আগে একটা চোট্ খাবে না, এমন দুর্দান্ত লেঠেল সে।"

সুধীরা বল্‌লে, "জানি।"

"কিন্তু আর একটা কথা বোধ হয় জানিস নে।"

"কী কথা ?"

কী ভাবে কথাটা ব্যক্ত করবেন বোধ করি তাই ভাবতে মন্দাকিনী এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন তারপর সুধীরার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "কুমারগঞ্জের জমিদার রঘুনাথ রায়কে জানিস তো ?"

ঘাড় নেড়ে সুধীরা বল্‌লে, "জানি।"

"আমাদের একটা ব্যবহারে রঘুনাথ রায় আমাদের ওপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হ'য়ে আছে, তা-ও বোধ হয় জানিস ?"

মন্দাকিনীর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদুস্বরে সুধীরা বল্‌লে, "হ্যাঁ, তা-ও জানি।"

"রঘুনাথ রায় বীরেনকে ব'লে পাঠিয়েছে যে, দরকার হ'লে তার কৈবর্ত আর বাগ্দী প্রজাদের মধ্য থেকে পঁচিশ জন বাছা লেঠেল বীরেনের সাহায্যে পাঠিয়ে দেবে।"

মন্দাকিনীর কথা শুনে মুহূর্তের জন্যে সুধীরার মুখে উদ্বেগ দেখা দিলে; কিন্তু পরক্ষণেই শান্তমুখে সে বল্‌লে, "এ কথা তুমি জানলে কেমন করে পিসিমা ?—বীরেনবাবু তোমাকে বলেছেন ?

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "বীরেন হলো শত্রুপক্ষ,—সে কখনও তার সুবিধে অসুবিধের কথা আমাকে বলে ? রঘুনাথ রায়ের একজন আমলা আমাদের মহেশ গোমস্তাকে এ কথা বলেছে। আধ ঘণ্টাটাক হলো মহেশ আমাকে এ কথা বল্‌তে এসেছিল।"

সুধীরা বললে, "মহেশবাবু যখন তোমার কাছে আসছিলেন, আমার সঙ্গে বারান্দায় দেখা হয়েছিল। আমাকে কিন্তু তিনি কিছু বলেননি।"

"সব কথাটা তোকে বলতে সাহস করেনি বলেই বলেনি।"

বিস্মিতকণ্ঠে সুধীরা বললে, "কেন ? সাহস করেননি কেন ?"

মন্দাকিনী বললেন, "রঘুনাথ রায় শুধু বীরেনকে সাহায্য করবার কথাই বলেনি; বলেছে আমরা যদি এখনও তার কথায় রাজি হই তা হ'লে বীরেনের বিরুদ্ধে আমাদেরই সাহায্য করবে। এ কথা মহেশ তোকে সোজাসুজি বলতে পারেনি।"

সুধীরার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; বললে, "না, আমাদের সাহায্য করবার

দরকার নেই, বীরেনবাবুকেই তিনি সাহায্য করুন।"

কুমারগঞ্জের রায়েরা পলতাডাঙার ঠিক পার্শ্ববর্তী জমিদার। বগুড়া এবং রাজসাহী জেলায় তাদের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি। রঘুনাথ রায় তরফ আট আনার একমাত্র স্বত্বাধিকারী। বৎসর দুই হলো সে পিতৃহীন হয়েছে, এবং এখনও এক বৎসর হয়নি তার স্ত্রী তিন বৎসরের একটিমাত্র কন্যা রেখে পরলোক গমন করেছে। মৃত্যুর মাস আষ্টেক পূর্বে পীড়িতা পত্নীকে নিয়ে রঘুনাথ চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যাচ্ছিল, দুর্গাপূজা সমাপন করে কন্যাসহ উমাশঙ্কর চৌধুরীও কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, নাটোর রেল স্টেশনে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ। পূর্বে সীমানা সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদ ও মামলা-মকর্দমা হেতু কুমারগঞ্জ এবং পলতাডাঙার জমিদারদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু রঘুনাথের পিতামহর আমলে একটি বিবাহ-ঘটনা উভয় পক্ষকে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করে, এবং তদবধি পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্যের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। উমাশঙ্কর নাটোর থেকে কলিকাতা পর্যন্ত একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করেছিলেন, রঘুনাথের কিন্তু রিজার্ভের ব্যবস্থা ছিল না রোগাতুর রঘুনাথ-পত্নীর যন্ত্রণা এবং অবসন্নতা দেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উমাশঙ্কর স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সযত্নে নিজ কক্ষে স্থান দিয়েছিলেন, এবং সুধীরা যথাসাধ্য সাহচর্য এবং সেবা-পরিচর্যার দ্বারা পীড়িতার কষ্টের লাঘব করতে চেষ্টা করেছিল।

সেই সময়ে পাঁচ ছয় ঘণ্টাকালব্যাপী একত্র যাপনের সুযোগে সুন্দরী সুধীরার অপরূপ লাবণ্য এবং সুমধুর ব্যবহার দেখে রঘুনাথ মুগ্ধ হয়। সেই মোহ মনের মধ্যে লোভের সঞ্চার যে করেনি তা নয়, কিন্তু মৃত্যুলোকযাত্রিণী স্ত্রীর স্বল্পাবশিষ্ট আয়ু সেই লোভকে তখন নিরুপায় করে রেখেছিল। কিন্তু বাধা অপসৃত হওয়ার মাস তিনেকের মধ্যে রঘুনাথের পক্ষ হতে উমাশঙ্করের নিকট বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত হলো।

নাটোর রেল স্টেশনে সুধীরার সাক্ষাৎলাভ এবং কলিকাতা পর্যন্ত তার সহিত একত্র যাপন দৈবের অঙ্গুলি-সংকেত বলে রঘুনাথের মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, সে ঘটনা যেন রিক্ত করবার পূর্বেই সৌভাগ্য-দেবতা কর্তৃক ক্ষতিপূরণের আশ্বাস প্রদান,—নদীর এক কূল ভাঙবার আগে অপর কূলে চর জাগাবার পূর্ব লক্ষণ। সুধীরার বয়সের তুলনায় বয়স তার বেশি নয়, এবং সুধীরার পৈত্রিক সম্পত্তির তুলনায় তার সম্পত্তি যথেষ্ট বেশি। সুতরাং সফলতার বিষয়ে মন একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিল। কিন্তু তথাপি কুলপুরোহিত যাদবনাথ তর্কালঙ্কার যখন উমাশঙ্করের অসম্মতির দুঃসংবাদ বহন করে বিরসমুখে কলিকাতা থেকে ফিরে এলেন তখন রঘুনাথের বিস্ময় ক্রোধকে পরাভূত করলে। মনে হলো অকৌশলী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কার্যপটুতার অভাব বশত সমস্ত ব্যাপারটা পণ্ড করে এসেছে। শেষ পর্যন্ত, লালসার রসায়নে প্রত্যাখ্যানের অবমাননা এবং গ্লানি জীর্ণ হলো। রঘুনাথ তার ম্যানেজার রামশরণ লাহিড়ীকে পুনর্বার উমাশঙ্করের নিকট

প্রেরণ করে।

উমাশঙ্করের নিকট উপস্থিত হ'য়ে রামশরণ কুমারগঞ্জ আট আনী জমিদারের সম্পদ এবং প্রতিপত্তির বিস্তারিত ফিরিস্ত খুলে বসল। শত শত ক্রোশব্যাপী সুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি, লক্ষ লক্ষ টাকার বৃহৎ মহাজনী কারবার, কত ক্ষেত খামার, কত খাল বিল পুষ্করিণী, কত জলকর বনকর ফলকর, কত নদ নদী চরভূমি, কত তালুক মৌজা মহাল। এই বিপুল সম্পত্তির সহিত পলতাডাঙার বিস্তৃত সম্পত্তি মিলিত হ'লে একটা ছোট-খাট রাজ্যে পরিণত হবে। কুমারগঞ্জের একমাত্র মালিক রঘুনাথ রায় পলতাডাঙার একমাত্র অধিকারিণী সুধীরা রায় চৌধুরী। এত বড় সংযুক্ত ভূখণ্ডের শরিক নেই, ভাগ নেই, বাটোয়ারা নেই।

এত প্রলোভনেও কিন্তু উমাশঙ্কর প্রলুব্ধ হলেন না; বললেন, এ যদি শুধু কুমারগঞ্জের সহিত পলতাডাঙার মিলনের কথা হতো তা হলে আপত্তির কারণ ছিল না; কিন্তু এর সহিত যখন দুটি মানব-চিত্তের পরস্পর যোগের কথাও জড়িত রয়েছে তখন কেবলমাত্র জমিদারীর যোগের কথা ভাবলেই চলবে না।

নির্লোভতার অতল গর্ভে তালুক মৌজা মহাল মগ্নপ্রায় দেখে প্রভুর নিকট প্রতিষ্ঠানাশের দুশ্চিন্তায় রামশরণের মুখ শুষ্ক হয়ে উঠল। সে অনেক যুক্তি-তর্ক দেখলে, অনেক উপরোধ-অনুরোধ করলে, এমন কি অবশেষে খানিকটা বিরক্তি এবং অসন্তোষ প্রকাশ করতেও ছাড়লে না কিন্তু সসন্তান স্বল্পশিক্ষিত দ্বিতীয়পক্ষ পাত্রের হস্তে সুধীরাকে অর্পণ করতে উমাশঙ্কর কিছুতেই স্বীকৃত হ'লেন না, আশাহত অসন্তুষ্ট রামশরণকে মিষ্টি কথায় বিদায় দিলেন।।

পুনরায় দ্বিতীয়বার বিফল মনোরথ হয়ে রঘুনাথ ক্রোধে এবং অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। প্রকাশ্যে উমাশঙ্করকে অভিসম্পাত দিলে, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, প্রথম সুযোগেই এই দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। সুযোগ উপস্থিত হতেও অধিক বিলম্ব হলো না। তার নিজ এলাকার অধিবাসী সুপ্রসিদ্ধ দাঙ্গাবাজ বাগ্দী এবং কৈবর্ত প্রজাদের মধ্য থেকে পলতাডাঙার চৌধুরীরা লাঠিয়াল সংগ্রহের চেষ্টা করছে জানতে পেরে অনুসন্ধানের দ্বারা সে চাটুয্যেদের সহিত চৌধুরীদের বিবাদের কথা অবগত হলো। এই বিবাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে সহজে তার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে বিশ্বাস করে অবিলম্বে সে তার বিশ্বস্ত আমলা গোবিন্দ ঘোষকে বীরেনের কাছে পাঠালে চৌধুরীদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ সহযোগিতার প্রস্তাব করে। শুধু লোকবলই নয়, প্রয়োজন হলে অর্থবলের দ্বারাও সহায়তা করতে প্রস্তুত আছে এমন ইঙ্গিতও করলে। এই অযাচিত উপচিকীর্ষার আন্তরিকতার বিষয়ে বীরেনের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য গোবিন্দ রঘুনাথের প্ররোচনার গোপন হেতুটিও বীরেনের নিকট কতকটা প্রকাশ করলে।

বীরেন কিন্তু রঘুনাথের প্রস্তাবিত সাহায্য গ্রহণ করতে অসম্মত হলো; বিশেষত রঘুনাথের উপচিকীর্ষার যথার্থ কারণ অবগত হয়ে সে বিষয়ে তার আরো প্রবৃত্তি হলো না। বিবাহের প্রস্তাবে যে অযোগ্য পাত্র কন্যাপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

হয়েছে, তার উত্তেজনাকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করতে বীরেন হীনতা বোধ করলে। ভগ্নমনোরথ গোবিন্দ ঘোষ বীরেনের নিকট হতে শুধু শুষ্ক ধন্যবাদ বহন করে পথে এসে দাঁড়াল।

গ্রামেই তার দূরসম্পর্কিত বৈবাহিক এবং বাল্যবন্ধু মহেশ মিত্রের বাস। মহেশ মিত্র চৌধুরী বংশের একজন কর্মচারি। মহেশের গৃহে উপস্থিত হয়ে গোবিন্দ একেবারে তার হাত চেপে ধরলে; বললে, "দোহাই বেই, যেমন করে পার এর একটা ব্যবস্থা কর, নইলে যে, মুখ থাকবে না তাই নয়, বোধহয় চাকরিও থাকবে না।" সব কথা শুনে বিপন্ন মহেশ বিমূঢ়ভাবে বললে, "কিন্তু বীরেন চাটুয্যেকে রাজিকরাতে চেষ্টা করছি জানতে পারলে আমারও তো চাকরি থাকবে না গোবিন্দ!"

গোবিন্দ বললে, "আহা হা, বীরেন চাটুয্যেকে রাজি করবার চেষ্টা করতে কে তোমাকে বলছে? চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা তো এখন এখানেই রয়েছে, যেমন করে পার তাকে রাজি করো। সে যদি আমাদের মহারাজাকে বিয়ে করতে রাজি হয় তা হলে বীরেন চাটুয্যের অরাজি হওয়াই শুধু সামলে যাবে না, সমস্ত চাটুয্যে গুষ্টিকে এই পলতাডাঙা গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে দোব, আর পাঁচ শ টাকার তোড়া নিজে ব'য়ে এনে তোমার বাড়িতে রেখে যাব।" শুনে মহেশ মিত্রের লোভ হলো, কিন্তু ভরসা হলো না; বললে, "তুমি যখন এত করে বলচ তখন একবার দস্তুর মতো চেষ্টা করে দেখব, কিন্তু আশা-টাশা কোরো না। বাপের চেয়ে মেয়ে এক কাঠি দড়ো এ মনে রেখো।" চক্ষু কুঞ্চিত করে গোবিন্দ বললে, "লোভ দেখাও না! দশ হাজার টাকার অলঙ্কারের লোভ দেখাও। যতই হোক, শেষ পর্যন্ত মেয়েমানুষ তো!" গোবিন্দর পরামর্শ শুনে মহেশ মিত্রের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল; বললে, "বাপকে পিছনে রেখে যে-লোক বীরেন চাটুয্যের মতো একজন পুরুষমানুষের সঙ্গে লাঠালাঠি করতে আসে সে কেমন মেয়েমানুষ তা বুঝতে পারছ না? আমি তাকে দশ হাজার টাকার অলঙ্কার দেখাতে গেলে সে আমাকে কী মূর্তি দেখাবে তাই ভাবছি!"

ভেবে-চিন্তে মহেশ প্রথমে মন্দাকিনীর নিকটে কথাটা পাড়লে, কিন্তু ফল হলো একই। মন্দাকিনী বললেন, "দশ হাজার টাকার অলঙ্কার কি রঘুনাথ রায়ের জমিদারী ছাড়া আলাদা জিনিস যে, দশ হাজার টাকার লোভ দেখাচ্ছ মহেশ? সে তো তার সমস্ত জমিদারীরই লোভ দেখিয়েছিল। দোজবরে পাত্রে আমরা কিছুতেই মেয়ে দেব না, এ তুমি ভালো ক'রে তোমার বেইকে বুঝিয়ে দিয়ো।"

এই হলো পূর্বের কথা। সুতরাং সুধীরার সহিত মন্দাকিনীর খুব সংক্ষেপেই এ বিষয়ে কথা শেষ হলো। মন্দাকিনী বললেন, "রঘুনাথ রায়ের কথা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না সুধা, সে-কথার শেষ উত্তর আমি মহেশকে দিয়ে দিয়েছি। কাল বীরেনের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখি, সে কী বলে। তারপর তার সঙ্গে রঘুনাথ একান্তই যদি যোগ দেয় তাহলে কী আমাদের করতে হবে না,

হবে সে কথা তখন ভেবে দেখা যাবে।"

আরও কিছুক্ষণ মন্দাকিনীর সহিত কথোপকথনের পরে সুধীরা ঘর হতে নিক্রান্ত হয়ে বারান্দায় এল। অদূরে প্রভাময়ীকে মন্দাকিনীর কক্ষাভিমুখে আসতে দেখে সে দাঁড়িয়ে রইল। প্রভাময়ী নিকটে এসে বললে, "কোথায় যাচ্ছ?—পিসিমার কাছে?"

অপ্রতিভ মুখে প্রভা বললে, "হ্যাঁ।"

"পিসিমা চিরকাল এখানে আছেন, তাঁর ঘরে তো গেলেই হলো, আমি দুদিনের জন্যে এসেছি, আমার ঘরে যাও না কেন?"

এ কথার কোন উত্তর প্রভা দিলে না, শুধু তার মুখমণ্ডলে মৃদু হাস্য ফুটে উঠল।

সুধীরা বললে, "আসবে আমার ঘরে?"

"আপনার কোনও অসুবিধা হবে না তো?"

"তোমার কোনও অসুবিধা হবে না তো?"

মাথা নেড়ে প্রভা বললে, "না।"

"তবে এস আমার সঙ্গে।" বলে সুধীরা অগ্রসর হলো। সুধীরাকে অনুসরণ করে প্রভাময়ী তার কক্ষের ভিতর প্রবেশ করলে।

একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে সুধীরা বললে, "বোসো।"

কুণ্ঠিতভাবে প্রভা চেয়ারের সম্মুখ ভাগের একটু অংশ অধিকার করে উপবেশন করলে।

শয্যার উপর পাশ ফিরে শুয়ে করতলে মাথা রেখে প্রভাময়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করে সুধীরা বললে, "তুমি বীরেনবাবুর চর,—না?"

অকস্মাৎ সুধীরার প্রশ্নে প্রভাময়ীর মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করলে; ভয়ে ভয়ে বললে, "চর আপনি কাকে বলেন?"

সুধীরা বললে, "শত্রুপক্ষের বাড়িতে এসে যে গুপ্ত কথা জেনে নিয়ে গিয়ে জানিয়ে দেয়, তাকে চর বলি।"

শুনে প্রভাময়ীর মুখ থেকে উদ্বেগের চিহ্ন কতকটা অপসৃত হলো; বললে, "তা হলে আমি চর নই; আমি গুপ্ত কথা শুনিইনে, তা বলব কেমন করে!"

"তা হলে কোন্ কথা বলো?"

এক মুহূর্ত সুধীরার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মনে মনে কী চিন্তা করে প্রভাময়ী বললে, "যে কথা এমনি শুনতে পাই তা হয়তো বলি।"

"কিন্তু বীরেনবাবুর তেমন কোনও কথা তো আমাদের কাছে তুমি বলো না!"

সকৌতূহলে প্রভা জিজ্ঞাসা করলে, "কী কথা?"

"যে সব কথা এমনি তাঁর কাছে শুনতে পাও? এই ধর, কবে তিনি তোমাকে বিয়ে করবেন সেই কথা?" তারপর প্রভাময়ী কোন উত্তর দেবার পূর্বেই বললে, "না, সে বুঝি তোমার গুপ্তকথা? সে কথা বুঝি বলতে নেই?"

প্রভাময়ীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশিত হলো। বললে, "দেখুন দেখি, আপনিও যদি এই সব কথা বলবেন, তা হলে অন্যের দোষ কী।"

প্রভাময়ীর প্রতিবাদের ভঙ্গি দেখে সুধীরা হেসে ফেললে; বললে, "সত্যিই অন্যের কোনও দোষ নেই। বীরেনবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, এ তো ভালো কথা। বীরেনবাবুকে তুমি কি তোমার অযোগ্য পাত্র মনে কর?"

সুধীরার কথা শুনে প্রভা চকিত হয়ে উঠল, বললে, "ছি, ছি! আমি কি তাই বলছি? রাজকন্যের সঙ্গে বীরুদার বিয়ে হলে তবে শোভা পায়, আর আমার মতো গরীবের মেয়ে তাঁকে অযোগ্য পাত্র মনে করবে?"

সুধীরা বললে, "তা হলে কিন্তু তোমার বীরুদার বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। আমাদের এই গরিব বাংলা দেশে রাজকন্যে তিনি পাবেন কোথায়?"

সুধীরার কথোপকথনের মধ্যে সরসতার পরিচয় পেয়ে প্রভাময়ীর মনে সাহসের সঞ্চার হয়েছিল, বললে, "কেন পাবেন না? এই তো আপনিই রয়েছেন।"

বিস্ময়ের কপট সুরে সুধীরা বললে, "আমি! আমি তো রাজকন্যে নই, আমি সামান্য জমিদার কন্যে, আমি তাঁর যোগ্য হব কেমন করে?" তারপর হঠাৎ মনে মনে কিসের আশঙ্কা করে ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, "তুমি চর হতে চাও না তো প্রভা?"

প্রভা বললে, "না।"

"গুপ্ত কথা বলে দিলে চর হয় তা জান তো?"

"জানি।

"আমি তোমাকে এতক্ষণ যা কিছু বললাম, সব গুপ্ত কথা। খবরদার এসব কথা তোমার বীরুদাকে বোলো না, তাহলে তোমাকে চর মনে করব। চরের সঙ্গে চোরের কতটুকু তফাৎ জান তো? শুধু একটা 'ও' কারের। চোর চুরি করে টাকাকড়ি, আর চর চুরি করে কথা।"

প্রভাময়ী এ কথার কোন উত্তর দিলে না, শুধু একটু হাসলে।

প্রায় অর্ধঘণ্টা কালব্যাপী কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সুধীরা প্রভাময়ীর নিকট হতে অনেক সংবাদ অবগত হলো। গ্রামের কথা, বীরেনের কথা, প্রভাময়ীদের গৃহ-সংসারের কথা, এমনকি রাখাল ঘটকেরও কিছু-কিছু কথা। অবশেষে প্রভাময়ীকে বিদায় দিলে; বললে, "আচ্ছা, এবার পিসিমার কাছে যাও; কিন্তু এর পর থেকে আমার কাছে না এসে যদি খালি পিসিমার কাছেই যাও তাহলে তোমাকে তোমার বীরুদার চর বলেই মনে করব।"

"না, আপনার কাছেও আসব।" বলে সহাস্যমুখে প্রভাময়ী প্রস্থান করলে।

আট

পরদিন বীরেন যখন সুধীরাদের গৃহে উপস্থিত হলো তখন তাদের বারান্দার ঘড়িটায় ঢং ঢং করে আটটা বাজছে। সিঁড়ির দুপাশে দুটো সুবৃহৎ কামিনী ঝাড়। অসময়ের ফুল, কিন্তু পরিচর্যার গুণে অজস্র ফুটে রয়েছে। তার অলস মিষ্টি গন্ধে বায়ু ভারাক্রান্ত। অদূরে একটা সুদৃশ্য উচ্চ পিত্তলের দাঁড়ের উপর শিকলে বাঁধা একটা কাকাতুয়া বসে ছিল। ঘাড় বেঁকিয়ে বীরেনকে দেখে বার দুই পাখা ঝাপটা দিয়ে 'কে এলো, কে এলো' করে উঠল।

বেণী নামীয় একজন পরিচারক, বোধহয় সুধীরা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, নিকটে কোথাও অপেক্ষা করছিল,—কাকাতুয়ার কথা শুনে সামনে এসে বীরেনকে দেখতে পেয়ে যুক্ত করে প্রণাম করলে, তারপর বারান্দার এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বীরেনকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললে, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, দিদিরাণীকে খবর দিচ্ছি।" বলে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলে।

কক্ষটি ক্ষুদ্র, কিন্তু নিরতিশয় পরিচ্ছন্ন। ভূমিতল উৎকৃষ্ট গালিচার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছাদিত। মধ্যস্থলে মেহগেনি কাঠের একটি উজ্জ্বল পালিশ করা গোল টেবিল। তার মাঝখানে কারুকার্যখচিত একটি ফুলদানীতে সদ্য-আহৃত একগুচ্ছ পুষ্পিত কামিনী ফুলের পল্লব। ঘরের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র রাইটিং টেবিল, এবং অপর পার্শ্বে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটি আরামদায়ক সোফা। দক্ষিণদিকের দেওয়ালে জানালার পার্শ্বে একটি দীর্ঘ মূল্যবান ক্লক প্রায় নিঃশব্দে পেণ্ডুলাম পরিচালনা করছে। বাহিরের দিকের দুইটি গবাক্ষে ফিকা নারাঙ্গি রঙের পর্দা আঁটা, তজ্জন্য ঘরের আলোকের প্রখরতা অনেকটা মন্দীভূত।

গোল টেবিলের দুই দিকে রাখা দুইখানা চেয়ারের মধ্যে একখানা অধিকার ক'রে বীরেন সুধীরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। শিকারের অপেক্ষায় শিকারিরা মন যেমন তন্ময় হ'য়ে ওঠে তার মনের মধ্যে তেমনি তন্ময়তা, কিন্তু সে তন্ময়তা আগ্রহের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। পূর্ব দিন সুধীরার সংস্পর্শে আসার পর সে বুঝেছে, তার সহিত সংঘর্ষ নিতান্ত সহজ হবে না। কিন্তু তারপর থেকে সুধীরার উপর তার শ্রদ্ধা ঠিক সেই অনুপাতে বর্ধিত হয়েছে শিকারের উপর শিকারীর শ্রদ্ধা যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় যখন সে বুঝতে পারে তার শিকার হরিণী নয়, বাঘিনী।

মিনিট দুয়ের মধ্যে ভিতরের দিকের দ্বারের পর্দা স'রিয়ে কক্ষে সুধীরা প্রবেশ করলে। এই মাত্র যে স্নান সমাপন করেছে, তার স্নিগ্ধতা দেহে এবং কেশে সুস্পষ্ট; মুখে আতিথেয়তার প্রসন্ন দীপ্তি। আজ যেন সে বাদিনী নয়, প্রতিবাদিনীও নয়; আজ সে অতিথিপরা পুরকন্যা।

আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে যুক্ত করে সহাস্য মুখে বীরেন বললে, "নমস্কার।"

সুধীরাও যুক্তকরে নমস্কার ক'রে বললে, "নমস্কার। বসুন, বসুন।"

উভয়ে আসন গ্রহণ করলে বীরেন বললে, "আমি যখন বারান্দায় উঠছি তখন আপনার ঘড়িতে আটটা বাজছে। আপনার ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে আমার মনের কাঁটার কতখানি যোগ দেখছেন?"

সুধীরা স্মিতমুখে বললে, "আপনি খেলোয়াড় মানুষ, সময়ের প্রতি নিষ্ঠা আপনার থাকবারই কথা।"

সুধীরার কথা শুনে বীরেনের মুখে নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল; বললে, "বিশেষতঃ আজকের খেলাটা যখন এমন গুরুতর যে, তার পরিণতি সুধাও হ'তে পারে, গরলও হ'তে পারে। কিন্তু পরিণতি যাই হোক না কেন, এই রকম মারাত্মক খেলার এমন একটা আকর্ষণ আছে যে আজকের এই মুহূর্তটির জন্যে কাল থেকে মনের মধ্যে শুধু আগ্রহই নয়, একটা আনন্দও জেগে রয়েছে।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "আনন্দ কেন?"

"এত বড় খেলাটা অদৃষ্টে জুটে গেল, তার একটা আনন্দ নেই?"

"কিন্তু এ খেলাতে আপনার হার হ'তেও তো পারে?"

স্মিতমুখে বীরেন বললে, "তা হয়তো পারে; কিন্তু মিস্ চৌধুরী, ছোট খেলায় জিতে আমি যে আনন্দ পাই, বড় খেলায় হেরে অনেক সময়েই তার চেয়ে বেশি পেয়ে থাকি। ভূমৈব সুখং, উপনিষদের এ বাণী, এ জীবনের হার-জিতের মধ্যেও খাটে। সে হিসেবে আপনার কাছে হারও আমার পক্ষে আনন্দের বস্তু হ'তে পারে।"

অজ্ঞাতসারে সুধীরার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল; বললে, "আমি সামান্য স্ত্রীলোক ব'লে না-কি?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "না—আপনি অসামান্য স্ত্রীলোক ব'লে।"

ভ্রূকুঞ্চন অনেকখানি মিলিয়ে গেল। বীরেনের মুখের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সুধীরা বললে, "না,—আমি অসামান্য স্ত্রীলোক নই।

বীরেনের মুখে মৃদু হাস্য ফুটে উঠলো; বললে, "ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, পদ্মরাগ মণি যদি বলে, আমি অসামান্য বস্তু নই, তা হ'লে জহুরীকেও কি সে কথা স্বীকার করতে হবে?"

এবার ঠিক ভ্রূকুঞ্চন দেখা গেল না, তৎপরিবর্তে মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠল। বীরেনের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আসন ত্যাগ ক'রে উঠে গিয়ে দক্ষিণ দিকের গবাক্ষের পর্দাটা একটু সরিয়ে দিয়ে সুধীরা বললে, "এবার তা হ'লে কাজের কথা আরম্ভ করুন। Non-violent method-এর দ্বারা কী ক'রে এ বিবাদের মীমাংসা করতে চান তা বলুন।" কাজের কথা উত্থাপিত ক'রেই কিন্তু অন্য একটা কথা মনে পড়ল, কাজের কথা আরম্ভ হ'য়ে গেলে যা উত্থাপিত করার মতো আবহাওয়া হয়তো নাও থাকতে পারে। বললে,

"আপনার হাতের অবস্থা কী রকম? ঘা শুকিয়ে গেছে তো?"

আমার হাতটা সরিয়ে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অংশটা বার করে বীরেন বললে, "এখনও খুলিনি। খুলে দেখব নাকি?"

"দেখুন না।"

বাম হাত দিয়ে সেফ্‌টিপিনটা খুলে বীরেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বস্ত্র-খণ্ডটা উন্মোচিত করলে; তারপর তুলো ধ'রে একটু টান দিতেই সমস্ত তুলোটাই উঠে এল, শুধু ক্ষতর শুকনো মুখে-মুখে একটুখানি কবে লেগে রইল।

"এগুলো এখানে ফেলতে পারি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় ফেলুন।"

বস্ত্র এবং তুলা ভূমিতলে নিক্ষেপ ক'রে বাম করতল দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে বীরেন বল্‌লে, "নাঃ—একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

"বেদনা আছে?"

"একটুও নেই। থাকবার উপায় কোথায় মিস্ চৌধুরী? শুধু তো টিঞ্চার আয়োডিনই নয়, টিঞ্চার আয়োডিনের সঙ্গে আর একটা যে ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন তার শক্তি যে অদ্ভুত।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুধীরা বললে, "কই, আর কিছু দিইনি তো।"

কৌতুকের মৃদু হাস্যে বীরেনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, বললে, "দিয়েছিলেন, ভুলে গেছেন। গাছগাছড়া জড়িবুটির মতো কিছু নয়, মধু জাতীয় পদার্থ।" বিমূঢ় সুধীরার বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "বুঝতে পারছেন না? নিরাপ সমবেদনা,—মানস-পদ্মবনের সামগ্রী।" বলে হাসতে লাগল।

শুনে সুধীরার মনের মধ্যে বিস্ময় গভীরতর হলো। তা হলে সত্যসত্যই ওষুধ-পত্র নয়—কৌতুক,—কাব্য। কোথা দিয়ে কেমন করে মনে পড়ে গেল গত কল্যকার কথা,—রাখাল নটককে দুই বাহুর উপর তুলে ধরে দুলিয়ে নিয়ে বেড়ানো।

অদ্ভুত লোক এই বীরেন চাটুয্যে, আর অদ্ভুত তার কার্যকলাপ, প্রণালী-পদ্ধতি! যার সঙ্গে হাতাহাতি করবার কথা, তাকে বুকে নিয়ে দুলিয়ে বেড়ায়, আর, যার সঙ্গে করবার কথা বচসা-বিতর্ক, তার সঙ্গে করে কাব্য! রাগ হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না শক্তিকে সংহত করে আঘাত করবার পূর্বেই কোন্ ছিদ্র-পথ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে শক্তি তার বেগ হারায়।

"মিস্ চৌধুরী!"

জিজ্ঞাসু নেত্রে সুধীরা বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"চুপ ক'রে রয়েছেন যে? আমার কথায় রাগ করলেন নাকি?"

'রাগ করিনি'র চেয়ে 'রাগ করেছি' বললে হয়তো ব্যাপারটাকে ঘোরালো করবার সুযোগ আরও অধিক দেওয়া হবে; সুতরাং বললেই হলো, "না"।

উৎফুল্ল মুখে বীরেন বললে, "তা হ'লে সাহস পেয়ে একটা জিনিস আপনার কাছে ভিক্ষে চাচ্ছি।"

শুনে সুধীরা চিন্তিত হলো। সাহস পাওয়ার পূর্বেও যে ব্যক্তির সাহসের অন্ত থাকে না, সাহস পাওয়ার পর সহসা সে কোন্ অদেয় বস্তু চেয়ে বসবে তা কে জানে! জড় জগতের কোনও পার্থিব বস্তুর পরিবর্তে যদি মানস-পল্লবনের কোনও অপার্থিব সামগ্রী হয়, তা হ'লেই তো বিপদ! সেরূপ অবস্থায় আতিথ্যধর্ম পালনের দাবি মেটানো হয়তো কঠিন হ'য়ে উঠবে। ভয়ে ভয়ে সুধীরা বললে, "কী, বলুন?"

ব্যাণ্ডেজে ব্যবহৃত সেফ্‌টিপিন্‌টা টেবিলের উপর প'ড়ে ছিল; সেটা তুলে ধ'রে বীরেন বললে, "এই সেফ্‌টিপিন্‌টি।"

সেফ্‌টিপিন্‌টি। দু'পয়সায় এক ডজন পাওয়া যায়, সেই রকম একটা সেফ্‌টিপিন্! প্রার্থিত বস্তুর পার্থিবতায় এবং সামান্যতায় সুধীরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশ্বস্ত হ'তে পারল না। মনে হলো, একটা অকিঞ্চিৎকর সেফটিপিনের যৎসামান্য বস্তু-ভাগের মধ্যে তার সমস্ত অভিপ্রায় আবদ্ধ হয়ে আছে, এমন মানুষই নয় বীরেন চাটুয্যে। ক্ষুদ্র পিনের অন্তরালে যে উদ্দেশ্য অবস্থান করছে তা নিশ্চয় ক্ষুদ্র নয়, এই আশঙ্কা ক'রে ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কী হবে আপনার এই সামান্য সেফটিপিনে?"

বীরেন বললে, "সামান্য নয় মিস্ চৌধুরী,—এই সেফটিপিনটি আপনার কাছে সামান্য হলেও আমার কাছে অসামান্য। আপনার সঙ্গে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত হয়তো তার সবটাই আমার দিক দিয়ে পরাজয়ের কাহিনী হবে। সেই অন্ধকারের ইতিহাসের মধ্যে যে মুহূর্তটি উজ্জ্বল, এই সেফটিপিন তার সাক্ষী। করুণা দিয়ে কাল আপনাকে জয় ক'রে আমি এটি অধিকার করেছি মিস্ চৌধুরী। সুতরাং বুঝতে পারছেন, এই জয়-চিহ্ন আমার কাছে সামান্য বস্তু নয়।" ব'লে হাসতে লাগল;

এ কথার উত্তর নেই। কলহের দ্বারা এ কথার প্রতিবাদ করতে যাওয়া যেমন অশোভন, নিরুত্তরের দ্বারা এ কথাকে পরিপাক ক'রে নেওয়াও তেমনি কঠিন! লাঠালাঠির বিষয়ে বিতর্ক করতে এসে যে নির্লজ্জ ব্যক্তি এমন রসগভীর কথা বলতে পারে, তার কাছে মুখর হ'তে পারে এমন নির্লজ্জতা সুধীরার নেই। তথাপি সে একেবারে চুপ ক'রে থাকতেও পারলে না; বললে, "ছোট জিনিসকে আপনি অত্যন্ত বড় ক'রে তুলতে পারেন বীরেন বাবু!"

সহাস্যমুখে বীরেন বললে, "না, মিস্ চৌধুরী, আমি যাদুকর নই,—সে ক্ষমতা আমার নেই। তবে বড় জিনিসের সম্পর্কিত সব জিনিসকেই আমি বড় ক'রে দেখে থাকি। যে ডালটি আমার কাছে বড়, তার পাতাটিও আমার কাছে ছোট নয়। দোকানদারের পাতায় আঁটা সেফটিপিন, আর আপনার ব্লাউস থেকে খুলে দেওয়া সেফটিপিন আমার কাছে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু।"

এ কথা শুনে সুধীরার মনে গভীর অনুতাপ হলো। মনে মনে বললে, 'ভালো করিনি কথার উত্তর দিতে গিয়ে এমন বেহায়া লোককে কথা বলবার সুযোগ দিয়ে।' আর কিছু বললে পাছে বীরেন আরোও কিছু বলবার সুবিধা পায় সেই ভয়ে সে বীরেনের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে ব'সে রইল।

তথাপি সেফটিপিনের প্রসঙ্গটা সেখানেই শেষ হলো না।

টেবিলের উপর পিনটা স্থাপিত ক'রে বীরেন বললে, "আপাতত রইল এটা এখানে। ফিরে যাবার সময়ে যদি এমনি পড়ে থাকে, তা হ'লে এ কথা বুঝলে নিয়ে যাব যে, এর প্রতি আমার অধিকার স্থাপনে আপনার দিক থেকে অসম্মতির কারণ নেই।"

সুধীরার ইচ্ছা হলো পিনটা নিয়ে একেবারে জানালা গলিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসে দেখায় কেমন তার অসম্মতির কারণ নেই। কিন্তু পাছে সেরূপ আচরণের দ্বারা তার দিক থেকেও ছোট জিনিসকে বড় ক'রে তোলার দুর্বলতা প্রকাশ পায়, সেই ভয়ে সে বীরেনের এ কথাটাও নিঃশব্দে পরিপাক করলে।

ভিতরের দিকের দ্বারের পর্দা ঠেলে বেণী প্রবেশ করলে। সুধীরার নিকটে এসে নিম্নকণ্ঠে বললে, "নিয়ে আসব দিদিরাণী ?"

মৃদুস্বরে সুধীরা বললে, "আন।"

নিঃশব্দে লঘুপদে বেণী পর্দা ঠেলে ভিতরে অন্তর্হিত হলো।

চক্ষু ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে বীরেন বললে, "কী আনতে গেল ? লাঠি নয় তো ?"

বীরেনের ভঙ্গি দেখে সুধীরার মুখে ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হলো। কৌতুক-পরিহাসের একটা মাদকতা আছে ; ঝোঁকের মাথায় লোভ সংবরণ করতে পারলে না ; বললে, "লাঠি নয়,—ছোরা।"

কপট আতঙ্কের স্বরে বীরেন বললে, "ছোরা ?—কিন্তু নিরস্ত্র হ'য়ে যে মানুষ আত্মসমর্পণ করেছে, তার জন্যে ছোরার কী প্রয়োজন ?"

কৌতূহল সহকারে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "নিরস্ত্র কেন ?—আপনি আপনার ছোরা আনেননি না-কি ?"

স্মিতমুখে বীরেন বললে, "নিশ্চয় আনি নি। একজন সৈনিককে নিরস্ত্র করলে যে-পরিমাণ অপমান করা হয়, সেই পরিমাণ সম্মান আপনাকে দেবার জন্যে স্বেচ্ছায় আমি নিজেকে নিরস্ত্র করেছি। আজ আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে আসিনি মিস্ চৌধুরী, আজ আমি আপনার একজন অনুগত প্রজারূপে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। এ অঞ্চলে আমাদের যা কিছু জমি-জমা আছে, মায় ভদ্রাসন বাড়ি আর বিবাদী জমি, সব-কিছুরই জমিদার আপনারা তা আমি আজ ভুলিনি। আজ আমি আপনার কাছে প্রার্থী।"

ভয়ে ভয়ে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কিসের প্রার্থী ?"

ভিতরের দ্বারের দিকে ঈষৎ বিস্ফারিত চক্ষে দৃষ্টিপাত ক'রে বীরেন বললে,

"মিষ্টান্নের নয় মিস্ চৌধুরী, যদিও মিষ্টি জিনিসের বটে।"

বীরেনের কথার এবং দৃষ্টির ভঙ্গিতে পিছন ফিরে তাকিয়ে সুধীরা দেখলে একজন ভৃত্য পর্দা সরিয়ে ধরেছে, আর সেই অল্প পরিসর স্থানের মধ্য দিয়ে দুই হস্তে একটা ট্রে ধারণ করে বেণী সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করছে। ট্রের উপর চায়ের সরঞ্জাম এবং বিবিধ খাদ্যসম্ভার; অপর ভৃত্যের হস্তে জলের পাত্র।

সুধীরা বললে, "এ মিষ্টান্ন আপনিই এসেছে, আপনাকে প্রার্থনা করতে হয় নি।"

বীরেন বললে, "কিন্তু সে মিষ্টি জিনিসের জন্যে আমি আপনিই এসেছি, আর আমাকে প্রবলভাবে প্রার্থনা করতে হবে।"

কথাটা এমন জটিল মনে হলো যে, সে মিষ্টি জিনিসটা যে কী, তা জিজ্ঞাসা করতে সুধীরার সাহস হলো না; সে নিরুত্তর রইল।

ফুলদানিটা সরিয়ে বীরেনের সম্মুখে টেবিলের উপর একটা বড় তোয়ালে পেতে তদুপরি ট্রে এবং জলের গ্লাস স্থাপন করে ভৃত্যদ্বয় বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

বিস্মিতকণ্ঠে বীরেন বললে, "এ কী ব্যাপার বলুন তো মিস্ চৌধুরী?"

খাবারের ডিশ বীরেনের দিকে একটু সরিয়ে দিয়ে মৃদু স্মিতমুখে সুধীরা বললে, "একটু খান।"

"এই সমস্ত?—একা?"

সুধীরা বললে, "বেশি কই,—অল্পই তো।"

বীরেন বললে, "না, না, মিস চৌধুরী, বেশিকে অল্প ব'লে বেশির মর্যাদা নষ্ট করবেন না। এ আপনার পক্ষে বেশি, আমার পক্ষেও বেশি; এমন কি আমাদের দুজনের পক্ষেও বেশি। তা ছাড়া, আপনার দিক থেকে এ সব আচরণ ঠিক সঙ্গত হচ্ছে না।"

ঈষৎ কৌতূহল সহকারে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?

"আমার প্রগল্‌ভতা মাফ করবেন, আপনার লাঠিয়ালের দল আড়াল থেকে যদি দেখতে পায় যে, আপনি নিজে বসে আমাকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন তা হলে হয়তো তারা আমার মাথা লক্ষ্য করে খুব জোরে লাঠি চালাতে পারবে না। তাদের ধারণা হবে, আমার সঙ্গে আপনার বিরোধটা ঠিক অন্তরের জিনিস নয়, বাইরের একটা অভিনয়। সুতরাং আমাকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত দিলে আপনি মনে মনে কষ্টই পাবেন।"

বীরেনের আত্ম-সিদ্ধান্তের এই অপরূপ ভঙ্গি দেখে একটু পুলকিত হয়ে সুধীরা বললে, "ভালই তো; আপনি তো তাতে খুশিই হবেন।"

"কিসে?—আপনি মনে কষ্ট পেলে?"

"উঁহু,—আমার লাঠিয়ালের দল non-violent হলে।"

মিনতির সুরে বীরেন বললে, "না মিস্ চৌধুরী, আমি আপনার লাঠিয়ালদের করুণার প্রত্যাশী নই, আমি আপনারই করুণার প্রত্যাশী। এমন কি, আপনার

নির্মমতাও আমার কাছে উপেক্ষার বস্তু নয়। জীবন-মরণ একান্তই যদি নির্ভর করে তো মহত্তের হাতেই যেন তা করে।"

কথোপকথন পুনরায় ঘোরালো হয়ে এল। নদীর স্রোত ছাড়িয়ে এর গতি দিক্‌হীন সীমাহীন মহাসাগরের ঊর্মিমালার দিকে ; সে দিকটা শুধু অজানাই নয়, অস্পষ্টও। ভয় হয়, এরূপ কথোপকথনের পরিণামে শেষপর্যন্ত দিকভ্রষ্ট হতে না হয়। অথচ মনের গোপন কোণে এর জন্য মোহও যে একটু নেই, তা নয়। সেই অমার্জনীয় দুর্বলতার প্রত্যবায় বহন করে মন ক্রমশঃ হয়ে উঠছে অপরাধী।

বীরেন বলতে লাগল, "অবশ্য একথা যদি জানতে পারি যে, আপনার লাঠিয়ালের হাতে মাথা ফাটাতে পারলে, আপনার আঁচল-ছেঁড়া জলের পটি মাথায় ধারণ করবার সৌভাগ্য হবে, তা হলে আপনার লাঠিয়ালের লাঠির জন্যে আমার মনে লোভের অন্ত থাকবে না। এ কথা একটুও অতিরঞ্জিত করছিনে, টিঞ্চার আয়োডিন পর্বের পর রাখাল দাদাকে শুধু সর্বান্তঃকরণে ক্ষমাই করি নি, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সমস্ত মন ভরে উঠেছিল। দুর্মূল্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্যে মানুষে কত দিকে কত কষ্ট করে তা যদি আপনি জানতেন মিস্ চৌধুরী, তা হলে আমার এ কথা সহজেই বুঝতে পারতেন।" বলে হাসতে লাগল।

এই ধরনের কথোপকথনকে যে-কোনো প্রকারে প্রতিরোধ করতেই হবে, এই সঙ্কল্প করে সুধীরা বললে, "শুধু এ কথাই নয়, এমন অনেক কথাই আমি জানিনে। কিন্তু আমাদের আসল কথা কিছুই এখনও হয়নি, তা'তে হয়তো কতকটা সময় লাগতে পারে। তার আগে আপনি একটু কিছু খান।"

বীরেন বললে, "একটু-কিছু না খেলে যদি আপনার আতিথ্য-ধর্ম ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকে, তা হলে না হয় আপনার আদেশ পালন করছি ;—কিন্তু একটু-কিছু সত্যি-সত্যিই একটু-কিছু হলে অনুগ্রহ করে অপরাধ নেবেন না, কারণ এখনি বাড়ি থেকে বেশ একটু-কিছু খেয়ে আসছি।"

বীরেনের কথা শুনে সুধীরা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হলো। অপ্রতিভ মুখে বললে, "আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে বীরেন বাবু! আমার উচিত ছিল আপনি এখানে চা খাবেন সে কথা স্পষ্ট করে কাল আপনাকে বলে দেওয়া, কিংবা আজ সকালে আপনাকে লিখে পাঠানো।"

বীরেন বললে, "কিন্তু এখনও তো সে ত্রুটির সংশোধন হতে পারে।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞেস করলে, "কি করে?"

"ধরুন, আমি যদি সমস্ত খাবারটাই খেয়ে ফেলি?"

অবাক হয়ে বীরেনের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে সুধীরা বললে, "বেশ কথা তো! আমি করলাম অপরাধ, আর আপনি করবেন তার প্রায়শ্চিত্ত?"

বীরেন বললে, "তাতে আমার দিক দিয়ে একটু সুবিধের সম্ভাবনা আছে। প্রায়শ্চিত্তটা আমি করলে আপনার মনে যদি একটু কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয়, তা হলে সেটা আখেরে আমার উপকারে লাগতে পারে।"

এবার সুধীরা না হেসে থাকতে পারলে না; বললে, "আপনার শুধু ছোরাই চলে না; কথাও আপনার এরকম চলে যে, আপনার সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন!"

সুধীরার কথা শুনে বীরেনের মুখে মৃদু হাস্য ফুটে উঠলো; বললে, "আশা করা যাক, শেষ পর্যন্ত যেন না পেরেই ওঠেন!"

সুধীরা মনে মনে বললে, সে আশা সুদূরপরাহত। মুখে বললে "সে যা হবার পরে হবে। আপাতত অপরাধটা আমার কাঁধেই ঝুলুক, আপনি যা পারেন তাই খান।"

বীরেন বললে, "সবটা ঝুলে কাজ নেই মিস চৌধুরী, আংশিক প্রায়শ্চিত্ত করে খানিকটা হাল্কা করে ফেলুন।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "আংশিক প্রায়শ্চিত্ত? সে আবার কী করে করব?"

"কী করে করবেন, তা আমি যথাসময়ে আপনাকে বুঝিয়ে দেব। তবে সে প্রায়শ্চিত্তের উপকরণ সবই এখানে আছে, শুধু আর এক দফা পেয়ালা-পিরিচ আনালেই হবে। অনুগ্রহ করে হুকুম করুন।"

বীরেনের কথার মর্মোপলব্ধি করতে এবার আর সুধীরার বিলম্ব হলো না; ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললে, "না ন',—আংশিক প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নেই, সুবিধামতো কোনও সময়ে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করতেই চেষ্টা করব। আপনি খেতে আরম্ভ করুন, আমি ততক্ষণ আপনার চা তৈরি করে দিই।" বলে পেয়ালা পিরিচটা নিজের সম্মুখে টেনে নিলে।

বাধা দিয়ে বীরেন বললে, "কেন মিস্ চৌধুরী, আমার এ অনুরোধ কি এতই অসঙ্গত? আপনার আর আমার মধ্যে ব্যবধানের কথা আমি ভুলিনি, কিন্তু অতিথিকে এইটুকু সম্মান দান করলে আপনার মহত্ত্ব বৃদ্ধিই পাবে।"

বীরেনের কথা শুনে ঈষৎ তীব্রতার সহিত সুধীরা বললে, "মহত্ত্বের কথা এখন না হয় থাক,—কিন্তু ব্যবধানটা কিসের এমন করে বলছেন বলুন তো?"

বীরেন বললে, "আমি বলি, ব্যবধানের কথাও এখন থাক্; যত কিছু হাঙ্গামার কথা ওঠবার আগে চা-পানের পর্বটা নির্বিঘ্নে শেষ হোক। ওসব কথা তো একটু পরে আপনা আপনিই উঠবে, ওর জন্যে ব্যস্ত হবার কোনও প্রয়োজন নেই।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অবস্থান করে সুধীরা মনে মনে কী চিন্তা করলে; তারপর ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকলে, "বেণী!"

পর্দা ঠেলে ত্বরিত পদে কক্ষে প্রবেশ করে বেণী বললে, "দিদিরাণী!"

"এ চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে, টি-পটটা নিয়ে গিয়ে একটু বেশি করে চা তৈরি করে আন। আর, আর-একটা পেয়ালা-পিরিচ।"

টেবিলের উপর থেকে টি-পট্ তুলে নিয়ে বেণী সত্বর প্রস্থান করলে।

"মিস্ চৌধুরী!"

নিঃশব্দে সুধীরা বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

একটু ইতস্তত সহকারে মৃদুস্মিত মুখে বীরেন বললে, "কিছু যদি মনে না করেন তা হলে একটা কথা বলি।"

নূতন কোনও গুরুতর কথার অবতারণার উদ্দেশ্যেই যে এই বিনয়মসৃণ কপট ভূমিকা, তদ্বিষয়ে সুধীরার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। সভীতি অস্বস্তির সহিত সে জিজ্ঞাসা করলে, "কী কথা?"

"দেখুন, কাল থেকে আপনাকে বারবার মিস্ চৌধুরী বলে সম্বোধন করছি,—এ কিন্তু আমার একটুও ভালো লাগছে না। আপনার যে শ্রী, আপনার যা মাধুর্য, তা একান্ত ভাবে ভারতবর্ষীয়; এমন কি আপনার শাড়ীর পাড়টুকুর মধ্যেও বিলিতি স্কার্টের নামগন্ধ নেই। আপনার এই ধারার সঙ্গে বিদেশী কটুগন্ধী মিস্ চৌধুরী সম্বোধন একেবারেই খাপ খাচ্ছে না। আচ্ছা, কী করি বলুন তো?" বলে উত্তরের জন্য বীরেন নীরবে সুধীরার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

উত্তরের প্রত্যাশায় এরূপ ভাবে নিঃশব্দ হলে উত্তর না দিয়ে পারে এমন লোক বিরল। বীরেনের মুখের উপর মুহূর্তের জন্য চকিত দৃষ্টিপাত করে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সুধীরা বললে, "তা হলে ও নামে ডাকা বন্ধ করুন।"

"তা না হয় বন্ধ করাই যাবে, কিন্তু কী নামে ডাকব তা বলুন? যদি বলেন, 'কুমারী চৌধুরী',—ওকিন্তু আমার আরও খারাপ লাগে। বিলিতি আমার বরং সহ্য হয়, কিন্তু বিলিতির অনুকরণের দুর্গন্ধ একেবারে অসহ্য।"

বীরেনের এ অভিমতে সুধীরা কোন মন্তব্য প্রকাশ করলে না, চুপ করে বসে রইল।

বীরেন বলতে লাগল, "তৃতীয় পক্ষের নিকট উল্লেখে শ্রীমতী সুধীরা চলতে পারে, কিন্তু সম্বোধনে অচল। 'সুধীরা দেবী' অবশ্য অচল নয়, কিন্তু একটা যেন অনাত্মীয়তার ব্যবধান সৃষ্টি করে। মিস্ চৌধুরী?"

বীরেনের প্রতি দৃষ্টি উত্তোলিত করে সুধীরা বললে, "বলুন।"

"কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন! যে নামে আপনাকে আমি মনের মধ্যে নিরন্তর চিন্তা করি,—কারণ, আপনার চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তা তো আজকাল আমার মনের মধ্যে আর বড় দেখতে পাই নে,—লাঠির ভয় এমনি বিষম ভয়,—আপনার সেই সহজ সরল যথার্থ নামে কিন্তু প্রকাশ্যে আপনাকে ডাকবার উপায় নেই। আগে-পাছে একটা কোনও উপসর্গ অথবা প্রত্যয় জুড়ে না দিলে শিষ্টাচারের আইন লঙ্ঘন করা হবে!"

বীরেনের কথা শুনে উৎকণ্ঠায় সুধীরার বুক দুড়-দুড় করতে লাগল। কী সর্বনাশ! এই দুঃসাহসিক লোকটা তাকে মনে-মনে সুধীরা বলে সম্বোধন করে কোন্ অধিকারে? আর করেই বা যদি, কোন্ সাহসে সে তার সেই মনের গোপন কথা এমন করে মুখে প্রকাশ করে বলে?

"মিস্ চৌধুরী?"

সুধীরা বীরেনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

"আপনি তো কিছু বলছেন না ?"

সুধীরা বললে, "আমার কিছুই বলবার নেই বোধ হয়, তাই বলছিনে।" মনে মনে বললে, 'আছে, যথেষ্ট আছে। আমি বলি, একজন অসহায়া মেয়েকে একান্তে পেয়ে আতিথেয়তার পরিপূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে এমন করে তার মনের উপর ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা অতিশয় গর্হিত আচরণ; বিশেষতঃ যখন সেই আচরণ এমন ধূর্ততার সহিত হিসাব করে অশিষ্টতার সীমান্ত রেখা এড়িয়ে চলে যার জন্যে প্রতিবাদ করা যায় না, কলহ করতে সৌজন্যে বাধে।'

বেণী প্রবেশ করে টেবিলের উপর টি-পট ও পেয়ালা-পিরিচ রেখে চলে গেল।

পেয়ালা-পিরিচ নিজের সম্মুখে স্থাপিত করে বীরেন বললে, "আপনার যখন কিছুই বলবার নেই, তখন আপাতত 'মিস্ চৌধুরী' সম্বোধনই চলুক।" তারপর টি-পটের দিকে সে হাত বাড়াতে, ব্যস্ত হয়ে সুধীরা টি-পটটা নিজের কাছে তুলে নিয়ে বললে, "আপনি কেন কষ্ট করছেন, আমি করে দিচ্ছি।" বলে টি-পট থেকে নিজের সম্মুখের পেয়ালায় চা ঢালতে লাগল।

বীরেন বললে, "ভুল করছেন মিস্ চৌধুরী, আমি নিজের জন্যে চা করতে যাচ্ছিলাম না। আমার চায়ের পেয়ালা আপনি যে দয়া করে আপনার নিজের কাছে রেখেছেন, এত শীঘ্র ভুলে যাবার মতো সে কথা আমার পক্ষে সামান্য নয়। আমি আপনার জন্যে চা করতে যাচ্ছিলাম।"

সুধীরা বললে, "তাই বা কেন কষ্ট করবেন, আমি এখনি করে নিচ্ছি।"

বীরেন বললে, "না, মিস্ চৌধুরী, অনুগ্রহ করে আপনার চা তৈরি করবার অধিকার আমাকে দিন। তা'হলে ভবিষ্যতের দুর্দিনে অন্তত এইটুকু মনে করেও সান্ত্বনা পাব যে, যত সামান্যই হোক না কেন, তবু আপনার সেবায় আসবার সৌভাগ্য একদিন আমার হয়েছিল। অনুগ্রহ করে এই কষ্টটুকু করবার আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।"

শুধু যে এইটুকু আনন্দ থেকেই সুধীরা বীরেনকে বঞ্চিত করতে পারলে না তা নয়; বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত গভীরতর আনন্দের দ্বারাও তাকে কৃতার্থ করতে হলো। আদায় করবার কৌশল যারা অবগত আছে তারা কখনও একবারেই আদায় করে না, বারে বারে করে। হিট্‌লারের মতো তারা জানে যে, পরবর্তী ভূমিখণ্ড অধিকারের ঠিক পূর্ব অবস্থা সম্মুখবর্তী ভূমিখণ্ড অধিকার করা; সুতরাং তারা একথাও জানে যে, খাবারের ডিবারের ডিসে সম্মত করবার পূর্ব অবস্থা চায়ের পেয়ালায় সম্মত করা। একটি ছোট ডিশে কিছু খাবার দিয়ে বীরেন যখন সুধীরার সম্মুখে স্থাপন করলে তখন সুধীরা প্রথমটা অল্প কিছু আপত্তি করলেন বটে, কিন্তু একথাও সে বুঝলে যে, এই নিয়ে অধিক বাদানুবাদ করতে গেলে, প্রথমত বাদানুবাদ হবে নিষ্ফল, এবং দ্বিতীয়ত অফলপ্রদ বাদানুবাদের অছিলায় এই প্রগল্ভ ব্যক্তিটিকে অনেক নূতন কথা বলবার সুযোগ দেওয়া হবে।

সুতরাং খাবারের ডিশেও তাকে অগত্যা সম্মত হতে হলো।

পানাহারের মধ্যে একসময়ে বীরেন বললে, "দেখুন মিস্ চৌধুরী, আমার প্রথম অপরাধ হচ্ছে, আমি একজন পুরুষ; আর, আমার দ্বিতীয় অপরাধ হচ্ছে, উপস্থিত এখানকার বাড়িতে আমার কোনও স্ত্রীলোক আত্মীয় নেই। এই দুই অপরাধের জন্যে আমার বাড়িতে আপনাকে আহ্বান করবার অধিকারও আমার নেই। সেই জন্যে আপনার বাড়িতেই অনুরোধ-উপরোধ করে আপনাকে সামান্য কিছু খাইয়ে নিমন্ত্রণটা সেরে গেলাম। অবশ্য এ ঠিক তাই হলো লোকে যাকে বলে গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজো।" বলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

সুধীরার মুখেও মৃদু হাস্য ফুটে উঠলো; সে বললে, "বেশ তো ভবিষ্যতে কোনোদিন আপনার স্ত্রী যখন এখানে আসবেন, তখন না হয় আমাকে নিমন্ত্রণ করবেন।"

সহাস্য মুখে বীরেন বললে, "মূলেই যাঁর অস্তিত্ব নেই তাঁর পক্ষে এখানে আসা কিন্তু একটা অলৌকিক ব্যাপার হবে।"

সুধীরা বললে, "আজ তাঁর অস্তিত্ব নেই সে কথা আমি জানি। আমি বলছি ভবিষ্যতে কোনোদিনের কথা।"

"কিন্তু ভবিষ্যতেও যদি কোনও দিন আমার স্ত্রী আপনাকে চা খাওয়ান তা হলেও সেটা অলৌকিক ব্যাপার হবে।"

গভীর বিস্ময়ে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে বীরেন বললে, "সেটা কিন্তু এমন গোলমেলে কথা যে উপস্থিত আপনার না শোনাই ভালো। শাস্ত্রে আছে যে-কথায় সহজে মানুষের বিশ্বাস হবে না, সত্যি হলেও সে কথা প্রকাশ করতে নেই।"

এ কথাটাও এমন গোলমেলে মনে হলো যে, শুনে সুধীরা চুপ করে গেল,—আর কোনও প্রশ্ন করতে তার সাহস হলো না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চা-পানের পর্ব্ব শেষ হলো। বেণী এসে টেবিল পরিষ্কার করে জিনিস পত্র তুলে নিয়ে গেল।

নয়

বৈশাখের খর রৌদ্রের উত্তাপ এরই মধ্যে অনেকটা বেড়ে উঠেছে। অদূরবর্তী আম বাগানের প্রচ্ছন্ন শাখায় বসে একটা ঘুঘু নিরন্তর একটানা সুরে করুণ বিলাপধ্বনি করে চলেছে। সে ধ্বনি যেন দুর্বিবহ নিদাঘ-দাহের বিরুদ্ধে ক্ষীণ অবসন্ন কণ্ঠের নিস্তেজ প্রতিবাদ।

বীরেন বললে, "দেখুন মিস্ চৌধুরী, যে জমি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ, বস্তুত তার প্রত্যেকটি ধূলিকণা যদি আমাদের না হতো তা হলে আমি

কখনই এর মধ্যে প্রবেশ করতাম না। বাবার মুখে এ জমির ইতিহাস শুনে আমাদের এখানকার সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রত্যেকটি দলিল আমি তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখেছি। ন্যায়ত, ধর্মত, আর আইনত, এ জমি যে আমাদের সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আচ্ছা বলুন তো, আমাদের বাস্তুভিটের অংশ এই জমি আপনাদেরই কি কেড়ে নেওয়া উচিত ; না, আমাদেরই ছেড়ে দেওয়া উচিত ? তাতে কি কোন পক্ষেরই মঙ্গল আছে ?"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করে সুধীরা বললে, "আপনি আমাকে কী করতে বলেন ?"

"আমি আপনাকে সুবিচার করতে বলি। আপনি আমাদের জমিদার, আপনাদের খাজনা দিয়ে আপনাদের আশ্রয়ে আমরা এ গ্রামে বাস করি, সে কথা আপনি ভুলে যাবেন না। তা ছাড়া, আমরা আপনাদের এক-পাঁচিলের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর কাছ থেকে প্রতিবেশী যেটুকু সদয় ব্যবহার প্রত্যাশা করে আমি আপনার কাছে তার প্রার্থী। আপনি অনুগ্রহ ক'রে বিচার করুন।"

"কী বিচার করব ? এ জমি আপনাদের, সেই কথা স্বীকার ক'রে নেব ?"

"যদি প্রমান করতে পারি তা হ'লে নেবেন।"

অতি ক্ষীণ হাস্যরেখায় সুধীরার অধর কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল ; বললে, "এই কি আপনার non-violent method ?"

বীরেন বললে, "হঁ্যা, এই তার সূচনা বটে, কিন্তু এই সব নয়। জানেন তো non-violent method-এর আরম্ভ আবেদন- নিবেদনে, কিন্তু তা'তে সফল না হ'লে অসহযোগ, সত্যাগ্রহ—এমন কি অনশনে মৃত্যু পর্যন্ত অনেক কিছু পদ্ধতি প্রণালী আছে।" ব'লে সে হাসতে লাগল।

সুধীরা বললে, "তা থাক। কিন্তু তার আগে আমি একটা কথা আপনার কাছে সুস্পষ্ট করতে চাই,—তা হলে আপনাদের আলোচনা অনর্থক দীর্ঘ হবে না।"

"কী কথা বলুন ?"

"এই জমি সম্বন্ধে আপনার যদি কোনও রকম দাবি-দাওয়া, উপরোধ-অনুরোধ, এমন কি—যেমন আপনি বলছেন—আবেদন-নিবেদনই থাকে, তা হলে তার জন্যে আপনাকে বাবার কাছে যেতে হবে।"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে সুধীরার প্রতি ঋজু দৃষ্টিপাত করে বীরেন বললে, "তা হলে আজ আমি আপনার কাছে কী কথা বলতে এসেছি তা তো ঠিক বুঝতে পারছিনে মিস্ চৌধুরী ?"

সুধীরা বললে, "জমির দখল সম্বন্ধে যদি আপনার কোনও কথা বলবার থাকে তো তাই বলতে এসেছেন।"

"কিন্তু জমির স্বত্ব সম্বন্ধে কোনও কথায় আপনি যদি একেবারেই কান না দেন তা হলে জমির দখল সম্বন্ধে কথা বলে কী লাভ হবে তা বলুন ?"

সুধীরা বললে, "আমি তো বলেছিলাম, কোনও লাভই হবে না। আমার দিকের কথাটা তা হলে আরও একটু স্পষ্ট করে বলি। আমি এখানে এসেছি শুধু জমির দখল সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে; জমির স্বত্ব সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করতে আমি আসিনি। আপনি যদি বিনা বিবাদে দখল নিয়ে জবরদস্তি করা বন্ধ করেন তো ভালোই, তা নইলে বাধ্য হয়ে আমাকে বল প্রয়োগ করতে হবে, আর তাতে যদি লাঠালাঠি আর রক্তপাত হয়, তার জন্যে দায়ী হবেন আপনি—আমি নয়।"

সুধীরার কথা শুনে বীরেনের মুখে মৃদু হাস্য ফুটে উঠল; বললে, "অন্ততঃ যে লাঠি আমার মাথায় পড়বে, আর যে রক্তপাত আমার দেহ থেকে হবে তার জন্যে আপনাকে দায়ী করব না, সে কথা এখনি দিয়ে রাখলাম। কিন্তু শুধু আমিই তো নয়,—আমি ছাড়া আরও অনেকেই তো আছে। কী হবে সামান্য এক টুকরো জমির জন্যে মাথা কাটাকাটি আর নরহত্যা করে? তার চেয়ে আমি না হয় আমার দ্বিতীয় পন্থাটা একবার চেষ্টা করে দেখি।"

বীরেনের কথা শুনে সকৌতুক অবজ্ঞায় সুধীরার দুই চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠল; বললে, "কী আপনার দ্বিতীয় পন্থা? সত্যাগ্রহ?"

বীরেন বললে, "না, ঠিক সত্যাগ্রহ নয়।"

"তবে কী? অসহযোগ?"

মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "অসহযোগ তো নয়ই, বরং ঠিক্ তার বিপরীত।" তারপর এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অবস্থান করে বোধকরি মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে সম্পূর্ণ সমাহিত কণ্ঠে বললে, "স্বত্বের অধিকারে আমাকে যদি না দেন, সহৃদয়তার অনুগ্রহে দিন না মিস্ চৌধুরী। এই জমিটুকু দান করুন না আমাকে।"

সবিস্ময়ে সুধীরা বললে, "দান আপনি নেবেন?"

বীরেন বললে, "দয়া করে যদি দেন, দু হাত পেতে নেব।"

যাচনার এই হীন সকরুণ ভাষা শুনে ঘৃণায় এবং কতকটা দুঃখে সুধীরার মন সংকুচিত হয়ে উঠল। অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তি আদায় করবার জন্য এ কী নির্লজ্জ লোভাতুরতা! অথচ এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত এই ব্যক্তি আত্ম-গরিমার বেগবান ঘোড়ায় চড়ে দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে! সুধীরার কণ্ঠ দিয়ে কে যেন জোর করে কথাটা ঠেলে বার করে দিলে, "দান নিলে আপনার সম্মানের হানি হবে না?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "একটুও হবে না। বরং যে শর্তে এ দান আমি চাচ্ছি সেটা মঞ্জুর হলে আমার সম্মান শতগুণ বেড়ে যাবে।"

শর্তের কথা শুনে সুধীরার মনে আবার নূতন করে বিস্ময় দেখা দিলে; সকৌতূহলে বললে, "শর্ত? শর্ত আবার কিসের?"

কী ভাবে কথাটা বলবে মনে মনে বোধ হয় ক্ষণকাল বীরেন সেই চিন্তা

করলে; তারপর সুধীরার মুখের উপর স্থির দৃষ্টিপাত করে স্নিগ্ধস্বরে বললে, "শর্ত আপনাদের একান্ত করুণার। কিন্তু মিস্ চৌধুরী, আমি আপনাদের কাছে করযোড়ে ভিক্ষা চাচ্ছি, দয়া করে এই জমিটুকু আমাকে আপনারা যৌতুক দিন না।"

বিস্ফারিত নেত্রে সুধীরা বললে, "যৌতুক ?—তার মানে ?"

নিঃশব্দ স্তিমিত হাস্যে বীরেনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ; বললে "বিপদে ফেললেন মিস্ চৌধুরী। একজন অবিবাহিত পুরুষমানুষ একজন অবিবাহিত মেয়ের কাছে যৌতুক ভিক্ষা করলে কী তার মানে হয়, এর চেয়েও স্পষ্ট করে বলতে হলে সত্যিই বিপদের কথা।"

বীরেনের কথা শুনে প্রথমে সুধীরার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করলে, তারপর তার দুই চক্ষুর মধ্যে অগ্নি-কণিকা জ্বলে উঠল। কী বলবে সহসা ভেবে না পেয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "এ কিন্তু ভারি অন্যায় আপনার! আপনি আমাকে অপমান করছেন।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে দৃঢ় কিন্তু অপরুষ কণ্ঠে বীরেন বললে, "না, নিশ্চয়ই করছিনে। আপনিই আমাকে অপমান করছেন।"

"আমি অপমান করছি ?"

বীরেন বললে, "তা'তে কোন সন্দেহ আছে মিস্ চৌধুরী ? আমার মনের শ্রেষ্ঠ বস্তু আপনাকে নিবেদন করলে আপনি অপমানিত হন, এ কথা বললে যদি আমাকে অপমানিত করা না হয়, তা হলে আর কোন্ কথা বললে হবে তা বলুন ?"

সুধীরা বললে, "কিন্তু এ আপনার মনের শ্রেষ্ঠবস্তু নয়!"

এ তবে কী ?"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুধীরা বললে, "যে কোনও উপায়ে জমিটা অধিকার করবার জন্যে এ আপনার একটা অন্যায় কৌশল!"

সুধীরার কথা শুনে একটা নিষ্প্রভ আর্ত হাস্যে বীরেনের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে উঠল, মৃদু অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে 'ধরা পড়ে গেছি মিস্ চৌধুরী। কৌশলই বটে, তবে ভারি কাঁচা কৌশল। এর দ্বারা কাজ হয় না, অথচ দুর্নাম হয়। পর মুহূর্তেই সোজা হয়ে উঠে বসে সামনের দিকে একটুখানি ঝুঁকে পড়ে দৃঢ়স্বরে বললে, "কিন্তু যদি বলি এ একেবারেই তা নয় ?—যদি বলি, পঁচিশ বছর আগে যে অত্যাচার যে-পাপ মন্দাকিনী পিসির জীবনটা নষ্ট করেই নিরস্ত হয়নি, এই সুদীর্ঘকাল দুটো বাড়ির মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে এ আপনাকে প্রাণখোলা আহ্বান,—তা হলে কী বলবেন ?"

সুধীরা বললে, "তা হ'লে বলব, কোন্ জিনিস দিয়ে কোন্ জিনিস করা যায়, আর যায় না, তা আপনি কিছুই বোঝেন না।"

বীরেনের মুখে মৃদুহাস্য দেখা দিল ; বললে, "বুঝি বই কি মিস্-চৌধুরী,—তা-ই যদি না বুঝব তা হলে একটু আগে আপনাদের আর আমাদের মধ্যে ব্যবধানের কথা তুলেছিলাম কেন ?···সে ব্যবধানের অনুপাত কী, তা জানেন ?"

সুধীরা কোনও কথা বললে না, চুপ করে রইল।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বীরেন বললে, "সিংহ-ছাগ অনুপাত ! অর্থাৎ আপনারা যদি সিংহ তো আমরা ছাগল।"

একথা শুনে সুধীরা একেবারে অবিচলিত থাকতে পারলে না। একটা ক্ষীণ হাস্যরেখা তার অধরপ্রান্তে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল ; বললে, "এ আপনাকে কে বললে ?"

"মন্দাকিনী পিসিমার সঙ্গে আমার বাবার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন ?"

"জানি।"

"সেই বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেবার সময়ে আপনার বাবার জেঠামশায় বলেছিলেন, চৌধুরীদের মেয়ের সঙ্গে চাটুয্যেদের ছেলের বিয়ে হলে সিংহ-ছাগ দোষ হয়। গৃহস্থ ঘরের সামান্য পাত্রকে নাকচ করে তিনি মন্দাকিনী পিসিমার বিয়ে দিলেন চণ্ডীতলার জমিদারের একটা দুশ্চরিত্র মাতাল ছেলের সঙ্গে। চৌধুরী বংশের বহু গৌরবের বহু সম্মানের আভিজাত্য রক্ষিত হলো। কিন্তু সেই আভিজাত্য বজায় রাখার মূল্য মন্দাকিনী পিসিমাকে এই পঁচিশ বৎসর ধ'রে দিনে-দিনে পলে-পলে নিশ্বাসে-নিশ্বাসে শোধ করতে হচ্ছে। আচ্ছা বলুন তো মিস্ চৌধুরী, এই যে ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে সন্তানহীন বিধবার দুঃখময় জীবন-যাপন—এই তাঁর পক্ষে গৌরবের হয়েছে,—না, আমার মার স্থান অধিকার করে তিনি যদি নিজ সংসারের কর্ত্রী রূপে স্বামী-পুত্র নিয়ে শ্রদ্ধা সম্মানের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াতেন, সেই তাঁর পক্ষে গৌরবের হতো ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা না করে সুধীরা বললে, "এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়তো খুব কঠিন হবে না, কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এত কথা জেনে-শুনে আপনার আবার সেই চৌধুরী বংশের আভিজাত্যের পাষাণে মাথা ঠেকাবার দুর্মতি কেন আজ হল ?"

বীরেন বললে, "দুর্মতি ঠিক আজই হয় নি, আগেই হয়েছে। আপনার এ প্রশ্নের পুরোপুরি উত্তর দিতে হলে বছর দুই আগেকার কথার জের টানতে হয়, যখন কলকাতার ভারতী সাহিত্য-সভায় মিস্ সুধীরা চৌধুরীকে দেখে বুঝতে পারিনি যে, তিনি আমাদের পলাশডাঙ্গার জমিদার বাড়ির মিস্ রায় চৌধুরী। কিন্তু যে-শিক্ষা আজ হল, তারপর সে-সব কথা বলতে আর সাহসও হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না।"

সুধীরা বললে, "তা হ'লে সে-সব কথা ব'লেও কাজ নেই, কারণ আমারও সে-সব কথা শোনাবার কৌতূহল নেই। এবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,

পিসিমার অদৃষ্টের কথা কেন তুলেছেন? পিসিমার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আপনি আমাকে লোভ দেখাতে চান,—না ভয় দেখাতে চান?"

বীরেন বললে, "লোভ দেখিয়ে কোনো ফল আছে বলে মনে হয় না। ভয় দেখাতেই চাই।"

"কিসের ভয়?"

"কুমারগঞ্জের ভয়। পঁচিশ বছর আগেকার চণ্ডীতলার রতন রায়ের মতো এবারও কুমারগঞ্জের রঘুনাথ রায় কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত আছে। আমার আবেদন নামঞ্জুর করবার উৎসাহে তার আবেদনটা মঞ্জুর না হয়ে যায়, আভিজাত্যের পায়ে আর একবার সমারোহের সঙ্গে ফুল-বিল্বপত্র না পড়ে—এই ভয়।"

সুধীরা বললে, "আভিজাত্যের প্রতি ত' দেখচি আপনার শ্রদ্ধার অন্ত নেই; কিন্তু আমি যদি বলি, এটা আপনার আভিজাত্যহীনতার লক্ষণ, তা হলে সে আপনার ভালো লাগবে তো?"

বীরেন বললে, "এই মনে ক'রে ভালো লাগবে যে, আপনি যখন আমার মধ্যে আভিজাত্যহীনতার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন, তখন আভিজাত্যের পাপ যে আমার মধ্যে নেই সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিন্তু দুঃখ নেই মিস্ চৌধুরী, আর বেশি দিন নয়, আপনারাও শীঘ্রই ও পাপ থেকে মুক্তিলাভ করবেন। যে গণশক্তি দেশের মধ্যে মাথা তুলে উঠছে তার পায়ের তলায় আপনাদের এই অন্তঃসারশূন্য আভিজাত্য দেখতে দেখতে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে।"

এই সুতীব্র আক্রমণ, অন্তত বাহ্যত, অবিচলিত মূর্তিতে পরিপাক করে সুধীরা বললে, "ধুলো যখন হয়ে যাবে তখন না-হয় আপনার non-violent method-এর কথা আর একবার ভেবে দেখব; আপাতত যতদিন না যাচ্ছে ততদিন আপনার সে method-এর কোনও দিকেই কোনও আশা নেই,—তা স্থির জেনে রাখুন।"

বীরেন বললে, "আপনিও জেনে রাখুন, non-violent method এমন সর্বনেশে জিনিস যে, অনেক সময়েই তার ক্রিয়া-কৌশল প্রতিপক্ষ ঠিক আপনার মতো করেই ভুল করে। এ যেন কতকটা চোরাবালির মতো-শক্ত বালিতে বেড়িয়ে বেড়িয়ে নিশ্চিন্ত পথিক তার সীমান্ত রেখায় উপস্থিত হয়ে যেমন বুঝতে পারে না যে, আর এক পা বাড়ালেই বিপদ।"

সুধীরা বললে, "আপনার কী রকম কাজ-কর্ম আছে তা বলতে পারিনে, কিন্তু আমার আজ খুব বেশি অবসর নেই। বাবাকে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখতে হবে, তাতে অনেকটা সময় লাগবে। সুতরাং আপনাকে আর বেশিক্ষণ আটকে রেখে লাভ নেই। আপনার অহিংস-নীতি সম্বন্ধে আপনি অনেক কথাই তো বললেন, এবার হিংস্র নীতির কথাটা সংক্ষেপে আমি বলি। আজ থেকে দশ দিন, অর্থাৎ পরশু শুক্রবারের পরের শুক্রবারে, সমস্ত জমিটা আমি পাচিল দিয়ে ঘিরে নোব।

রাজমিস্ত্রি, ইট-সুরকি, মাল-মশলা আনবার জন্যে নাটোরে লোক গেছে,—পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে সব এসে পড়বে। তবু আরও তিন-চার দিন পরে পাঁচিল গাঁথা আরম্ভ হবে। পাঁচিল গাঁথার কাজে রাজমিস্ত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেজন্য আমার লাঠিয়ালের দল সেখানে হাজির থাকবে।"

বীরেন বললে, "দশ দিনের দীর্ঘ নোটিশের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এতটা সময়ের কোনও দরকারই ছিল না। আমিও সেদিন করিম বক্স আর আমার অন্য দু'চার জন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হাজির থাকব। কিন্তু তার জন্যে আপনার রাজমিস্ত্রীদের বেশীক্ষণ অসুবিধে ভোগ করতে হবে ব'লে মনে হয় না।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"আমাদের পক্ষের মাত্র সাত আট জনের মাথা ফাটিয়ে ভূমিশায়ী করতে আপনার ত্রিশ চল্লিশ জন লাঠিয়ালের আর কত সময় লাগবে মিস্ চৌধুরী?"

তীক্ষ্ণভাবে বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সুধীরা বললে, "কিন্তু সাত আট জন কেন? রঘুনাথ রায় তো আপনাকে অনেক লাঠিয়াল জোগাবে ব'লে কথা দিয়েছে।"

বীরেন বললে, "কথা দিতেই সে পারে, কিন্তু আমাকে রাজি করানোও কি তার হাতের মধ্যে? আমিও আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, রঘুনাথ রায়ের একটা লোকও আপনার বিরুদ্ধে আমার দিকে লাঠি ধরতে পাবে না। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

"কিন্তু কেন? তাতে আপত্তি কিসের?"

বীরেন বললে, "এতটা ইতরতা করলে আমি নিজেকে কোনও দিনই ক্ষমা করতে পারব না, মিস চৌধুরী!"

সুধীরা বললে, "ইতরতাই বা কেন বলছেন?

এবার বীরেন হেসে ফেললে; বললে, "সে কথা শুনলে, আপনি মুখে কিছু না বললেও মনে মনে হয়তো ভাববেন, এ বেহায়া লোকটা এরই মধ্যে আবার কৌশলের প্যাঁচ কষতে আরম্ভ করেছে।" ব'লে চেয়ার পরিত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে করজোড়ে বললে, "আচ্ছা, চললাম তা হ'লে। নমস্কার।"

সুধীরাও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে যুক্তকরে বললে, "নমস্কার।"

বীরেন বললে, "যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। আজ আপনাকে সত্যিসত্যিই আমি অপমানিত করিনি। যে সম্মান আজ আমি আপনাকে দিয়েছিলাম, এর আগে কোনওদিন কোনও মেয়েকে তা দিই নি; ভবিষ্যতেও কোনও দিন কোনও মেয়েকে তা দেব না। এ কথা আপনি অবিশ্বাস করবেন না। আমি ছোট, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা যে ছোট নয়, তা আজ আপনাকে প্রার্থনা করে প্রতিপন্ন করেছি। অন্তত সে জন্যেও একটুখানি শ্রদ্ধা আমাকে করবেন।" দু'চার পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, "আপনি কিন্তু ভারি শক্ত মানুষ মিস চৌধুরী, কিছুই আপনার কাছ থেকে আদায় করা যায় না। এমন কি,

ওই ছোট একটা যে সেফটিপিন তাও আপনার কাছে আটকে রইল, নিয়ে যাওয়া গেল না।" বলে হাসতে হাসতে পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্তব্ধ হয়ে সুধীরা নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা সে বলতে পারলে না, বল্‌বার ছিল না-ও বোধ হয় কোনও কথা। বিদায়কালে ভদ্রতা রক্ষার জন্য বীরেনের সহিত এক পা এগিয়ে যাওয়া—তাও হয়ে উঠল না। বীরেনের আচরণের একেবারে শেষের দিকটা এমন অদ্ভুত ভাবে অপরূপ যে, সুধীরার গোপন মনের গোপনতর একটা দিক বারবার তার কাছে হার মানতে লাগল।

নিদ্রোত্থিতের মতো সহসা এক সময়ে জেগে উঠে সুধীরা দেখলে সেই আটকে থাকা সেফটিপিনটা টেবিলের উপর প'ড়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে সেটা তুলে নিয়ে দুই আঙুলের মধ্যে উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করলে, তারপর জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরে ঘাসের উপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

ফিরে এসে সোফার উপর সোজা হ'য়ে উপবেশন করলে। মনে হলো নিজেকে সামলে নেবার একটু যেন প্রয়োজন হয়েছে। চক্ষু মুদিত ক'রে ঈষদাবসন্ন মস্তক সোফার পিঠে হেলিয়ে দিলে। উচ্ছল মন নিয়ে বেশিক্ষণ কিন্তু স্থির হ'য়ে বসতে পারলে না। অন্দরে প্রবেশ করলে।

প্রথমেই দেখা হলো মন্দাকিনীর সহিত। অপ্রীতিকর প্রশ্নের ভয়ে আগে-ভাগেই বলে বসল, "সুবিধে হলো না পিসিমা,—তোমার পরামর্শ ই জানিয়ে দিলাম, —শুক্রবারে পাঁচিল গাঁথা।"

"কী বললে তবু?"

"সব বাজে কথা,—অন্য সময়ে বলব অখন। ব'লে ব'কে মাথা ধ'রে গেছে, একটু শুতে চললাম।"

ব্যস্ত হয়ে মন্দাকিনী বললেন, "ওমা, শুতে যাবি কী? আগে চা-খাবার খেয়ে যা।"

সুধীরার মুখ ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল, বললে, "চা খাবার খেয়েছি।"

"কোথায়? বাইরে বীরেনের সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।"

মনে মনে খুশী হয়ে মন্দাকিনী বললেন, "আচ্ছা, তবে একটু শুগে, যা। কিন্তু রঘুনাথ রায়ের কোনও কথা জানতে পারলি কিনা, শুধু সেই কথাটা বলে যা।"

সুধীরা বললে, "রঘুনাথ রায়কে নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই পিসিমা।"

"কেন?"

"রঘুনাথ রায়ের কাছ থেকে একটি লাঠিয়ালেরও সাহায্য বীরেন বাবু নেবেন না।"

"এ কথা সে নিজে বললে?"

"হ্যাঁ, নিজেই বললেন।"

ঈষৎ চিন্তিতভাবে মন্দাকিনী বললেন, "না, নিলেই ভালো ; কিন্তু বিশ্বাস কি, মত বদলাতে আর কতক্ষণ।"

"না পিসিমা, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার,—রঘুনাথ রায়ের সাহায্য তিনি কখনই নেবেন না।"

মন্দাকিনীর লোভ হলো, জিজ্ঞাসা করেন, বীরেনের উপর এতখানি বিশ্বাস এরই মধ্যে কেমন ক'রে হলো ; মুখে বললেন, "আচ্ছা যা, তুই একটু শুগে যা।"

দশ

উপরে গিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে সুধীরা যে দুইটা জানালা খোলা ছিল তাও বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর শয্যায় এসে শুয়ে প'ড়ে বোধ হয় নিদ্রার অভিপ্রায়েই চক্ষু মুদিত করলে। কিন্তু তাতে নিদ্রার অবস্থা উপস্থিত না হ'য়ে উপস্থিত হলো ধ্যানের অবস্থা। অর্থাৎ দেহের চক্ষু বন্ধ হওয়ার ফলে মনের চক্ষু বেশি করে উন্মুক্ত হলো—যে সকল চিন্তা এতক্ষণ অস্পষ্ট আকারে মনের আকাশে বিচরণ করছিল, এবার তা সুস্পষ্টতা লাভ করলে।

সুগভীর অভিনিবেশ সহকারে সুধীরা আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলো। অমীমাংসিত যুদ্ধের অবসানে সেনাপতি যেমন নিজ পক্ষের লাভ-লোকসানের দ্বারা জয়-পরাজয়ের মাত্রা নির্ণয় করতে প্রবৃত্ত হয়, ঠিক সেইভাবে সে চতুর্দিক সন্ধান করে করে দেখতে লাগল। যে ব্যাপারটা বীরেনের সহিত আজ সংঘটিত হলো তাকে যদি যুদ্ধের সহিত তুলনা করতে হয় তা হলে সব কথা খতিয়ে দেখলে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে মন সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পাবে না। বিশেষতঃ, যুদ্ধের শেষ দিকটায় বীরেন দুমদাম করে এমন কতকগুলা গোলাগুলি ছুঁড়ে গেল যে, জয় যদি মোটের উপর সুধীরার পক্ষেই হয়ে থাকে তো সে-জয়ের অনেকখানি গৌরবই সে নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

আজকের ব্যাপারটা যে, অস্ত্রাযুদ্ধের মতো নিতান্তই একটা লঘু অকিঞ্চিৎকর ঘটনা হবে, চা-পান করতে করতে চায়ের পেয়ালার মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে বীরেনের নন্-ভায়োলেন্ট মেথডের অপমৃত্যু ঘটবে, সে বিষয়ে সুধীরার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু কার্যকালে ঘটনার অদ্ভুত পারম্পর্য দেখে বিস্ময়ে সে অভিভূত হয়েছিল। উঃ, কী দুঃসাহসী লোক এই বীরেন চাটুয্যে! কী দুর্দান্ত তার বুকের পাটা! বলে কি-না জমিটা যৌতুক দিন! সে এসেছে কলকাতা থেকে ঐ জমিটা দখল করবার সংকল্প নিয়ে, আর তাকে ধরেই টানাটানি! জমির দখল ছেড়ে দেওয়ার নাম-গন্ধ তো নেই, উল্টে জমির স্বত্বাধিকারিণীকে পর্যন্ত দখল করবার অভিসন্ধি! ডাল ছেড়ে একেবারে গোড়া ধরে টান! এ যেন সেই আদিম বর্বর যুগের অধিকার বিস্তার করবার নির্লজ্জ জবরদস্তি।

হৃদয়ের অত্যন্ত নিভৃত প্রদেশ থেকে কে যেন অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল, শোনো সুধীরা, শুধু আদিম বর্বর যুগেরই নয়, সকল যুগের সর্বকালের এই হচ্ছে চরমতম প্রণালী। অধিকার যদি করতে হয় তো দয়া-মায়া নয়,—এই রকম করে একেবারে গোড়া ধরে পড়্ পড়্ করে টান দিতে হয়। প্রয়োজন হলে চুলের মুঠি ধরে টান দিলেও অন্যায় হয় না। আচ্ছা, বল দেখি, টান যদি প্রচণ্ডই না হলো, তা হলে আকৃষ্ট হয়ে সুখের প্রত্যাশা কি ছাই করতে পার ?

চমকিত হয়ে সুধীরা বললে, তা জানিনে, কিন্তু তুমি কে ?

ক্ষীণস্বরে উত্তর এল, আমি তোমার ঘুমন্ত মন।

সভীতি-উৎকণ্ঠায় সুধীরা বললে, তুমি যদি ঘুমন্ত মন হও, তা হলে দয়া করে ঘুমিয়েই থাকো ; দোহাই তোমার, জেগো-না !

ঘুমন্ত মন বললে, কী করব বল, তোমার জাগ্রত মন এমন হৈ-চৈ লাগিয়েছে যে, না জেগে থাকতে পারলাম কৈ ? সে দেখছি সমস্ত ব্যাপারটার একটা কদর্থ করে আমাকে ভুল পথে প্রবর্তিত না করে ছাড়বে না। আমি তোমাকে একটু সাবধান করে দিতে চাই।

সুধীরা বললে, না, তোমার সাবধান করে কাজ নেই। তুমি যা সাবধান করবে তা আরম্ভেই বোঝা গেছে। ভালোয় ভালোয় ঘুমিয়ে পড়বে তো পড়ো, নইলে তোমাকে এমন সাংঘাতিকভাবে মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন দোবো যে, কিছুকালের মতো অসাড় হয়ে স্তব্ধ থাকতে হবে।

ঘুমন্ত মন বললে, তাতে অসুবিধা তোমারই হবে বেশি। জাগাতে ইচ্ছে করলেও আমাকে জাগাতে পারবে না, আর তোমার জাগ্রত মনের কাছে যত রাজ্যের বাজে কথা শুনে শুনে অস্থির হয়ে উঠবে। তার চেয়ে আমি যা বলি একটু মন দিয়ে শোন।

নিরুপায় হয়ে সুধীরা বললে, কী বলছ তুমি ?

আমি বলছি, 'অধিকার করবার কৌশল,' 'বর্বর যুগের জবরদস্তি' এই ধরনের যত-সব বাজে মাল আমদানি করে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি কোরো না। যা সত্যি সত্যিই আছে,—তা নেই, বোলো না।

কী আছে ?

বীরেনের ভালোবাসা।

কে বললে আছে ?

কেন, স্বয়ং বীরেনই তো বললে। তার মুখেই তো শুনলে, শুধু আজই আছে তা নয়, দু বছর আগের ভারতী সভার অধিবেশনের দিন থেকে আছে।

সুধীরা বললে, সে ভালোবাসার কোন অর্থ নেই।

ঘুমন্ত মন বললে, কোনো ভালোবাসারই কোনও অর্থ নেই। তোমার ভালোবাসার কোনও অর্থ নেই।

আমার আবার কিসের ভালোবাসা ?

ঘুমন্ত মন বললে, আজও যদি তা না বুঝে থাক, দুদিন পরে নিশ্চয় বুঝবে।

বীরেনের হাত থেকে তোমার রক্ষে নেই সুধীরা। সে বর্বরেরই মত চুলের মুঠি ধরে একদিন তোমাকে অধিকার করবে। তার আকর্ষণের সর্বনেশে বেগ নিজের মনের মধ্যে অনুভব করছ না ?

এ কথা শুনে সুধীরার দুই চক্ষু জলে ভ'রে এল; রুদ্ধস্বরে বললে, তা যদি হয়, এ কালা মুখ নিয়ে বাবার কাছে আর ফিরে যাব না, গলায় কলসী বেঁধে রুইপুকুরে ডুবে মরব।

ঘুমন্ত মন বললে, কিন্তু কেন বলো দেখি ? এ মনোভাব তোমার কিসের জন্তে ? সে কি এতই অবাঞ্ছনীয়, এতই হেয় যে, তার অধিকার অনুভব করলে তোমাকে ডুবে মরতেই হবে ? সেফটিপিনটা তখন জানালা গলিয়ে মাঠে ছুঁড়ে ফেলে দিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'লে না,—এত অশ্রদ্ধা তার প্রতি কী কারণে হলো ?

সুধীরা বললে, সামান্য একটা সেফটিপিন ফেলে দেওয়াতে কী এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ হয়েছে তা তো বুঝতে পারছিনে।

ঘুমন্ত মন বললে, বুঝতে পারছ,—স্বীকার করছ না। আচ্ছা, বাড়ীতে তো শালগ্রাম-শিলা আছে। ঐরকম করে টান মেরে মাঠে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পার ? কেন, সামান্য একটা পাথরের নুড়ি বই তো নয়, কী এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ তা'তে হবে ? সেফটিপিনটা কিছুই নয় সুধীরা; সেফটিপিনের মধ্যে বীরেনের অন্তরের যে মনোভাব জড়িয়ে রয়েছে সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। আচ্ছা, ফেলে দিলে কেন বল দেখি ? ফেলে দিলে তো চিরদিনের মতই তাকে তুমি শেষ করলে। তুলে না রাখ, পড়ে থাকতেও তো পারতো।

সুধীরা কিছু বললে না, চুপ ক'রে রইল।

ঘুমন্ত মন বললে, যে কথাগুলো বললাম, ভালো ক'রে ভেবে দেখো। এবার আমি ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করলাম।

ক্ষণকাল সুধীরা চক্ষু মুদ্রিত ক'রে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। তারপর শয্যা ত্যাগ করে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে উপস্থিত হলো। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলে দাসদাসীরা নিজ নিজ কার্যে ব্যাপৃত,—সংসারের প্রথম দিকের দাবি-দাওয়া মিটিয়ে মন্দাকিনী নিশ্চয়ই এতক্ষণে পূজার ঘরে প্রবেশ করেছেন। ত্বরিত পদে সুধীরা বাহিরে মাঠের উপর জানালার তলায় এসে দাঁড়াল। যেখানে সেফটি-পিনটা নিক্ষেপ করেছিল মোটামুটি তার একটা আন্দাজ ছিল। অল্প জায়গার মধ্যে খুঁজে বার করতে বিলম্ব হলো না। দেখলে দূর্বার ভিতর এক জায়গায় অল্প একটু চিক্‌চিক্ করছে। চোরের মতো ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করে সহসা এক সময়ে টপ করে তুলে নিলে, তারপর বাম হাতের একটা চুড়িতে সেটাকে নিয়ে লঘুপদে স্থানত্যাগ করলে।

সেফটিপিনটা উদ্ধার করে মনের একটা দিক যেন একটু হাল্কা হয়ে গেল। আহারাদির পর মধ্যাহ্নটা কাটল খানিকটা নিদ্রায়, খানিকটা জাগরণে, খানিকটা পুস্তকপাঠে। অপরাহ্নে কেমন একটা কৌতূহল হলো, দক্ষিণ দিকের বারান্দায়

গিয়ে তাকিয়ে দেখলে বিবাদী জমির উত্তর-পশ্চিম কোণে বকুলগাছের তলায় চৌধুরী বাড়ির দিকে পিছন করে বীরেন যথারীতি তার ডেক-চেয়ারে বসে পুস্তক পাঠ করছে। দেখে নিমেষের মধ্যে মনটা একেবারে তিক্ত হয়ে গেল। বিরক্ত ও ক্রোধের তাড়নায় সমস্ত অন্তরের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা উঠল জ্বলে। সকালবেলার আলোচনা যে-ভাবে পরিণতি লাভ করেছিল তার সহিত বীরেনের এ আচরণের অসঙ্গতি নেই; কিন্তু তথাপি যেদিক নিয়ে যেমন করেই হোক মনের মধ্যে একটা যে বিশেষ অবস্থা গড়ে উঠবার উপক্রম করছিল তার সহিত রূঢ়ভাবে ছন্দ গেল কেটে।

মনের একদিক দিয়ে কিন্তু সুধীরা খুসীও হলো। মনে করলে, যে-দুর্বলতা যে-মোহ মনকে বিকল করে তার ব্রতভঙ্গ করবার সহায়তা করছিল তা যে এমনি করে কেটে গেল, তা ভালোই হলো। অন্তরের যে অঞ্চলে ঘুমন্ত মনের বাস সে দিকের দ্বার কঠিনভাবে রুদ্ধ করে দিয়ে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, আর লোভ নয়, মোহ নয়, দুর্বলতা নয়,—এবার মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

নিচে নেমে এসে মন্দাকিনীর সহিত সাক্ষাৎ ক'রে বললে, পিসিমা তুমি যে তখন বলছিলে, বীরেন চাটুয্যের মত বদলাতে আর কতক্ষণ,—ভেবে দেখলাম, তোমার কথাই, ঠিক। রঘুনাথ রায়ের লাঠিয়ালদের সাহায্য সে নেবে মনে ক'রেই আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত।"

মন্দাকিনীর লোভ হলো একবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমার যে বীরেন চাটুয্যের বিষয়ে আবার এত শীঘ্র মত বদলালো, তার কী উত্তর দিচ্ছ শুনি? প্রকাশ্যে বললেন, "বেশ তো, কাল করিমগঞ্জের দুর্যোধন মণ্ডলকে তলব করলেই হবে।"

সুধীরা বললে, "হ্যাঁ পিসিমা, কাল সকালেই তুমি সে ব্যবস্থা কোরো। ও-সব লোকের কথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই।" বলে প্রস্থান করলে।

সিঁড়ির মুখে দেখা হলো প্রভাময়ীর সঙ্গে। কোথা দিয়ে কোন দুরবগম্য প্ররোচনার প্রভাবে তার মনটা হয়ে উঠল বিরূপ। ভ্রুকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলে "কোথায় যাচ্ছ?

সুধীরার মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার সুস্পষ্ট অভাব লক্ষ্য করে সংকুচিতভাবে প্রভাময়ী বললে, "আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"কেন, কী দরকার?"

এ প্রশ্নে প্রভাময়ীর সংকোচ আরও বর্ধিত হল; মৃদুস্বরে বললে, "দরকার এমন কিছু নেই,—এমনি দেখা করতে যাচ্ছিলাম। আপনি যে বলেন, এ বাড়িতে এসে আপনার সঙ্গে দেখা না করলে আমাকে বীরুদার চর মনে করবেন।"

"ও, তা-ও বটে। আচ্ছা তা হলে এস আমার সঙ্গে।" বলে সুধীরা অগ্রসর হলো।

"সুধা!"

পিছন ফিরে সুধীরা দেখলে বারান্দায় নিষ্ক্রান্ত হয়ে মন্দাকিনী তাকে ডাকছেন।

"কী বলছ পিসিমা ?"

"একটা কথা শুনে যা।"

প্রভাময়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে সুধীরা বললে, "প্রভা, তুমি দোতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় গিয়ে একটু বোসো,—পিসিমার কথা শুনে আমি এক্ষণি আসছি।" বলে মন্দাকিনীর নিকট উপস্থিত হলো।

মন্দাকিনী তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছিলেন; বললেন, "ঐ চেয়ারটায় একটু বোস।" সুধীরা চেয়ারে উপবেশন করলে বললেন, "কী-সব কথা সকালে হলো বীরেনের সঙ্গে তা তো কিছু বললিনে ? বলেছিলি পরে বলবি।"

সুধীরা স্থির করেছিল মন্দাকিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা না করলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আর কোনও কথা বলবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে বলতে ইতঃস্তত করে, অথবা কিয়দংশ গোপন রেখে, কথাটায় অযথা গুরুত্ব আরোপ করে এমন ইচ্ছাও তার ছিল না। যে-সকল কথা বীরেন বলেছিল সংক্ষেপে সমস্তই সে বলে গেল, নিতান্ত যে-টুকু বললে মন্দাকিনীর ব্যক্তিগত অনুভূতিকে ক্ষুণ্ণ করা হবে সেইটুকু বাদ দিলে। কথা শেষ করে সে বললে, "একবার আস্পর্ধা দেখছ পিসিমা ? শিক্ষিত হয়েও লোকটার ব্যবহার দেখছ ? আবার বলে কি-না, যে-পাপ পঁচিশ বছর ধ'রে দুটো বাড়ির মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে, জমিটা ওকে যৌতুক দিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে। শোন কথা। কোথাকার কোন্ পাপ কে কবে করলে কি করলে না,—পঁচিশ বছর পরে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে এমনি ক'রে। প্রায়শ্চিত্তই বটে।" বলে খিল খিল করে হেসে উঠল।

সুধীরা হাসলে বটে, কিন্তু সে হাসির মধ্যে কৃত্রিমতার এমন একটু প্রাণহীন সুর ছিল, যা প্রখরবুদ্ধিশালিনী মন্দাকিনীর তীক্ষ্ণ শ্রুতিশক্তির নিকট সহজেই ধরা পড়ল। মনে মনে মাথা নেড়ে তিনি বললেন, এ সুর কিন্তু যথার্থ সুর নয়; আসল যা সুর তা আবিষ্কার করতে না পারলে কিছুই তেমন করে বোঝা যাচ্ছে না। প্রকাশ্যে বললেন, "সুধা, একটা কথা আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিনে।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কী কথা পিসিমা ?"

"সকাল বেলা আমি যখন তোকে বলেছিলাম যে, বীরেন যে বলেছে রঘুনাথ রায়ের লাঠিয়ালদের সাহায্য নেবে না, সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ তার মত বদলে যাওয়া অসম্ভব নয়, তখন তুই জোরের সঙ্গে আমাকে বলেছিলি, 'পিসিমা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কখনই তিনি রঘুনাথ রায়ের সাহায্য নেবেন না'; বিকেল বেলা তুই এসে বলছিস 'পিসিমা, ভেবে দেখলাম তোমার কথাই ঠিক, বীরেন চাটুয্যের মত বদলাতে বেশিক্ষণ লাগবে না।' আমি ভাবছি, এই এক বেলার মধ্যে বীরেনের বিষয়ে তোর মত যে এতখানি বদলাল সে-কি শুধু আমার কথাই ভেবে; না, এর মধ্যে কিছু ঘটেছে, অথবা আর কিছু ভেবেছিস ?"

মন্দাকিনীর প্রশ্ন শুনে সুধীরা নিজেকে একটু বিমূঢ় বোধ করলে। বাস্তবিক, এত বড় মত পরিবর্তনের একমাত্র কারণ মন্দাকিনীর মতের পুনর্বিবেচনা, একথা

বললে পরিপূর্ণ কৈফিয়ৎ দেওয়া হবে বলে তার মনে হলো না। প্রশ্নোত্তরের ত্বরিত গতির বেগে তাড়াতাড়িতে সত্য কথাটাই তাকে বলতে হলো। বললে, "আজও সে প্রতিদিনের মতো চেয়ার নিয়ে বকুলতলায় বসেছে। এ থেকে মনে হয় আমাদের কাজে সাধ্যমতো বাধা দিতে সে ত্রুটি করবে না।"

সুধীরার কৈফিয়ৎ শুনে মন্দাকিনীর অধর প্রান্তে অতি ক্ষীণ হাস্য-রেখা দেখা দিলে। তিনি বললেন; "তুই তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তাকে পাঁচিল গাঁথার নোটিশ দিবি, অথচ সে চেয়ার নিয়ে বকুলতলায় বসবে না, হিসেব মতো এ প্রত্যাশা তুই করতে পারিসনে তো সুধা।"

সুধীরার মুখ ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল; বললে, "সে প্রত্যাশা আমি করছিওনে পিসিমা।"

মন্দাকিনী নিঃশব্দে মনে মনে কী একটু চিন্তা করলেন; তারপর বললেন, "প্রভা একা বসে আছে। তুই এখন যা, অন্য সময় আবার কথা হবে অখন।"

ক্ষণকাল বিলম্ব না করে সুধীরা প্রস্থান করলে।

এগার

দ্বিতলে উপস্থিত হয়ে প্রভাময়ীর নিকট একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সুধীরা উপবেশন করলে।

বীরেন তখনও তার ডেকচেয়ারে পূর্ববৎ শয়ন ক'রে ছিল। দৃষ্টি তার বইয়ের খোলা পাতার উপর নিবদ্ধ; দক্ষিণ হস্তে দুই অঙ্গুলির মধ্যে একটা জ্বলন্ত চুরোট; অলসভাবে মাঝে মাঝে তাতে দুই একটা টান দেওয়ার সময়ে নীলচে রঙের প্রচুর ধূমোদ্গিরণ হচ্ছে।

প্রভাময়ী বললে, "আমি সকালেও একবার এসেছিলাম দিদিরাণী।"

সুধীরা বললে, তুমি আমাকে দিদিরাণী বলছ কেন -"

স্মিতমুখে প্রভাময়ী বললে, "সবাই যে আপনাকে তাই বলেই ডাকে।"

"তা ডাকুক। সে সবাইয়ের সঙ্গে তুমি এক নও। তুমি আমাকে সুধীরাদিদি বলে ডাকবে। বুঝেছ!"

এই আত্মীয়োচিত আচরণে মনে মনে খুশী হয়ে প্রভাময়ী বললে, "আচ্ছা, তাই বলব। সকালে যখন এসেছিলাম তখন আপনি বীরুদার কাছে ছিলেন।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, তাঁর কাছে ছিলাম না, তিনিই আমার কাছে ছিলেন।"

এই দুইয়ের মধ্যে কী যে পার্থক্য তা প্রভাময়ী একটুও বুঝলে না, বোধ হয় বোঝবার চেষ্টাও করলে না; বললে, "তা হবে। কিন্তু কী এত কথা আপনাদের হচ্ছিল বলুন তো? এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা,—বাপরে বাপ! কথা আর শেষ হয় না।

অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বাড়ি চলে গেলাম।"

সুধীরা বললে, "আমার সঙ্গে তোমার বীরুদার বেশিক্ষণ কথা হলে তুমি তা হলে বিরক্ত হও?"

অপ্রতিভ হয়ে প্রভাময়ী বললে, "ও মা, তা হব কেন? বরং খুশীই হই। তা ব'লে অতক্ষণ যে অপেক্ষা করবে, সে বিরক্ত হবে না?" তারপর সহসা সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করে বললে, "আচ্ছা, আজ তো বীরুদার কাছে একা একা অনেকক্ষণ ছিলেন, কেমন লাগল তাঁকে?"

এ প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে সহসা ভেবে না পেয়ে কথাটাকে এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে সুধীরা বললে, "আমাকে তাঁর যেমন লেগেছে ঠিক তার উল্টো লাগল।" পরমুহূর্তেই কিন্তু সে বুঝতে পারলে যে, এড়িয়ে যাওয়া তো হলোই না, উপরন্তু একটু ভালো করেই বিপদের ফাঁদ রচিত করা হলো।

হাতে হাতে প্রমাণও পাওয়া গেল তার। সুধীরার দিকে এক মুহূর্ত নিঃশব্দে চেয়ে থেকে বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "ঠিক বলেছেন তো।"

সকৌতূহলে উৎকণ্ঠার সহিত সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কী ঠিক বলেছি?

প্রভাময়ী বললে, "সত্যি আপনাকে তাঁর খুব ভালো লেগেছে।" তারপর নিরতিশয় কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, আপনাকে যে তাঁর ভালো লেগেছে কী করে তা জানলেন?"

অসতর্ক বাক্যের দ্বারা বেশ একটু অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়েছে বুঝতে পেরে সেই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের অভিপ্রায়ে সুধীরা বললে, "কেন, তুমি নিজেই তো সে কথা বলছ।"

চেষ্টা নিষ্ফল হলো। প্রবলভাবে মাথা নেড়ে প্রভাময়ী বললে, "আহা, হা! সে তো পরে বলেছি। তার আগেই তো আপনি বললেন, আপনাকে তাঁর যেমন লেগেছে, ঠিক তার উল্টো তাঁকে আপনার লেগেছে।"

কথাটার গতি পরিবর্তনের জন্য সুধীরা একবার শেষ চেষ্টা করলে; বললে, "কিন্তু তোমার বীরুদাদাকে আমার যে খারাপ লেগেছে তা কী করে তুমি বুঝলে?

এবার কিন্তু কথাটা সত্যিই একটু দিক পরিবর্তন করলে। ভ্রুকুঞ্চিত করে প্রভাময়ী বললে, "ও মা, তা আর বোঝা যায় না! কই, কোনও দিন তো আপনার এরকম গম্ভীর মুখ দেখিনি, আজই বা এত গম্ভীর কেন হলো তা বলুন? এখন তো তবু একটু ভালো। প্রথমে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন একটা"—কথাটা শেষ না করে প্রভাময়ী হেসে ফেললে।

সুধীরা বললে, "ঠিক যেন একটা কী, বল?"

"রাগ করবেন না তো?"

"না, নিশ্চয়ই করব না।"

একটু ইতস্ততঃ ভাবে সহাস্য মুখে প্রভাময়ী বললে, "ঠিক যেন একটা বোলতার চাক।"

শুনে সুধীরার মুখমণ্ডলে ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিলে; মৃদুস্বরে বললে, "তা কি করব বল? তোমার বীরুদার মতো মৌমাছির চাকের মতো মুখ এখন কোথায় পাই।"

মাথা নেড়ে প্রভাময়ী বললে, "বীরুদার মুখ তো মৌমাছির চাকের মতো নয়,—মৌমাছি যেখান থেকে চাক করবার জন্যে মধু নিয়ে আসে, তার মতো।"

"সর্ষে ফুলের মতো।"

কৃত্রিম কোপ সহকারে প্রভাময়ী বললে, "না না! পদ্ম-ফুলের মতো। অন্তত আজকে তো তাই মনে হচ্ছে।"

"এত খুশী?"

"খুব খুশী! আমি তো মনে করেছিলাম আপনাকেও ঠিক তেমনি খুশী দেখব। কিন্তু কেন যে"—তারপর সহসা সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করে ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "আপনার ওপর তাঁর কত বিশ্বাস শুনবেন?"

অনুৎসুক স্বরে সুধীরা বললে, "আমার ওপর আবার তাঁর কিসের বিশ্বাস?"

উৎসাহ ভরে প্রভাময়ী বললে, "শুনুন না বলছি। কিন্তু আগে প্রতিজ্ঞা করুন, আমি আপনাকে বলেছি, সে কথা কখনও বীরুদাদাকে বলবেন না।"

সুধীরা বললে, "আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হচ্ছেই বা কবে যে, তাঁকে বলতে যাব।"

প্রভাময়ী বললে, "তা আমি জানিনে, দেখা হলেও বলবেন না বলুন?"

অবুঝ মনের মধ্যে কৌতূহলও নিতান্ত কম ছিল না। অগত্যা সুধীরা সেই প্রতিশ্রুতিই দিলে।

প্রভাময়ী বললে, "আজ সকালে আপনাদের বাড়ি থেকে বাড়ি গিয়ে একটু পরে বীরুদাদের বাড়ি গেলাম। তখন বীরুদা ফিরে এসেছেন। কথায় কথায় বললেন, শুক্রবারে দেওয়াল গাঁথার দিন আপনাদের সঙ্গে লাঠালাঠি হবে। বললেন, 'আমাদের পক্ষে আমিই প্রথমে লাঠি ধরব, আমাকে ঘায়েল করবার আগে আমার দলের কাউকে, এমন কি করিম বক্সকে পর্যন্ত, ঘায়েল হতে আমি দেব না।' তাতে আমি বললাম, 'আমিও আপনাকে ঘায়েল হতে দেব না বীরুদা, সে দিন আপনার কাছে কাছেই থাকব, আর আপনার গায়ে লাঠি পড়বার মতো হলে ছুটে গিয়ে এমন ভাবে আপনাকে জড়িয়ে ধরব যে, আমাকে আগে না মারলে আপনার গায়ে লাঠির আঁচও লাগবে না।' তাতে কী বললেন জানেন?"

সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কী বললেন?"

প্রভাময়ী বললে, "অল্প একটু হেসে বীরুদা বললেন, 'তার দরকার হবে না প্রভা, সে রকম অবস্থায় সে কাজ সুধীরা নিজেই করবে।' আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কী বলছ বীরুদা, তুমি বিপক্ষ পক্ষ, তোমার সঙ্গেই ঝগড়া, আর সুধীরা দিদি কি-না তোমাকে জড়িয়ে ধরবেন?' তাতে সেই রকমই অল্প একটু হেসে বললেন, 'আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দরকার হলে ধরবে বইকি।' আচ্ছা, এতখানি বিশ্বাস আপনার ওপর কী রকম করে হলো বলুন তো?"

সুধীরার নিকট হতে কিন্তু এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করে প্রভা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, একথা তিনি আমাকে ভোলাবার জন্যে বললেন,—না, সত্যিসত্যিই এ কথা সত্যি ?"

এ প্রশ্নেরও কোনও উত্তর না পেয়ে প্রভাময়ী সুধীরার প্রতি ভালো করে দৃষ্টিপাত করে দেখলে যে, সে মুখ হতে যে-মেঘ অনেকখানি অপসৃত হয়ে গিয়েছিল পুনরায় সেখানে তা সঞ্চিত হয়েছে। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা সভীতি অস্বস্তি দেখা দিলে। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল ; তারপর মৃদুস্বরে বললে, "চললাম সুধীরা দিদি, কাল আবার না-হয় আসব।" বলে সিঁড়ির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো।

এবার সুধীরা কথা কইলে ; গভীর স্বরে বললে, প্রভা, শুনে যাও।"

ভয়ে ভয়ে প্রভাময়ী সুধীরার সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

দৃঢ়কণ্ঠে সুধীরা বললে, "আবার যদি বীরেন বাবুর সঙ্গে তোমার এ বিষয়ে কথা হয় তা হলে তাঁকে বোলো যে, তাঁর বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল,—আমার কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্যই তিনি পাবেন না।"

পাংশু মুখে আর্তস্বরে প্রভাময়ী বললে, "এ বিশ্বাস তাঁর ভুল ?"

"হ্যাঁ, ভুল।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "আচ্ছা, বলব।" তারপর ধীরে ধীরে প্রস্থান করলে।

বকুল গাছের দিকে সুধীরা চেয়ে দেখলে এরই মধ্যে কোন এক মুহূর্তে বীরেন চেয়ার নিয়ে অলক্ষিতে প্রস্থান করেছে। মনে হলো সে যেন কোনও এক অশুভ গ্রহ ক্ষণকালের জন্যে দৃষ্টির বাইরে অন্তর্হিত হয়েছে। অন্তরের অপচীয়মান শক্তিকে প্রাণপণে সঞ্চিত করে সে মনে মনে বলতে লাগল, বাবা, যে প্রতিশ্রুতি তোমাকে আমি দিয়ে এসেছি তা একটুও ভুলিনি। যতদিন এখানে আমি আছি, আমি তোমার মেয়ে নই, ছেলে। মেয়েমানুষের কোনও দুর্বলতা আমার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না। যদিও দরকার নেই, তবু, তুমি সামনে রয়েছ মনে করে, আর একবার তোমাকে সেই প্রতিশ্রুতি দিলাম। আমি যে পলতাডাঙ্গার বহু পুরাতন রায়চৌধুরী বংশের মেয়ে, আমি যে তোমার একমাত্র সন্তান, লঘু কারণে ভেঙে পড়বার মতো আমি যে সামান্য নই, সাধারণ নই,—সে কথা কোনও লোভ, কোনো মোহই কোনদিন আমাকে ভোলাতে পারবে না।

আপন মনের গভীরতায় মগ্ন হয়ে সুধীরা ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর নিচে নেমে এসে মন্দাকিনীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললে, "পিসিমা, আজ সন্ধ্যার পর তোমার কাছে আমি ছেলেবেলাকার মতো রূপকথার গল্প শুনব।"

মন্দাকিনী বললেন, "কেন রে, এই নাটক নভেলের যুগে হঠাৎ রূপকথার গল্প শোনবার খেয়াল হলো কেন ? রূপকথার সমস্তই যে আজগুবী কাণ্ড।"

সুধীরা বললে, "কী জানি কেন, আজগুবী কাণ্ডই আজ শুনতে ইচ্ছে করছে।"

স্মিতমুখে মন্দাকিনী বললেন, "আচ্ছা, তাহলে আমার আহ্নিক হয়ে গেলে আসিস,—বলব অখন।"

রাত্রি আটটার মধ্যে মন্দাকিনীর পূজা-পাঠ শেষ হয়ে গেল। বাতের জন্য সিঁড়ি ভাঙবার ভয়ে তিনি একতলার ঘরে বাস করেন। সুধীরা এসে পর্যন্ত কিন্তু রাত্রে সুধীরার ঘরেই শয়নের ব্যবস্থা করেছেন। দ্বিতলে উপস্থিত হওয়া মাত্র সুধীরা আগ্রহ ভরে বললে, "এবার তা হলে আরম্ভ কর পিসিমা!"

মন্দাকিনী বললেন, "কিসের গল্প বলব বল—রাজকন্যে আর দৈত্যের?"

অসম্মতিসূচক মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, "দৈত্য-টৈত্য থাকলে ভারি গাঁজাখুরি মনে হয়; তার চেয়ে আর কিছু বল।"

"তবে রাজপুত্তুর আর রাজকন্যের গল্প?"

"ও-ও নয় পিসিমা,—ও ভারি একঘেঁয়ে। সেই রাজপুত্তুর শেষ পর্যন্ত রাজকন্যেকে উদ্ধার করবে তো? ও শুনে শুনে কান পচে গেছে!"

সহাস্যমুখে মন্দাকিনী বললেন, "ভারি বিপদে ফেললি তো দেখছি সুধা, যা বলি তাই তোর পছন্দ হয় না। আচ্ছা, তা হলে রাজকন্যে আর গৃহস্থকুমারের গল্প বলি। কেমন?"

সুধীরা বললে, "শেষকালে সেই গৃহস্থকুমারের সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে হবে তো?"

"তা তো হবেই; কিন্তু কত কাণ্ড-কারখানা করে হবে, তা শোন্।"

"যত কাণ্ড-কারখানা করেই হোক, ও কিন্তু একেবারে আজগুবী কাণ্ড হবে।"

মন্দাকিনী বললেন, "কিন্তু তুই তো তখন আজগুবী কাণ্ডই শুনতে চাচ্ছিলি। তা ছাড়া, এ তো আর পলতাডাঙ্গার রাজকন্যে নয়, এ রূপ-কথার দেশের ময়নাডাঙ্গার রাজকন্যে,—এখানে আজগুবী কিছুই নেই,—যা ঘটে সবই সম্ভব।"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরা মনে মনে বললে, পলতাডাঙ্গায় কিন্তু আজগুবী কাণ্ড ঘটে পিসিমা। এখানকার জমিদার-কন্যে নিজের মনে জমিদার-পুত্রের মন লাগিয়ে এসে গৃহস্থকুমারের পুরুষত্বকে অগ্রাহ্য করে। প্রকাশ্যে স্মিতমুখে বললে, হ্যাঁ, পিসিমা ময়নাডাঙ্গার সঙ্গে পলতাডাঙ্গার ঐ তফাৎ টুকু আছে। ময়নাডাঙ্গায় যা ঘটে তাই সম্ভব,—আর পলতাডাঙ্গায় যা সম্ভব তাই ঘটে। অসম্ভব কোনও কিছু পলতাডাঙ্গায় ঘটে না।"

মন্দাকিনী বললেন, "অসম্ভব তুই কাকে বলিস?"

সহাস্যমুখে সুধীরা বললে, "পলতাডাঙ্গায় যা সম্ভব নয় তাই অসম্ভব।"

"তা হলে ময়নাডাঙ্গায় যা অসম্ভব নয় তার একটা গল্প বলি শোন্।"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরা হাসতে লাগল; বললে, "তুমি যখন আজগুবী গল্প না শুনিয়ে ছাড়বে না, তখন বল।" বলে উৎসাহের সঙ্গে একটা পাশ বালিশ অবলম্বন করে জুৎসই হয়ে বসল।

এক মুহূর্ত মনে মনে নিঃশব্দে চিন্তা করে মন্দাকিনী গল্প বলতে আরম্ভ করলেন।

বার

পরদিন প্রত্যূষে রাখাল আত্রাই নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। প্রত্যাগমনের পথে গৃহের নিকটবর্তী হয়ে দেখলে বীরেন নিজেদের বাড়ির ফাটকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সোজা যেতে হলে বীরেনের সম্মুখ দিয়ে যেতে হয়,—সেটা খুব উৎসাহজনক বলে মনে হলো না। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বিপরীত দিকে পদচালনা করাও অমর্যাদাসূচক মনে হলো। এই দুই বিপরীত পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টা অধিকতর আপত্তিকর সহসা তা নির্ণয় করতে না পেরে রাখালের গতি হলো মন্দীভূত। কিন্তু পর মুহূর্তেই যখন দেখা গেল, বীরেন রাখালের দিকে গতি চালিত করে এগিয়ে আসছে, তখন ব্যাপার জটিলতর হয়েছে আশঙ্কা করে রাখাল স্থির হয়ে দাঁড়াল।

একেবারে রাখালের নিকটে এসে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে বীরেন বললে, "নমস্কার রাখালদা!"

প্রতি নমস্কার না করে রুষ্ট মুখে রাখাল বললে, 'পথ ছাড়ো!"

রাখালের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে দিয়ে বীরেন বললে, "হাত ধরো।"

দুই তিন পা পিছিয়ে গিয়ে সরু খ্যানখ্যানে গলায় রাখাল চিৎকার করে উঠল, "What do you mean Sir ?"

পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে উর্ধ্বে সঞ্চালিত করতে করতে বীরেন বললে, "Peace !"

"Peace ? যার সঙ্গে দুদিন পরে লাঠালাঠি হবে, তার সঙ্গে peace ?"

গম্ভীর মুখে বীরেন বললে, "সে ভয়ঙ্কর দিনের কথা আপাতত: তুলে রাখো রাখালদা,—সেদিন তোমারও পিঠে ছোরা, আমারও মাথা কাটা! সে নিদারুণ দিনের কথা উপস্থিত যতটা সম্ভব ভুলে থাকাই ভালো। আমি বলছি, peace till then !"

পিঠে ছোরার কথা শুনে ভয়ে রাখালের মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল। কুঞ্চিত চক্ষে পাংশু মুখে সে বললে, "পিঠে ছোরা কী রকম? আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক যে, আমার পিঠে ছোরা পড়বে? হ্যাঁ:! পিঠে ছোরা না বলে আরও কিছু! মারামারি হবে তো আমি তার কী জানি!"

বিস্মিত কণ্ঠে বীরেন বললে, "সে কি রাখালদা! তুমি নিজেকে প্রথম পক্ষীয় বলে দাবী কর, আর মারামারির তুমি কিছু জানো না বলছ? আমাদের দিকে আমি প্রথম পক্ষ বলে আমি তো নিজেই বলছি যে, আমার মাথা কাটা যাবে। আমি করিমকেও খুব ভালো করে বলে দিয়েছি যে, সেদিন যেখানেই তুমি থাক-না কেন, খুঁজে-পেতে তোমাকে বার করে তোমার পিঠে যেন এমন করে প্রথম পক্ষের দাগ দেগে দেয়, যাতে কেউ তোমাকে কখনও তৃতীয় পক্ষ বলতে আর সাহস না করে।"

ক্রোধ, দুঃখ এবং কতকটা অভিমান মিশ্রিত একটা মাঝামাঝি স্বরে রাখাল বললে, "এক তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে তৃতীয় পক্ষ বলে না।"

বীরেন বললে, "আমাদের আসন্ন যুদ্ধের দিনে আশা করি তুমি বিপদের মধ্যে এমন ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়বে যাতে আমিও তোমাকে আর তৃতীয় পক্ষ বলব না। কিন্তু সে কথা যাক, উপস্থিত আমাদের বাড়ি চল।"

ভ্রূকুটি ক'রে রাখাল বললে, "তার মানে ?"

"তার মানে, তুমি বিলাত ফেরৎ মানুষ, আদৎ যা ভাল জিনিস তার তুমি মর্ম বোঝো। আমার বাড়িতে একেবারে প্রথম শ্রেণীর চা আছে, যার সমতুল্য জিনিস তুমি এই অজ পাড়াগাঁ পলতাডাঙ্গায় কেন, কলকাতাতেও সহজে পাবে না। একেবারে বাছাই পাতা, চা-বাগানের আত্মীয়-অফিসরের কাছ থেকে উপহার পাওয়া।"

"তাতে কী হয়েছে ?"

"তাতে হয়নি কিছু এখনও ; তুমি গেলেই হবে। কালো ছাগলের কাঁচা দুধ দিয়ে উৎকৃষ্ট চার কাপ চা তৈরী হবে , তুমি দু কাপ খাবে আর আমি দু কাপ।"

রাখাল ঘটকের মুখে একটা অবজ্ঞার চিহ্ন দেখা দিলে ; বললে, "All bosh! নাও, পথ ছাড়। তোমার সঙ্গে নষ্ট করবার মতো আমার যথেষ্ট সময় নেই।" বলে পাশ কাটাবার উপক্রম করলে।

পাশের দিকে সরে গিয়ে রাখালকে আটকে দাঁড়িয়ে বীরেন বললে "আমি তোমাকে assure করছি রাখালদাদা, সময় নষ্ট হবে না। শুধু চা-ই নয়। নাটোর থেকে টাটকা এসেছে আধখানা চাঁদের মতো এক-একটা চন্দ্রপুলি, আর সের দুয়েক বড় বড়-ছানাবড়া। দুকাপ চা খেয়ে গোটা চারেক ছানাবড়া আর চন্দ্রপুলি উদরস্থ করে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করলে তুমি আমাকে admire করতে আরম্ভ করবে, এ আমি নিশ্চয় বলছি। তা ছাড়া, অনেকটা ঘুরে এসেছ ; তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে you badly need some refreshment।"

এরূপ চন্দ্রপুলি ছানাবড়া সংযুক্ত চা পানের প্রস্তাব লোভজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু যার সঙ্গে একনম্বরের বিবাদ মাথার উপর আসন্ন হয়ে ঝুলছে তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ সমীচীন হবে কি-না, সে কথাও বিবেচ্য। তা ছাড়া, একথা শুনলে সুধীরা প্রসন্ন হবে না তদ্বিষয়েও সন্দেহ নেই। এই সকল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে রাখাল বললে, "Thank you, দরকার নেই। পথ ছাড়ো।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "নিশ্চয় ছাড়ব না। তোমাকে দিয়ে পাল্টা দিইয়ে, ঋণ থেকে তোমাদের মুক্ত করিয়ে, তবে ছাড়ব।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে রাখাল বললে, কিসের পাল্টা ?"

বীরেন বললে, "চা খাওয়ার পাল্টা। কাল সকালে তোমার ভগ্নী আমাকে চা খাইয়েছিলেন, সামাজিক ভদ্রতা অনুযায়ী তার পাল্টা খাওয়া খেয়ে যেতে তুমি

বাধ্য; কারণ আমার বাড়িতে এখন স্ত্রীলোক নেই, সুতরাং তাঁকে আমি নিমন্ত্রণ করতে পারিনে।"

সুধীরাও যে বীরেনের সহিত চা পান করেছিল সে কথা সে বললে না।

বিস্ফারিত চক্ষে রাখাল বললে, "আমার ভগ্নী তোমাকে চা খাইয়েছিল ?"

বীরেন বললে, "শুধু চা-ই নয়, তার সঙ্গে প্রচুর খাবার।"

"বিশ্বাস করিনে।"

বীরেন বললে, "দেখ রাখালদাদা, বাজে কথা বলার আমার অভ্যেস নেই। বেশি চালাকি যদি কর তা হলে আবার সেদিনকার মতো তোমাকে কোলে তুলে দোলাতে দোলাতে নিয়ে যাব। তার চেয়ে আপত্তি না করে লক্ষ্মীছেলের মতো ভালোয় ভালোয় চল।" বলে রাখালের বাম বাহুর সহিত নিজ দক্ষিণ বাহু জড়িয়ে দিয়ে কতকটা টানতে টানতে রাখালকে ধরে নিয়ে চলল।

গেটের ভিতর প্রবেশ করে বীরেন বললে, "যাচ্ছই যখন তখন সহজে চল রাখালদাদা। তোমাকে এরকম করে টেনে নিয়ে যাচ্ছি আমার চাকর-বাকররা দেখতে পেলে তোমারও গৌরব বাড়বে না, আমারও গৌরব বাড়বে না।"

রাখাল দেখলে জোর করে সত্যই কোনও লাভ নেই। অগত্যা সহজ হয়ে চলতে চলতে বললে, "যাচ্ছি, কিন্তু under protest যাচ্ছি।"

রাখালের কথা শুনে বীরেন গম্ভীর মুখে বললে, "সে ভালো কথা। মুখের protestই ভালো, দেহের protestটা এ বয়সে একটু খারাপ দেখাচ্ছিল।"

বীরেনদের দক্ষিণ দিকের বারান্দা থেকে চৌধুরী বাড়ির কোনও অংশই দৃষ্টিগোচর হয় না। সেখানে উপস্থিত হয়ে রাখাল একটু স্বস্তি বোধ করলে। সুনীরা অথবা চৌধুরী বাড়ির অপর কেহ তাকে চাটুয্যে বাড়িতে দেখতে পেলে একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন হবে, মনে মনে এ আশঙ্কা তার ছিল।

একটা গোল টেবিল বেষ্টন করে কতকগুলো চেয়ার ছিল, তন্মধ্যে একটা চেয়ার রাখালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বীরেন বললে, "নিশ্চিন্ত হয়ে বোসো রাখালদাদা, কোনও ভয় নেই তোমার। তুমি যখন উপস্থিত আমার সম্মানার্হ অতিথি, আমার কাছ থেকে সব রকম শ্রদ্ধা আদর আর protection তুমি দাবি না করেও পাবে।"

যে কারণেই হোক, এ বিশ্বাস রাখালেরও মনে মনে ছিল। তদুপরি বীরেনের মুখে সে বিষয়ে স্পষ্ট আশ্বাস লাভ করে সে খুসী হল। "Thank you" বলে চেয়ারে উপবেশন করে সিগারেট কেস্ থেকে একটা সিগারেট বার করে সে দেশলাই জ্বাললে। বীরেনের সঙ্গে টানাটানি করে বেচারা একটু ক্লান্তও হয়েছিল।

গণেশকে ডাকবার জন্য বীরেন কয়েকপদ অন্দরের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিল, দেশলাই জ্বালার শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাড়াতাড়ি নিকটে এসে নিচু হয়ে ফুঁ দিয়ে সে রাখালের দেশলাই নিভিয়ে দিলে। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

নির্বাপিত কাঠিটা হাতে ধরে বিস্ময়বিমূঢ় ভঙ্গিতে বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রাখাল বললে, "অর্থাৎ ?"

সম্মুখের চেয়ারে উপবেশন করে বীরেন বললে, "অর্থাৎ, আমার বাড়িতে দয়া করে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ নিজের সিগারেটটিও ধরাতে পাবে না।" পকেট থেকে দেশলাই আর সিগারেটের কেস বার করে রাখালের সম্মুখে টেবিলের উপর স্থাপন করলে।

দেশলাই ও সিগারেট কেস্ টেনে নিয়ে বিস্মিত স্বরে রাখাল বললে, "তুমি সিগারেট খাও ?"

রাখাল বললে, "খাই। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আর একটু বাড়ালে দেখতে পাবে এমন আরও দু-চারটে কুকার্য আমি করে থাকি।"

"না' না, তা বলছিনে, বকুলতলাতে তো দেখি লম্বা মোটা চুরুট মুখে দিয়ে পড়ে থাক।"

স্মিতমুখে বীরেন বললে, "রণক্ষেত্রে রাইফেল চালাই বলে বাড়ির ভিতর চালাতে হবে তার কী মানে আছে বল ? বাড়িতে চালাই রিভলভার। বকুলতলায় লম্বা মোটা চুরুট মুখে দিয়ে পড়ে থাকি তোমাদের মনে একটা আতঙ্কমিশ্রিত সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলবার জন্যে ; একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে।"

"কিসের আবহাওয়া ?"

"রণাস্ফালনের।"

বীরেনের কথা শুনে রাখালের মুখে মৃদু কুঞ্চন দেখা দিলে, যদিচ অর্থ তার ঠিক কী, তা বোঝা গেল না। একটু চুপ করে থেকে সে বললে, "সে কথা থাক, কাল তোমাকে সুধীরা চা খাইয়েছিল এ কথা সত্যিই সত্যি ?"

বীরেন মাথা নেড়ে বললে, "একেবারেই সত্যি।"

"আর খাবার ?"

"প্রচুর !"

"Honour bright ?"

"Honour bright !"

মনে মনে কী চিন্তা করে রাখাল কতকটা নিজের মনে মনেই বললে, "What does she mean by it after all ?"

স্মিতমুখে বীরেন বললে, "Perhaps something which does not really mean anything "

একটু চুপ করে থেকে রাখাল বললে, "তা সত্যি। These women folk are sometimes hopelessly meaningless !"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা হুইস্‌ল বার করে বীরেন সজোরে বাজিয়ে দিলে।

বিস্মিত কণ্ঠে রাখাল বললে, "এ আবার কী ?"

বীরেন বললে, "এ কিন্তু hopelessly meaning নয়। এর concrete meaning এখনই সশরীরে হাজির হবে।"

বলতে বলতে করিম বকস সবেগে বারান্দায় আবির্ভূত হয়ে "হুজুর!" বলে সেলাম করে দাঁড়াল। সাতঙ্ক বিস্ময়ে রাখাল ঘটক তার ছয় ফুট দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের প্রতি তাকিয়ে রইল।

রাখাল ঘটককে নির্দেশ করে বীরেন বললে, "ওস্তাদ, ইনকো পহচানা ?"

করিম বক্‌স্ বললে, "হাঁ হুজুর, জরুর পহচানা। ইয়ে তো জিমিদার ঘরকে কোই রিস্তেদার হোঙ্গে।"

বীরেন বললে, "অভি তো ইয়ে হমারে মেহবান হৈঁ। চা পিনেকে ওয়াস্তে হম ইনকো বোলায়া হৈ। কুচ খাতির তো ইনকো জরুর করনা চাহিয়ে। এক অচ্ছা আবাজ ইন্‌কো শুনা দেও।"

বীরেনের কথা শুনে "জো হুকুম" বলে করিম বক্‌স সহসা এমন একটা বিকট চিৎকার করে উঠল যে, মনে হলো বারান্দার ছা তটাই বুঝিবা সেই শব্দের দাপটে খসে ভেঙে পড়ে। প্রাঙ্গণে যে দু-চারজন লোক কাজ করছিল, এরূপ চিৎকারে অভ্যস্ত হলেও তারা ক্ষণকালের জন্তে কাজ বন্ধ করে তাকিয়ে রইল। আর রাখাল ঘটকের যা অবস্থা হলো তা বর্ণনা করার চেয়ে অনুমান করাই ভালো। মুখে একটা অস্ফুট অবাচিক শব্দ ক'রে সে ভীতিপাংশু মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যে কোনও একদিকে একটা ছুট দিতে পারলেই যেন ভালো হয়! বীরেন কিন্তু তার অবকাশ না দিয়ে হাত ধরে তাকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললে, "কিছু ভয় নেই রাখাল দাদা, এ তোমার অনারে চিৎকার। বড় বড় লোকের খাতিরে কলকাতায় তোপ পড়তে শুনেছ তো ? এ-ও কতকটা সেই রকম।"

রাখাল ঘটকের তখনও পা কাঁপছিল, বিরক্তিমিশ্রিত বিরস মুখে সে বললে, "God save me from such খাতির! আমি কিন্তু আর বেশিক্ষণ থাকব না, তা বলে দিচ্ছি।"

বীরেন বললে, "না, বেশিক্ষণ তোমাকে থাকতে হবে না, এক্ষণি চা আসছে।" তারপর করিম বক্‌সের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, "ওস্তাদ, গণেশকো জলদি ভেজ দেনা!"

"বহুত খুব" বলে করিম দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে, এবং ক্ষণকাল পরেই গণেশ এসে উপস্থিত হলো। বীরেনের নিকট এসে বললে "ক্যানে ?—আমাকে আবার কী করতে বলছ ?"

বীরেন বললে, "ঐরকম একটা চিৎকার করতে বলছি।"

চক্ষু বিস্ফারিত করে গণেশ বললে, "শোন কথা! আমি কি একটা গুণ্ডা যে, ঐরকম চিৎকার করব ?"

বীরেন বললে, "তা করিম বক্‌সই একটা গুণ্ডো না-কি ? একবার সামনা-সামনি বল না তাকে গুণ্ডো, তা হলে তোর মুণ্ডোটাই গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দেবে।"

প্রসঙ্গটা বিপজ্জনক বিবেচনা করে এবিষয়ে আর কোনও কথা না বলে গণেশ বললে, "কী করতে হবে বল ?"

বীরেন বললে, "বামুন ঠাকুরকে বল আমাদের দুজনের জন্তে টি-পটে চার পেয়ালার মতো চা দেবে, আর তার সঙ্গে ছানাবড়া আর চন্দ্রপুলি। চা হবে কালো ছাগলের কাঁচা দুধ দিয়ে। বুঝলি ? না, সে দুধ মৌতাতের মুখে মেরে দিয়েছ ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করে গণেশ বললে, "কী যে বল দাদাবাবু! আমি কি আফিমের মৌতাত করি যে দুধ মেরে দোব ?"

"তবে কিসের মৌতাত করিস ?"

রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করে গণেশ বললে, "শোনো কথা! কিসের মৌতাত করি তাও বলতে হবে।" তারপর বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললে, "যাই করি না কেনে, তুমি মুনিব, তোমার কাছে কিছু ছাপা আছে না-কি ?"

বীরেন বললে, "আচ্ছা, আর সাধুগিরি ফলাতে হবে না। নিয়ে আয় দুধ—দেখি আমি তুই কী করেছিস।"

দুধের পাত্র নিয়ে এসে গণেশ ঢাকনা খুলে বীরেনের সামনে ধরলো।

পাত্রের ভিতর দৃষ্টিপাত করে বীরেন বললে, "কালো ছাগলের দুধই যদি, তা হলে এত শাদা হলো কী করে শুনি ?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বীরেনের দিকে চেয়ে দেখে গণেশ বললে, "শোন কথা! তা কালো ছাগলের দুধ শাদা না হয়ে কালো হবে না-কি ?"

বীরেন বললে, "কালো ছাগলের দুধ যদি কালচেই না হবে তো শাদা ছাগলের দুধ অত শাদা হয় কেন ? আর, কালো ছাগলেব দুধ যদি অত শাদাই হবে তো শাদা ছাগলের দুধ একটু কালচে হবে না কেন তা বল ?"

হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে গণেশ বললে, "তা আমি বলতে নারব দাদাবাবু। ক্যানে, তা তোমার ঐ বন্ধুটিরে শুধাও। লেখাপড়া জানা মানুষ বলতি পারবে।" তারপর রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, "দেখ দিকি বাবু নিত্যি সকালে এমন একটা করে কথা তুলবে যে, সারা দিন মাথা গুলিয়ে থাকবে! শাদা ছাগলের দুধ ক্যানে কালো হবে তার আমি কী জানি বল তো!"

গণেশের কথা শুনে বীরেন ও রাখাল যুগপৎ সমস্বরে হেসে উঠল। শাদা ছাগলের দুধ যে এত শীঘ্র কালো হয়ে উঠবে তা তাদের মধ্যে কেউই প্রত্যাশা করেনি।

বীরেন ও রাখালের ঐকতানিক হাসি শুনে বিরক্তিতে গণেশের চক্ষু কুঞ্চিত হয়ে উঠল ; বললে, "তা এই দুধে চা হবে, না গায়ের দুধে হবে তা বল।"

বীরেন বললে, "এই দুধ, কি সেই দুধ কিচ্ছু আমি জানিনে। কালো

ছাগলের কাঁচা দুধে হবে।"

অভিনিবেশ সহকারে বীরেনের কথার তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করে গণেশ বললে, "তা হলে কাঁচা দুধই তো বলছ? কালো দুধ বলছ না?"

বীরেন বললে, "কালো দুধ বলছি, কি বলছিনে তা আমি কিছু জানিনে। আমি বলছি কাঁচা দুধ।"

পুনরায় মনোযোগের সহিত ক্ষণকাল চিন্তা করে গণেশের মুখে বিরক্তির ছায়া দেখা দিলে; বললে, "কী গেরো! তবে তো এই দুধই বলছ। দেখ দেখি, খামকা এতটা সময় নষ্ট করে দিলে।" বলে গজর গজর করতে করতে প্রস্থান করলে। দু-চার পা অগ্রসর হয়ে ফিরে এসে বললে, "একটা কথার উত্তর দাও তো!...দেখি, কী দেবে?

বীরেন বললে, "কী কথা?"

"ছাগল তো লালও হয়?"

"তা তো হয়ই, আমাদেরই তো লাল ছাগল আছে।"

"আচ্ছা, কালো ছাগলের দুধ যদি কালচে হবে, তা হলে লাল ছাগলের দুধ কী রকম হবে শুনি?"

গণেশের কথা শুনে বীরেন হো হো করে হেসে উঠল; বললে, "সাধে কি বলি গণেশ, তোর একটা শুঁড় ছিল, কেমন করে খ'সে গেছে। তুই একটা মস্ত বড় হস্তিমূর্খ! ওরে, কালো থেকে যদি কালচে হয়, তা হলে লাল থেকে কী হবে? নীলচে?"

গণেশের সব কিছু সহ্য হয়, শুধু বুদ্ধিহীনতার অপবাদ সহ্য হয় না; বললে, "না, না, তাই কি আমি বলছি যে, লাল থেকে নীলচে হবে? লাল থেকে তো লালচেই হবে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে রুক্ষ স্বরে বীরেন বললে, "তবে?"

বীরেনের তাড়নায় একটু ভীত হয়ে গণেশ বললে, "তবে আবার কী? সে তো অন্য কথা। কিন্তু দুধে কী হবে শুনি?"

তেমনি ভ্রূকুঞ্চিত করে বীরেন বললে, "দুধে চা হবে। যা, পালাঃ— শীগ্‌গির চায়ের ব্যবস্থা কর।"

"এই দেখ, কোন কথা থেকে কোন কথা এনে ফেললে! খালি মাথা গুলিয়ে দেবার মৎলব।" বলে গজ্‌গজ্ করতে করতে গণেশ প্রস্থান করলে।

গণেশ অন্তর্হিত হলে রাখাল বললে, "পাগল না-কি?"

বীরেন বললে, "ষোল আনা না হলেও, শ্রীমতী গঞ্জিকা দেবীর কৃপা আর কিছুদিন চললে, অথবা আর একটু বাড়লে, তাই দাঁড়াবে।"

ঘৃণা ও বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে রাখাল বললে, "গাঁজাখোর?"

বীরেন বললে, "গাঁজা যখন খায় তখন সে অপবাদ অস্বীকার করা যায় না?"

"রাখো কেন অমন লোককে? ছাড়িয়ে দিতে পার না?"

রাখালের কথা শুনে বীরেন মৃদু মৃদু হাসতে লাগল ; বললে, "কত চেষ্টা করে ওর গাঁজাই ছাড়াতে পারলাম না, তা ওকে ছাড়াব কেমন করে রাখাল দাদা ?"

রাখাল বললে, "গাঁজা হলো একটা নেশা, ছাড়ানো শক্ত। কিন্তু তাই বলে গাঁজাখোরকে ছাড়াতে পারবে না কেন ?"

তেমনি হাসতে হাসতে বীরেন বললে, "কিন্তু দোষ তো শুধু গাঁজাখোরেরই নয় রাখালদাদা, আমারও যে দোষ আছে।"

"তোমার আবার কিসের দোষ ?"

"নেশার।"

"কিসের নেশার ? গাঁজার ?"

রাখালের কথা শুনে বীরেন উচ্চ হাস্য করে উঠল ; "গাঁজার চেয়েও কড়া নেশার। গণেশের হচ্ছে গাঁজার নেশা, আর আমার হচ্ছে গণেশের নেশা। গণেশেরও গাঁজা ছাড়বার যো নেই, আমারও গণেশ ছাড়বার যো নেই।"

"তার মানে ?"

বীরেন বললে, "মানে অনেক কিছুরই থাকে না রাখালদা, থাকলেও অনেক সময়েই তা বোঝান যায় না। মোটের ওপর এইটুকু জেনে রাখো যে, যে-কারণেই হোক, গণেশের সম্পর্কে আমার মনে একটু দুর্বলতা আছে।"

গণেশ শুধু তার পিতার সময়েরই নয়, তার পিতামহর সময়ের ভৃত্য। চল্লিশ বৎসর পূর্বে দশ বৎসরের বালকরূপে চাটুয্যে পরিবারে তার প্রবেশ এবং তার জননীর দীর্ঘকালব্যাপী ব্যাধির সময়ে সে-ই তাকে বুকে করে মানুষ করেছিল,— এ সকল কথা বলে গণেশের বিষয়ে রাখালের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে বলে বীরেনের মনে হলো না। রাখালও চুপ করে গেল, আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না।

সমারোহের সহিত চা-পান শেষ হলো। শুধু ছানাবড়া এবং চন্দ্রপুলিই নয়, হরিরাম পাচকের নৈপুণ্যে এবং উদ্যমে আরও তিন-চার প্রকারের মুখরোচক খাদ্য চা-পানের তালিকাকে সমৃদ্ধ করেছিল।

বীরেনের সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাতে ধরাতে রাখাল বললে, "আজকের মধ্যাহ্ন-ভোজনটিকে একেবারে হত্যা করলে বীরেন। পিসিমার এলাকার বন-বাদাড়ের তরকারি আজ একেবারে untouched পড়ে থাকবে। সুক্তো, চচ্চড়ি ছেঁচকির আজ কোনও আশাই রইল না।"

বীরেন বললে, "না, না রাখালদা, কাল মিস্ চৌধুরী যে খাবার খাইয়েছিলেন তার তুলনায় এ কিছুই নয়। তুমি বরং বাড়িতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।"

সুধীরা বীরেনকে চা খাইয়েছিল তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রতীতি হবার পর থেকে রাখালের সংকোচ অনেকটা কেটে গিয়েছিল। সে বললে, "বাড়ি গিয়ে সে কথা

তো নিশ্চয় হবে ; কিন্তু সে যাই হোক, এ রকম হেত্তী আর গুড্ টি অনেক দিন খাই নি।"

গৃহ গমনের জন্ত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে রাখাল বললে, "আপোস নিষ্পত্তির কি কোনও আশাই নেই বলে মনে কর ?"

বীরেন বললে, "কিসের আপোস-নিষ্পত্তি ?"

"ওই cursed দেড় বিঘা জমির, যা নিয়ে তোমাদের মধ্যে লাঠালাঠির উপক্রম চলেছে ?"

বীরেনের মুখে নিঃশব্দে হাস্ত ফুটে উঠল ; বললে, "Cursed কেন বলছ রাখালদা, আমার তো মনে হয় blissful। ও জমি এরই মধ্যে আমাকে যা দিয়েছে, আর যদি কিছু নাও দেয়, তবুও আমি তাকে বলব প্রচুর। ও জমির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ, চা খেয়েছ তো খেয়েছ, পাল্টা দিয়েছ ; তাতে লোকে বিশেষ কিছু মনে করবে না। কিন্তু আর যদি বেশি বিলম্ব কর তা হলে না নাইয়ে-খাইয়ে আমি তোমাকে ছাড়ব না। সে অবস্থায় কিন্তু তোমার ভগ্নী মনে করতে পারেন যে, আমি তোমাকে দলে টানবার চেষ্টা করছি।"

রাখালের মুখে পুলকের চাপা হাসি দেখা দিলে ; বললে, "যদি বিশ্বাস কর তো একটা কথা বলি।"

"কী কথা ?"

"টানবার চেষ্টা করছ, না, already টেনেছ !"

বীরেন উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললে, "এই সামান্ত একটু চা খাইয়ে না-কি ?"

সজোরে মাথা নেড়ে রাখাল বললে, "রামচন্দ্রঃ ! far from it ! তবে হাঁা, আজকের তোমার এই magnificent চা-টা Last Straw বটে, that broke the camel's back" বলে উচ্চহাস্ত করে উঠল। হাসি থামলে বললে, "সেদিন পুকুরপাড়ে যা গালাগালটা তোমাকে দিয়েছিলাম তাতে তুমি যদি আমাকে ছুঁড়ে পুকুরে ফেলে দিতে তা হলেও আমি grudge করতে পারতাম না। কিন্তু তুমি সত্যিকারের একজন ভদ্রলোক, একজন পয়লা নম্বরের স্পোর্টস্‌ম্যান, কত সহজে আর কত শীঘ্র তুমি আমাকে ক্ষমা করলে বল দেখি, অথচ আজ পর্যন্ত আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই নি।"

বীরেন বললে, "তুমি ভুলে যাচ্ছ রাখালদা, মিস চৌধুরী চেয়েছিলেন।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে রাখাল বললে, "আরে, রেখে দাও তোমার মিস্ চৌধুরী। আমি করলাম অপরাধ, আর মিস্ চৌধুরী চাইলেন ক্ষমা,—এ ক্ষমা চাওয়ার কোন মানে আছে না-কি ?" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় উচ্ছ্বাসের সহিত বলে উঠল, "আর তা ছাড়া—"কিন্তু ঐ পর্যন্ত বলেই কথাটা শেষ না করে সহসা থেমে গেল।

বীরেন বললে, "আবার কী ?"

কথাটা সোজাসুজি বলতে বোধ হয় রাখালের সংকোচ বোধ হচ্ছিল ; বললে "দেখি তোমার হাতের সেই ঘা-টা ?"

বীরেন বললে, "সে তো তার পরদিনই শুকিয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, হঠাৎ কামড়ালে কেন বল তো রাখালদা ? না কামড়ালেও তো পারতে ?"

একটু অপ্রতিভ হয়ে রাখাল বললে, "ও কি আর ইচ্ছে করে কামড়েছিলাম ? হঠাৎ হয়ে গেল। কি জান ? ওটা হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্যে একটা automatic reaction, একটা involuntary gesture, নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবার একটা spasmodic expression।"

সহাস্যমুখে বীরেন বললে, "কিন্তু রাখালদাদা, তোমার spasmodic expression-এর জলুনি তা বলে নিতান্ত কম নয়।"

বীরেনের বামস্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করে দুঃখিত স্বরে রাখাল বললে, "I am sorry বীরেন !"

মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "না, না রাখালদাদা, এতে তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। ও তো তোমার volitional operation নয়, involuntary gesture ; ওর জন্য তোমার অপরাধ কোথায় বল ?"

রাখাল বললে, "তোমার এই generous interpretation-এর জন্যে ধন্যবাদ,—কিন্তু আর দেরি করা নয়, চললাম। বাড়ি ফিরতে যে-রকম দেরি হয়ে গেল, ওরা হয়তো ভাবছে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এসে শেষকালে লোকটা আত্রাই নদীতে ডুবে মরল !"

রাখাল যে একজন বিলাত ফেরৎ ব্যক্তি, ছলে ছুতোয় সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার সুযোগ পেলে সে সহজে ছাড়ে না।

বীরেন বললে, "আচ্ছা, আর তোমাকে আটকাব না,—কিন্তু আমার বাড়িতে চা খাবার তোমার চিরস্থায়ী নিমন্ত্রণ রইল। চায়ের পিপাসা পেলেই অসংকোচে অকুতোভয়ে আমার এখানে চলে এস।"

মৃদু হেসে রাখাল বললে, "অসংকোচে হয়তো আসব—কিন্তু অকুতোভয়ে আসব তা বলতে পারিনে। তোমার ঐ করিম বকসটির সম্বন্ধে অকুতোভয় হতে পারি এত শক্ত মেরুদণ্ড আমার নেই।"

ব্যগ্রকণ্ঠে বীরেন বললে, "না, না, রাখালদা, করিম বক্সের সম্বন্ধে নিশ্চয় অকুতোভয় হতে পার। ও তোমার কোন অনিষ্ট করবে না।"

রাখাল বললে, "আরে ভায়া, অনিষ্ট হয়তো করবে না, কিন্তু খাতির করতেও তো পারে। খাতির করে যদি সেই রকম একটা আওয়াজ ছাড়ে, তা হলে ?"

বীরেন বললে, "তা হলে তাতে ক্ষতিই বা কী রাখাল দাদা ?"

রাখাল বললে, "পেটের মধ্যে লিভার পিলে বলে যে জিনিসগুলো আছে, তাদের কথা ভুললেও তো চলবে না,—তাদের ক্ষতিও তো ক্ষতি। পিলে

চষকালে ক্ষতি হয় না, এ তুমি আমাকে বলতে পার ?"

রাখালের কথা শুনে বীরেন সহাস্যমুখে বললে, "না ঠিক বলতে পারিনে। সে যাই হোক, তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমি না বললে করিম বক্স তোমাকে আওয়াজ শোনাবে না।"

রাখালকে বীরেন নিজেদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে রাখাল বললে, "তুমি যদি বল বীরেন, একটা যা হয় কিছু মিটমাটের জন্যে একবার চেষ্টা করে দেখি।"

বীরেন বললে, "তা যদি একান্তই দেখতে হয় তা হলে আমার দিকেই চেষ্টা করে দেখো ; ওদিকে কিছুমাত্র আশা ভরসা নেই।"

"কেন ?"

"কারণ, ও পক্ষের মিটমাটের শর্ত হচ্ছে এ পক্ষের ষোল আনা পরাজয় স্বীকার করা ; অর্থাৎ, বিনা বাক্যে দেড় বিঘা জমির দেড় বিঘারই দখল ছেড়ে দিয়ে নত মস্তকে জমি থেকে বেরিয়ে আসা।"

"আর, এ পক্ষের শর্ত কি শুনি ?"

"এ পক্ষের শর্ত হচ্ছে, দেড়বিঘা জমির মধ্যে ধর্মত আর আইনত যদি এক ছটাক জমিও অপর পক্ষের না হয়, তা হলে এক ছটাক জমিরও দখল না ছাড়া। আর, এ পক্ষের মতে, ধর্মত আর আইনত, সিকি ছটাক জমিও ও পক্ষের নয়।"

"তা হলে তোমার কাছেই বা অনর্থক চেষ্টা করে কী লাভ আছে তা বল ?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "না,—বিশেষ কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।"

আজ প্রত্যুষে মন্দাকিনী লাঠিয়ালদের বলবৃদ্ধির জন্যে দুর্যোধন মণ্ডলকে তলব করবার ব্যবস্থা করেছিলেন, সে কথা রাখাল ঘটকের জানা ছিল। এ পক্ষের করিম বকস যে একাই একশ', তাও সে আজ স্বচক্ষে দর্শন করলে। লাঠালাঠির কালে আহত হবার পূর্বে সে যে বিপক্ষ দলের অন্ততঃ দশবারো জনকে ভূমিশায়ী করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। সুতরাং, পাঁচিল গাঁথবার দিন শক্তি-পরীক্ষাটা একান্তই যদি হয় তো বেশ একটু সমারোহেরই সহিত হবে এ আশঙ্কা তার মনে বদ্ধমূল হলো। দুঃখিত স্বরে সে বললে, "তা হলে দেখছি, কতকগুলো মাথা-কাটাকাটি আর রক্তপাত কিছুতেই আটকাতে পারা গেল না। আচ্ছা, এতে কার কী লাভ হবে বল তো শুনি ?"

বীরেন বললে, "আমি তো মনে করি, আমার হয় তো হবে। যদি আমার কিছুমাত্র আশা ভরসা থাকে তো একমাত্র মাথা-কাটাকাটির মধ্যেই আছে, এ তোমাকে বলে রাখলাম।"

সকৌতূহলে রাখাল জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ?"

বীরেন বললে, "ত্রৈরাশিকের অঙ্ক মনে আছে তো রাখালদাদা ? কল অফ থ্রি ? এততে যদি অত হয় তা হলে ততে কত ?"

মৃদু হেসে রাখাল বললে, "আশা তো করি, আছে।"

"আচ্ছা, তা হলে এই সহজ ত্রৈরাশিকটা কষো দেখি: অল্প একটু দাঁতের কামড়ে মিস্ চৌধুরীর মনে যদি অতখানি করুণার সঞ্চার হতে পারে, তা হলে লাঠির চোটে মাথা কাটলে কতখানি হবে? আমার তো মনে হয়, কোনও গতিকে মাথাটা কাটিয়ে একবার শয্যা নিতে পারলে মিস চৌধুরীকে দিয়ে আমার প্রার্থনাটা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া খুব কঠিন না হতেও পারে।"

ঔৎসুক্যভরে রাখাল জিজ্ঞাসা ক'রলে, "কী তোমার প্রার্থনা?"

অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা অমন ভাবে বলে ফেলে বীরেন একটু বিমূঢ় হয়ে গেল। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললে, "প্রার্থনা আর কি। ঐ দেড় বিঘে জমি নিয়ে পরস্পরের মধ্যে যে মনোমালিন্য চলছে, তা যেন মিটে যায়—এই আমার প্রার্থনা।"

কিন্তু এই প্রার্থনার কথা থেকে রাখালের ঔৎসুক্য জাগ্রত হলো গতকল্যকার সুধীরা ও বীরেনের সাক্ষাৎকারের প্রতি। বললে, কাল তুমি কখন গেছলে সুধীরার সঙ্গে দেখা করতে?"

"বেলা আটটার সময়ে।"

"ফিরলে কখন?"

"তা প্রায় সাড়ে নটায় হবে।"

ক্ষণকাল কী চিন্তা করে রাখাল বললে, "আমি বেরিয়েছিলাম সাতটার সময়ে, আর ফিরি দশটার পর। তুমি গিয়েছিলে, সে সংবাদ পেয়েছিলাম; কিন্তু চা খেয়েছিলে তা জানতাম না। অতক্ষণ ধ'রে কী তোমাদের কথা হলো বলতে কিছু আপত্তি আছে?"

বীরেন বললে, "তা একটু আছে বই কি। কথাটা তো শুধু আমারই নয়, সুধীরাও তো বলেছিলেন। তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি কী করে বলি? তাঁর কাছ থেকে তুমি শুনো।"

"সেও যদি ঐ কথাই বলে,—কথাটা তো শুধু তারই নয়, তোমারও—তা হলে?"

"তা হলে তাঁকে বোলো যে তাঁর যদি তোমাকে বলতে কোনও আপত্তি না থাকে তো আমার নেই।"

"দেখা যাবে।" বলে রাখাল গৃহাভিমুখে প্রস্থান করলে। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে দেখলে প্রভাময়ী চৌধুরী বাড়ির গেট দিয়ে নির্গত হয়ে তাকে দেখেই বিপরীত দিকে চলে গেল। একবার মনে হলো চেঁচিয়ে ডাকে। কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে বীরেনকে গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাহস হলো না।

তের

গৃহে পৌঁছে সুধীরার সহিত রাখালের অবিলম্বে সাক্ষাৎ হলো। সুধীরা তখন নিজ কক্ষের সম্মুখের বারান্দায় বসে উমাশঙ্করকে চিঠি লিখছিল। দূর থেকে দেখতে পেয়ে নিকটে এসে রাখাল বললে, "কী সুধীরা, কলকাতায় চিঠি লিখছ বুঝি?"

সুধীরা বললে, "হ্যাঁ লিখছি। তুমি আজ লিখবে না কি রাখালদা?"

রাখাল বললে, "না, আমি আজ লিখব না, কাল লিখলেই হবে। কাল আমাদের লোক ডাক নিয়ে যাবে তো?"

"হ্যাঁ যাবে।"

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে নিকটে বসে হাসি-হাসি মুখে রাখাল বললে, "কোথায় গিয়েছিলাম বলতে পার সুধীরা?"

সুধীরা বললে, "কেন, তুমি তো ব'লে গিয়েছিলে, আত্রাই নদীর ধারে বেড়াতে যাচ্ছ।"

"আহা হা, সে তো কোন সকালে গিয়েছিলাম। এতক্ষণ ছিলাম কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে সুধীরা বললে, "বোধ হয় মিত্তিরদের বৈঠকখানায়।"

রাখাল বললে, "রামচন্দ্রঃ! একদিন ওরা ডেকে নিয়ে গিয়েছিল বলে কি রোজ রোজ যাই? আবার ভেবে বল।"

পুনরায় অল্পক্ষণ চিন্তা করে সুধীরা বললে, "তা হলে বোধ হয় চাটুয্যে বাড়ি।"

"কোন চাটুয্যে?"

"বীরেনের চাটুয্যে।"

বিস্ময়ের ভান করে রাখাল বললে "বীরেন চাটুয্যের বাড়ি? শত্রুপুরীতে? যাদের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে রয়েছে তাদের কাছে গিয়েছিলাম বলতে চাও তুমি।"

মৃদু হেসে সুধীরা বললে, "তাতে কী হয়েছে, যুদ্ধের সময়েই তো লোকে ছলে-ছুতোয় শত্রুশিবিরে গিয়ে থাকে শত্রুপক্ষের শক্তিসামর্থ্যের সন্ধান নেবার জন্যে।"

সুধীরার কথা শুনে রাখালের মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল; বললে, "তুমি ঠিকই অনুমান করেছ, আমি বীরেন চাটুয্যের বাড়িই গিয়েছিলাম, আর তার শক্তি সামর্থ্যেরও কিছু সন্ধান পেয়ে এসেছি; কিন্তু সংবাদ শুভ নয়।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞেসা করলে, "কেন?"

করিম বক্সের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে রাখাল বললে, "সে একবারে সাক্ষাৎ যমদূত! আমাদের দলের সব কটাকে সে একাই সাবাড় করে দিতে পারে। কী ভীষণ লোক, এখনও আমার বাঁ পেটে ব্যথা হয়ে রয়েছে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে সুধীরা বললে, ওমা কেন? পেটে ঘুঁসি মেরেছিল না-কি?"

সুধীরার কথা শুনে রাখালের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল; বললে, "বল কি! পেটে ঘুঁসি মারলে আর এ বাড়িতে ফিরতে হতো না! —আবাজ দিয়েছিলে, আবাজ! আবাজ!"

সবিস্ময়ে সুধীরা বললে, "আবাজ? আবাজ আবার কী?"

রাখাল বললে, "হুঙ্কার, হুঙ্কার! হুঙ্কার ছেড়েছেল!"

সুধীরা বললে, "ও, আওয়াজ,—শব্দ। তা আওয়াজ দিলে কেন? তোমাকে ভয় দেখাবার জন্যে না-কি?"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে রাখাল বললে, "মোটেই না! খাতির দেখাবার জন্যে। কলকাতায় রাজা-মহারাজা এলে কোর্টে কামান দাগে না?—এও কতকটা সেই রকম। Salute আর কি?"

"তা, স্যালিউটে পেটে ব্যথা হয়ে গেল?"

"আহা, স্যালিউটে কি হলো?—পিলে চমকে হলো। পেটের ভেতর অত জোরে পিলে চমকালে পেটে ব্যথা হবে না?"

রাখালের কথা শুনে সুধীরা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল; বললে, "কী শোচনীয় অবনতি তোমার হয়েছে রাখাল দা! সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এসে, কত কাফ্রি পোর্তুগীজ রুশ গুণ্ডার গল্প করে শেষকালে কি-না করিম বকসের আওয়াজ শুনে তোমার পিলে চমকে গেল!"

রাখাল বললে, "God save you from such experience! কিন্তু যদি কখনও তোমাকে সে খাতির করে তখন দেখবে পিলে চমকায় কি চমকায় না। শুধু আবাজ শুনলেই নয়, তার মূর্তি দেখলেও পিলে চমকায়। দেহে যেন রক্ত মাংস নেই, শুধু হাড় পেশি আর চামড়া! কলকাতার কোনও কোনও পেট্রোলের দোকানে লোহার মানুষের ছবি দেখেছ? হাত পা দেহ—সব লোহার সিলিণ্ডার দিয়ে তৈরী, ছুট দেবার জন্যে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছে? ঠিক সেই রকম দেখতে। একেবারে ইস্পাতের দেহ! ভালো করে ব্যবস্থা কর সুধীরা;—তোমার দুর্যোধন-টুর্যোধনের কাজ নয়।"

সহাস্যমুখে সুধীরা বললে, "তুমি দুর্যোধনকে দেখনি, তাই ও কথা বলছ। দুর্যোধন যদি নিজের হাতে লাঠি ধরে তা হলে দশটা করিম বকসের সাধ্য নেই যে তার কাছে এগোয়; বৈকালে সে আসছে তো, তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। কিন্তু সে কথা থাক, তুমি বীরেন বাবুদের বাড়ি গেলে কেন? হঠাৎ সেখানে যাওয়ার কী এমন কারণ ঘটল?"

রাখাল বললে, "আমি কি গেলাম? আমি ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসছিলাম, ও গেটে দাঁড়িয়েছিল, জোর করে টেনে নিয়ে গেল।"

সুধীরা বললে, "কোলে করে না-কি?"

সুধীরার কথা শুনে রাখাল হেসে ফেললে, "তা বড় মিছে বলনি, সে ভয়ও দেখিয়েছিল। কিন্তু যাই বল সুধীরা, ছেলেটা নিতান্ত মন্দ নয়, rather ভালোই

বলতে হবে। I confess, I have almost begun to love him!"

সুধীরার মুখে চাপা হাসি ফুটে উঠল; বললে, "তা ও-রকম বড় বড় ছানাবড়া আর চন্দ্রপুলি খাওয়ালে না ভালোবেসে কি আর থাকা যায়!"

সুধীরার কথা শুনে রাখাল ঘটকের দুই চক্ষু বীরেনের বাড়ীতে খাওয়া ছানাবড়ারই মতো বড় বড় আর গোল গোল হ'য়ে উঠল; বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে বললে, "Good Gracious! তুমি কী করে জানলে?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সুধীরা বললে, "তা ছাড়া, কালো ছাগলের কাঁচা দুধ দিয়ে বাছাই পাতার চা।" বলে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

তেমনি বিস্ময়-মিশ্রিত স্বরে রাখাল বললে, "ব্যাপার কী বল দেখি সুধীরা? রেডিয়ো-টেলিভিশন না-কি?" তারপর হঠাৎ আসল ব্যাপারটা অনুমান করে বলে উঠল, "ও! বুঝতে পেরেছি। That silly girl প্রভাময়ী;—It was none but that absolutely silly girl! সে-ই তোমাকে সব খবর দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, আমরা যখন চা খাচ্ছিলাম তখন ও-ই একবার এক মুহূর্তের জন্য উঁকি মেরেছিল। আমি যখন বাড়ি আসছি তখন সে আমাদের গেট দিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল। উঃ! একটা মেয়ে বটে! সেখানে হাজির থেকে সব দেখেছে, শুনেছে; তারপর সাঁ ক'রে এখানে এসে তোমাকে সমস্ত রিপোর্ট দিয়ে আমি বাড়িতে ঢোকবার আগে একেবারে লম্বা। এই সব মেয়ে পোলিটিকাল ফিল্ডে গুপ্তচর হ'লে দু'পয়সা ক'রে খেতে পারে। আচ্ছা, সত্যি করে বল, ও-ই তোমাকে সব কথা বলেছে কি-না?"

সুধীরা বললে, "যেই বলুক, কথাটা যে সত্যি তাতে তো আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

রাখাল বললে, "না, তা নেই। সত্যিই সে আমাকে দিয়ে বেশ ভালো ক'রেই পাল্টা দিইয়ে নিয়েছে।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "পাল্টা?—কিসের পাল্টা?" প্রভাময়ীর নিকট সে যে-সমস্ত কথা অবগত হয়েছিল তার মধ্যে এ কথাটা ছিল না।

রাখাল বললে, "তুমি যে কাল সকালে তাকে চা খাইয়েছিলে তার পাল্টা।"

ভ্রুকুঞ্চিত করে সুধীরা বললে, "তার পাল্টা তুমি এত শীগগীর আর অত সহজে দিয়ে এলে!"

ব্যস্ত হয়ে রাখাল বললে, "ঐ যে বললাম, প্রথমটা under compulsion, তারপর ক্রমশ—"

রাখালকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে সুধীরা বললে, "তারপর ক্রমশ ক্রমশ ভালোবাসতে আরম্ভ করলে?"

সুধীরার কথা শুনে রাখাল হো হো করে হেসে উঠে বললে, "ঠিক বলেছ, এক কোপে সারতে গেলে বলতে হয় ক্রমশ ক্রমশ ভালোবাসতে আরম্ভ করলাম। লোকটার মধ্যে এমন কিছু নিশ্চয় আছে যাতে শেষ পর্যন্ত তাকে ভালো না

বেসে বোধ হয় উপায় নেই। এই ধর না কেন, পরন্তু তার ওপর মনের ভাব কী রকম ছিল; পুকুর ধারে তাকে রীতিমত গালাগালই দিয়েছি; আর আজ তার বাড়ি চা খেয়ে এলাম। নাঃ, ছেলেটার magnetic power আছে।" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় বললে, "তা ছাড়া, তোমার কথাটাই ভাব-না কেন,—"

রাখালকে তার কথার মধ্যে থামিয়ে দিয়ে সুধীরা বললে, "দোহাই রাখালদাদা, আমার কথাটা না ভাবলেও কোনও ক্ষতি হবে না,—তোমার নিজের কথার দ্বারাই যথেষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বীরেনবাবু একটি শক্তিশালী চুম্বক। এখন স্নান করে নাও, খাওয়ার সময় হয়ে এল।"

রাখাল কিন্তু অত সহজে দমবার পাত্র নয়, অধিকতর নির্বন্ধের সহিত বললে, "শুধু আমার পক্ষেই নয়, তোমার পক্ষেও সে শক্তিশালী চুম্বক। নইলে শত্রুকে কে আর অমন করে টিঙ্চার আয়োডিন লাগিয়ে দেয়, আর চা খাওয়ায় তা বল?"

প্রতিবাদ করা অপেক্ষা এ কথা স্বীকার করে নেওয়া অধিকতর নিরাপদ বিবেচনা করে সুধীরা বললে, "আচ্ছা, মানলাম আমার পক্ষেও তিনি শক্তিশালী চুম্বক। এখন তুমি স্নান করতে যাও।"

বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে অগত্যা রাখালকে স্নান করতে যেতে হলো; কিন্তু আহারের পরই সে পুনরায় সুধীরাকে চেপে ধরল, বললে, "বীরেন তোমার কাছে কী প্রার্থনা করেছিল বলতো সুধীরা?"

প্রার্থনার কথা শুনে সুধীরার মুখ শুকিয়ে গেল; একটু ইতস্তত সহকারে সে বললে, "প্রার্থনা? প্রার্থনা আর আমার কাছে কী করেছিলেন তিনি?"

"তবে যে বীরেন বললে, মিস্ চৌধুরীর মনে এত অল্প কারণে করুণার সঞ্চার হয় যে, কোনও গতিকে যদি একবার মাথাটা কাটিয়ে শয্যা নিতে পারি তা হলে হয়তো তাঁকে দিয়ে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া খুব কঠিন হবে না?"

ভয়ে ভয়ে অথচ ঔৎসুক্যের প্ররোচনায় সুধীরা প্রশ্ন করলে, "কী তাঁর প্রার্থনা তা তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন?"

রাখাল বললে, "করিনি কি?—করেছিলাম। গোলমাল করে আসল কথাটা বললে না। তা ছাড়া, কাল সকালে তোমাদের কী সব কথা হলো জিজ্ঞাসা করায় কী বললে জান?"

"কী বললেন?"

"বললে, 'কথা তো শুধু আমিই বলিনি, সুধীরাও তো বলছিলেন। তাঁর অনুমতি বিনা আমি তো বলতে পারিনে, অতএব তাঁর কাছেই শুনো'। এখন তুমি বলবে তো বল।"

মৃদু হেসে সুধীরা বললে, "আমারও তো সেই আপত্তিই হতে পারে রাখালদাদা, বীরেনবাবুর অনুমতি ব্যতীত কী করে বলি?"

সুধীরার কথা শুনে রাখালের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল; বললে, "সে ব্যবস্থা

আমি করে এসেছি। বীরেন তোমাকে বলতে বলেছে যে, তোমার যদি আমাকে বলতে কোনও আপত্তি না থাকে তো তারও নেই।"

সুধীরা মাথা নেড়ে বললে, "না, তা হতে পারে না। তুমি যখন প্রথম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছ, তখন তাঁরই বলবার কথা। তাঁর যদি বলতে আপত্তি না থাকে তো আমারও নেই,—এ কথা তুমি তাঁকে দেখা হলে জানিয়ে দিয়ো।"

সুধীরার কথা শুনে রাখাল হাসতে লাগল ; বললে, "ছোটবেলায় কথামালায় পড়েছিলাম, দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নেই,—তোমরা দুজনেই দেখচি সেই দুরাত্মা। দুজনকে একত্র পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেও তোমাদের ছলের অসদ্ভাব হবে না, এ আমি লিখে দিতে পারি।"

সুধীরা এ কথার কোনও উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখমণ্ডল একটা নিঃশব্দ স্তিমিত হাস্যে রঞ্জিত হয়ে উঠল।

রাখাল প্রস্থান করলে সুধীরা বারান্দা থেকে ঘরে প্রবেশ করে একটা ইজি চেয়ারে শয়ন করে চক্ষু বুজে পড়ে রইল। উমাশঙ্করকে চিঠি লেখা এখনও শেষ হয় হয় নি, খানিকটা বাকি আছে। প্রয়োজনীয় চিঠি, অনেক শলা-পরামর্শের কথা আছে, তা ছাড়া গতকল্য নানা বাধা বিঘ্নের জন্য চিঠি দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তবুও চিঠির শেষ করতে ইচ্ছে হলো না। না হয় আরও একটা দিন বিলম্বই হবে।

চক্ষু মুদ্রিত করে সুধীরা ভাবছিল বীরেনের অবুঝ মনের নিরতিশয় বিবেচনাহীনতার কথা। অবৈরিতার দিনে সুধীরার নিকট হতে যে সৌজন্য যে সহানুভূতি সে লাভ করেছে, তিতিক্ষাহীন অকরুণ সংগ্রামের কালেও তা দুর্লভ হবে না—এ প্রত্যাশার তার ভিত্তি কী ? গতকল্য সকালে বীরেনের সহিত তার যে সুদীর্ঘ এবং সুস্পষ্ট বাদানুবাদ হয়েছে তার ফলে এইরূপ অকারণ সঙ্গতিহীন প্রতীতি হতে তার মন পরিপূর্ণ ভাবে মুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার কোনও পরিচয়ই তো নেই, পরন্তু সেই দুরপনেয় প্রত্যাশার দৃঢ়তা এত সমুচ্চ মাত্রায় বলবৎ হয়েছে যে, কোনো গতিকে মাথাটা কাটিয়ে একবার শয্যা গ্রহণ করতে পারলেই ব্যস্, আর কোনও চিন্তা নেই, একেবারে নির্বিবাদে প্রার্থনা মঞ্জুর,—এ কথাটা শুধু মনেই ভাবা চলছে না, পথ থেকে লোক ধরে নিয়ে গিয়ে বলাও চলছে। অথচ এই প্রার্থনা যে অতীব অসঙ্গত এবং সম্ভাবনাবর্জিত প্রার্থনা, গতকল্য সে মন্তব্য প্রায় নিষ্ঠুরতার সহিত করতেও সুধীরা ইতস্তত করেনি। সুধীরার ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিলে। আশ্চর্য ! এত অবুঝ আর বেহায়া লোকও থাকে।

পরক্ষণেই কিন্তু সহসা সুধীরার একবার বীরেনের দিকের কথাটা ভেবে দেখতে ইচ্ছা হলো ; অর্থাৎ, বীরেনের ধারণায় কিছুমাত্র যৌক্তিকতার সংস্রব আছে কি-না তাই।

আচ্ছা, ধরাই যাক, পাঁচিল গাঁথার শুক্রবার দিনে পাঁচিল গাঁথার সময়ে বীরেনের লোক পাঁচিল গাঁথায় বাধা দিতে আরম্ভ করলে। তখন লাঠি নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে দুর্যোধন মণ্ডল বীরেনের পক্ষকে আক্রমণ করলে, তার পিছনে আর সব

লাঠিয়ালরা লাঠি উঁচিয়ে ছুটে চলল। ওদিক থেকে সকলকে পিছনে ঠেলে রেখে বীরেন এল লাঠি হাতে এগিয়ে। লাগল বীরেনের সঙ্গে দুর্যোধন মণ্ডলের সাংঘাতিক সংগ্রাম। ক্ষণকালের জন্য কে হারে কে জেতে সংশয়ের বস্তু হ'য়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ এক অসতর্ক মুহূর্তে দুর্যোধন মণ্ডলের লাঠির সজোর চোট্ পড়ল বীরেনের মাথায়। মাথা গেল ফেটে, প্রবল রক্তস্রাবে সমস্ত মুখ রক্তাক্ত হ'য়ে গেল, ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো বীরেনের দেহ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল—নিস্পন্দ সংজ্ঞাহীন, তাড়াতাড়ি কয়েকজন লোক ছুটে এসে বীরেনকে ধরাধরি ক'রে তুলে নিয়ে গেল। তখন দুর্যোধন মণ্ডলে আর করিম বকসে ভীষণ লাঠালাঠি বেধে গিয়েছে, উভয়ের হুঙ্কারে আকাশ কম্পিত হচ্ছে, দুর্যোধন মণ্ডলের একটা প্রবল আক্রমণ করিম বকস সামলাতে পারলে না, কোমরে চোট পেয়ে ভূমিশায়ী হলো; তাকেও তার দলের লোকেরা তুলে নিয়ে চ'লে গেল। উৎসাহিত হয়ে দুর্যোধন মণ্ডল আর তার দলের লাঠিয়ালেরা বীরেনের দলের প্রতি চড়াও হলো। প্রভু এবং সর্দারের এত দ্রুত পরাজয়ে বীরেনের দল মনের শক্তি হারিয়েছিল, তারা অপর পক্ষের আক্রমণ রোধ করতে পারলে না, হটে গেল। তখন এ দিকে রাজমিস্ত্রীর দল পরম উৎসাহে পাচিল গাঁথতে আরম্ভ করে দিয়েছে, আর ওদিকে চাটুয্যেদের উত্তর দিকের বারান্দায় সুধীরার দৃষ্টিপথের সম্মুখে বীরেনের অচেতন দেহ শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকজনের ছুটোছুটি পড়ে গিয়েছে, কেউ আনছে জল, কেউ আনছে ব্যাণ্ডেজ আর টিঞ্চার আয়োডিন। এই আবেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সুধীরা নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির সহিত পাঁচিল গাথার একটির পর একটি ইট সাজানো দেখতে পারবে তো?

চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে সুধীরা কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বারান্দার পশ্চিম প্রান্তে বাথরুমে প্রবেশ করে মুখে চোখে জল দিলে। তারপর ঘরে ফিরে এসে উমাশঙ্করকে লেখা অসমাপ্ত চিঠিখানা নিয়ে শেষ করতে বসল। এক জায়গায় লিখলে, বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, কাল শুক্রবারের পরের শুক্রবার পাঁচিল গাঁথা হবেই। সহজে আমরা বল প্রয়োগ করব না, কিন্তু ওরা যদি পাঁচিল গাঁথতে বাধা দেয় তা হলে বাধ্য হয়ে বল প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্য কাউকে যাতে বেশি চোট না দেওয়া হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখব। তবে একান্তই যদি লাঠালাঠি হয় তো পরিণামে কতদূর পর্যন্ত দাঁড়াবে তা কিছুই বলা যায় না। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলে পুলিশ আদালতের ভয় আছেই। কিন্তু তোমার মুখেই তো শুনেছি, জমিদারি রাখতে হলে মামলা মকদ্দমার ভয় করলে চলে না।

বেলা পাঁচটার সময়ে মোক্ষদা ঝি এসে বললে, "দিদিরাণী, দুর্যোধন মণ্ডল এসেছে। পিসিমা তোমাকে ডাকছেন। ওমা, কী আকৃকিরতি গো দিদিরাণী, যেন একটা দানব না দত্যি। দেখে তুমি ভয় না পাও তো কী বলেছি!"

সুধীরা বললে, "তা হলে ভালোই তো রে। লেঠেলের সর্দারের আকৃতি দত্যির মতো হবে না তো আদুরে-গোপালের মতো হবে না-কি? —আচ্ছা, তুই যা, আমি এখনি আসছি।"

মোক্ষদা চলে গেলে তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্তন করে নিয়ে সুধীরা নিচে নেমে গেল। যাবার সময়ে একবার এ পুকুরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, বীরেন যথানিয়ম বকুলতলায় পিছন ফিরে ডেক-চেয়ারে বসে আছে। উঃ, কী অদ্ভুত লোকই এই বীরেন চাটুয্যে! সকাল বেলা প্রার্থনার কাহিনী, আর বিকেল বেলা চোখ রাঙানির পালা! ঠিক যেন দুমুখো সাপ। কোনও দিকটাই তার সুবিধের নয়।

নিচে এসে সুধীরা দেখলে মন্দাকিনী বারান্দায় একটা তক্তপোষের উপর বসে আছেন, আর দুর্যোধন মণ্ডল তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্যোধনের সঙ্গে যারা এসেছিল তারাও বেশ বলিষ্ঠ দীর্ঘাবয়ব লোক; কিন্তু আম গাছের সারির মধ্যে সুবৃহৎ বটবৃক্ষকে যেমন দেখায়, সেই লাঠিয়ালদের মধ্যে দুর্যোধন মণ্ডলকেও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল। দুর্যোধনকে দেখে সুধীরা খুশী হলো। দূর থেকে এক-আধবার করিম বকসকে যা দেখেছে, এ তার চেয়ে কোনও অংশেই কম নয় বলে মনে হলো।

সুধীরা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই করজোড়ে দুর্যোধন বললে, "জয় হোক রাণীদিদির!" তারপর ভূমিষ্ঠ হয়ে তাকে প্রণাম করলে। দুর্যোধনের প্রণাম করার পর তার দলের লোকেরাও সুধীরাকে প্রণাম করলে।

দুর্যোধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সুধীরা বললে, "তুমিই তো দুর্যোধন মণ্ডল?"

যুক্তকরে দুর্যোধন বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিরাণী, আমি আপনার শ্রীচরণের দাস দুর্যোধন।"

সুধীরা বললে, "আমার তোমাকে একটু একটু মনে পড়ে দুর্যোধন। সে অনেক দিনের কথা, তখন আমার বছর তিনেক বয়স হবে। পুজোর সময়ে তুমি এসেছিলে লাঠি খেলা দেখাতে। আমাকে এক হাতে ধরে কাঁধে বসিয়ে আর এক হাতে খুব লম্বা একটা লাঠি নিয়ে দৌড়ে গিয়ে লাঠির ভরে তুমি একটা উঁচু বেড়া ডিঙিয়ে গিয়েছিলে। সে কথা তোমার মনে পড়ে?"

উৎফুল্ল মুখে দুর্যোধন বললে, "মনে পড়ে বই কি দিদিরাণী। খুব মনে পড়ে। লাফিয়ে পড়ার পর আপনি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছিলেন।"

"সে কথাও তোমার মনে আছে?"

"থাকবে না দিদিরাণী? অন্য ছেলে হলে কেঁদে-ককিয়ে সারা হয়ে যেত। আপনার হাসি দেখে সভাসুদ্ধ সকলে একেবারে অবাক! লাঠি খেলা দেখে খুশী হয়ে কর্তামশায় আপনার হাত দিয়ে আমাকে একটা আকবরি মোহর বকশিস করেছিলেন।"

সুধীরা বললে, "তা হবে। সে কথা আমার মনে নেই।"

হঠাৎ সুধীরার মনে পড়ল রাখাল ঘটকের কথা। মোক্ষদা নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল, সত্বর রাখালকে ডেকে আনবার জন্য তাকে আদেশ করলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাখাল এসে পড়ল। তাকে কিছুই বলবার প্রয়োজন হলো না, দুর্যোধনকে দেখা মাত্র তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ নির্গত হলো। সেই শব্দে ভীতি এবং

বিস্ময়ের ব্যঞ্জনা।

মৃদুকণ্ঠে সুধীরা বললে, "দেখলে তো রাখাল দাদা ?"

দুর্যোধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই রাখাল বললে, "দেখলাম।"

"কী বুঝলে ?"

"ঠিক বুঝতে পারছিনে। বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক।"

রাখালকে নির্দেশ করে সুধীরা বললে, "ইনি আমার দাদা হন দুর্যোধন। কলকাতায় থাকেন, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের বিশেষ কিছু ধারণা নেই। বিলাতে যখন ছিলেন তখন সে দেশের অনেকে বড় বড় পালোয়ান দেখেছেন, আজ তোমাকে দেখলেন।"

দণ্ডবৎ হয়ে রাখালকে প্রণাম করে দুর্যোধন বললে, "তেনাদের দেহে দেবতার অংশ আছে দাদাবাবু। আমি তেনাদের কাছে কোন্ ছার।"

দুর্যোধনের বিনয়-বাক্যের উত্তর দিলে সুধীরা; ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললে, "না, না দুর্যোধন, কে বললে তুমি ছার ? আমার তো মনে হয় তুমি তাদের কারুর চেয়েই খাটো নও।"

সুধীরার নিকট হতে এই উচ্চ প্রশস্তি লাভ করে আনন্দে দুর্যোধনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাথা নত করে সুধীরাকে প্রণাম করে সে বললে, "এ আপনার আশীর্বাদ দিদিরাণী!"

মৃদু হাস্যের দ্বারা সে কথার শেষ করে সুধীরা বললে, "বাবার মুখে শুনেছি তোমরা যখন শত্রু-পক্ষকে তাড়া কর তখন মুখে একটা ভয়ংকর শব্দ কর। কী যেন তার একটা নাম আছে—"

সহাস্য মুখে দুর্যোধন বললে, "আছে। আমরা তাকে তাড়ান ডাক বলি।"

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাড়ান ডাকই বটে। দাদাবাবু এই প্রথম পলতাডাঙায় এসেছেন, ওঁর খাতিরে একবার ওঁকে তোমাদের তাড়ান ডাকটা শোনালে হয় না দুর্যোধন ?— কিন্তু শুধু তুমি একা।"

"যে আজ্ঞে দিদিরাণী!" বলে দুর্যোধন একমুহূর্তে শ্বাস টেনে যেন একবার দম নিয়ে নিলে, তারপর 'হালা-লালা-লালা' করে এমন একটা বিকট বীভৎস ডাক ছাড়লে যে বহু দূরে পর্যন্ত কুকুরগুলো আতঙ্কে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে উঠল, আর নিকটে আম গাছে কয়েকটা কাক বসে ছিল, ভয়ার্ত রবে কা-কা করতে করতে উড়ে পালাল।

কাতর নেত্রে সুধীরার প্রতি দৃষ্টিপাত করে রাখাল বললে, "দোহাই সুধীরা! একদিনে দুবার খাতির আমার মতো দুর্বল প্রকৃতির লোকের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। আবার দিলে চমকালো!"

রাখালের খেদোক্তিতে একটা মৃদু হাস্যধ্বনি উত্থিত হলো।

মন্দাকিনী এতক্ষণ নিঃশব্দ সংস্কারে দুর্যোধনের সহিত সুধীরার সপ্রতিভ এবং মর্যাদাব্যঞ্জক কথোপকথন শ্রবণ করছিলেন; রাখালের কথায় কৌতূহলী হয়ে

জিজ্ঞাসা করলেন, "দুবার খাতির কেমন করে হলো রাখাল?—একবারই তো এখন হলো।"

রাখাল বললে, "না পিসিমা, এখন হলো দু নম্বর, একনম্বর শত্রুশিবিরে হয়েছে, সে কথা পরে বলব অখন।" তারপর দুর্যোধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, "এ তোমার তাড়ন ডাক নয় যুধিষ্ঠির, এ তোমার—"

রাখালের কথা শেষ হবার পূর্বেই একটা উচ্চ হাস্য উত্থিত হলো। সকৌতূহলে রাখাল জিজ্ঞাসা করলে, "কী? কী হলো? হাসলে কেন তোমরা?"

অপ্রতিভ মুখে দুর্যোধন বললে, "আজ্ঞে আমার নাম যুধিষ্ঠির নয়, দুর্যোধন। যুধিষ্ঠির আমার ভাই বটে।"

মৃদুস্মিত মুখে রাখাল বললে, "I am sorry! কিন্তু difficulty কী হলো জান? মহাভারতেও যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের ভাই। এখন তোমার নাম বলতে গিয়ে যদি তোমার ভায়ের নাম মুখে এসে পড়ে তা হলে যুধিষ্ঠির বলতে গিয়ে মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে ভুলে তোমাকে দুর্যোধন বলে ফেলাও অসম্ভব নয়।"

পুনরায় একটা উচ্চ হাস্য উত্থিত হলো। সুধীরা বললে, "তা হলে ভুলটাই কিন্তু ঠিক হবে, কারণ ওর নাম দুর্যোধনই; যুধিষ্ঠির ওর ভাইয়ের নাম।"

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বিমূঢ় ভাবে রাখাল বললে, "নাঃ, এ দেখছি একটা hopeless muddle হয়ে উঠল! যুধিষ্ঠির-দুর্যোধন, দুর্যোধন যুধিষ্ঠির। অর্থাৎ, কে কোনটা, অথবা কে কোন্‌টা নয়!" তারপর হঠাৎ উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, "নাঃ—হয়েছে। এবার একেবারে স্থির করে নিচ্ছি,—once for all!" দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে বললে "দুর্যোধন, তোমার নাম দুর্যোধন তো?"

আশ্বস্ত হয়ে ব্যগ্রোৎফুল্ল মুখে দুর্যোধন বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ দাদাবাবু, আমার নাম দুর্যোধন।"

রাখাল বললে, "বেশ কথা। অর্থাৎ কি-না, তুমি ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে দুর্যোধন। কেমন ঠিক তো?"

যেটুকু আনন্দ দুর্যোধনের মুখে দেখা দিয়েছিল, মুহূর্তের মধ্যে তা' অন্তর্হিত হলো। বিরস মুখে মাথা নেড়ে বললে, "আজ্ঞে না দাদাবাবু, আমি নিতাই মণ্ডলের ছেলে দুর্যোধন!"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হলো।

বিহ্বল ভাবে বিকৃত মুখে রাখাল বললে, "আহা হা! সে কথা বলছিনে, কি গেরো! পলতাডাঙার কথা বলছিনে; সেই মহাভারতেরই কথা বলছি। যাত্রা, যাত্রা,—যাত্রা শোনো নি? যাত্রার কথা বলছি। যাত্রায় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে দুর্যোধনকে লড়াই করতে দেখনি?"

উপর্যুপরি এতগুলি প্রশ্নের তাড়নায় নিজেকে যৎপরোনাস্তি বিপন্ন মনে করে যুক্তকরে দুর্যোধন বললে, "আজ্ঞে দাদাবাবু, দেখেছি কি দেখিনি তা আমার মনে নেই। তা ছাড়া, অন্ধের কথা যদি কইলেন তো এক বদু মাইতি ছাড়া সারা

করিমগঞ্জের তল্লাটে আর কেউ অন্ধ নেই। আর যদু মাইতির ছেলে দুর্যোধন নয়,—নিতাই মণ্ডলের ছেলে দুর্যোধন বটে।"

দুর্যোধনের দলে পীতাম্বর ঘোষ নামে এক ব্যক্তি ছিল। জাতিতে সে গোয়ালা এবং বয়সে দুর্যোধনের চেয়ে দু-চার বৎসরের বড়ই হবে। রাখাল ঘটক এবং দুর্যোধন মণ্ডলের মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান জটিলতা তার বরদাস্ত হলো না। সে ভেড়েফুঁড়ে, দুচারজনকে ঠেলেঠুলে, এগিয়ে এসে বললে, "আরে সর্দার, তুই আবার মাইতি কয়ে আরও গোল পাকাতে লাগছিস কেন বল দেখি? দাদাবাবু তো ঠিকই কইচে।"

পীতাম্বর ঘোষের প্রতি ভ্রূকুটি করে দুর্যোধন বললে, 'কী ঠিক কইচে?"

"তুই দুর্যোধন মণ্ডল না?"

"হাঁ, আমি তো দুর্যোধন মণ্ডল।"

"আর তোর বাপ নিতাই মণ্ডল না?"

"হাঁ, নিতাই মণ্ডল তো বটে।"

"তবে?"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে পীতাম্বরের দিকে তাকিয়ে গভীর বেগের সহিত দুর্যোধন বললে, "তবে কী! আর ধেরতোরাষ্ট্রো কইছে যে?'

এ কথাটা পীতাম্বরের মনে পড়েনি। নিজের এই হিসাবে ভুলের ত্রুটির জন্য অপ্রতিভতার নিঃশব্দ স্তিমিত হাস্যে তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করে করজোড়ে সে বললে, "হাঁ দাদাবাবু, এই ধেরেতোরাষ্টোটি কে বটে বুঝিয়ে বলেন।"

দুর্যোধনও পীতাম্বরের প্রার্থনার সহিত নিজের নির্বাক প্রার্থনা মিলিত করে রাখাল ঘটকের প্রতি সানুনয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রাখাল কী বলতে যাচ্ছিল,—তাকে বাধা দিয়ে সুধীরা নিম্নকণ্ঠে বললে, "প্রহসন তো যথেষ্ট হলো রাখালদা, এবার একটু কাজের কথা হোক।" তারপর দুর্যোধন ও পীতাম্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, "শোনো তোমরা, আমি বুঝিয়ে বলছি। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন দুঃশাসনের বাপ। আর দুঃশাসন ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে। কেমন, এবার বুঝলে তো?"

দুর্যোধন এবং পীতাম্বরের উদ্বেগপীড়িত মুখ নিমেষের মধ্যে প্রশান্ত হয়ে উঠল। সুধীরার কথার দ্বারা যেন সকল সমস্যারই নিরসন হলো সেইভাবে উভয়ে তৎপরতার সহিত ঘাড় নেড়ে জানালে যে তারা বুঝেছে।

রাখাল ঘটককে নির্দেশ করে পীতাম্বর যুক্তকরে বললে, এই কথাটি যদি দাদাবাবু, আগে আপনি ফাঁস করতেন তা হলে এত ঝামেলা হতো না।" বলে নিঃশব্দে হেসে রাখালের দিকে তাকিয়ে রইল।

পীতাম্বরের ভঙ্গি দেখে এবং কথা শুনে রাখাল হেসে ফেললে। বললে "ভুল হয়ে গিয়েছে বাপু! ও কথা বললে যে, তোমরা দুজনে শীঘ্র জলের মতো বুঝে

যাবে তা আগে বুঝতে পারিনি। কিন্তু কী বুঝলে তোমরা তা একবার বল দেখি শুনি ?"

একান্ত দ্বিধাহীনতার সহিত অসংশয়িত কণ্ঠে পীতাম্বর বললে, "ওই যা দিদিরাণী কইলেন, তাই।"

রাখাল বললে, "বুঝেছি। আর, দিদিরাণী কী কইলেন শুনি ?—তোমরা যা বুঝলে তাই ?"

রাখালের প্রশ্নের প্রথম অংশ শুনে পীতাম্বরের ললাটে চিন্তার ক্ষীণ রেখা দেখা দিয়েছিল, শেষ অংশ শ্রবণ মাত্র কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তা অন্তর্হিত হলো। প্রসন্ন নিশ্চিন্ত মুখে সে বললে, "হাঁ !"—একথা বলতে তার বিন্দুমাত্র সংকোচ অথবা চক্ষুলজ্জা বোধ হলো না।

ইত্যবসরে সুধীরার আদেশে মোক্ষদা ঝি প্রভৃতি সকলেই সে স্থান পরিত্যাগ করেছে,—থাকবার মধ্যে আছে সদলে দুর্যোধন, রাখাল, কানাই হালদার এবং মন্দাকিনী।

সুধীরা বললে, "দুর্যোধন !"

কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে এসে যুক্তকরে দুর্যোধন বললে, "দিদিরাণী !"

"পিসিমা কেন তোমাকে ডাকিয়েছেন, তাঁর মুখে সব শুনেছ তো ?"

"শুনেছি দিদিরাণী।"

"কলকাতা থেকে ওরা একজন খুব দুর্দান্ত মুসলমান গুণ্ডা আনিয়েছে। এখানকার কয়েকজন লেঠেলকে সে তালিম দিচ্ছে। তা ছাড়া শোনা যাচ্ছে, কুমারগঞ্জের রঘুনাথ রায়ের এলাকার বিশ পঁচিশ জন লেঠেল ওদের দিকে যোগ দিতে পারে। তা দেয় দিক্, ওরা যা পারে তা তো করবেই, তাতে আমাদের বলবার কী আছে। কিন্তু আমাদের কী হবে দুর্যোধন ? আমাদের নিজেদের জমিতে আমরা পাঁচিল তুলতে পারব না, পাশের বাড়ির একজন প্রজা তা ভেঙে ফেলে দেবে ? পলতাডাঙার জমিদার বংশের মুখে এমনি করে চুণকালি পড়বে ? আর এই অপমানটা আমাদের সহ্য করতে হবে তুমি, দুর্যোধন মণ্ডল, বেঁচে থাকতে ?"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে দৃপ্ত স্বরে দুর্যোধন বললে, "কিছুতে না দিদিরাণী। কিছুতে না। এই পলতাডাঙার দরবারের ভাত কাপড়ে আমাদের সাতপুরুষ মানুষ হয়েছে। তোমার পাঁচিলের একটা ইটের যদি ওদের হাত দিতে দিই তা হলে আমাদের সাতপুরুষকেই নেমখারাম বলে গাল দিয়ো !"

কিছুক্ষণ পূর্বে যে দুর্যোধনকে দেখা গিয়েছিল এ দুর্যোধন যেন আর সে লোকই নয়। এর মূর্তি তা নয়, এর বুলি তা নয়, এর ভাষা তা নয়, এর কোন-কিছুই তা নয়। লাঠি আর দাঙ্গা নিয়ে দুর্যোধনের যে জীবন, সে জীবনে এক সম্পূর্ণ পৃথক মানুষ। সাধারণ জীবনের সঙ্গে তার সে জীবনের কোনও মিলই যেন খুঁজে পাওয়া যায় না।

দুর্যোধনের কথায় খুশী হয়ে সুধীরা বললে, "এ তুমি পারবে তা আমি জানি

দুর্যোধন। কিন্তু এ কথাও জান তো, ও পক্ষ হচ্ছে হাকিমের পক্ষ ?"

দুর্যোধনের মুখে মৃদুহাস্ত দেখা দিলে; অদূরে দণ্ডায়মান কানাই হালদারকে দেখিয়ে বললে, 'সে কথা জানেন তোমার হালদার মশাই দিদিরাণী, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। আমি জানি দাঙ্গা, আর আমার এই লাঠি।" বলে চিৎকার করে উঠল, "ভাই সকল!"

দুর্যোধনের দলের সকল লোক একযোগে সাড়া দিলে, "হুকুম!"

"জান্ কবুল?"

"জান্ কবুল!"

নিজের দলকে সম্বোধন করে দুর্যোধন বললে, "হাকিমকে ভয় কোরো না ভাই সকল। জেলে গেলে তোমাদের ছেলে-পিলেদের সুখ বাড়বে, পয়সা কামানো বন্ধ হলেও তারা এখনকার চেয়ে ভালো খাবে ভালো পরবে—এ দরবারের এই নিয়ম, তা মনে রেখো।"

সুধীরা বললে, "মারামারি আমি চাইনে দুর্যোধন। আমি চাই আমার পাঁচিল গাথা। বিনা মারামারিতে, শুধু ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে যদি কার্যোদ্ধার হয় তা হলে তোমাদের পুরস্কার বাড়বে বই কমবে না। ওরা যদি দাঙ্গা করে তা হলেই তোমরা দাঙ্গা কোরো, নচেৎ নয়। আর, কিছুতেই প্রাণে কাউকে মেরোনা, অথবা গুরুতর চোট দিওনা। পাঁচিল গাথার কাছে ওদের ভিড়তে না দিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।"

উত্তেজনার মুখে দুর্যোধন সুধীরাকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছিল, পুনরায় 'আপনি' আরম্ভ করলে, বললে, "যেমন আদেশ করবেন দিদিরাণী, তেমনই ঠিক হবে। কিন্তু শুনছি ও পক্ষের হাকিমবাবুর ছেলে নিজে লাঠি ধরবে,—তার কী ব্যবস্থা করব বলুন? বলেন তো ছোকরাকে পিঠ মোড়া করে ধরে নিয়ে এসে আপনার পায়ের তলায় ফেলে দিই।"

মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, "না, তা কোরো না।"

"তবে না-হয় লাঠির চোটে একখানা হাত কি একটা পা ভেঙে দিলেই হবে।"

দুর্যোধনের প্রস্তাব শুনে সুধীরার মুখমণ্ডলে যেন একটা ছায়া দেখা গেল, বললে, "না, না, ও-সবও কোরো না।"

বিমূঢ় দুর্যোধন বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "কিন্তু সে যদি লাঠি চালাতে থাকে তা হলে আমাদেরও তো একটা যা হয় কিছু করতে হবে দিদিরাণী?"

বীরেনের সম্পর্কে সুধীরার মনে দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করে মন্দাকিনী মনে মনে পুলকিত বোধ করেছিলেন, এবার তিনি কথা কইলেন, বললেন, "তাকে জখম না করে তোমরা দু তিন জনে মিলে তার হাতের লাঠিটা কেড়ে নিতে পারবে না দুর্যোধন?"

দুর্যোধন বললে, "একটা ইস্কুলে পড়া ছোকরার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিতে দু তিন জনের দরকার হবে না পিসিমা, একজনার দ্বারাই তা হতে পারবে।"

সুধীরার ইচ্ছা হলো বলে, ইস্কুলে-পড়া ছেলেকে যত সহজ মনে করছ ঠিক তত সহজ কিন্তু সে নয়। কিন্তু সে কথা না বলে মন্দাকিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, "কিন্তু হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিলে তাকে একটু বেশি রকম অপমান করা হবে না কি পিসিমা ?"

মন্দাকিনীর মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল। তিনি বললেন, "হয়তো হবে। কিন্তু এ যে একটা কঠিন সমস্যা হয়ে উঠল সুধা! দেহেও তার চোট দিতে মানা করছিস্, মনেও তার চোট দিতে চাচ্ছিস নে,—তবে কী করে তাকে শাস্তি দিতে চাস তা বল ?"

এবার কথা কইলে রাখাল ঘটক। ব্যস্ত হয়ে কয়েক পদ মন্দাকিনীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, "এ রকম অবস্থায় পিসিমা, আমার মতে, বীরেনের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলা ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই।"

অপ্রসন্ন নেত্রে রাখাল ঘটকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সুধীরা বললে, "ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না রাখাল দাদা, উপায় আছে।" তারপর দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললে, "তোমার প্রতি কোনও রকম নিষেধই রইল না দুর্যোধন, যেমন তুমি বুঝবে তেমনি ব্যবস্থা করবে।"

প্রসন্নমুখে দুর্যোধন বললে, "যে আজ্ঞে দিদিরাণী!"

কানাই হালদারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সুধীরা বললে, "হালদার মশাই, পিসিমার সঙ্গে কথা কয়ে আপনি দুর্যোধনের খরচপত্র যা দেবার দিয়ে দিন। তা ছাড়া, যাবার আগে ওদের বেশ ভালো করে জল খাইয়ে দেবেন।"

কানাই হালদার বললে, "আচ্ছা, তা দেবো।"

মন্দাকিনী বললেন, "খরচপত্র যা দেবার তা তুই-ই বলে দে না সুধা। অনেকদিন পরে তুই এখানে এসেছিস্, তোর হুকুম মতো বকশিস পেলে ওরা খুশীই হবে।"

মনে মনে একটু চিন্তা করে সুধীরা কানাই হালদারকে বললে, "আজ দুর্যোধনকে দশ টাকা, আর অন্য সকলকে দুটাকা করে দিন। আর, কাজ শেষ হলে দুর্যোধন আরো পঞ্চাশ টাকা, আর তার দলের লোকেরা প্রত্যেকে দশ টাকা করে পাবে। তা ছাড়া, একখানা করে ধুতি। তারপর কারও যদি বেশি রকম চোট্ জখম লাগে, তার ব্যবস্থা আমরা স্বতন্ত্র করব।"

সুধীরার আদেশ শুনে দুর্যোধনেরা সদলে উল্লাসের সহিত চিৎকার ক'রে উঠল।

সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমরা খুশী হয়েছ দুর্যোধন ?"

দুর্যোধন বললে, "খুব খুশী হয়েছি দিদিরাণী!"

"কবে পাঁচিল গাঁথা, তা তোমাদের ঠিক মনে আছে তো ?"

দুর্যোধন বললে, "কাল শুক্রবারের পরের শুক্রবারে।"

সন্তুষ্টমুখে সুধীরা বললে, "ঠিক বলেছ। আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় তোমরা এখানে আসবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে এইখানেই রাত্রি কাটাবে। কেমন ?"

"তাই হবে দিদিরাণী।"

মন্দাকিনীকে সুধীরা বললে, "আর তো এদের কিছু বলবার নেই পিসিমা ?"

মন্দাকিনী বললেন, "না, সব কথাই তো হলো,—উপস্থিত আর কিছু বলবার নেই।"

তখন সুধীরা দুর্যোধনকে বললে, "আচ্ছা, এবার তা হ'লে তোমরা সদর দেউড়িতে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে একটু বিশ্রাম কর। হালদার মশায় এখনই যাচ্ছেন।"

সদলে দুর্যোধনেরা প্রস্থান করলে সুধীরা বললে, "থানা পুলিশের কোনও ব্যবস্থা ওরা করেছে কি-না সে খবর আপনি রাখছেন তো হালদার মশায় ?"

কানাই হালদার বললে, "এ পর্যন্ত কোন কিছু তো করেনি। করলেই আমরা খবর পাব, সে ব্যবস্থা আমার ঠিক করা আছে।"

সুধীরা বললে, "আজ পর্যন্ত চৌধুরীরা পুলিসকে খবর দিয়ে কোনও দাঙ্গা করেনি ; এবারও করবে না। কিন্তু ওরা কিছু করলে বাধ্য হয়ে আমাদের তার প্রতিকার করতে হবে।"

কানাই হালদার বললে, "থানা পুলিশের বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো মা, সে বিষয়ে যা করা দরকার তা আমি করব। শুধু তুমি রঘুনাথ রায়ের কথাটা দিদিমণির সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখো।" মন্দাকিনীকে কানাই হালদার দিদিমণি বলে ডাকে।

কানাই হালদারের কথা শুনে সুধীরা মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হলো ; একটু তীব্র কণ্ঠে বললে, "কী আশ্চর্য ! রঘুনাথ রায়ের কথাটা কি আমাদের মধ্যে কিছুতেই শেষ হবে না !"

কানাই হালদার বললে, "যে কথা কর্তামশাই একবার শেষ করেছেন কার সাধ্যি আছে সে কথা আবার তোলে। আমি বলছিলাম, ওকে একেবারে নির্ভরসা না ক'রে এই ক'টা দিন একটু আশায় আশায় রাখলে হয় না ?—শুধু এই পাঁচিল গাঁথা পর্যন্ত কয়েকটা দিন।"

সুধীরা বললে, "কিন্তু ওকে আপনারা এত ভয় করছেন কেন ?"

কানাই বললে, "ও যেমন পরাক্রান্ত তেমনি দুর্দান্ত। মহেশ করের সাত বিঘে নিষ্কর জমিটা নিয়ে যা কাণ্ড করলে তা যদি জানতে তা হলে আমার কথাটা বুঝতে পারতে। রাতারাতি জমির চেহারা গেল বদলে, আর তিনটে লোক যে কোথায় অদৃশ্য হলো তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। পুলিশ যখন এল তখন সারা গাঁয়ের লোক আতঙ্কে আধমরা হ'য়ে রয়েছে—একটা লোকও মহেশের স্বপক্ষে একটা কথা বলতে সাহস করলে না। পুলিশ মহেশ করকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল। তারপর মকদ্দমায় মহেশের দেড় বৎসর সশ্রম জেল হলো। আমার ভয়, রঘুনাথ রায়ের লোক এ গ্রামে যে-রকম শেকড় গেড়ে বসেছে, শেষ পর্যন্ত বীরেন চাটুয্যের দলে ওরা যোগ না দেয় !"

মন্দাকিনী বললেন, "আমার কিন্তু মনে হয় হালদার মশায়, বীরেন কখনও

রঘুনাথ রায়ের সাহায্য নেবে না।"

সাগ্রহ কণ্ঠে কানাই বললে, "এ আপনি কী করে বলছেন দিদিমণি ?"

মন্দাকিনী বললেন, "যে রকম করেই বলি না কেন, আপনি দেখবেন এ কথা সত্যি হবে।"

কানাই হালদার এবং রাখাল ঘটক প্রস্থান করলে সুধীরা আগ্রহ ভরে মন্দাকিনীকে ঠিক কানাইয়ের প্রশ্নটাই করলে, বললে, "এ তুমি কী করে বলছ পিসিমা ? কারও কাছে কিছু শুনেছ ?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে স্মিতমুখে মন্দাকিনী বললেন, "তোর কাছেই তো শুনেছি সুধা।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুধীরা বললে, "বীরেন বাবুর সেই কথার ওপর নির্ভর করে বলছ ?"

মন্দাকিনী বললেন, "শুধু সেই কথা কেন, বীরেনের সব কথার ওপর নির্ভর করে বলা যায়, বিশেষত তোকে যে কথা সে দিয়েছে তার ওপর নিভর করে তো নিশ্চয়ই বলা যায়।"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরার মুখ ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। একবার ইচ্ছা হলো জিজ্ঞাসা করে, তাকে-দেওয়া কথার এ বিশেষত্ব কেমন করে আসে, কিন্তু সাহস হলো না, পাছে সে প্রশ্নের উত্তরে আরও গুরুতর কোনও কথা উত্থিত হয়। বললে, "তবে দুর্যোধনকে আনালে কেন ?"

"কতকগুলো গরিব লোক তোর হাত দিয়ে কিছু টাকা পাবে তাই আনালাম।" বলে মন্দাকিনী হেসে উঠলেন।

এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা করে সুধীরা বললে, "এবার থেকে আমি নিজে নিজে আর কোনও কিছুই করব না পিসিমা, তুমি যা বলবে শুধু তাই করব।"

মন্দাকিনী ঘাড় নাড়লেন ; বললেন, "না তা করিসনে সুধা, তাতে আসল জিনিসে দেরি পড়ে যাবে।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "আসল জিনিস কী পিসিমা ?"

প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে মন্দাকিনী যেন পূর্ব কথারই অনুবৃত্তি স্বরূপ বলতে লাগলেন, "নিজে ভুল ভ্রান্তি করিস, সে ভালো, তাতে একদিন ঠিক পথের সন্ধান পাবি ; কিন্তু পরের বুদ্ধি দিয়ে সব সময়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না সুধা।"

এবার সুধীরা অধিকতর বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করলে, "আমার আবার সমস্যা কিসের ? আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে।"

মন্দাকিনী বললে, "তোর সমস্যা শুধু পাঁচিল গাঁথারই নয়, পাঁচিল ভাঙারও।"

"পাঁচিল ভাঙারও ? কোন্ পাঁচিল ভাঙার ?" উগ্র বিস্ময়ে সুধীরার দুই চক্ষু কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

"মনের পাঁচিল সুধা। আমাদের সকলেরই মনের মধ্যে এমন সব কঠিন পাঁচিল আছে যা তোর এই ইট-সুরকির পাঁচিল—আট-নদিন পরে যা তুই গাঁথতে তুলেছিস্—তার চেয়েও অনেক শক্ত।"

ক্ষুব্ধ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সুধীরা বললে, "পিসিমা !"

মন্দাকিনী বললেন, "কী বলছিস্ ?"

"তুমি আমাকে শুভ প্রবৃত্তি দিয়ো।"

সুধীরার কথা শুনে মন্দাকিনীর মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে। শান্তকণ্ঠে বললেন, "ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলি! কিন্তু কোনটা শুভ, আর কোনটা অশুভ, তা তুই নিজে চিনতে পারবি তো ? যা, ওপর থেকে তৈরি হয়ে আয়, আমিও গা ধুয়ে আসি, চায়ের সময় হলো।" বলে প্রস্থান করলেন।

চোদ্দ

একটা সুতীব্র আত্মাবমাননার গ্লানিতে সুধীরার সমস্ত অন্তর ভরে উঠল। আমি দুর্বল, আমি অক্ষম, আমি অদৃঢ়, এইরূপ একটা আত্মতিরস্কারে সে নিরন্তর নিজেকে ধিক্কৃত করতে লাগল। দুর্যোধন যখন বীরেনের একটা হাত অথবা পা ভেঙে দেবার প্রস্তাব করেছিল তখন সে তাতে আপত্তি করেছিল কোন্ মূঢ়তার বশে ? কেন সে নিজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে চেপে রাখতে পারেনি!

সন্ধ্যার পর রাখালের সহিত সাক্ষাৎ হতে সুধীরা বললে, "রাখাল দাদা, তুমি পাঁচিল গাথার দিন পর্যন্ত আর চাটুয্যে বাড়ি যেয়ো না।"

রাখাল বললে, "স্বেচ্ছায় যাব না ; কিন্তু যেতে যদি বাধ্য হতে হয়, তা হলে ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করে সুধীরা বললে, "বাধ্য হতে হয় মানে ?"

"মানে, যদি বলপ্রয়োগ হেতু যেতে বাধ্য হই ?"

বিরক্তিবিরূপ মুখে সুধীরা বললে, "অতটুকুও যদি সামলাবার শক্তি তোমার না থাকে, তা হলে চাটুয্যে বাড়ির সামনে দিয়ে এ ক'দিন না হয় চলাফেরা কোরো না।"

চক্ষু বিস্ফারিত করে রাখাল বললে, "কী সর্বনাশ! সে তো এখনও আট-ন দিনের কথা সুধীরা ; এই এতদিন তুমি আমার আত্রাই নদীর পথ বন্ধ করে দিতে চাও না-কি ?"

সুধীরার মুখে হাস্যরেখা ফুটে উঠল ; বললে, "আত্রাই নদীর পথ ? না, চা খাওয়ার পথ ?"

সহাস্যমুখে রাখাল ঘটক বললে, "তা যদি বল তো দুই-ই।"

সুধীরা বললে, "তা হ'লে রাখাল দাদা, দুই জায়গার পথই এ কয়েকদিন বন্ধ থাক।"

রাখাল বললে, "তা না হয় থাক্ ; কিন্তু সুধীরা, দাঙ্গা হাঙ্গামা না হয়ে এ বিবাদ কি কোনও রকমেই মেটবার আশা নেই ?"

সুধীরা বললে, "কেন থাকবে না ? নিঃস্বত্ব কবুল হ'য়ে বীরেন বাবু দখল ছেড়ে দিন, তা হলে মিটবে।"

সুধীরার কথা শুনে হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে রাখাল বললে, "নাঃ, তা হলে দেখছি নিতান্তই সেই অঙ্ক কষা ভিন্ন মিটমাটের অন্য কোনও সম্ভাবনা নেই।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "অঙ্ককষা আবার কী রাখাল দাদা ?"

রাখালের মুখে রহস্য এবং কৌতুকের রুদ্ধ হাসি দেখা দিলে ; বললে, "কী বল দেখি ?"

ভেবে দেখবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করে সুধীরা বললে, "বলতে পারলাম না।"

রাখাল বললে, "আচ্ছা, এতেতে যদি অত হয়, তা হলে ততেতে কত, —এ কোন্ অঙ্ক বল দেখি ?"

একটু চিন্তা করে সুধীরা বললে, "রুল অফ থ্রি।"

খুশী হয়ে রাখাল বললে, Right ! বীরেন আশা করে, এই রুল অফ থ্রির মধ্য দিয়েই তার প্রার্থনা মঞ্জুর হতে পারে।"

একথার উত্তরে সুধীরা কোনও প্রশ্ন করলে না, কিন্তু তার প্রখর দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্নের ব্যঞ্জনাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

সেই নিঃশব্দ প্রশ্নের উত্তরে রাখাল বললে, "সে বলে, সামান্য একটু দাঁতের কামড়ে যদি টিঞ্চার আয়োডিন আর ব্যাণ্ডেজ হয়, তা হলে লাঠির চোটে মাথা ফাটাতে পারলে তার প্রার্থনা মঞ্জুর না হয়ে যায় না।"

রাখালের কথা শুনে প্রথমটা সুধীরার মুখমণ্ডলে একটা সূক্ষ্ম ছায়া দেখা দিলে, পরমুহূর্তেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বললে, "ভুল, ভুল! সম্পূর্ণ ভুল! যদি কখনও তোমার বীরেন চাটুয্যের সঙ্গে এ বিষয়ে আবার কথা হয় তো তাকে বোলো, এ Simple Rule of Three-র ব্যাপার নয়, এ Compound Rule of Three-র ব্যাপার। এতে লাঠির চোটে মাথা ফাটাতে পারলে দেড় বিঘা জমির পরিবর্তে হয়তো তার অদৃষ্টে দেড় মাস হাসপাতাল বাসই সার হবে।"

উত্তরে রাখাল একটা কিছু বলবার উপক্রম করতেই তাকে থামিয়ে দিয়ে সুধীরা বলতে লাগল, "দোহাই রাখালদাদা, এ প্রসঙ্গ আর বন্ধ কর! তোমার কোনও চিন্তা নেই, তোমাদের বাক্যবীর বীরেন চাটুয্যে ঘটনার দিনে ঠিক অক্ষত মস্তকেই বর্তমান থাকবেন। এত বেশি, আর এত রকম, যারা কথা কইতে পারে, কার্যকালে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না, এ তুমি ঠিক জেনো। সে যাই হোক, এ কথা সর্বদা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উপস্থিত বীরেন চাটুয্যে আমাদের পরম শত্রু, সুতরাং তার সঙ্গে আমরা কোনও সামাজিকতা, কোনও আত্মীয়তা করব না। কোনও কিছুই আমরা তার হাত থেকে নোব না,—এমন কি এক পেয়ালা চা পর্যন্ত নয়। শোনো রাখালদা, তুমি আমাকে কথা দাও, আমি না বললে তুমি আর ও বাড়ির ছায়া মাড়াবে না।"

রাখাল বললে, "আচ্ছা, প্রতিশ্রুত হলাম! কিন্তু—"

রাখালের কথায় বাধা দিয়ে সুধীরা বললে, "আর কিন্তু-টিন্তু নয়, একেবারে ঠিক।"

ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে রাখাল বললে, "আচ্ছা, ঠিকই তা হ'লে হলো। এখন আমি চললাম মিত্তিরদের বাড়ি। একটু আগে বিপিন মিত্তির ডাকতে এসেছিল। খাবার সময় হলে দয়া করে ডেকে পাঠিয়ো।"

সুধীরা বললে, "পাঠাব।"

গেটের নিকট উপস্থিত হয়ে রাখালের মনে হলো কে একজন স্ত্রীলোক যেন অলক্ষিতে পাশ কাটিয়ে জমিদার গৃহে প্রবেশ করতে চায়। কৃষ্ণা পঞ্চমী; চন্দ্র উদিত হতে তখনও অনেক বিলম্ব। চতুর্দিক তমসাবৃত। গেটের মাথায় ধূম-মলিন চিমনির ভিতরে কেরোসিনের একটি বাত্তি কোনও প্রকারে মাত্র স্বীয় অনুজ্জ্বল অস্তিত্বটুকর প্রমাণ দিয়ে রেখেছে, নিচেকার পুঞ্জীভূত অন্ধকারের প্রতি তার কিছুমাত্র বৈরাচরণের পরিচয় নেই।

"কে?" বলে পকেট থেকে টর্চ বার করে মুখে ফেলতেই রাখাল দেখলে প্রভাময়ী। একটু সরে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বললে, "I see, মিস্ প্রভাময়ী ব্যানার্জি! এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?"

হাত দিয়ে চক্ষু হ'তে টর্চের আলো নিবারিত করে প্রভাময়ী বললে, "জমিদার বাড়ি। উঃ! পথ ছাড়ুন।"

রাখাল বললে, "ছাড়ছি। তার আগে তুমি বল, কেন জমিদার বাড়ি যাচ্ছ!"

"সুধীরা দিদির সঙ্গে দেখা করতে।"

"কী দরকার?"

"তা বলব না! উঃ! টর্চ বন্ধ করুন।"

টর্চের আলোক রেখা একটু নিচের দিকে নামিয়ে রাখাল বললে, "তুমি জমিদার বাড়িও যাও, চাটুয্যে বাড়িও যাও। এ পক্ষের কথা ও পক্ষকে বল, আবার ও পক্ষের কথা এ পক্ষকে বল। তুমি কোন্ পক্ষের লোক বল তো?"

"আমি দু পক্ষেরই লোক।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রাখাল বললে, "দেখ, আমিও বোধহয় দু পক্ষেরই লোক;"

রাখালের কথা শুনে প্রভাময়ী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললে, "একদিন চন্দ্রপুলি খেয়েই দু পক্ষের লোক হয়েছেন, তা হলে আর একদিন খেলে তো এ পক্ষকে ছেড়ে একেবারে ও পক্ষের হয়ে যাবেন!"

"তুমি ভারি দুষ্টু!"

"এত বড় মেয়েকে দুষ্টু বলতে আপনার মুখে বাধে না?"

"আচ্ছা, তা হলে তুমি ভারি লক্ষ্মী! কেমন?—এবার হলো তো?"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে পাশ কাটাবার নিষ্ফল চেষ্টা করে প্রভাময়ী বললে, "নিন, পথ ছাড়ুন! টর্চ নেভান। আচ্ছা, লোকে দেখলে কী ভাববে বলুন তো?"

টর্চের আলোটা একেবারে ভূমিতলে ফেলে রাখাল বললে, "লোকে দেখলে

ভাববে, মাথা-কাটাকাটি না হয়ে বিবাদটা যাতে মেটানো যায় সেই উদ্দেশ্যে এরা একটা Confederacy তৈরী করছে।"

"সে আবার কী জিনিস?"

সবিস্ময়ে রাখাল বললে, "Confederacy! Confederacy কাকে বলে জান না? এই Confederacy, অর্থাৎ কি-না তোমরা যাকে বল—কী যেন ভালো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—সংসদ।"

প্রভাময়ী বললে, "সংসদের সঙ কে? আপনি?"

রাখাল বললে, হ্যাঁ, আমি সঙ, আর তুমি সঙ্গিনী।" বলে পুনরায় টর্চের আলোটা প্রভাময়ীর মুখের উপর নিক্ষেপ করলে।

বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে প্রভাময়ী বললে, "আবার আপনি আরম্ভ করলেন! আচ্ছা, রইলাম আমি চোখ বুজে, থাকুন আপনি যতক্ষণ পারেন আলো ফেলে।" বলে চক্ষু মুদ্রিত করলে।

রাখাল বললে, "না, বেশিক্ষণ থাকতে হবে না। তোমার মুখে একটা কিছু ঠেকলেই চোখ খুলো।"

তাড়াতাড়ি চোখ খুলে সতর্জনে প্রভাময়ী বললে, "ছি-ছি! ভারি অসভ্য তো আপনি!"

রাখাল বললে, "কেন, অসভ্য কেন? ইয়েই বা ভাবছ কেন তুমি? ইয়ে না হয়েও তো হতে পারে।"

রুষ্টস্বরে প্রভাময়ী বললে, "কিয়ে হতে পারে?"

"কেন, এই টর্চের কাঁচ।"

"টর্চের কাঁচ কি কিসের কাঁচ একবার দেখাচ্ছি ভালো করে।" বলে চাবির রিং টেনে নিয়ে অধরে স্থাপিত করে প্রভাময়ী বললে, "হুইসিল্ বাজাই? করিম বকসকে টেনে নিয়ে আসি এখানে?"

প্রভাময়ীর প্রস্তাব শুনে রাখাল চকিত হয়ে উঠল; সভীতিকণ্ঠে বললে, "তোমার রিং-এ হুইসিল্ আছে না-কি?"

সদর্পে প্রভাময়ী বললে, "নেই? বাজিয়ে দেখাব না-কি একবার?"

ব্যগ্রকণ্ঠে রাখাল বললে, "না, না, দোহাই তোমার দেখিয়ো না। কোথায় পেলে?"

"বীরুদা দিয়েছে। বলেছে, যতদিন আপনি পলতাডাঙায় থাকবেন, সঙ্গে সঙ্গে রাখতে।"

"কেন?"

"দেখাচ্ছি কেন।" পুনরায় অধরের নিকট চাবির রিং নিয়ে গিয়ে আদেশে ভঙ্গি সহকারে প্রভাময়ী বললে, "টর্চ নেভান।"

তাড়াতাড়ি টর্চ নিভিয়ে রাখাল বললে, "এই নেভালাম।"

"পথ ছাড়ুন।"

একটু সরে দাঁড়িয়ে রাখাল বললে, "এই ছাড়লাম !"

রাখালকে অতিক্রম করে জমিদার বাড়ির দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে প্রভাময়ী বললে, "এবার চললাম।"

রাখাল বললে, "আচ্ছা, এস !"

রাখালের আয়ত্তের বাইরে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রভাময়ী খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, "এটা কিন্তু হুইসিল নয়,—এটা একটা বড় তালার মোটা চাবি। আজ এইতেই কাজ চলল, কিন্তু কাল বীরুদার কাছ থেকে সত্যি-সত্যিই একটা হুইসিল চেয়ে নিতে হবে।" বলে দ্রুতপদে অগ্রসর হলো।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রাখাল এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর প্রস্থানপরা প্রভাময়ীকে উদ্দেশ করে উচ্চৈঃস্বরে বললে, "দুষ্টু !" পরক্ষণেই ততোধিক উচ্চৈঃস্বরে বললে, "না, না, লক্ষ্মী!" বলে ধীরে ধীরে মিত্রদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করলে।

পনেরো

পরদিন সকালে চা পানের সময় সুধীরা শুধু এক পেয়ালা চা খেলে, খাবার একটুও খেলে না।

মন্দাকিনী ব্যস্ত হয়ে বললেন, "সে কি সুধা, খাবার একেবারে খেলিনে যে ?"

সুধীরা বললে, "ক্ষিদে একেবারে নেই পিসিমা। তা ছাড়া পেটটা কেমন ভার হয়ে রয়েছে, একটু ব্যথাও করছে।"

মন্দাকিনী বললেন, "ওমা, এত অসুখ করেছে! তা হলে চা-ই বা খেলি কেন ?"

মৃদু হেসে সুধীরা বললে, "চায়ে অপকার করবে না—উপকারই করবে।"

কৃত্রিম রোষ সহকারে মন্দাকিনী বললেন, "কী চা-ভক্তই তোরা হয়েছিস ! চা যেন একটা ওষুধ—উপকার করবে! বিনোদ কবরেজের কাছ থেকে গোটা দুই শূলকালান্তক বড়ি আনিয়ে দিই, এখন একটা খা, আর ঘণ্টা দুই পরে আর একটা খাস্—ক্ষিদেও হবে, ব্যথাও সেরে যাবে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করে সুধীরা বললে, "না পিসিমা, না! তোমার কালান্তক বড়ি পেটে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণান্তক হবে! কবিরাজি ওষুধ আমি কোন দিনই সহ্য করতে পারিনে। মিছে তুমি ভাবছ পিসিমা। এমন কিছু অসুখ করেনি আমার। ও একটু পরে এমনি-এমনিই ভালো হয়ে যাবে।"

একটা কথা মনে পড়ে মন্দাকিনী বললেন, "কবরেজি ওষুধ যদি না খাস্ তো, বীরেনের কাছ থেকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনিয়ে দিই। ও বেশ ভালো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে।"

বিস্মিতকণ্ঠে সুধীরা বললে, "ও ডাক্তারিও করে নাকি ?"

"ডাক্তারি করে না, তবে গরীবগুরবকে বিনা পয়সায় ওষুধ দেয়। কী বলিস ? বীরেনের কাছ থেকে দুদাগ ওষুধ আনিয়ে নোব ?

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, "আধ দাগও নয়। ওর কাছ থেকে কোন উপকারই—তা সে যত সামান্যই হোক না কেন—এখনও আমরা নিতে পারিনে। এ তো অসুখই নয়, কলেরা হলেও নিতাম না।"

সুধীরার কথা শুনে মনে মনে শিউরে উঠে তিরস্কারের ভঙ্গিতে মন্দাকিনী বললেন, ষাট ! ষাট ! যখন-তখন ক্ষণে-অক্ষণে এমন করে যা-তা কথা বলতে নেই সুধা ! আচ্ছা, যা ওপরে গিয়ে একটু চুপ করে শুয়ে থাক—ভালো হয়ে যাবে।"

"তোমার কোনও ভয় নেই পিসিমা, অন্তত এবার ক্ষণে-অক্ষণে ফলবার কোনও সম্ভাবনা নেই।" বলে হাসতে হাসতে সুধীরা প্রস্থান করলে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তার শরীরটা সুস্থ হয়ে গেল। মনটাও একটু খুশি হবার একটা কারণ উপস্থিত হলো। কানাই হালদার এসে সংবাদ দিয়ে গেল, সে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছে যে, রঘুনাথ রায়ের লোক ঘন ঘন বীরেন চাটুয্যের সহিত দেখা করছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বীরেন চাটুয্যে কতকটা কটুবাক্য বলেই তাদের ভাগিয়ে দিয়েছে। সে রঘুনাথ রায়ের কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করবে না তা এক রকম নিশ্চিত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এই সংবাদে সুধীরা খুশি হলো বীরেন চাটুয্যের পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি হতে পাবলে না বলে ততটা নয়, যতটা রঘুনাথ রায়ের সাহায্য গ্রহণ করবে না বলে বীরেন তাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি অটুট রইল বলে। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হওয়ার মধ্যে খুশির উৎস কোথায় লুক্কায়িত আছে তার অনুসন্ধিৎসা সারাদিন তার মনকে অধিকার করে রইল। তা ছাড়া, রঘুনাথের নিকট হতে তার বিরুদ্ধে সাহায্য গ্রহণ করতে বীরেনের প্রবল আপত্তি এমন এক রহস্য, যার সমাধানের চেষ্টার মধ্যে একটা সুমিষ্ট আনন্দ-রসের সন্ধান নিরন্তর জাগ্রত হয়ে রইল।

বৈকালে কিন্তু বীরেনকে বকুলতলায় বসে থাকতে দেখে মনটা আবার তিক্ত হয়ে গেল। বীরেনের এই ভঙ্গিটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, এই দর্পিত আচরণই তার স্বরূপের যথার্থ পরিচয়,—বাকি যা-কিছু সমস্তই স্বার্থান্বেষী কৌশলীর চতুর অভিনয় ! সারাদিন মনের মধ্যে যে দু-একটি সমুজ্জল মনোবৃত্তি প্রভা বিকিরণ করে বর্তমান ছিল, দেখতে দেখতে কোথায় তা অদৃশ্য হয়ে গেল।

চা-পানের পর বস্ত্র পরিবর্তিত করে সুধীরা নীচে উপস্থিত হলো। তার পদদ্বয়ে শু-জুতা লক্ষ্য করে মন্দাকিনী বললেন, "কী রে সুধা, বাইরে বেড়াতে যাচ্ছিস নাকি ?"

সুধীরা বললে, "হ্যাঁ পিসিমা। খোলা জায়গায় একটু ঘুরে এলে শরীরটা হয়তো

একটু হাল্কা হবে।"

"তা বেশ তো—একটু ঘুরে আয় না। কিন্তু সঙ্গে যাচ্ছে কে ?"

"জীবন সিং।"

"শুধু জীবন সিং ? কেন, রাখালকেও সঙ্গে নে না ?"

ব্যস্ত হয়ে সুধীরা বললে, "রক্ষে কর পিসিমা, তা হলে বাক্যের চোটে বড়ানোর সমস্ত সুখটাই নষ্ট হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, তা হলে যা, কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসিস।"

"তা আসব।" বলে সুধীরা প্রস্থান করলে। পথে পদার্পণ করেই মনে হলো একটা আশঙ্কার কথা আছে—বীরেনের সহিত দৈবাৎ দেখা হয়ে যেতেও পারে। একবার ফিরে যেতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলে, দেখা হলেই বা এমন কী ভয়ের কারণ আছে—সকলেই তো আর রাখাল ঘটক নয়।

"জীবন সিং!"

"দিদিরাণী ?"

"মহেশপুরের মাঠের দিকে চল।"

"চলুন দিদিরাণী।"

ঠিক সেই সময়ে বকুলতলা থেকে উঠে এসে বারান্দায় বসে বীরেন পুলকিত চিত্তে প্রভাময়ীর মুখে গত রাত্রের কাহিনী সবিস্তারে শুনছিল।

কাহিনী শেষ হলে সহাস্যমুখে সে বললে, "তা হলে একটা হুইসিল নিয়ে রাখবে না-কি প্রভা ?"

প্রভাময়ী বললে, রামচন্দ্রঃ! ওকে ভয় দেখিয়েছি বলে সত্যি-সত্যিই নিতে হবে না কি ? সাধ্যি কি ওর আমার ওপর কোনও অন্যায় ব্যবহার করে।"

বীরেন বললে, "তা ছাড়া, লোকটা ঠিক তত খারাপই নয়, প্রথম-প্রথম যতটা মনে হয়েছিল।"

প্রভাময়ী বললে, "তা ছাড়া, প্রথম দিনই তোমার হাতে রীতিমত শিক্ষা পেয়ে হয়তো অনেকটা শুধরেও গেছে।"

বীরেন বললে, "তা ছাড়া তোমার হাতে পড়লে ও যে বেশ খানিকটা শিক্ষা পাবে না, সে ভরসাও ওর নেই।"

প্রভাময়ী বললে, "তা ছাড়া,—তোমাকে তো এখন ও রীতিমত ভালোবাসতেই আরম্ভ করেছে।"

বীরেন বললে, "তা ছাড়া, আর একজনকেও হয়তো ও যা করতে আরম্ভ করেছে তা বললে তুমি রেগে যেতে পারো। অতএব 'তা ছাড়া' ছেড়ে দিয়ে এইবার একটু চা খাওয়াবার ব্যবস্থা দেখ। চায়ের জন্যে প্রাণটা একেবারে চা-চা করছে।"

কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে প্রভাময়ীকে ভোলাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিন্তু প্রভাময়ীর রাগ নিবারণ করা গেল না। ক্রুদ্ধ-স্বরে সে বললে, "ছি ছি, বীরুদা, তোমার মুখে কিছুই

আটকায় না দেখছি !"

মুখ-চক্ষের ভাব গম্ভীর করে নিয়ে বীরেন বললে, "কেন ? আটকায় না কেন ? আটকাল তো। বললাম, 'হয়তো যা করতে আরম্ভ করেছে'। না আটকালে যা বলতাম তা শুনলে বুঝতে পারতে আটকেছে কি-না। বলব, শুনবে ?"

দৃপ্তকণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "না, খবরদার বোলোনা। বলবার দরকার নেই।"

"আন্দাজেই বুঝেছ ?"

"জানিনে।" বলে সরোষভঙ্গি সহকারে প্রভাময়ী চা করবার জন্যে প্রস্থান করলে।

চা খেতে খেতে কথায় কথায় আবার সেই কথাটাই উঠল। বীরেন বললে, "কিন্তু তাতে তুমি রাগ করছ কেন প্রভা। কেউ যদি মনে মনে তোমাকে কিছু করে, তাতে তোমার কী দোষ তা বল ?"

ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "ও: ! আসল কথা না বলে আবার 'করে' বলা হচ্ছে ! কত সভ্যতা !"

বীরেন বললে, "বেশ তো, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো সেই চার-অক্ষরের আসল কথাটাই না হয় বলি।"

"চললাম আমি তাহলে এখান থেকে।" বলে রুষ্টমুখে প্রভাময়ী দাঁড়িয়ে উঠে প্রস্থানোদ্যত হলো।

মিষ্টি বচনে তাকে শান্ত করে বসিয়ে বীরেন বললে, "আচ্ছা, মিছিমিছি তুমি অত রাগ করছ কেন বল তো ?"

উত্তেজিত স্বরে প্রভা বললে, "মিছিমিছি 'কেউ যদি কিছু করে, কেউ যদি কিছু করে', বললে রাগ করব না ?"

বীরেনের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলে; "মিছিমিছি নয় প্রভা, সত্যিসত্যিই। তোমার মতো এমন একটি মেয়েকে একজন অবিবাহিত পুরুষ যদি একবার দুষ্টু আর একবার লক্ষ্মী বলে তা হলে অনুমান করা যেতে পারে যে, সে তোমাকে হয়তো চার-অক্ষরের কোন ব্যাপার করতেই আরম্ভ করেছে।"

উচ্চকণ্ঠে প্রভা বললে, "তোমাকে চার-অক্ষরের ব্যাপার করুক সুধীরা।"

প্রভাময়ীর কথা শুনে বীরেন হো হো করে হেসে উঠে বললে, "শাপ দিচ্ছ ? কিন্তু করলে তো বেঁচে যাই প্রভা। করে কই বল ? সে তো লাঠির ঘায়ে আমার মাথা কাটাবার চেষ্টায় আছে।"

শেষোক্ত কথাকে উপেক্ষা করে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রভা বললে, "তুমি তাহলে সুধীরাকে—তারপর ঠিক কী বলবে ভেবে না পেয়ে ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে অবশেষে সেই কথারই আশ্রয় গ্রহণ করে বললে—কর ?"

দক্ষিণ করের তর্জনীর অগ্রভাগটুকু দেখিয়ে বীরেন বললে, "একটু একটু করি।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে বিস্মিত কণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "কর ! আচ্ছা তা'হলে রাখাল ঘটকেতে আর তোমাতে কী তফাৎ রইল বল দেখি ?"

মৃদু মৃদু ঘাড় নেড়ে প্রশান্তমুখে বীরেন বললে, "কিছুই রইল না। সেও করে, আমিও করি।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "না, সে তা করে না; সে আমাকে অপমান করে।"

বীরেন বললে, "সুধীরাও মনে করে, আমি তা করিনে, আমি তাকে অপমান করি।"

তীক্ষ্ণভাবে বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রভাময়ী জিজ্ঞাসা করলে, "এ তোমাকে কে বললে?"

এ প্রশ্নের কিন্তু উত্তর দেওয়ার সময় হলো না। সহসা জমিদার বাড়ির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে বীরেন দেখলে গৃহ হতে লোকজন পথের দিকে ছুটে চলেছে। একজন ভৃত্য মাথার উপর একটা চেয়ার বহন করে নিয়ে গেল। অকস্মাৎ একটা বিপদ উপস্থিত হলে যেমন চাঞ্চল্য দেখা যায়, ঠিক তেমনি চাঞ্চল্য।

খাবারের রেকাব হস্তে অদূরে হরিরাম পাচক আবির্ভূত হয়েছিল, ব্যস্ত হয়ে বীরেন তাকে বললে, "বামুন ঠাকুর, শীগগির গিয়ে দেখে এস জমিদার বাড়িতে কিসের গোলমাল হচ্ছে।"

রেকাবটা তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর স্থাপিত করে হরিরাম দ্রুতপদে প্রস্থান করলে। ঘটনা-স্থল পর্যন্ত কিন্তু তাকে যেতে হলো না, মধ্য পথেই সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বললে, "সর্বনাশ দাদাবাবু! চৌধুরী বাড়ির দিদিরাণীকে গোখরো সাপে কামড়েছে।"

বিদ্যুৎ বেগে চেয়ার পরিত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বীরেন বললে, "কাকে? সুধীরাকে?"

"হ্যাঁ দাদাবাবু। রাস্তায় চৌধুরী বাড়ির গেটের একটু দূরে দিদিরাণী পড়ে আছে,—জ্ঞান নেই।"

পকেটে হাত দিয়ে বীরেন দেখে নিলে ছোরাটা তখনও পকেটেই আছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ করে তাড়াতাড়ি আলমারি খুলে পোটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের শিশিটা বার করে পকেটে ফেললে, টেবিলের উপর ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালিত করে একটা মোটা লাল-নীল পেন্সিল দেখতে পেয়ে তুলে নিলে, তারপর বেরিয়ে এসে প্রবল বেগে টান দিয়ে বারান্দায় টাঙানো শক্ত দড়ির আলনাটা পট্‌পট্‌ করে দুই প্রান্তে ছিঁড়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হলো।

ঘটনাস্থলে উপনীত হয়ে সে দেখলে চতুর্দিক দিয়ে সুধীরাকে জনতা ঘিরে রয়েছে। উচ্চৈঃস্বরে একটা হাঁক দিয়ে উঠল, "কী করছ তোমরা এখানে এমন করে ভিড় করে? হাওয়া ছেড়ে দাও।"

ভৎর্সিত জনতা তাড়াতাড়ি দূরে সরে গেল।

অদূরে হাত দুয়েক দীর্ঘ একটা মৃত গোখরা সাপ পড়ে রয়েছে। লাঠির নির্দেশে জীবন সিং দেখিয়ে দিলে সেই বিষধর কালভুজঙ্গই এই আকস্মিক

সর্বনাশের অধিনায়ক।

সুধীরার নিকটে দাঁড়িয়ে মন্দাকিনী চক্ষে অঞ্চল দিয়ে নিঃশব্দে রোদন করছেন। ভীতিবিহ্বল কানাই হালদার ও রাখাল ঘটক দুই বাহু ধরে সুধীরাকে চেয়ারে বসাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার স্রস্ত শিথিল দেহকে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছে না। সুধীরার মস্তক অবনমিত, মুখমণ্ডল ভয়ার্ত বিবর্ণ, দৃষ্টি অবসন্ন অনিমেষ, হস্তদ্বয় শিথিল বিলম্বিত। দেখলে মনে হয় সমস্ত দেহ জুড়ে চৈতন্য স্তিমিত হয়ে এসেছে।

ভূমিতলে তাড়াতাড়ি বসে পড়ে বীরেন জিজ্ঞাসা করলে, "বাঁধন দেওয়া হয়েছে?"

রাখাল বললে, "হ্যাঁ, হয়েছে।"

"কটা?"

"একটা। জীবন সিং তার পৈতে দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে।"

"কোন পা?"

"বাঁ পা।"

বাম পদের বস্ত্র সরিয়ে বীরেন দেখলে গোছের একটু উপরে বাঁধন পড়েছে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ছোরা বার করে আলনার দড়িটা প্রয়োজন মতো কেটে নিয়ে পায়ের ডিমের ঠিক নিম্নে বেশ ভালো করে আর একটা বাঁধন দিয়ে লাল-নীল পেন্সিলের দ্বারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধনটা কষে শক্ত করে বেঁধে দিলে; তারপর দু হাতের উপর সুধীরার বিবশ দেহ টপ করে তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে ধাবিত হলো।

হরিরাম যে-সংবাদ দিয়েছিল তা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়; সুধীরার চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত হয় নি, তবে গভীর ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। এক সময়ে মনে হলো সে যেন তার অর্ধনিমীলিত চক্ষের অলস দৃষ্টি দিয়ে একবার বীরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। বাম হস্তের জোরে মাথাটা একটু তুলে ধরে সুধীরার বাম কর্ণের নিকট মুখ নিয়ে গিয়ে বীরেন উচ্চৈঃস্বরে বললে, "মিস্ চৌধুরী! কিছু হয়নি আপনার। শুধু ভয় পেয়েছেন। এক্ষণি আপনাকে সম্পূর্ণ আরাম করে দিচ্ছি।"

উত্তর দেবার ক্ষমতা সুধীরার ছিল না। দক্ষিণ পাশে ঢলে পড়ে তার মুখখানা বীরেনের দেহের দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে এল; —দুর্বলতা বশত—অথবা নিদারুণ দুঃসময়ে বিপদের বন্ধুর মধ্যে নিবিড়তর আশ্রয়ের সন্ধানে, তা ঠিক বোঝা গেল না।

জমিদার গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বীরেন একজন ভৃত্যকে অবিলম্বে এক গেলাস পানীয় জল, একঘটি পরিষ্কার জল, সাবান, তোয়ালে ও একটা পরিষ্কার কাঁচের বাটি আনিতে আদেশ করলে; তারপর সিঁড়ি অতিক্রম করে দোতলার বারান্দায় উপস্থিত হয়ে ধীরে ধীরে সুধীরাকে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কানাই হালদার, রাখাল ঘটক ও মন্দাকিনী প্রভৃতি এসে পড়লেন।

কানাই হালদারকে বারান্দার এক প্রান্তে নিয়ে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে বীরেন বললে, "হালদার মশায়, চিকিৎসার কী ব্যবস্থা করেছেন ?"

কানাই হালদার বললে, "একজন সেপাই গ্রাম থেকে রোজা ডাকতে গেছে; আর একজন সাইকেলে মাধবপুরে গিয়েছে রামরতন ডাক্তারকে নিয়ে আসতে।"

"মাধবপুর তো এখান থেকে প্রায় চার মাইল পথ।"

"তা হবে বই কি।"

মন্দাকিনী দ্রুতপদে নিকটে এসে ত্রস্তকণ্ঠে বললেন, "বীরেন, দেখবে চল বাবা, সুধা কী রকম হয়ে গেছে।"

ত্বরিত-গতিতে সুধীরার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বীরেন দেখলে সুধীরার মস্তক বাম পার্শ্বে ঈষৎ হেলে পড়েছে, আর চক্ষু প্রায় নিমীলিত হয়ে এসেছে।

সুধীরার উপর ঝুঁকে পড়ে উচ্চকণ্ঠে বীরেন ডাক দিলে, "মিস্ চৌধুরী! আমার দিকে চেয়ে দেখুন। আপনার কোনও ভয় নেই। অনর্থক ভয় পাচ্ছেন।"

সুধীরার দিক থেকে কিছুমাত্র সাড়া পাওয়া গেল না। অত উচ্চ ডাকেও সুধীরাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে মন্দাকিনী পুনরায় রোদন করতে আরম্ভ করলেন।

বিরক্তিবিরূপ দৃষ্টিতে মন্দাকিনীকে দূরে সরে যেতে ইঙ্গিত করে বীরেন সুধীরার দুই স্কন্ধে দুই হাত রেখে সজোরে নাড়া দিয়ে উচ্চতর কণ্ঠে ডাকলে, "সুধীরা! চেয়ে দেখ! তোমার কিচ্ছু হয়নি। শুধু ভয় পেয়েছ!"

এবার সুধীরার অবনমিত মুখ মুহূর্তের জন্য ঈষৎ উন্নত হয়ে পুনরায় নত হয়ে গেল। চিবুক ধরে সুধীরার মুখ ক্ষণকাল উত্তোলিত করে রেখে বীরেন বললে, "মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন কেন? কিচ্ছু হয়নি আপনার। এক্ষণি আপনাকে ভালো করে দিচ্ছি।"

দুইজন ভৃত্য জল সাবান তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হলো। একজনের হাত থেকে তাড়াতাড়ি জলের গ্লাসটা সুধীরার মুখের কাছে ধরে বীরেন বললে, "একটু জল খাবেন?"

সুধীরা সামান্য একটু জল পান করলে।

তখন সুধীরার সম্মুখে ভূমিতে উপবেশন করে বীরেন দংশিত স্থানটা ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্য দুই হাত দিয়ে সুধীরার বাম পদ নিজ ক্রোড়ের দিকে টেনে নিলে। পা'টা তার অধিকার থেকে মুক্ত করে নেবার জন্য সুধীরা চেষ্টা করছে অনুভব করে ঈষৎ তিরস্কারের সুরে বীরেন ববলে, "একটু চুপ করে বসে থাকুন দেখি। ভালো হয়ে গেলে তখন না হয় ক্ষমা-টমা যা চাইবার চেয়ে নেবেন। এখন আমার কাজে বাধা দেবেন না।"

সূর্য অস্তমিত হলেও গোধূলির সুস্পষ্ট আলোকে বীরেন দেখতে পেলে ক্ষতস্থানে রক্ত পড়েনি, শুধু ঘন নীল বর্ণের দুইটি ক্ষুদ্র বিন্দু পাশাপাশি অবস্থান করছে। দংশনের রীতি দেখে বীরেন শঙ্কিত হলো। টিপ্, ছোবল, ছড়—এই ত্রিবিধ দংশনের মধ্যে টিপ দংশনই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। বিদ্বেষের বশীভূত হয়েক্রুদ্ধ

বিষধর কর্তৃক মনুষ্যদেহে পুরাদস্তুর ইনজেক্সন ভিন্ন টিপ্‌ দংশন আর কিছুই নয়।

ক্ষিপ্রগতিতে সাবান-জল দ্বারা ক্ষতস্থান একটু পরিষ্কৃত করে নিয়ে বীরেন তার ছোরার অগ্রভাগ দিয়ে দংশিত স্থান চার পাঁচ ফালা করে গভীরভাবে চিরে দিলে; তারপর ক্ষতব উপব ওষ্ঠাধর প্রয়োগ কবে বিনাক্ত রক্ত চুষে চুষে কাঁচের বাটিতে ফেলতে লাগলো।

এই ভয়াবহ প্রক্রিয়াব কথা গোধ কবি অনেকেরই জানা ছিল না। বিস্ময়ে ও আতঙ্কে কয়েকজন অস্ফুট শব্দ কবে উঠল, মন্দাকিনী ভয়ে কাঠ হয়ে রইলেন; এবং সুধীরা প্রাণপণ শক্তিতে বীবেনের মুষ্টি থেকে নিজের পা মুক্ত কবে নেবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল;—চক্ষে তার দুরন্ত উদ্বেগের বিহ্বলতা।

দৃঢ় মুষ্টিতে সুধীরার পা চেপে ধরে রেখে ক্ষত হতে তার রক্তাক্ত মুখ উত্তোলিত করে ক্রুদ্ধস্বরে বীবেন বললে, "ছেলেমানুষী কববেন না। আমাকে মন দিয়ে আমার কাজ করতে দিন।" বলে পুনবায় চুষে চুষে রক্ত বার করে ফেলতে লাগল।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে নিঃশব্দ সন্ত্রাসের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়া চলল। সমবেত ব্যক্তিবর্গ দুঃসহ উত্তেজনায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল, এবং শঙ্কাহত সুধীরা তার ভয়চকিত চিত্তের নিরুপায় বেদনার সহিত নির্নিমেষ আতঙ্কে বীরেনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পড়ে রইল। জীবন তার এমনই কি মূল্যবান বস্তু যার জন্য বীরেন নিজের জীবন এমন করে বিপন্ন করছে,—এই তাব বেদনা।

রক্ত যখন শেষ হয়ে এল এবং স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করলে, তখন বীরেন রক্ত চোষা বন্ধ করে পকেট থেকে পোটাশিয়ম্‌ পারম্যাঙ্গানেটের শিশি বার করলে। তারপর ক্ষতস্থানে খানিকটা ঔষধ প্রয়োগ করে খুব জোরে রগড়াতে লাগল। মিনিট দুই রগড়ানোর পর ক্রোড় হতে সুধীরার পা তুলে নিয়ে একটা নিচু টুলের উপর স্থাপন করে উঠে দাঁড়াল। তার অধর, ওষ্ঠ, চিবুক তখন রক্তে আপ্লুত। সেই কদর্য ভয়াবহ দৃশ্য দেখে অনেকে শিউরে উঠল; কেউ কেউ চক্ষু ফিরিয়ে নিলে।

একজন ভৃত্যকে বীরেন জিজ্ঞাসা করলে, "ওপরে বাথরুম আছে?"

"আজ্ঞে, আছে। আমার সঙ্গে আসুন।" ব'লে ভৃত্য বীরেনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

মুখ হাত ধুয়ে এসে বীরেন সেই বিষাক্ত রক্তের বাটিটা তুলে ধ'রে ক্ষণকাল ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করলে, তারপর সুধীরার নিকটে গিয়ে সহাস্য মুখে বললে, "মিস চৌধুরী, সমস্ত বিষ এই বাটিতে উঠে এসেছে, আপনার দেহে আর একবিন্দুও নেই। এখন আপনি নিরাপদ।" তারপর রাখালের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, "দেখবে না-কি রাখালদা?" ব'লে বাটিটা তার হাতে দিলে।

সন্তর্পণে বাটিটা হাতে নিয়ে তাকিয়ে দেখে রাখাল শিউরে উঠল। বললে, "By Jove! তুমি না থাকলে সুধীরাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারা যেত না বীরেন, তুমিই তার জীবন দিয়েছ!"

রাখালের কথা শুনে মৃদু মৃদু ঘাড় নেড়ে স্মিত মুখে বীরেন বললে, "না রাখালদা,

তোমার হিসেবে একটু ভুল হচ্ছে; ওপরওয়ালা ভদ্রলোককে যদি এ ব্যাপার থেকে একান্তই বাদ দাও, তাহ'লে বলতে হবে জীবন সিংই মিস চৌধুরীর জীবন দিয়েছে। অত তাড়াতাড়ি বাঁধন দিয়ে বিষটাকে সে একেবারে আটকে ফেলেছিল।"

মন্দাকিনী বললেন, "আর যে নিজের জীবনকে অগ্রাহ্য করে চুষে চুষে সেই বিষটাকে বার করে মেয়েটিকে বাঁচালে সে কিছুই করেনি?"

"সে নিশ্চয়ই একটু বাহাদুরী করেছে।" বলে বীরেন হাসতে লাগল; তারপর সুধীরার সম্মুখে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কথা কইতে ঠিক পারছেন না,—না?"

অল্প ঘাড় নেড়ে সুধীরা জানালে,—না।

'ও শকের (shock) জন্যে হয়েছে, একটু পরেই পারবেন। কিন্তু মোটের ওপর একটু ভালো বোধ করছেন তো?"

সুধীরা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

উদ্বিগ্নস্বরে প্রভাময়ী জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু তুমি নিজে কেমন আছ বীরুদা?—তুমি নিজে কেমন বোধ করছ?"

এ প্রশ্ন শুধু প্রভাময়ীরই প্রশ্ন নয়, এ প্রশ্ন সুধীরারও প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তরে বীরেন কী বলে তা শোনবার আগ্রহে সুধীরা উৎকর্ণ হয়ে বীরেনের দিকে চেয়ে রইল।

প্রভাময়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্মিতমুখে বীরেন বললে, "আমি? আমি তো একটুও ভালো বোধ করছিনে প্রভা। বুক ধড়ফড় করছে, মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ছে, জিভ ভিতর দিকে টানছে। অর্থাৎ, একটু আগে তোমার সুধীরাদিদির যা কিছু উপসর্গ হচ্ছিল, আমার এখন তার সব-কিছুই হচ্ছে।" বলে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

বীরেনের এই প্রাণখোলা উচ্চহাস্যে সকলের মনে নিদারুণ দুশ্চিন্তার দুর্বহ ভারটা একটু যেন লঘু হয়ে গেল। এমন কি সুধীরারও অধর-কোণে একটা ক্ষীণ হাস্যরেখা মুহূর্তের জন্য দেখা দিলে।

মন্দাকিনী বললেন, "ঠাট্টা করেও ও-সব সর্বনেশে কথা বোলো না বাবা। সত্যি করে বল, তুমি কেমন আছ।"

মন্দাকিনীর কথা শুনে বীরেন সহাস্য মুখে বললে, "সাপের বিষ এমন গুরুতর জিনিস পিসিমা, যে, ভালো না থাকলে তা নিয়ে ঠাট্টা করা চলে না। আমি ভালোই আছি। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন বাড়ি চললাম। ডাক্তার এলে, যদি দরকার হয়, আমাকে খবর দেবেন।"

বীরেনের এ কথায় শুধু মন্দাকিনীই নয়, কানাই হালদার থেকে আরম্ভ করে মোক্ষদা ঝি পর্যন্ত সকলেই বিশেষভাবে আপত্তি করলে। এমন কি, বাক্যহারা রোগিণীর মুখ-চক্ষের মধ্যে যে কাতরতা ফুটে উঠল তার একমাত্র ভাষ্য, বীরেনের গৃহে যাওয়ার বিরুদ্ধে ঐকান্তিক আপত্তি।

রাখাল বল্লে, শুধু সুধীরার জন্যেই নয়, আমাদের জন্যেও তোমার থাকা উচিত। তোমার মুখ চেয়েই আমরা তবু একটু শক্তি পেয়েছি। রাস্তায় সুধীরার দুহাত ধরে আমার আর হালদার মশায়ের টানাটানির দুরবস্থা সে তো তুমি নিজ চক্ষে দেখেছ বীরেন ?" তারপর কানাই হালদারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, "বলুন না হালদার মশায়, তখন আপনার হাত পায়ের অবস্থা কেমন হয়েছিল, বলুন না।"

কানাই হালদার বললে, "আজ্ঞে, পেটের মধ্যে সব সেঁদিয়ে গিয়েছিল।"

কানাই হালদারের কৌতুকোদ্দীপক কিন্তু অকপট উত্তরে একটা মৃদু হাস্যধ্বনি উত্থিত হলো।

বীরেন বললে, "আচ্ছা, এরকম অবস্থায় অন্তত তোমার হেফাজতের জন্যে রয়ে গেলাম রাখাল দাদা। ঐ ইজিচেয়ারটা দেখে মনে হচ্ছে, ওর কোলে দেহটাকে একটু এলিয়ে দিতে পারলে মন্দ হয় না।" বলে বারান্দার একেবারে অপর প্রান্তে রাখা একটা ইজি-চেয়ারের দিকে অগ্রসর হলো।

মন্দাকিনী বললেন, "চেয়ারটা এইখানেই এনে দিক্ না কেন বীরেন ?"

ফিরে তাকিয়ে বীরেন বললে, "না পিসিমা, একান্তে রয়েছে বলেই ওটার ওপর বিশেষ একটু লোভ হচ্ছে।" বলে সেই চেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

একটু পরে বীরেনের নিকট এসে মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "বীরেন, সুধাকে একটু দুধ-টুধ কিছু খেতে দোব ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে বীরেন বল্লে, কাজ নেই পিসিমা, আমরা তো আর ডাক্তার নই, এ সময়ে কী খেতে দেওয়া উচিত অথবা উচিত নয়, তার আমরা কিছুই জানিনে। ডাক্তার না আসা পর্যন্ত কিছুই খেতে দেবেন না। শুধু জল খেতে চাইলে একটু করে জল দেবেন।"

"তোমাকে একটু চা দিই ?"

"না, পিসিমা একটু আগেই চা খেয়েছি।"

"তবে একটু খাবার আর জল ?"

"খাবারও খেয়েছি। এক গ্লাস জল না-হয় পাঠিয়ে দিন।"

"দিচ্ছি।" তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে মন্দাকিনী বললেন, "বীরু, তোমাকে যে কী বলব তা আমি একটুও বুঝতে পারছিনে বাবা! আশীর্বাদ করি তুমি শতায়ু হও। তুমি আজ আমার মুখ রেখেছ।"

সবিস্ময়ে মন্দাকিনীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বীরেন বললে, "কেন পিসিমা ?"

"আমার মনের কথা তুমি তো সব জান না বাবা,—ঠিক বুঝতে পারবে না।"

"কী জানিনে পিসিমা ?"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করে মন্দাকিনী বললেন, "তুমি যদি আমার ছেলে হতে বীরেন, তাহলে তোমাকে যেমন ভালোবাসতাম, ঠিক তেমনিই তোমাকে ভালোবাসি।"

এই একটিমাত্র কথায় দুর্ভাগিনী মন্দাকিনীর অন্তরের সমস্ত বেদনার পরিচয় পেয়ে চেয়ার পরিত্যাগ করে বীরেন দাঁড়িয়ে উঠল; তারপর নত হয়ে মন্দাকিনীর পদধূলি গ্রহণ করে বললে, "পিসিমা, আজ থেকে তুমি আমাকে ছেলে বলেই মনে কোরো।"

বীরেনের মাথায় হাত দিয়ে নিঃশব্দে আশীর্বাদ করে চোখের জল সামলাতে সামলাতে মন্দাকিনী প্রস্থান করলেন।

একটু পরে একজন চাকর এসে বীরেনের দক্ষিণ দিকে একটা ছোট টিপয়ের উপর এক গ্লাস জল রাখলে।

বীরেন তাকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের দিদিরাণী এখন জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে আছেন?"

ভৃত্য বললে, "আজ্ঞে, জেগে আছেন।"

"চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন, না পাশ ফিরে?"

"আজ্ঞে, চিৎ হয়ে।"

"আচ্ছা, যাও।"

ভৃত্য প্রস্থান করলে বীরেন একটু জল খেলে, তারপর হঠাৎ কী মনে হয়ে মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগল,

হে নিরুপমা,
চপলতা যদি করে থাকি কিছু
করিও ক্ষমা

বোল

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়ে রামরতন ডাক্তার তাঁর টমটম গাড়ির বেল বাজাতে বাজাতে জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলেন। একটা প্রশস্ত কাঁচা পথের উপর মাধবপুর এবং পলতাডাঙ্গা উভয় গ্রামই অবস্থিত। বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে এই পথের উপর দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি, মোটরকার, সাইকেল প্রভৃতি অনায়াসে যাতায়াত করে। সেইজন্য ডাক্তার রামরতনের আসতে তেমন বিলম্ব হয়নি।

রামরতনের বয়স মাত্র পঞ্চাশ অতিক্রম করেছে। দীর্ঘ কৃশ ঋজু গৌরবর্ণ দেহ। গলাবন্ধ কোট এবং সরু-পা প্যান্টালুন পরিধান করে রোগী দেখে বেড়ান। মাথায় কখনও গান্ধী ক্যাপ ব্যবহার করেন, কখনও বা টুপি নেবার কথা ভুলে যান। ভদ্র সদাশয় অন্তঃকরণ হতে উদ্গত একটি সরল মিষ্ট-হাসি সর্বদাই মুখে লেগে আছে, যা দেখলে রোগীর মনে আশার সঞ্চার হয়। অর্থকষ্ট জানালে রোগীর দর্শনী

মাপ, জোড় হস্ত করলে বিনা মূল্যে ঔষধ লাভ এবং অশ্রুপাত করলে পথ্যের মূল্য প্রাপ্তি। লোকে বলে, 'ডাক্তার বাবু, ভালোমানুষ পেয়ে অসৎ লোকেরা আপনাকে ঠকিয়ে থাকে।' ডাক্তার বলেন, 'কত ঠকাবে বলো? অসৎ লোকেরা আমাকে ঠকায়, আমি সৎ লোকেদের ঠকাই। মোটের উপর আমারই উদ্বৃত্ত থাকে, নইলে খাই পরি কোথা থেকে?'।

ডাক্তার বিচক্ষণ চিকিৎসক এবং বগুড়া হ'তেও উপকৃত ব্যক্তিরা রামরতন চাটুয্যেকে চিকিৎসার জন্য সময়ে সময়ে আহ্বান ক'রে নিয়ে যায়। পলতাডাঙ্গা, কুমারগঞ্জ, হরিপুর প্রভৃতি আশেপাশের আট দশখানা গ্রামে তাঁর পশার যথেষ্ট। একটু কঠিন রোগ হলেই পলতাডাঙ্গার চৌধুরী এবং চাটুয্যে বাড়িতে তাঁর ডাক পড়ে।

টমটম হতে অবতরণ করে দ্রুতপদে ডাক্তার দ্বিতলের বারান্দায় উপস্থিত হলেন। পিছনে পিছনে তাঁর সহিস একটি সুবৃহৎ বাক্স বহন করে আনলে। বাক্সের মধ্যে যা ঔষধ-পত্র অস্ত্র-শস্ত্র আছে তদ্দ্বারা একটি ছোট-খাটো ডিস্‌পেনসারী সাজানো চলে।

ডাক্তার এসে সর্ব প্রথম একটা উজ্জ্বল ডে-লাইট আলোকের সাহায্যে সুধীরার পায়ের বাঁধন পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর নাড়ী পরীক্ষা করলেন। আকৃতি দেখেই মনে ভরসা পেয়েছিলেন, নাড়ী পরীক্ষা করে আশ্বস্ত হলেন। বাক্স খুলে একটা ঔষধ বার করে ইনজেকসন দিলেন, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বললেন, "কোনও ভয় নেই, সেরে যাবে। এখন সমস্ত ঘটনা গোড়া থেকে আরম্ভ করে পর পর আমাকে ভালো করে শোনাও। ক্ষতস্থান চিরে দিয়েছে কে?"

বীরেনকে দেখিয়ে রাখাল ঘটক বললে, "ইনি,—পাশের বাড়ির বীরেনবাবু। শুধু চিরেই দেন নি, চুষে চুষে সমস্ত বিষাক্ত রক্ত বার করে দিয়ে খুব ভালো করে পোটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ঘষে দিয়েছেন।"

বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ডাক্তার বললেন, "কে? বীরেন না-কি? অনেক দিন তোমাকে দেখি নি, চিনতে পারি নি। তা ছাড়া ভালো করে লক্ষ্যও করিনি। যা করেছ তা তো ভালোই করেছ, আর করেছ বলেই রোগীর অবস্থা এত ভালো তা এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু দাঁত তোমার পানসে নয় তো?"

বীরেন বললে, "না, তেমন পানসে নয়।"

বীরেনের কথা শুনে চিন্তিত মুখে ডাক্তার বললেন, "বল কী হে! তেমন পানসে নয় কী বলছ? দাঁতন ব্যবহার করলে রক্ত পড়ে না তো?"

মৃদুস্মিত মুখে বীরেন বললে,"শুকনো দাঁতন ব্যবহার করলে কখনও কখনও পড়ে।"

"আর ব্রাশ ব্যবহার করলে?"

"নরম ব্রাশ ব্যবহার করলে পড়ে না।"

বীরেনের কথা শুনে ডাক্তারের মুখ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল; বললেন, "রক্তটা ধ'রে রেখেছ তো?"

রক্তের বাটিটা ডাক্তারকে দেখান হলো। রক্তের বর্ণ এবং পরিমাণ দেখে ডাক্তার শিউরে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! এ যে এক রাশ বিষ! একটা সাপ আর কত বিষ ঢালতে পারে? এ তুমি নিঃশেষে চুষে চুষে সমস্তটাই বার করেছ বাবা। কই, হাতটা তোমার দেখি একবার?"

বীরেনের নাড়ী পরীক্ষা করে ডাক্তারের মুখ প্রফুল্ল হলো না। তাড়াতাড়ি বাক্স থেকে একটা ঔষধ বার করে ইন্‌জেকসন দিতে উদ্যত হলেন।

চকিত হয়ে বীরেন বললে, "আমাকে আবার মিছে এ-সব কেন করছেন ডাক্তারবাবু?"

বীরেনের বাম হাতটা টেনে নিয়ে স্পিরিট দিয়ে একটা অংশ পরিষ্কার করতে করতে ডাক্তার বললেন, "আগে ইন্‌জেক্‌সনটা দিয়ে নিই, তারপর বলব কেন করছি।"

ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হলে বললেন, "আর একটা ইজিচেয়ার নেই? থাকে তো নিয়ে এস, বীরেন একটু শুয়ে থাকুক এখন।"

দুজন ভৃত্য মিলে বারান্দার অপর প্রান্তের ইজিচেয়ারটা নিয়ে এসে সুধীরার চেয়ারের পাশে স্থাপন করলে।

এবার বীরেন প্রবলভাবে আপত্তি করলে; বললে, "আপনি আমাকে অনর্থক রোগী করে তুলছেন ডাক্তারবাবু। আমার এমন কিছুই হয়নি, যার জন্যে এত ব্যবস্থার দরকার।"

বীরেনের দুই স্কন্ধে হাত দিয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, "আমিও তো বলছি এমন কিছু হয়নি। তেমন কিছু হলে এখন কি আর এমন করে তোমার মুখ দিয়ে কথা বেরোত? কিন্তু খানিকটা বিষ যে আত্মসাৎ করেছ তাতে সন্দেহ নেই। তবে ভয় নেই, মারাত্মক পরিমাণ নয়।"

বীরেন বললে, "তাই যদি, তাহলে আমি বাড়ি গিয়ে খানিকটা ডন-বৈঠক করে সেটুকু বিষ হজম করে নিই।"

বীরেনের কথা শুনে ডাক্তার হাসতে লাগলেন; বললেন, "সাপের বিষ অত সহজ নয় রে বাবা! ডন-বৈঠক করলে রক্ত চলাচল বেড়ে গিয়ে অপকারই করবে, উপকার করবে না। আসল কথা তাহলে খুলে বলি শোন। মা লক্ষ্মীর চিকিৎসা তুমি করেছ, তোমার চিকিৎসা আমি করছি।" রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা-লক্ষ্মীর নামটি কী বলুন তো?"

রাখাল বললে, "সুধীরা।"

ডাক্তার বলতে লাগলেন, "সুধীরা মার চিকিৎসা তুমি এমন সম্পূর্ণভাবে করেছ বীরেন, যে আর কিছু না করে সন্ধ্যেবেলা বাঁধন খুলে দিলেও কোনও ক্ষতি হয় না। তবে আরও গোটা দুয়েক ফোঁড়-ফাঁড় আমাকে দিতে হবে, নইলে জমিদার বাড়ি থেকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা কিছুতেই বের করা যাবে না।"

ডাক্তারের কথায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হলো।

বীরেনকে লক্ষ্য করে ডাক্তার বললেন, "আর সোজা হয়ে বসে থেকো না, বেশ আরাম করে শুয়ে পড়। একটু পরে তোমাকে একটা গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন দোব। বাড়ি যাবার কথা বলছিলে, সেটা আর আজ রাত্রে নয়, চা-টা খেয়ে কাল সকালে।"

এ কথায় বীরেন ভারি আপত্তি করতে লাগল। বললে, ইন্‌জেক্‌সনের জন্যে যদি একান্তই কিছুক্ষণ থাকতে হয় তো থাকবে, কিন্তু বাড়ি তাকে যেতেই হবে।

রাখাল ঘটক, মন্দাকিনী প্রভৃতি এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। রাখাল বললে, "যদি দরকার হয়তো বলপ্রয়োগ করব।"

বীরেন বললে, "কী, দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলবে না কি ?"

রাখাল বললে, "হ্যাঁ, মিনতির দড়ি দিয়ে।"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হলো।

ডাক্তার বললেন, "তুমি ও বাড়ি গেলে আমাকে অন্তত বার দুয়েক তোমাকে দেখতে যেতে হবে। নইলে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হলে কী কৈফিয়ৎ দোব বল তো ? তিনি আমার একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু তা বোধকরি জান না ?"

বীরেন বললে, "আজ্ঞে, হ্যাঁ, জানি।"

"তা যদি জানো, তাহ'লে অন্ধকার রাত্রে ঘাসের মধ্যে দিয়ে আমাকে টানাটানি করে কী তোমার লাভ হবে বল ? ডাক্তারকে কামড়ালে কে তাকে রক্ষে করবে শুনি ? তা ছাড়া, এ বাড়িতে একটা রাত কাটাতে এতই বা তোমার আপত্তি কিসের তা ঠিক বুঝতে পারছিনে। তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ কিছু আছে নাকি ? আমি তো দেখছি, উপস্থিত তুমি এ বাড়ির পরম বন্ধু। —নিজের জীবন বিপন্ন করে একটি মহা মূল্যবান জীবন রক্ষা করেছ। তোমার তো এ বাড়ির ওপর একটা আধিপত্য জন্মে গেল হে !"

মৃদু স্বরে বীরেন বললে, "আসলে কিন্তু ঠিক সময়ে বাঁধন পড়েছিল বলেই উনি রক্ষা পেয়েছেন।"

ডাক্তার বললেন, "তা নয় রে বাবা, তা নয়। বাঁধন চিরকালই পড়ে, আর মারাও চিরকালই যায়। নাগরাজ যদি একটু গভীর ভাবে অনুগ্রহ করেন তাহলে বাঁধনের সাধ্য কি আটকায়। ওপরকার বাঁধন ওপরেই বাঁধা থাকে, তলায় তলায় সমস্ত রক্ত-প্রণালী দিয়ে দেহে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। অত শীঘ্র তুমি যদি বিষ না বের করে দিতে তাহলে আমি এসে হয়তো বিশেষ কিছু করতে পারতাম না। আত্ম-প্রশংসা হজম করবার মতো তোমার পরিপাক-শক্তি প্রবল নয় তা বুঝতে পারছি বীরেন, কিন্তু মানুষকে মানুষ যদি কখনোও বাঁচিয়ে থাকে তাহলে তুমি মা-সুধীরাকে আজ বাঁচিয়েছ তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

চেয়ার পরিত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে ডাক্তার বললেন, "তোমরা দু'জনে শুয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম কর, আমি ততক্ষণ নিচে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে একটু চা খাবার চেষ্টা দেখি। চা-টা না খেয়েই তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে পড়েছিলুম।" সুধীরার

সম্মুখে এসে একটু নত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কেমন আছ মা ?"

এতক্ষণে সুধীরার বাক্‌শক্তি ফিরে এসেছিল। কম্পিত স্বরে বললে, "ভালো আছি।"

নাড়ীটা আর একবার পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার বললেন, "সত্যিই ভালো আছ।"

সুধীরার সর্পাঘাতের কথা উমাশঙ্করকে জানানো হবে কি-না তদ্বিষয়ে মন্দাকিনী ডাক্তারের পরামর্শ প্রার্থনা করলেন।

উমাশঙ্করের শারীরিক অবস্থার কথা অবগত হয়ে ডাক্তার বললেন, "মা লক্ষ্মী যখন বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে, তখন আমার মনে হয়, না জানানোই ভালো। আসতেও তিনি পারবেন না, অথচ সংবাদ পেয়ে একবারে অধীর হয়ে উঠবেন—তাতে কী লাভ হবে। পাঁচ ছয় দিনের আগে সুধীরা-মা যে কলকাতা যেতে পারবেন তা মনে হয় না। বিষ থেকে রক্ষে পেয়েও অনেক সময়ে ঘা নিয়ে বিপন্ন হতে হয়। ঘা শুকোবার আগে পায়ে চাড় লাগলে গুরুতর ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে।"

ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী অবশেষে স্থির হলো উমাশঙ্করকে উপস্থিত সংবাদ দেওয়া হবে না।

রাত্রি তখন দশটা। ঘণ্টাখানেক পূর্বে ডাক্তার তাঁর চিকিৎসার বাকি কর্তব্যটুকু শেষ করেছেন। সুধীরা এবং বীরেন উভয়েই তাদের নিজ নিজ ইজিচেম্বারে নিদ্রাগত হয়েছে। বাইরের বারান্দায় বসে রাখাল চুরুট খাচ্ছে। এমন সময়ে গৃহাভিমুখিনী প্রভাময়ী অন্দর মহল হতে নির্গত হয়ে বাইরের প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়ে গেটের দিকে অগ্রসর হলো।

রাখাল দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে তাকে অনুসরণ করে কাছাকাছি এসে পিছন দিক হতে টর্চের আলো নিক্ষেপ করলে। আলোক প্রভাময়ীকে অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়ে সামনে পড়ল।

আলো দেখে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে প্রভা বললে "এ কী! আপনি আসছেন কেন ?"

নিকটে এসে রাখাল বললে, "চল, আলো দেখিয়ে তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রভা বললে, "না, আপনাকে পৌঁছতে হবে না।"

রাখাল বললে, "অবুঝ হয়োনা প্রভা। দেখলে তো সুধীরা হঠাৎ কী একটা ভীষণ কাণ্ড করে বসল। ভগবান না করুন, তোমারও যদি অমনি কিছু হয় তাহলে আমাকেই তো তোমার পা চুষতে হবে।"

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে প্রভাময়ী বললে, "না, কক্ষনো আপনি চুষবেন না।"

"তবে কে চুষবে ?"

"কেউ চুষবে না।"

ব্যগ্র কণ্ঠে রাখাল বললে, "না, সে আমি প্রাণ থাকতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না! নিশ্চয় চুষব। বীরেন কেন তাহলে সুধীরার পা চুষলে বল?"

প্রভাময়ী বললে, "বীরুদা কেন চুষলে সে কথা আমি কক্ষনো আপনাকে বলব না!"

"আমিও তোমার পা কেন চুষব, সে কথা তোমাকে কক্ষনো বলব না। তবে তুমি যদি একান্তই শুনতে চাও তাহলে না-হয় বলি।"

উচ্ছলিত হয়ে উঠে প্রভা বললে, "না, খবরদার আপনি বলতে পাবেন না! আচ্ছা, কেন আপনি এমন করে আমার পেছনে লেগেছেন বলুন তো?"

স্মিত মুখে রাখাল বললে, "তুমি এগিয়ে চলেছ বলে। পাশে এসে দাঁড়াও প্রভা, কোন গোল থাকবে না।"

"সে কথা আমি বলছিনে।"

"কিন্তু আমি যে সেই কথাই বলছি।"

একটু বিমূঢ়ভাবে ইতস্ততঃ করে প্রভা জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ পাশে?"

"বাঁ পাশে।"

"কক্ষনো না,—ডান পাশে!"

"আচ্ছা, তাই সই।"

"উঃ! কী নাছোড়বান্দা লোক আপনি!" বলে বিরক্তি ভরে প্রভাময়ী রাখালের দক্ষিণ পাশে গিয়ে দাঁড়াল। "কিন্তু অর্ধেক পথ থেকে ফিরে আসতে হবে আপনাকে, তা বলে দিলাম!"

রাখাল বললে, "আচ্ছা চল তো এখন, তারপর অর্ধেক কি পুরো দেখা যাবে।"

বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে প্রভা বললে, "পুরো পথ না গিয়ে ফেরবার লোক তুমি নও তা আমি জানি!"

পুলকিত স্বরে রাখাল বললে, "তুমি বললে যে আমাকে?"

"আপনি! আপনি! আপনি! হয়েছে? এখন চল তাড়াতাড়ি।" বলে গজর গজর করতে করতে প্রভাময়ী রাখালের দক্ষিণ পাশে অবস্থান করে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হলো।

সতের

প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর বীরেন দেখলে তার পাশে ইজিচেয়ারে সুধীরা জাগ্রত হয়ে শুয়ে আছে, এবং গত রাত্রে যে সাত আট জন লোক তাদের সহিত বারান্দায় শয়ন করেছিল সকলেই ঘুম ভেঙে কখন নিচে নেমে গেছে। এখনও হয়তো সুধীরা তার ঘুম ভাঙার কথা টের পায় নি। বীরেন ধীরে ধীরে পুনরায় চক্ষু নিমীলিত করলে। সদ্যঘটিত অচিন্ত্যপূর্ব পরিবৃত্তির সহিত নিজ মনের ছন্দ মিলিয়ে নিয়ে তবে সে সুধীরার নিকট জাগ্রত হতে চায়, যাতে না নবজাগ্রত মনের অসতর্কতা বশতঃ বচনে-আচরণে কোনও প্রকার ছন্দঃপতন ঘটে।

কী অদ্ভুত গত রজনীর অচিন্তনীয় ঘটনাচক্র! সাত দিন পরে যার সহিত মারাত্মক সংঘর্ষের ব্যবস্থা স্থির হয়ে আছে, একই বিষের নেশায় বুঁদ হয়ে পাশাপাশি শয্যায় তার সহিত একত্র নিশা-যাপন! বিভিন্ন যাত্রীদলের নৌকাডুবির ফলে নদী-সৈকতের বাসর-শয়নে তারা যেন অদৃষ্টমিলিত মাত্র একটি রজনীর অপরিণীত বর-বধূ! আশ্চর্য! দৈব যখন বলবৎ হয়ে কাজ করে তখন কোনও কিছুই অসম্ভব থাকে না।

অথচ বাস্তব জগতের পণ্যশালায় এর মূল্য এক কপর্দকও নয়। নিশীথে দেখা স্বপ্নেরই মতো নিশীথের এই ঘটনা অলীক এবং মূল্যহীন। ডাক্তার বলে, সে সুধীরার জীবন রক্ষা করেছে। ডাক্তার কিছুই জানে না। শুধু মানুষের দেহের সহিতই তার পরিচয়, মনের সহিত কোনও পরিচয়ই নেই। সে সামান্য একজন প্রজানন্দন, জমিদার নন্দিনীর জীবন রক্ষা সে কেমন ক'রে করে! রঘুনাথ রায় এগু কো তা হয়তো করলেও করতে পারত।

বীরেন মনে মনে খুশী হলো। স্বপ্ন ভেঙেছে, বাস্তব জগতে সে জাগ্রত হয়েছে।

চক্ষু উন্মীলিত করে সে সোজা হয়ে উঠে বসল। সুধীরার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, "ভালো আছেন মিস্ চৌধুরী?"

বীরেনের দিকে মাথা ফিরিয়ে সুধীরা বললে, "ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?"

"আমি? আমার তো কিছু হয়নি,—আমি ভালোই আছি।" বলে চেয়ার পরিত্যাগ করে উঠে বারান্দার পশ্চিম প্রান্তে একবার গিয়ে দাঁড়াল, তারপর ফিরে এসে পুনরায় চেয়ারে উপবেশন করে বললে, "দেখুন, আপনি আর বেশি দিন এখানে থাকবেন না, কলকাতায় ফিরে যান। কী ব্যাপারই হতে চলেছিল বলুন তো? নিতান্ত ভগবানের দয়া বলেই না সামলে গেল। এখনও মনে হলে গা কাঁপে। আসছে শুক্রবার পর্যন্ত অবশ্য আপনাকে থাকতেই হবে। তা ছাড়া, পাঁচ ছ দিনের আগে তো পায়ের জন্তে আপনার এমনিই যাওয়া হবে না।' কিন্তু শুক্রবারের ব্যাপারটা চুকে গেলেই কলকাতায় চলে যাবেন। কলকাতায় ময়দান

যাদের পক্ষে মাঠ, ইডেন গার্ডেন অরণ্য, তাদের কি আর পাড়াগাঁয়ে বসবাস করা চলে? আমরা পাড়াগেঁয়েরা এখানকার হদিশ জানি। পথ চলবার সময়ে পঁচিশ হাত দেখে দেখে পথ চলি, আর সাধ্যমতো ঘাস পাতা মাড়াইনে। আপনি শুক্রবারের কাজ সেরে শনিবারেই নিশ্চয় কলকাতা ফিরে যাবেন।"

এ কথার উত্তরে সুধীরা কোন কথাই বললে না, বীরেনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে শুয়ে বাইরের আকাশের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

"মিস্ চৌধুরী!"

সুধীরা মুখ ফিরিয়ে বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

বীরেন বললে, "কাল সন্ধ্যাবেলা আপনার প্রতি একটু অন্যায় ব্যবহার করেছিলাম, তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।"

মুখ না ফিরিয়ে সুধীরা শুধু বীরেনের উপর হতে তার দৃষ্টি একটু সরিয়ে নিলে।

"কাল সন্ধ্যেবেলা এক সময়ে আপনাকে নাম ধরে আর তুমি বলে ডেকেছিলাম। প্রবল উত্তেজনার মুহূর্তে ওটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। যখন দেখলাম, মিস্ চৌধুরী ডাকে আপনি সাড়া দিচ্ছেন না, তখন হয়তো মনে হয়েছিল একেবারে আপনার সাক্ষাৎ নাম ধরে ডাকতে পারলে আপনার কানে তা হয়তো পৌঁছুতে পারে। পৌঁছেওছিল তাই। কিন্তু আসল কথা কী তা জানেন মিস্ চৌধুরী? এত কিছুই বিচার-বিবেচনা করে তখন ডাকিনি—মুখ দিয়ে আপনা-আপনিই ও ডাক বেরিয়ে গিয়েছিল। মানুষের জীবনে এমন সব মুহূর্ত আসে যখন তার প্রচণ্ড দাবি দাওয়ার সামনে থেকে সমস্ত সংস্কার সামাজিকতা সরে দাঁড়ায়। কাল আমারও হয়তো সেই রকম একটা মুহূত এসেছিল। জলে ডুবেছে এমন লোককে বাঁচাতে গিয়ে এক হাতে তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে, আর এক হাতে আর পায়ে সাঁতার কেটে চলে আসবারও তো দরকার হয়ে থাকে।" বলে বীরেন হাসতে লাগল।

পর মুহূর্তে সে দাঁড়িয়ে উঠে যুক্ত করে নমস্কার করে বললে, "আমি এখন বাড়ি চললাম।"

সুধীরা বললে, "একবার ডাক্তার মশায়কে বলে যাবেন না?"

"তিনি তো নিচেই আছেন, দেখা হবে এখন।" বলে বীরেন ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেল।

বীরেন চলে গেলে সুধীরার দুই চক্ষু দিয়ে খানিকটা অশ্রু ঝরে পড়ল,—দুঃখে, অভিমানে, বেদনায়, অথবা অন্য কোন দুর্নির্ণেয় মনোবৃত্তির প্রভাবে, তা তার অন্তর্যামীই বলতে সক্ষম।

আঠারো

মঙ্গলবারের সকাল। গত শুক্রবারে সুধীরাকে সর্প দংশন করেছিল। রবিবার সকালে রামরতন ডাক্তার এসে তার পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে মন্দাকিনীর অনুরোধে সমস্ত দিন পলতাডাঙ্গায় অতিবাহিত করে বৈকালে মাধবপুরে ফিরে গিয়েছিলেন। সুধীরার ক্ষতর অবস্থা ভালোই। বুধবার পর্যন্ত তার নিম্ন তলায় অবতরণ করা ডাক্তার কর্তৃক নিষিদ্ধ।

জলভরা মেঘ যেমন তার বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ বুকে নিয়ে থমথমিয়ে থাকে, সুধীরা তেমনি এ কয়েকদিন তার দুঃখ এবং বেদনা অন্তরে বহন করে স্তব্ধ হয়ে আছে। সে হাসে না, কথা কয় না, আলাপ আলোচনায় যোগ দেয় না, বই পড়ে না; একটা প্রগাঢ় বিষণ্ণতার দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত হয়ে সমস্ত দিন নিঃশব্দে শয্যার উপর পড়ে থাকে। রাখাল ঘটক রসিকতা করতে এসে পালিয়ে যায়, মন্দাকিনী সুধীরার প্রাণের নিরুদ্ধ কপাট খুলতে এসে কথা খুঁজে পান না, প্রভাময়ী গল্প করতে এসে নিঃশব্দে কাছে বসে থাকে।

দুই একটা নিতান্ত মামুলি কথা ভিন্ন সুধীরা তার সহিত কোনও কথাই কয় না,—এমন কি বীরেন শারীরিক কেমন আছে সে কথাও তাকে জিজ্ঞাসা করে না। কী তার প্রাণের দুঃখ, কী তার অন্তরের বেদনা, কী তার দ্বন্দ্ব-সমস্যা, কেউ তা সঠিক বুঝতে পারে না। কেউ কেউ অনুমান করে,—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। অনুমান অনুমানই থেকে যায়।

বৈকালে সুধীর বারান্দায় এসে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত ইজিচেয়ারে বসে থাকে। যেখানে বসে সেখান থেকে বকুলতলা স্পষ্ট দেখা যায়; কিন্তু শনি, রবি এবং সোম—এই তিনদিনের মধ্যে একদিনও বীরেনকে বকুলতলায় মুহূর্তের জন্য দেখা যায় নি। পূর্বের মতো এ কয়দিন বীরেন যদি চেয়ার নিয়ে এসে বকুলতলায় বসত তা হলে নিশ্চয় ভালো লাগত না, একথা সুধীরা বুঝতে পারে। অথচ বকুলতলায় বীরেনকে না দেখতে পেয়ে মনের কোণে এক সুগোপন প্রদেশে একটা যে সূক্ষ্ম নৈরাশ্যের ব্যথা জাগে, এ কথাও বুঝতে তার বাকি থাকে না। শুধু বুঝতে পারে না, কীরূপে এই দুটি পরস্পর-বিরোধী মনোবৃত্তি একই মনের মধ্যে বাসা বেঁধে অবস্থান করতে পারে। আশ্চর্য মানুষের যুক্তিবিবর্জিত অবুঝ মন! ·

পূর্বে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে বকুলতলায় বসে বিবাদী জমিতে অধিকার প্রচার করে এসে সর্পদংশনের ঠিক পরদিন হতে কী কারণে বীরেন বকুলতলায় আসা একেবারে বন্ধ করেছে তা সুধীরার নিকট একটুও অস্পষ্ট নয়। নিজের জীবন বিপন্ন করে উপকার সাধনের দ্বারা অপর পক্ষকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করার পরও ঠিক পূর্বের ন্যায় বৈর ভঙ্গি বলবৎ রেখে নিরুপায় অপর

পক্ষকে অসুবিধার অবস্থায় ফেলতে বীরেনের ভদ্র মনে বাধে, এ কথা সুধীরা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করে।

এই তো ও পক্ষের উদার উন্নত মনোভঙ্গি। আর এ পক্ষে? এ পক্ষে বৈর সাধনের বিস্তৃত ব্যবস্থা অখণ্ড সমগ্রতায় সচল রয়েছে। নিষ্পেষণ-যন্ত্রের কোনও দিকের কোন সুইচ কেউ তুলে দেয়নি। ঢেঁকিশালে মজুরাণীরা সুর করে গান গেয়ে সুরকি কুটছে, বিবাদী জমির কাছে কাছে মজুররা থাকবন্দী করে ইট সাজাচ্ছে, প্রধান রাজমিস্ত্রী মাথায় চুমকির কাজ করা টুপি পরে চতুর্দিকে তদারক করে বেড়াচ্ছে; ও দিকে করিমগঞ্জে দুর্যোধন মণ্ডল এবং তার লাঠিয়ালেরা আঘাত যাতে অব্যর্থ এবং সাংঘাতিক হয় সে জন্যে দল বেঁধে লাঠি চালনার অভ্যাস করছে। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে সুনিশ্চিত পদক্ষেপে সর্বনাশা শুক্রবার এগিয়ে আসছে। মধ্যে আর মাত্র ছটা দিন বাকি। তারপর? তারপর শুক্রবার সকালে এই নির্যাতন-নিষ্পেষণের নিষ্ঠুর যন্ত্র পরিপূর্ণ দাপটে চলবে তো? তা যদি না চলে তো কে তাকে রোধ করবে? যে চালিয়েছে সে? কিন্তু কী করে? কী করে?

উঃ। কী কুক্ষণেই না সে কলকাতা থেকে পা বাড়িয়েছিল। এখনও অদৃষ্টে কত দুর্গতি আছে কে জানে।

মোক্ষদা এসে বললে, "দিদিরাণী, ও বাড়ির বীরেনবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

সুধীরার মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

"এসেছেন? এইখানে ডেকে নিয়ে আয়।"

বীরেন এসেছে শুনে একটা অজানা আশার আনন্দে সুধীরার মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এ কয়েকদিন সে একেবারে নিঃশব্দে ডুব মেরেছিল; সুধীরার সংবাদ নেবার জন্যও একবার আসে নি। আজ সে এসেছে। কিন্তু কী কথা ভেবে কী কথা বলতে এসেছে কে জানে। তা সে যাই হোক না কেন, কথাবার্তা তো হবে, তার মধ্যে একটা রদ-বদলের, একটা ওলট-পালটের সম্ভাবনা তো থাকতে পারে। ওঃ, তা যদি হয় তো সে একেবারে বেঁচে যায়। হঠাৎ যেন কোথায় কোন্ দিকে একটা রুদ্ধ জানলা খুলে গিয়ে তার বদ্ধ নির্বাত মন হাওয়ার হাওয়ায় হাল্কা হয়ে উঠল।

দোতলার বারান্দায় বীরেন পদার্পণ করতেই সুধীরা চেয়ার ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে করজোড়ে প্রসন্নমুখে বললে, "আসুন।"

প্রতিনমস্কার করে স্মিতমুখে বীরেন বললে, "এই যে দাঁড়িয়েছেন দেখছি। তাহলে ডাক্তার মশায় যে পাঁচ-ছ'দিন বলেছিলেন, তার কিছু আগেই সেরে উঠলেন।"

উভয়ে আসন গ্রহণ করার পর সুধীরা বললে, "সেরে উঠেছি, একটু একটু চলাফেরাও করছি, কিন্তু বৃহস্পতিবারের আগে নিচে নামবার হুকুম নেই। তাই

আপনাকে ওপরেই আসতে হলো। আপনি কেমন আছেন বলুন ?"

বীরেন বললে, "সেই নিদারুণ আতঙ্কটা এখনও মনের মধ্যে লেগে রয়েছে ; তা ভিন্ন ভালোই আছি। কী ভয়টাই না আপনি সেদিন আমাদের দেখিয়েছিলেন !"

"আপনাকেও ?"

"তাই মনে হয়।"

"কিন্তু আমি মরে গেলে অন্তত আপনার পক্ষে তো ভালই হতো।"

"কেন বলুন তো ?"

"শত্রু নিপাত হতো।" কথাটা সুধীরা হাসিমুখেই বললে বটে, কিন্তু কোন্ দিকের কোন সূক্ষ্ম বেদনার আঘাতে তার চোখের কোণও ভিজে এল।

বীরেন বললে, "তা বটে। এ কথাটা এ পর্যন্ত খেয়ালই হয় নি।"

তারপর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, "সুখে স্বাস্থ্যে শত্রুর শত বর্ষ পরমায়ু হোক, কিন্তু আজ আমি শত্রুর কাছে হার স্বীকার করতে এসেছি।"

বীরেনের কথা শুনে সুধীরার মুখের দীপ্তি একটু যেন হ্রাস পেলে ; সাগ্রহে বললে, "কিসের হার ?"

স্মিতমুখে বীরেন বললে, "কিসের নয় ? সব-কিছুরই।" তারপর সহসা গৌরচন্দ্রিকা পরিত্যাগ করে গভীর কণ্ঠে বলতে লাগল, "দেখুন, শুক্রবারে আপনার পাঁচিল গাঁথায় আমি কোনও বাধাই দোব না। তার আগে আমি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাব। এ গ্রামের ওপর থেকে আমার মন একেবারে উঠে গেছে,—আর কোনদিনই এ গ্রামে আমি ফিরব না। কী হবে বলুন তো এ রকম ঝগড়া-ঝাঁটি লাঠালাঠি করে এখানে বাস করে ? বিবাদ তো মেটাতেই গিয়েছিলাম, শুক্রবার থেকে বিবাদটা আরও বেড়েই যাবে। এক-আধটা খুন জখম হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। এ আমি আর চাইনে, আমি আপনাদের কাছে হার স্বীকার করছি। আপনি যদি দয়া করে একটু শোনেন তা হলে আপনার কাছে একটা প্রস্তাব করি।"

শুষ্ক নিষ্প্রভ মুখে সুধীরা বললে, "কী আপনার প্রস্তাব বলুন।"

বীরেন বললে, "আমার প্রস্তাব, আপনারা আমাদের এ গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি কিনে নিন। শুধু বিবাদ জমির কথাই বলছিনে, জমি-জমা ভদ্রাসন বাড়ি পুকুর বাগান—যা-কিছু আছে সব। এর জন্যে আপনি যা দাম বলবেন আমি তাতেই রাজি হব। যদি বলেন পাঁচ টাকা, আমি ছ'টাকা চাইব না। আমি আপনাকে অঙ্গীকার-পত্র লিখে দোব যে, আজ থেকে এক মাসের মধ্যে বাবাকে দিয়ে রেজেষ্ট্রী-কোবালা করিয়ে দেব। বাবা একটুও আপত্তি করবেন না আপনি আপনার বাবার অনুমতি ভিন্ন কিছুই করতে পারেন না, আমি কিন্তু তা পারি। আমি যদি সমস্ত সম্পত্তি দিয়েও বাবাকে সে কথা জানাই—বাবা একবারও আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাইবেন না। তিনি মনে করবেন, যে অবস্থায়

সম্পত্তি বিলিয়ে দেওয়াই উচিত, ঠিক সেই অবস্থাতেই আমি বিলিয়ে দিয়েছি। আপনি অনুগ্রহ করে আমার প্রস্তাবে রাজি হন। এতে খুব চমৎকার হবে। আপনি মনে করবেন, বিবাদী জমী বাদ দিয়ে আপনি সম্পত্তি কিনলেন; আমি মনে করব, বিবাদী জমি শুদ্ধ আমি সম্পত্তি বেচলাম। আপনিও খুশী হবেন, আমিও খুশী হব, মধ্যে থেকে আমাদের বিবাদ বেচারা ডুবে মারা যাবে।" বলে বীরেন হাসতে লাগল।

এত কথার পরে সুবীরা একটা কথাও বললে না—শুধু বিরস মুখে বসে রইল।

বীরেন বলতে লাগল, "একটা কথা আপনাকে খুলে বলি। আজ একটু আগে স্বয়ং রঘুনাথ রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আপনাদের ওপর তার রাগের অন্ত দেখতে পেলাম না। প্রত্যাখ্যাত হয়ে অপমানে রাগে হতাশায় সে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের লোভে কত ভীষণ ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেছে তা জানেন তো? আমার মনে হয় আপনার এ গ্রামে এমন করে বাস করা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। আপনাকে নিয়ে একটা ছোটখাট রাম-রাবণের যুদ্ধ যদি ঘটে যায় তো খুব আশ্চর্য হব না। এ ক্ষেত্রে অবশ্য রাম এখনও কেউ নেই, কিন্তু রাবণ যে আছে, সে রাবণেরই মতো ভীষণ। সেই রাবণ চায় আমার কাছ থেকে মায় বিবাদী জমি আরও কিছু জমি কিনে নিয়ে আপনাদের কানাচে এসে বসতে। সে আমাদের সমস্ত সম্পত্তি কেনবার প্রস্তাবও করেছে—আর তার জন্যে যে টাকা দিতে চেয়েছে তা শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন। এই পাড়াগাঁয়ে আমাদের সম্পত্তির আর কত মূল্য হবে, ধরুন পাঁচ-ছ' হাজার টাকা। রঘুনাথ রায় দিতে চেয়েছে বিশ হাজার টাকা। আর তার রাগের যে-রকম বহর দেখলাম তাতে বিশ হাজার শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজারে উঠলেও খুব আশ্চর্য হব না—কারণ এ তো আর সত্যি-সত্যি জমির দাম নয়—এ তার বৈর নির্যাতনের খরচ। আমি অবশ্য তার প্রস্তাব যে-ভাবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত ঠিক সেই ভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু মানুষের মন তো, কখন্ লোভ এসে অধিকার করে বলা যায় না। তা ছাড়া, সম্পত্তি তো আর আমার নয়, বাবাকে গিয়ে যদি চেপে ধরে তাহলে কী হয় তাই বা কে বলতে পারে! মিস্ চৌধুরী, আমার প্রস্তাবে আপনি অনুগ্রহ করে রাজি হোন!"

এবারও সুবীরা কোনও উত্তর দিলে না, গম্ভীর-গম্ভীর মুখে নিঃশব্দে বসে রইল।

বীরেন বললে, "তা ছাড়া, আপনিও পড়েছেন এক মহাবিপদে। পিতৃসত্য লঙ্ঘনই বা কী করে করবেন, অথচ সম্প্রতি যে-সকল ঘটনা ঘটে গেল তাতে তকবারে যা হবার কথা আছে তার জন্যে মনের মধ্যে একটু সংকোচও হয় বৈ-কি। তাই বলছি, আমার প্রস্তাবে আপনি রাজি হলে সব দিকই একরকম রক্ষে হয়।"

তারপর চেয়ার ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আচ্ছা, এখনই যে আপনার মতামত আমাকে জানাতে হবে তার কী মানে আছে, একটু না হয় ভেবেই দেখুন। কালকের মধ্যে কিন্তু আমাকে জানাবেন। করিম বক্‌স্ আর আমার অন্যান্য লোকজন আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হচ্ছে। আমি বৃহস্পতিবার চলে যাব। শুক্রবারে আমার এখানে থাকা ভালো হবে না। জানেন তো গোঁয়ার গোবিন্দ মানুষ, চোখের সামনে আপনারা লাঠির জোরে পাঁচিল গাঁথিয়ে নিচ্ছেন দেখলে হয়তো সামলাতে পারব না, একাই তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব। তখন আপনারা পড়বেন বিপদে। সেদিনকার কথা মনে করে আমার প্রতি খুব কঠোর হওয়া হয়তো আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তার চেয়ে আড়ালে সরে যাওয়াই ভালো। আচ্ছা, চললাম। নমস্কার।"

বীরেনের সহিত সুধীরাও দাঁড়িয়ে উঠেছিল, নীরবে করজোড়ে বীরেনকে প্রতি-নমস্কার করলে।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বীরেন বললে, "এ বিষয়ে আমার কিন্তু ঐকান্তিক অনুরোধ রইল। আপনি অনুগ্রহ করে সম্মত হলে আমার নিজের সমস্যাও অনেকটা লঘু হবে।" বলে প্রস্থান করলে।

উনিশ

সেইদিন সন্ধ্যার পর চা-পানান্তে বীরেনের ঘরে বসে বীরেন ও প্রভাময়ী কথোপকথন করছিল।

প্রভাময়ী বললে, "শুধু কি তাই? বাবার সঙ্গে দেখা করে নানা রকম ফুস্‌মন্তর দিয়ে বাবাকে রাজি করে নিয়েছে। আমি আড়াল থেকে দেখলাম, বাবার হাতে এক তাড়া নোট গুঁজে দিলে। আচ্ছা, এ রকম নাছোড়বান্দা লোককে নিয়ে কী করা যায় বলতো বীরুদা?"

খুব গভীর ভাবে চিন্তা করবার ভান করে গম্ভীর মুখে বীরেন বললে "আমার তো মনে হয় একমাত্র বিয়ে করা ছাড়া আর কিছুই করা যায় না।"

সতর্জনে প্রভাময়ী বললে, "আচ্ছা বীরুদা, তুমিও একথা বলবে?" তর্জনের মধ্যে কিন্তু পূর্বের ন্যায় উগ্রতা পরিলক্ষিত হলো না।

বীরেন বললে, "শুধু আমি কেন প্রভা, যাকেই তুমি জিজ্ঞাসা করবে সেই তোমাকে একথা বলবে। আচ্ছা, তুমি তো বলছ এ দু-তিন দিন রাখাল তোমাকে উত্তম-খুত্তম করে মেরেছে, তাহলে তাকে বোঝবার যথেষ্ট সুযোগ তোমার হয়েছিল। কী রকম লোক তাকে দেখলে?—সত্যি করে বল।"

একটু ইতস্তত করে ঈষৎ লজ্জিতকণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "তা যদি বলতে হয়, তো খুব খারাপ লোক বোধ হয় নয়।"

বীরেন বললে, "আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলছি, এই 'খুব খারাপ হয়তো নয়' লোককে তুমি শীঘ্রই 'খুব ভালো লোক' বলতে আরম্ভ করবে। আচ্ছা, সেই চিঠিটার তুমি কোনোও উত্তর দিয়েছিলে?"

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হলো না, হরিরাম প্রবেশ করে বললে, "দাদাবাবু, ও বাড়ির রাণীদিদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

উগ্র বিস্ময়ে বীরেন জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায়?"

"এই বারান্দায়।"

ত্বরিতপদে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে বীরেন দেখলে সুধীরা এবং রাখাল দাঁড়িয়ে আছে।

বিস্ময়বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে বীরেন বললে, "আচ্ছা, এ কি কাণ্ড আপনার বলুন দেখি? এই সেদিন ও রকম একটা ব্যাপার হলো আর আজই অন্ধকারে ঘাস-পাতার মধ্যে দিয়ে এই এতখানি পথ হেঁটে এসেছেন। নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি। এসেছেন, আমার বাড়ি আপনার পদস্পর্শে পবিত্র হয়েছে। কিন্তু আমাকে ডাকিয়ে পাঠালেই তো হতো, আমি নিজে গিয়ে শুনে আসতাম।" তারপর রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, "আচ্ছা রাখাল দাদা, তোমারই বা এ কী-রকম বিবেচনা তা তো বুঝতে পারছিনে।"

রাখাল বললে, "কী করব ভাই বল? স্টীম-এঞ্জিন যখন সবেগে এগিয়ে চলে তখন মালগাড়িকে তার পিছনে ছুটতেই হয়।"

সুধীরাকে লক্ষ্য করে বীরেন বললে, "আসুন মিস চৌধুরী, ঘরের ভেতরে আসুন। এস রাখালদা।"

রাখাল বললে, "তোমাদের কী কনফিডেন্সিয়াল মিটিং আছে। সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ। বাইরে অপেক্ষা করবার জন্তে আমার প্রতি হার ম্যাজেষ্টির অর্ডার আছে। শ্রীমতী প্রভাময়ীরও বোধ হয় সেখানে থাকা চলবে না।"

বলা বাহুল্য বীরেনের সহিত প্রভাও বারান্দায় এসেছিল।

সহাস্যমুখে বীরেন বললে, "তা হলে তো ভালোই হলো, তোমাকে আর একলা বসে থাকতে হবে না। শ্রীমতী প্রভাময়ীতে আর তোমাতে দুখানা চেয়ার অধিকার করে বসে বসে গল্প কর।"

রাখাল বললে, "তোমার এ উপদেশের জন্তে ধন্যবাদ।"

ঘরের ভিতর সুধীরাকে নিয়ে গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়ে তার সম্মুখে আর একটা চেয়ারে নিজে বসে বীরেন বললে, "আসতে পায়ে খুব লেগেছে তো?"

ঘাড় নেড়ে সুধীরা জানালে, লাগে নি।

"বৃহস্পতিবারের আগে নিচে নামতে ডাক্তারের নিষেধ—আর মঙ্গলবারেই এতখানি পথ হেঁটে আমার বাড়ি আপনি এলেন। এ অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়ে আমি অবশ্য কৃতার্থ হয়েছি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আপনার শরীরের ইষ্ট-অনিষ্ট।"

নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগ এতক্ষণে কতকটা সামলে নিয়ে আর্দ্র কণ্ঠে সুধীরা বললে, "আপনি বলছিলেন চিরদিনের জন্যে আপনি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন, এ কিন্তু কখনোও করবেন না। কিসের জন্যে আপনি আপনার এত-দিনকার পৈত্রিক ভদ্রাসন বাড়ি ছেড়ে যাবেন? বিবাদী জমি আর বিবাদ রইল এখানে পড়ে— আমি কালই কলকাতা চলে যাচ্ছি। শুক্রবারে পাঁচিল গাঁথা-টাঁথা কিছুই হবে না, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।"

বীরেন বললে, তা না হোক, কিন্তু আরও তিন-চার দিন আপনার একটু বিশ্রাম নিয়ে গেলে হতো না? কাল আপনি যেতে পারবেন তো?

সুধীরা বললে, "পারব। বাবার কাছে যেতে কোনও কষ্ট হবে না। আপনি বলছিলেন, বাবার অনুমতি ভিন্ন আমি কোনও কিছুই করতে পারিনে— তা হয়তো পারিনে; কিন্তু এমন কোনও উপরোধ-অনুরোধ আদর-আবদার নেই যা বাবার কাছে আমার খাটে না। আমি সেখানে গেলে আমার সব গোলযোগ সহজ হয়ে যাবে, বাবা তাঁর অপরাধী মেয়েকে নিশ্চয় ক্ষমা করবেন।"

দুঃখার্ত কণ্ঠে বীরেন বললে, "আমি ও কথা বলে অপরাধ করেছি মিস চৌধুরী। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!"

সুধীরা বললে, "না, আপনি কোনও অপরাধই করেননি, অপরাধ আমিই করেছি। পুরুষের মন নিয়ে আপনাকে হারাব বলে ভারি দর্প করে এসেছিলাম; মেয়েমানুষের মন নিয়ে সম্পূর্ণ হেরেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!" বলে সহসা ভূমিতলে বসে প'ড়ে সজোরে বীরেনের দুই পা জড়িয়ে ধরলে। যে অশ্রু কোনও প্রকারে দুঃখার্ত নেত্রের মধ্যে আটকে ছিল, বীরেনের দুই পায়ের উপর তা ঝরঝর করে ঝরে পড়ল।

ব্যস্ত হয়ে সুধীরাকে দুই বাহু ধরে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে আর্দ্র-আর্ত কণ্ঠে বীরেন বললে, "না, ন', সুধীরা, এ তুমি ভারি অন্যায় করেছ! এ তুমি কেন করলে! এ তুমি একটুও ভালো করনি! আগে তুমি কোনও অপরাধ করেছ কি-না জানিনে, কিন্তু আজ গুরুতর অপরাধ করলে! এ অপরাধের জন্যে আমি বোধ হয় কোনও দিনই তোমাকে ক্ষমা করতে পারব না।"

এ তিরস্কারের উত্তর দেয় কে! সুধীরা তখন ইজিচেয়ারের হাতলের উপর দুইবাহুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে রোদন করছে।

সুধীরার মাথার চুলে দুই তিন বার ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বীরেন বললে "সুধীরা, শান্ত হও; লক্ষ্মীটি আর কেঁদো না।"

ধীরে ধীরে সুধীরার রোদন বন্ধ হলো। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে বীরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "এবার যাই?"

বীরেন বললে, "যাবার আগে কিন্তু একটা কথা বলে যাও সুধীরা!"

"কী কথা?"

একটু ইতস্তত করে বীরেন বললে, "জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না, পাছে আবার ভুল করে বসি, তবু জিজ্ঞাসা করি। কলকাতায় গিয়ে তোমার বাবাকে আমার প্রার্থনা জানাব কি?"

মুহূর্তের জন্ত বীরেনের দিকে চেয়ে চক্ষু নত করে সুধীরা বললে, "জানিয়ো।"

"সুধীরা!"

সুধীরা চেয়ে দেখলে ঐকান্তিক আগ্রহ ভরে বীরেন তার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে রয়েছে।

সুমিষ্ট কুণ্ঠার সহিত সুধীরা তার নিজের দক্ষিণ হস্ত বীরেনের হস্তের উপর স্থাপন করলে।

ক্ষণকাল পরে উভয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই রাখাল এবং প্রভাময়ী নিকটে এসে উপস্থিত হলো।

বীরেন বললে, "রোসো, তোমাদের সঙ্গে একটা জোর আলো দিয়ে দিই।"

রাখাল ঘাড় নেড়ে বললে, "কোনও দরকার নেই বীরেন, আমার সঙ্গে খুব জোর টর্চ আছে।" বলে টর্চ জ্বেলে প্রভাময়ীর মুখের উপর আলো ফেললে।

প্রভাময়ী কিছু না বলে মৃদু হেসে তার মুখ সরিয়ে নিলে। বীরেন দেখলে, সত্যই অন্ত আলোর বিশেষ প্রয়োজন নেই, রাখালের টর্চ খুব জোরালো।

সুধীরার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বীরেন বললে, "সুধীরা, আমরা যদি এখনই গিয়ে পিসিমাকে প্রণাম করি?"

সুধীরার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল, মৃদুস্বরে বললে, "চল।"

চক্ষু কুঞ্চিত করে রাখাল বললে, "কিন্তু 'আমরা' মানে কা! শুধু তোমরা দুজনে, না আমরা চারজনে?"

স্মিত মুখে বীরেন বললে, "আমরা চারজনে নিশ্চয় রাখাল দাদা।"

"That's all right!" বলে রাখাল টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "আমার পিছনে সুধীরা দাঁড়াও। তার পর প্রভা, সব শেষে বীরেন। Ladies middle, men flanks!"

রাখালের নির্দেশ মতো সকলে দাঁড়ানোর পর রাখাল বললে, "Now, quick march!" তারপর জমিদার বাড়ির দিকে অগ্রসর হলো। পিছনে পিছনে সুধীরা প্রভা এবং বীরেন তাকে অনুসরণ করে চলল। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ কম্পিত কণ্ঠে রাখাল গেয়ে উঠল,

> I have a flower within my heart,
> Daisy, Daisy!

তখন ক্ষণমাহাত্ম্য এমন তুঙ্গ, সকলের মনের তন্ত্রী এমন প্রবল উচ্চ সুরে বাঁধা যে, সমস্তই তার প্রভাবে অসামান্ত হয়ে উঠল। রাখালের গান শুনে কেউ হাসলে না, কেউ পরিহাস করলে না, এমন কি প্রভাময়ী পর্যন্ত মনে করলে যে, সে গানের সে সময়ে বিশেষ কোনও উপযোগিতা নিশ্চয়ই আছে।

একটু পরে রাখাল পুনরায় গাইলে,

> Weather she loves me or loves me not,
> Sometime it's hard to tell

গান শেষ হলে বীরেন বললে, "মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখ!"

সকলে তাকিয়ে দেখলে ঘন কৃষ্ণবর্ণ আকাশে একরাশ তারকা ঝিক্‌মিক্‌ করে হাসছে।

—]

সাত দিন

প্রেরণা

এক

প্রমীলা সেন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। পরিবার অর্থে তিনটি প্রাণী: বিধবা জননী বিজনবাসিনী, এগার বৎসর বয়স্ক ছোট ভাই সমর ওরফে ভোলা, এবং বাইশ বৎসর বয়সের অনূঢ়া কন্যা সে নিজে।

বাইশ বৎসর বয়সে প্রমীলার বিবাহের বয়স হয় নি, তা বলা চলে না। আর এ কথা একেবারেই বলা চলে না যে, তার বিবাহের এ পর্যন্ত কোনও চেষ্টা-চরিত্র হয় নি। উপস্থিত সপ্তম পাত্রের পালা চলছে; তৎপূর্বে যে ছয়টি পাত্র পর্যায়ক্রমে আসরে অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই চেষ্টা-চরিত্রের সীমান্তরেখা পর্যন্ত লড়ালড়ি করে অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। যোগ্যতার দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে তাদের প্রত্যেকেরই ওজন দেখে বিজনবাসিনী সন্তুষ্ট হয়েছিল, কিন্তু প্রমীলা কাউকেই গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয় নি। প্রত্যেককেই সে একই কথা বলে ভাগিয়েছে,—'বিয়ে করতে প্রেরণা পাচ্ছি নে।'

এই পাষণ্ড প্রেরণা বস্তুটি প্রমীলার হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রদেশে জমাট বেঁধে ঘুমিয়ে আছে, এবং কী উপায়ে তাকে জাগ্রত করা যায়, তা আবিষ্কার করবার জন্য পাত্রগণের উৎসাহ এবং তৎপরতার অন্ত ছিল না। ব্যারিস্টার বেসুরো কণ্ঠে গান গেয়েছে, এঞ্জিনিয়ার খণ্ডিত ছন্দে কবিতা লিখেছে, ব্যবসাদার গ্যালন-গ্যালন পেট্রোল পুড়িয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলে একই উত্তর লাভ করেছে, 'প্রেরণা পাচ্ছি নে।'

দুই

ছুটির দিন, বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। স্নানের জন্য উঠি-উঠি মন সত্ত্বেও একটা বই ছেড়ে প্রমীলা উঠতে পারছে না, এমন সময়ে বিজনবাসিনী কক্ষে প্রবেশ করল। প্রমীলার হাত থেকে বইখানা টেনে নিয়ে বন্ধ করে টেবিলের উপর রেখে বললে, "হ্যাঁ রে মীলা, আট-দশ দিন ধরে প্রদোষ আর আসছে না কেন শুনি?"

স্মিতমুখে প্রমীলা বললে, "এ প্রশ্নের উত্তর আমার চেয়ে তুমি কম দিতে পারবে না মা। কেন তিনি আসছেন না, সে কথা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। আমরা যা বলব, তা হবে অনুমান।"

"তাকেও তুই জবাব দিয়েছিস তা হলে?"

দুইটি কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষু বিজনবাসিনীর প্রতি স্থাপিত করে প্রমীলা বললে,

"অবাধ বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও তা আগে বল ?"

মনটা পূর্ব হতেই তিক্ত হয়ে ছিল, তদুপরি কন্যার এই ন্যাকামি-মিশ্রিত বাক্য শুনে একেবারে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ঝঙ্কার দিয়ে বিজনবাসিনী বললে, "বোঝাতে চাই তোমার মুণ্ডু আর আমার পিণ্ডি। কী হতভাগা মেয়েই না গর্ভে ধরেছিলাম।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রমীলা বললে, "গর্ভে ধরে ভালো করেছিলে তা বলছি নে, কিন্তু হতভাগা বলে গাল যদি দাও, নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব। তোমার মতো যার মা আছে সে হতভাগা, এ কথা ভগবান এসে বললেও বিশ্বাস করব না।"

একটা-কোনও উচিতমতো উত্তর সহসা খুঁজে না পেয়ে বিজনবাসিনী বললে, "না, তা কেন করবে।" তারপর হতাশামিশ্রিত কণ্ঠে বললে, "আচ্ছা, তোকে নিয়ে আমি কী করি, বল্ দেখি মীলা ?"

মৃদু হেসে প্রমীলা বললে, "পালিয়ে যাও মা। আমাকে নিয়ে এমন কোনও দেশে পালিয়ে যাও, যেখানে তোমাকে দুঃখ দিতে আর আমাকে জ্বালাতন করতে বিয়ে-পাগলার দল নেই।"

বিরক্তি-বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে বিজনবাসিনী বললে, "তুই ওদের বিয়ে-পাগলার দল বলছিস ?"

বিজনবাসিনীর কথার ভঙ্গি দেখে প্রমীলার মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য দেখা দিল; বললে, "বলব না কেন, মা ? তুমি তো স্বচক্ষে পড়েছ অজয় দত্তের কবিতা, আর স্বকর্ণে শুনেছ তারক মিত্তিরের গান। আচ্ছা, তুমিই বল, ওদের পাগল বললে খুব অন্যায় করা হয় কি ?"

কবিতা এবং গানের উল্লেখে বিজনবাসিনীরও মুখে হাসি দেখা দেবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু পাছে হাসি দেখে অবাধ্য কন্যা আস্কারা পায় সেই ভয়ে হাসি দমন করে গম্ভীর মুখে বললে, "প্রদোষও গান গায় ?—কবিতা লেখে ?"

মাথা নেড়ে প্রমীলা বললে, "না, ও দুটি গুণ ওঁর আছে, তা স্বীকার করতেই হবে।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিজনবাসিনী বললে, "ও! ঐ দুটি গুণই ওর আছে, আর কোনও গুণ নেই। তোর মতলব কী বল্ দেখি মীলা ?"

হাসিমুখে প্রমীলা বললে, "আমার মতলব অসাধু নয় মা। আমার মতলব তোমার সেবায় আর ভোলাকে মানুষ করে তোলবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করা।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিজনবাসিনী বললে, "ওঃ! ঢং দেখে বাঁচি নে। আমার সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন। প্রদোষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করলে তোর জীবন ধন্য হতো তা ভালো করে জেনে রাখিস। তুই তার কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নোস্।"

"হাতের, না, পায়ের ?

ভ্রূকুঞ্চিত করে ঔৎসুক্যের সহিত বিজনবাসিনী জিজ্ঞাসা করলে, "কী হাতের, না, পায়ের ?"

"ক'ড়ে আঙুল ?"

"পায়ের, পায়ের, পায়ের !" বিজনবাসিনী তর্জন করে উঠল।

ভালোমানুষের মতো মুখ করে শান্তকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "আমি তো তোমারও পায়ের ক'ড়ে আঙুলের যোগ্য নই, তাই বলে কি মা, তোমাকে বিয়ে করতে হবে ?"

"আমি কি তোমাকে বিয়ে করবার জন্ম গান গাচ্ছি, না, কবিতা লিখছি ?" ব'লে রণে ভঙ্গ দিয়ে বিজনবাসিনী দুদ্দাড় করে প্রস্থান করলে।

কৌতুকমিশ্রিত সুমিষ্ট হাসির দ্বারা মুখমণ্ডলকে অপূর্ব করে প্রমীলা ক্ষণকাল নিঃশব্দে বসে রইল, তারপর ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে পূর্বোক্ত বইখানাকে শেল্‌ফের মধ্যে তুলে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

প্রদোষের বিষয়ে এত কথার পর এ কথা বোধ করি বলা বাহুল্য যে, সে প্রমীলার পাণিপ্রার্থী সপ্তম পাত্র। বিজনবাসিনীর যোগ্যতার দাঁড়িপাল্লায় পূর্বতন ছয়টি পাত্রের মধ্যে কারও অপেক্ষা সে লঘু নয়।

তিন

ঘটনাক্রমে সেই দিনই সন্ধ্যার পর প্রদোষ এসে উপস্থিত।

পরীক্ষা নিকটবর্তী বলে সন্ধ্যা থেকে ভোলা পাঠে মনোনিবেশ করেছিল ; এবং প্রদোষ ও প্রমীলা একান্ত আলাপের সুযোগ পেলে তা থেকে সুবিধাজনক কিছু প্রত্যাশা করা যেতে পারে মনে করে বিজনবাসিনী প্রদোষকে চা-খাবার খাইয়ে নিজ শয়নকক্ষে 'অমিয়-নিমাইচরিত' খুলে আত্মগোপন করেছিল।

দু চারটে সাধারণ কথার পর আসল কথা উঠল। প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "এত দিন আসেন নি কেন প্রদোষবাবু ?"

মৃদু হেসে প্রদোষ বললে, "বোধ হয় আসবার প্রেরণা পাই নি বলে।" প্রমীলার বুঝতে বিলম্ব হলো না, তারই কড়িতে প্রদোষ তার দেনা পরিশোধ করলে। পাল্টা আঘাতটুকু বিনা প্রতিবাদে পরিপাক করে সে বললে, "আজ তবে কিসের প্রেরণায় এলেন ?"

"তোমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রেরণায়।"

প্রদোষের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রেরণায় ? কেন, ধন্যবাদের কী করেছি আমি ?"

স্মিতমুখে প্রদোষ বললে, "আমার প্রতি সদয় হয়েছ।"

ততোধিক বিস্ময়ে প্রমীলা বললে, "সদয় হয়েছি? কিন্তু কোনও দিন তো আপনার প্রতি অসদয় ছিলাম না।"

"সর্বনাশ! যা ছিলে তাকে যদি সদয় থাকা বলে তা হলে তোমার সদয় থাকা থেকে ভগবান আমাকে রক্ষে করুন!" ব'লে হো-হো করে প্রদোষ হেসে উঠল। তারপর অভয়-দানের মিষ্টি সুরে বললে, "কিন্তু ঘাবড়াবার কারণ নেই। সদয় হয়েছ জাগ্রত জীবনে নয়, স্বপ্নে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করে প্রমীলা বললে, "ও হরি! স্বপ্নে?" তারপরই মুখ ঈষৎ গম্ভীর করে নিয়ে বললে, "ও কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নে, প্রদোষবাবু।"

মৃদু হেসে প্রদোষ বললে, "কী বিশ্বাস কর না? স্বপ্ন? না, স্বপ্ন দেখা?"

এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে প্রমীলা টেবিলের উপরকার একটা কাগজ-চাপা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

প্রদোষ বললে, "বুঝেছি। তোমার পেপার-ওয়েটের নাড়াচাড়া দেখে বুঝতে বাকি নেই যে, তুমি বোঝাতে চাও, আমি স্বপ্ন দেখেছি সে কথাও তুমি বিশ্বাস কর না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়াই যায় যে, বস্তুত আমি স্বপ্ন দেখি নি, কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির মতলবে মিথ্যা স্বপ্নের ওজুহাত তুলেছি, তা হলেও এ মিথ্যার মূল্য আছে।"

একটু চুপ করে থেকে প্রমীলা বললে, "থাকলেও, সে মিথ্যার মূল্য এত অল্প যে, তার দ্বারা বিশেষ কিছু মূল্যবান বস্তু কেনা যায় না"

মৃদু হেসে প্রদোষ বললে, "তুমি যে শুধু মূল্যবান নও, অক্রেয়ও,—তা আমি জানি প্রমীলা। It is better to have tried and failed, than never to have tried at all—তোমার সঙ্গে আমি সেই খেলা খেলছি। অপরকে চেষ্টা করে পাওয়ার চেয়ে তোমাকে চেষ্টা করে না-পাওয়া আমি শ্রেয় মনে করি।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "ভুল মনে করেন, প্রদোষবাবু। অপাত্রে এত মূল্য আরোপ করবেন না।"

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাসিমুখে প্রদোষ বললে, "ভুল মনে করি, কি ঠিক মনে করি, সে কথা না হয় বাড়ি গিয়ে একবার ভালো করে ভেবে দেখা যাবে,—আপাতত চললাম।"

"কোথায়?"

"বন্ধুবান্ধবের সন্ধানে। এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরে কোনও লাভ নেই।"

"তা হলে এখানেই তো আর কিছুক্ষণ থাকতে পারতেন?"

"যে গাছের ফুল অধিকারে আসবার সম্ভবনা নেই, সে গাছের তলায় বিলম্ব করে কোনও লাভ আছে কি?" বলে প্রদোষ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল; তারপর সহসা মুখ গম্ভীর করে বললে, "মনস্তত্ত্বের একটা ছোট্ট কথা বলব?"

স্মিতমুখে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী কথা?"

"তোমার মনে প্রেরণা জাগবার যদিই বা ছায়ার মতো কোনও ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকে তো এ তোমাকে নিশ্চয় বলছি, নিজেকে অযথা সস্তা করলে একেবারেই তা লুপ্ত হবে।" বলে প্রদোষ আর এক দফা উচ্চহাসি হাসলে।

প্রমীলা এ কথার কোনও উত্তর দিলে না; শুধু তার ওষ্ঠাধরে কৌতুকের অতি ক্ষীণ নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করলে, "আবার কবে আসবেন ?" কিন্তু প্রদোষ কোনও উত্তর দেবার পূর্বেই ব্যস্ত হয়ে বললে, "না না, উত্তর দিতে হবে না আপনাকে,—আমি আমার প্রশ্ন তুলে নিচ্ছি। 'যে গাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে কোনও লাভ নেই, সে গাছতলায় আবার একদিন এসে কী লাভ ?'—এই ধরনের একটা উত্তর দেবেন তো ?"

প্রমীলার কথা শুনে প্রদোষ পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। বললে, "আমার মন তোমার কাছে স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছে, প্রমীলা। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত।"

প্রদোষ প্রস্থান করবার পর বিজনবাসিনী জিজ্ঞাসা করলে, "প্রদোষ অত হাসছিল কেন রে, মীলা ?"

প্রমীলা বললে, "জোরে জোরে ?"

"জোরে জোরে না তো কি মুচকি হাসির কথা জিজ্ঞাসা করছি ? কথা শুনে গা জ্বলে।"

শান্তকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "অল্প কারণে প্রদোষবাবু জোরে জোরে হাসেন।"

"তাই তো। প্রদোষবাবুর আর কাজ নেই, অল্প কারণে জোরে জোরে হাসেন। এত শীগগির চলে গেল যে ?"

"তোলা রইল পড়ায় ব্যস্ত, তুমি দিলে ঘরে ঢুকে গা-ঢাকা,—একা আর আমার সঙ্গে কত গল্প করবেন ?"

"অত ঢঙের কথা শোনবার আমার সময় নেই।" বলে বিজনবাসিনী বিরক্তিবিরূপ মুখে প্রস্থান করলে।

চার

মাস দুই পরে আবার একদিন প্রদোষ এসে দেখা দিলে। ভদ্রতা রক্ষার্থে প্রমীলাকে বলতেই হলো, "এতদিন আসেন নি কেন, প্রদোষবাবু ?"

স্মিতমুখে প্রদোষ উত্তর দিলে, স্বপ্ন দেখি নি বলে।"

"কী আশ্চর্য ? স্বপ্ন দেখলে তবে আপনি আসবেন ?"

"সব স্বপ্ন দেখলেই নয়,—যে স্বপ্নে আমার প্রতি তুমি সদয় হবে, সেই স্বপ্ন দেখলে আসব।"

"দেখেছেন না-কি স্বপ্ন ?"

"দেখেছি,—কাল ভোর রাত্রে।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রমীলা বললে, "আপনার ঘুম হয় প্রদোষবাবু?"

উৎসাহভরে প্রদোষ বললে, "গভীর ঘুম হয়। পড়ি আর ঘুমুই।"

"তবে বোধ হয় আপনার ঠিক হজম হয় না।"

"ক্ষেপেছ! সকালে উঠে খিদের চোটে কী খাই, টেবিল খাই, না চেয়ার খাই, করি।"

"তবে এত স্বপ্ন দেখেন কেন?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা করে প্রদোষ বললে, "কিন্তু দেখি বলে তো তুমি বিশ্বাস কর না প্রমীলা?"

প্রদোষের কথা শুনে প্রমীলার মুখে অপ্রতিভতার ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে। কতকটা যেন নিজেকে সংশোধিত করার ছলেই বললে, "তাও বটে।" তারপর প্রদোষের প্রতি মুখ তুলে সহজভাবে দৃষ্টিপাত করে বললে, "আচ্ছা, তর্কের খাতিরে ধরাই যদি যায় যে, দেখেন,—তা হলে সে কথাটুকু কোন্ লাভের জন্যে আমাকে জানাতে আসেন?"

শান্তকণ্ঠে স্মিতমুখে প্রদোষ বললে, "লাভের জন্যে আসি নে প্রমীলা, লোভে পড়ে আসি।"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "লোভে পড়ে?—কিসের লোভ?"

"এইটুকু সুসংবাদ তোমাকে জানাবার লোভ যে, 'আমারও ভাগ্যে পড়ে নি পড়ে নি কেবলই ফাঁকি।' স্বপ্নে-পাওয়া অবশ্য ষোল আনা পাওয়া নয়; কিন্তু ষোল আনা না পাওয়া, তাও আমি মনে করি নে।" বলে প্রদোষ উঠে দাঁড়াল।

প্রমীলাও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চললেন?"

প্রদোষ বললে, "নিঃসন্দেহ।"

স্মিতমুখে প্রমীলা বললে, "এত শীগগির কেন চললেন, সে কথাও তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার উপায় নেই।"

"কেন বল দেখি?"

"বলবেন, বেশিক্ষণ থেকে নিজেকে সস্তা করতে নেই।"

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে প্রদোষ বললে, "সে কথা মনে আছে তোমার?—আর সে কথা মনে নেই?"

"কোন্ কথা?"

"সুদূর সম্ভাবনার কথা?"

প্রমীলার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে; মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ, তা-ও আছে।"

পাঁচ

মাত্র দিন-ছয়েক পরে প্রদোষকে পুনরায় আসতে দেখে প্রমীলা ঈষৎ বিস্মিত হলো। কিন্তু এমন কোন কথা সে বললে না, যাতে তার বিস্ময় প্রকাশ পায়।

কথাটা তুললে প্রদোষ নিজেই; বললে, "এবার এত শীগগির এলাম ব'লে মনে করো না বিনা-স্বপ্নে এসেছি।"

স্মিতমুখে প্রমীলা বললে, "বিনা-স্বপ্নে আসবার তো কথা নেই আপনার।"

"না, তা নেই। একটা কথা তুমি কিন্তু নিশ্চয় স্বীকার করবে প্রমীলা।"

"কী কথা?"

"গত দুবারের স্বপ্ন দেখার আমি শুধু জানান্-ই দিয়ে গেছি; স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে তোমাকে বিব্রত করবার চেষ্টা করি নি।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "আপনার সে রুচিবোধের জন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ প্রদোষবাবু।"

প্রদোষ বললে, "ধন্যবাদ। কিন্তু এবারকার স্বপ্ন এমন যে, এবারকার স্বপ্নের বিবরণ দিলেই তুমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবে। তবে স্বপ্নের কাহিনী শুনে তোমার মুখে কৌতুক-রসের যে সুমিষ্ট হাসিটুকু ফুটে উঠবে, তা-ই হবে আমার-দেখা তোমার মুখের শেষ হাসি।"

পরম কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"কারণ, এর পর স্বপ্ন দেখে তোমাকে জানাতে এলে তা হবে ভূতের স্বপ্ন দিয়ে তোমাকে ভয় দেখানো।"

"তার মানে?"

"স্বপ্নের কাহিনী শুনলে তার মানে আপনিই বোঝা যাবে। বলব?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে প্রমীলা বললে, "বলুন।"

মনে মনে একটু কী ভেবে নিয়ে প্রদোষ বললে, "স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন রোগশয্যায় শুয়ে আছি; একজন ডাক্তার পাশে দাঁড়িয়ে স্টেথোস্কোপ নাড়তে নাড়তে বললে, আর আশা নেই।...আত্মীয়রা চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদছে। এমন সময়ে তুমি এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'শুনছেন? আপনি মরে যাচ্ছেন।' ...আমি বললাম, হ্যাঁ, সেই রকমই তো শুনছি'। তার উত্তরে তুমি বললে, 'আপনি মরছেন, কিন্তু আমি বাঁচলাম'।...ঘুম ভেঙে দেখি, কাক-কোকিল ডাকছে। ভারি মজার স্বপ্ন, নয় প্রমীলা? —এ কাহিনীতে কিন্তু তোমার বিব্রত হবার মতো কোনও ঘটনা নেই।"

প্রমীলা কোনও উত্তর দিলে না।

একটু চুপ করে থেকে প্রদোষ বললে, "স্বপ্ন অবশ্য স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই

নয়,—কিন্তু তাই বলে স্বপ্নকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। একজনের নিশ্চেতন মনের গভীর চিন্তা অথবা বাসনা অপর একজনের নিশ্চেতন মনে প্রতিফলিত হয়ে হয়তো স্বপ্ন দেখায়।"

এ কথারও প্রমীলা উত্তর দিলে না।

ছয়

পরদিন সকালে প্রদোষ চা পানান্তে খবরের কাগজ খুলে বসেছে, এমন সময়ে প্রমীলার ভাই ভোলা এসে পাশে দাঁড়াল।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ভোলাকে দেখে সহাস্যমুখে প্রদোষ বললে, "কী ভোলা, কী খবর?"

ভোলা বললে, "আজ সন্ধ্যার সময়ে দিদি আপনাকে একবার যেতে বলেছেন।"

"আমাকে যেতে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, আপনাকে।"

"ঠিক শুনেছ?"

"ঠিক শুনেছি।"

"কী নাম বল দেখি আমার?

নিঃশব্দে হাসির দ্বারা এই পরিহাসমূলক উত্তর দিয়ে গমনোদ্যত হয়ে ভোলা ফিরে তাকিয়ে বললে, "নিশ্চয় যাবেন, নইলে দিদি রাগ করবেন।"

যথাকালে প্রমীলার নিকট উপস্থিত হয়ে প্রদোষ বললে, "বিনা-স্বপ্নে আসার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, কারণ তোমার তলব পেয়ে এসেছি।"

প্রমীলা বললে, "বিনা স্বপ্নে আপনি আসেন নি।"

গভীর বিস্ময়ে প্রদোষ বললে, "আসি নি? কেন বল দেখি?"

"বসুন, বলছি।"

একটা চেয়ার টেনে বসে সকৌতূহলে প্রমীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রদোষ বললে, "বল।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রমীলা বললে, "কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি।"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রদোষ বললে, "তুমি স্বপ্ন দেখেছ? কী স্বপ্ন দেখেছ?"

প্রমীলার মুখমণ্ডল টকটকে হয়ে উঠল। একবার প্রদোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নতমুখে সে বলতে লাগল, "স্বপ্ন দেখেছি, যেন বিয়ে-বাড়ি, হৈ-চৈ হচ্ছে, বাজনা-বাদ্যি বাজছে···আমি কনে সেজে আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বসে আছি। এমন সময়ে শাঁখ বাজল,···বর এলেন আপনি। আর···আর···আমি উঠে দাঁড়িয়ে আপনার গলায়···"

"মালা দিলে ?"

"দিলাম।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে প্রদোষ বললে, "কিন্তু স্বপ্নের প্রসঙ্গকে আমরা তো মিথ্যা বলে সন্দেহ করি প্রমীলা ?"

আরক্তমুখে প্রমীলা বললে, "মিথ্যা হলেও সে মিথ্যার মূল্য আছে।"

উত্তেজনার বশে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রদোষ বললে, "আছে ? … আছে প্রমীলা ?—তা হলে কি শেষ পর্যন্ত তোমার মনে প্রেরণা জাগল ?"

প্রদোষের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত করে নতনেত্রে মৃদুস্বরে প্রমীলা বললে, "বোধ হয়।"

সবুজ মাঠ

এক

বেলা তখন সাড়ে আটটা। একটা প্রয়োজনীয় কাগজ খুঁজে বার করবার জন্য দিলীপ তার কাগজ-পত্রের চামড়ার বাক্সটা তোলপাড় করছে। এমন সময়ে অমিতা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

অপাঙ্গে অমিতাকে একবার দেখে নিয়ে মনে মনে বেশ-একটু খুশি হয়ে দিলীপ বললে, "এস অমিতা, বস।" তার পর পুনরায় নূতন উৎসাহে কাগজ অন্বেষণের কার্যে প্রবৃত্ত হলো।

পাশের একটা চেয়ারে উপবেশন করে অমিতা বললে, "তোমাকে অভিনন্দিত করতে এলাম দিলীপদা।"

অন্বেষণ-কার্যে লিপ্ত থেকেই দিলীপ এ কথার উত্তর দিলে ; বললে, "কেন, চাকরি পেয়েছি বলে ?"

অমিতা বললে, "হ্যাঁ, সেই জন্যেই।"

মৃদু হেসে দিলীপ বললে, "ব্যবসা করলাম না, বাণিজ্য করলাম না—সেই চিরন্তন চাকরির খাতায় নাম লিখিয়ে 'ভবদীয় অনুগত ভৃত্য' হলাম, এর জন্যে আমাকে তিরস্কৃত না করে অভিনন্দিত করতে এসেছ অমিতা ? যাই বল না কেন, আমি কিন্তু তোমার রুচির সুখ্যাতি করতে পারলাম না।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অমিতা বললে, "তবুও আমি তোমাকে অভিনন্দিত করছি। বিলেত থেকে এসে ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিতে না দিতে দিন-দশেকের মধ্যে একেবারে দেড় হাজার টাকা মাইনে—একে তুমি 'ভবদীয় অনুগত ভৃত্য' বল ? ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলছিলে, কিন্তু শুনছি, কলকাতার

প্রসিদ্ধ ব্যবসাপতি সুরেশ রায় তোমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবার জন্তে হেন চেষ্টা-চরিত্র নেই, যা করছেন না।"

কাগজপত্র নাড়তে নাড়তে ঈষৎ গভীর স্বরে দিলীপ বললে, "সে কথাও শুনেছ? কার কাছে শুনলে? সুরেশ রায়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কস ম্যানেজারের কাছে?"

মৃদু হেসে অমিতা বললে, "তা ছাড়া আর কার কাছে শুনব?"

সুরেশ রায়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কস ম্যানেজার বিমল অমিতার বড় ভাই এবং দিলীপের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

দিলীপ বললে, "চেষ্টা-চরিত্রের কথা কী রকম শুনছ, শুনি?"

অমিতা বললে, "শুনছি, সুরেশ রায়ের আবেদন মঞ্জুর হলে তুমি পাবে হাজার পঞ্চাশ টাকার যৌতুক। আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কস ম্যানেজার ঘটক-বিদায় পাবেন চীফ ওয়ার্কস ম্যানেজারের পদ। দুই বন্ধুরই হবে জয়-জয়কার।"

একটু চুপ করে থেকে দিলীপ বললে, "সে কথা একশো বার সত্যি। লোভনীয় প্রস্তাব! শুনে পর্যন্ত মনটা সর্বদা কেমন যেন খুশী-খুশী হয়ে আছে। ভাবছি কী জান অমিতা?"

"কী ভাবছ?"

"ভাবছি, জিনিসপত্র আর নগদ টাকায় পঞ্চাশ হাজার টাকা না নিয়ে সব টাকা নগদে নিলেই ভালো হয়। নগদ টাকা যত সহজে সুদ প্রসব করতে পারে, জিনিসপত্র তত সহজে পারে না।"

"তার মানে?"

"তার মানে, নগদ টাকা সরাসরি ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া চলে; কিন্তু চেয়ার-টেবিল ব্যাঙ্কে জমা দিতে হলে প্রথমে তা বিক্রি করে নগদ টাকায় পরিণত করতে হয়। অর্থাৎ—"

সহসা দিলীপ থেমে গেল, অর্থাৎ বলবার আর সময় হলো না। ব্যস্ত হয়ে সে একটা লম্বা খাম খোলবার অভিপ্রায়ে খামের কাটা মুখের উপর ফুঁ দিতে লাগল।

অমিতা বললে, "অর্থাৎ—কি? বললে না?"

খামের ভিতর থেকে এক খণ্ড কাগজ বের করে প্রসন্ন মুখে দিলীপ বললে, "অর্থাৎ, বেঁচে গিয়েছি। যা খুঁজছিলাম, তা পেয়েছি। না পেলে হয়েছিল আর কি! এখনই দেরাজগুলোও হাতড়াতে হতো।"

অমিতা বললে, "তুমি কিন্তু ভারি অগোছালো মানুষ দিলীপদা!"

দিলীপ বললে, "চিরকাল। এ বদ অভ্যাস আর গেল না। দেখ বরাতক্রমে সুরেশ রায়ের মেয়ে যদি একটু গোছালো প্রকৃতির হয়, তা হলে আমার অগোছালোপনার কতকটা কাটান হতে পারবে।"

অমিতা জিজ্ঞাসা করলে, "সুরেশ রায়ের মেয়েকে তোমার পছন্দ হয়েছে ?"

অল্প একটু চিন্তা করে দিলীপ বললে, "তা হবে না কেন, অপছন্দ হবার তো কিছু নেই, এক ঐ নামটুকু ছাড়া।"

অমিতা বললে, "কেন, মঞ্জরিকা তো বেশ আধুনিক নাম।"

দিলীপ বললে, "হোক আধুনিক, একে চার-অক্ষুরে, তার ওপর ঞ্জ জড়িয়ে একটা যুক্তাক্ষর।"

"তুমি ক-অক্ষুরে নাম পছন্দ কর ?"

"আমি পছন্দ করি তিন-অক্ষুরে নাম। দু-অক্ষুরে নেহাত ছোট, আর চার-অক্ষুরে একটু বড়।"

অমিতা বললে, "মৃণাল তিন-অক্ষুরে নাম,—পছন্দ হয় ?"

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে দিলীপ বললে, "একেবারেই না। ম-এ ঋকার মৃ উচ্চারণ করার মধ্যে বেশ একটু বেগ পেতে হয়।"

তবে কি রকম তিন-অক্ষুরে নাম তোমার পছন্দ ?"

দিলীপ বললে, "এই ধর, নমিতা। খাসা নাম! শান্ত, সহজ, মসৃণ। ডাকতে কেমন মিষ্টি লাগে।"

অমিতা বললে, "বিয়ের পরে মঞ্জরিকা বদলে নমিতা রেখো।"

দিলীপ বললে, "সে যথাকালে যা-হোক একটা ব্যবস্থা করলেই হবে, উপস্থিত তুমি আমার একটু উপকার করবে অমিতা ?"

সকৌতূহলে অমিতা জিজ্ঞাসা করলে, "কী উপকার ?"

"আমার এই অত্যন্ত অগোছালো বাক্সটা গুছিয়ে দেবে ? অদরকারী কাগজপত্রগুলো ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নির্বাসন দিয়ে দরকারীগুলো একটু সাজিয়ে রাখা,—এই আর কি! অর্থাৎ, অফিস আদালতে যাকে weeding of records বলে, ঠিক সেই কাজ। তুমি আমার weeding officer হবে ?"

অমিতা বললে, "এ কাজটা মঞ্জরিকার জন্যে মুলতুবি থাক না ?"

মৃদু হেসে দিলীপ বললে, "সে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই,—এ ধরনের কাজ করবার সুযোগ ভবিষ্যতে বহুবার আমি সৃষ্টি করতে পারব। গোছালো জিনিসকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অগোছালো করে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে আমার আছে। করবে ?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে অমিতা বললে, "না দিলীপদা, এ আমি পারব না। কোন্ কাগজ তোমার দরকারী, আর কোন্গুলো অদরকারী,—তা আমি কেমন করে বুঝব ?"

দিলীপ বললে, "যেটুকু বুদ্ধি আর বিবেচনা তোমার আছে, তাই দিয়েই বুঝবে। যে-কাগজগুলো অদরকারী বলে তুমি বাতিল করবে, আমি জানব সেইগুলোই অদরকারী; আর যেগুলো তুমি দরকারী বলে গুছিয়ে রাখবে, সেইগুলোকেই আমি দরকারী বলে মেনে নোব।"

অমিতা বললে, "তা হলে বুঝেছি, তোমার সব কাগজই অদরকারী।"

অমিতার কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠে দিলীপ বললে, "না না। সর্বনাশ। বাক্সটা যেন একেবারে উজাড় করে তোমার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে ঢেলে দিয়ো না। অনেক দরকারী কাগজও ওর মধ্যে আছে।"

অমিতা বললে, "তা হ'লে আমি শুধু জুতোর মাপ আর বাজারের ফর্দ জাতীয় কাগজগুলোকেই অদরকারী সাব্যস্ত করে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলব।"

অমিতার কথা শুনে প্রসন্নমুখে দিলীপ বললে, "তথাস্তু। তাই করলেই হবে।" তার পর বাক্সটা বন্ধ করে চাবির রিং থেকে চাবিটা খুলে অমিতার হাতে দিয়ে বললে, "তুমি বাড়ি পৌঁছবার মিনিট দশেকের মধ্যে রামদীন বাক্সটা নিয়ে গিয়ে তোমাকে দিয়ে আসবে।"

অমিতা বললে, "চাবি আমাকে দিয়ে দিলে, বাক্স খোলবার দরকার হবে না তোমার?"

দিলীপ বললে, "দরকার হলে অসুবিধে হবে না, আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে।"

প্রস্থানোদ্যত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে অমিতা বললে, "আমার বিচার কিন্তু নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে।"

দিলীপ বললে, "ষোল-আনা নির্বিচারে গ্রহণ করব।"

অমিতা প্রস্থান করলে একটা দেরাজ থেকে দিলীপ একখানা চৌকো খাম বার করলে। একটা পেপার ক্লিপ দিয়ে খামখানা বন্ধ। তারপর ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে চামড়ার বাক্সটা খুলে সেই খামখানা কাগজপত্রের অবিন্যাসের এক জায়গায় গুঁজে রেখে বাক্স বন্ধ করে রামদীনকে দিয়ে বাক্সটা অমিতাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে।

দুই

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর অমিতা নিজ কক্ষে একান্তে দিলীপের বাক্স খুলে বসল। মনের মধ্যে তার অননুভূতপূর্ব উত্তেজনার মৃদু আমেজ। একজন দেড় হাজার টাকা বেতনের উচ্চ কর্মচারীর কাগজপত্রের ভাগ্য নিরূপণের সে আজ চরম নিয়ন্ত্রী। যে কাগজকে সে অপ্রয়োজনীয় বলে নিন্দিত করবে, সে কাগজ আজ জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায় অথবা আগুনে ছাই করাও চলে। প্রভুর অধিকারের চতুঃসীমা হতে তার চিরনির্বাসন। যে কাগজকে সে দরকারী বলে সাব্যস্ত করবে, অন্তত উপস্থিত মতো বিলোপের হাত থেকে সে কাগজ বেঁচে গেল।

অমিতা তার দু দিকে দুটো পেপার-ওয়েট স্থাপন করলে। ডান দিকের পেপার-ওয়েটের তলায় জমবে দরকারী কাগজপত্র; বাম দিকে অদরকারী। অর্থাৎ

ডান দিকে দাক্ষিণ্যের স্বীকৃতি, বাম দিকে বিমুখতার নিদর্শন।

প্রথমেই হাতে উঠল লণ্ডনের কোন পুস্তকালয়ের একটা ক্যাশমেমো। অবিলম্বে অমিতা সেটা বাম কাগজ-চাপার তলায় স্থাপিত করলে। অর্থাৎ, ক্যাশমেমো বিতাড়িত হলো বাজে কাগজের দ্বীপান্তরে। তারপর উঠল লীড্‌স থেকে লণ্ডনে কোনও বন্ধুকে লেখা চিঠির খসড়া। ক্ষণকাল তার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে অমিতা সেটাকে ডান পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দিলে। অর্থাৎ খসড়া লাভ করলে কাজের জিনিসের ছাপ। এইরূপে দরকারী অদরকারী বাছাই হতে হতে বাম পেপার-ওয়েট যখন দক্ষিণ পেপাব-ওয়েটের চেয়ে ইঞ্চি সাতেক উঁচু হয়ে উঠেছে, তখন হাতে উঠল সেই ক্লিপ দিয়ে আঁটা খাম। মুহূর্তের জন্য মনের মধ্যে দ্বিধা উপস্থিত হলো, অমন বিশেষ ভাবে বন্ধ করা খামের ভিতরকার বস্তু তার পক্ষে দেখা উচিত হবে কি না। কিন্তু তখনই মনে হলো নির্বাচন করার যে অধিকার দিলীপের কাছ থেকে সে পেয়েছে, তা অকুণ্ঠ, অবারিত,—কোনও প্রকার বিধিনিষেধের দ্বারা তা খণ্ডিত নয়।

ক্লিপ খুলে খামের ভিতর থেকে যে বস্তু নির্গত হলো, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে অমিতার মুখ হয়ে উঠল রঞ্জিত, ললাটে কুঞ্চিত রেখা দেখা দিল। নির্নিমেষ নেত্রে ক্ষণকাল কাগজখানার উপর তাকিয়ে থেকে কেমন যেন তাব মনে হতে লাগল, এ ফোটো বিবাহিত মেয়ের নিরুদ্বেগ ফোটো কিছুতেই নয়, ফোটো তোলবার সময়ে এর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে দুর্লক্ষ্য আকৃতি আশ্রয় নিয়েছে, তা অবিবাহিত মেয়ের পাত্র-শিকার করবার আকৃতি। ফোটোখানার সামনে অথবা পিছন দিকে কোথাও এমন কিছুই লিখিত নেই, :যা থেকে কার ফোটো এবং কবে তোলা, তা বোঝা যায়।

ফোটোগ্রাফখানা খামের মধ্যে পুরে ক্লিপ এঁটে ক্ষণকাল অমিতা নিবিষ্ট মনে কী ভাবলে, তারপর খামখানা দক্ষিণ কাগজ-চাপার তলায় দরকারী কাগজের তাড়ায় রাখতে গিয়ে বাম পেপার-ওয়েটের তলায় চাপা দিলে। অন্যমনস্কভাবে দু-চারখানা কাগজপত্র ছাঁটাই-বাছাই করতে করতে সহসা মুহূর্ত কাল স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করে সে বাম পেপার-ওয়েটের তলা থেকে খামখানা পুনরায় বার করলে। তার পর ফোটোর পিছন দিকে সুস্পষ্টাক্ষরে 'নমিতা' লিখে তার পাশে একটি প্রশ্নের চিহ্ন বসিয়ে দিলে। খামের মধ্যে ফোটো পুরে এরার আর বাম পেপার-ওয়েটের তলায় না রেখে দক্ষিণ পেপার-ওয়েটের তলায় স্থাপন করলে।

ছাঁটাই-বাছাইয়ের কাজ একেবারে শেষ হয়ে গেলে অমিতা নির্বাচিত দরকারী কাগজগুলো কয়েকটা শ্রেণী-বিভাগে বিভক্ত করে ফিতা দিয়ে সুচারু ভাবে বেঁধে বেঁধে বাক্সর মধ্যে গুছিয়ে রাখলে।

বাক্স ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্ম সে রামদীনকে বেলা পাঁচটার সময়ে আসতে বলেছিল। যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে রামদীন বাক্স নিয়ে গেল।

তিন

সন্ধ্যা তখন সাতটা। অমিতাদের বাড়ি উপস্থিত হয়ে দিলীপের প্রথমেই সাক্ষাৎ হলো বিনয়ের সঙ্গে। বিনয় অমিতার ছোট ভাই।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলে, "বিমল কোথায় বিনয়?"

বিনয় বললে, "দাদা এখনও অফিস থেকে ফেরেন নি।"

বিস্মিত কণ্ঠে দিলীপ বললে, "এখনও ফেরে নি? মা কোথায়?"

"মেজদির দেওরের অসুখ, মা দেখতে গেছেন।"

"অমিতা কোথায়?—সেজদি?"

এ কথার উত্তর বিনয় না দিয়ে দিলে আর এক জন, বললে, "সেজদি তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে।"

চকিত হয়ে দিলীপ পিছনে তাকিয়ে দেখে, অমিতা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। দিলীপের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে কোন সময়ে সে অলক্ষিতে দিলীপের পিছনে এসে হাজির হয়েছে বোঝা যায় নি।

অমিতা বললে, "চল, ঘরে চল।"

ঘরে গিয়ে উভয়ে একটা গোল টেবিলের দু ধারে সামনা-সামনি দুটো চেয়ারে উপবেশন করলে। কিসের যেন একটা সঙ্কোচ বশত অমিতা দিলীপের সঙ্গে চোখাচোখি এড়াবার জন্য নতনেত্রে টেবিলের উপরিস্থিত একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। কিন্তু নতনেত্রে থেকেও সে যেন অনুভব করছিল, দিলীপ তার দিকে চেয়ে আছে। একবার চোখ তুলতেই সে দেখলে, শুধু চেয়েই নেই, মুখ টিপে টিপে হাসছে।

হেসে ফেলে অমিতা বললে, "হাসছ যে বড়?"

দিলীপ বললে, "হাসছি, তোমার দুর্বলতার কথা মনে করে।"

"কেন, কিসে আমার দুর্বলতা দেখলে?"

স্মিত মুখে দিলীপ বললে, তোমার 'নমিতা' লেখায়।" তারপর ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগল, "আচ্ছা, লিখলেই যখন 'নমিতা', অত কাছাকাছিই যখন গেলে, তখন একেবারে অমিতা লিখে লক্ষ্যভেদ করবার সৎসাহস দেখালে ক্ষতিটা কী হতো?"

ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে অমিতা বললে, "পরের কোটোয় নিজের নাম লিখব?"

দিলীপ বললে, "আহা-হা, পরের কোটোয় কেন লিখবে? পরের কোটোটা বাতিল করে ফেলে দিয়ে তোমার নিজের একটা কোটোয় 'অমিতা' লিখলে কে তোমাকে দোষ দিত?"

নিমেষের জন্য দিলীপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আরক্ত-স্মিত মুখে অমিতা বললে, "মঞ্জরিকা দিত।"

গভীর স্বরে দিলীপ উত্তর দিলে, "সত্যি! পঞ্চাশ হাজার টাকা মাঠে মারা গেল। কিন্তু যে-মাঠে মারা গেল, সে-মাঠ ফুল-ফোটা পাখি-ডাকা সবুজ ঘাসের মাঠ।" বলে হাসতে লাগল।

আষাঢ় ১৩৫৬

নতুন লেখক

এক

সম্প্রতি বাংলা দেশে ধূমকেতু নামে একটি মাসিকপত্রের আবির্ভাব হয়েছে। আবির্ভাবটা হয়েছেও ঠিক আকাশের ধূমকেতুরই মতো। অকস্মাৎ একদিন, প্রায় বিনা নোটিসেই, বাংলা মাসিকপত্র-গগনের একটা দিক উজ্জ্বল করে ধূমকেতুর আবির্ভাব হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সে আকাশের চন্দ্র-তারা মাসিকপত্রগুলো নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

সম্পাদক ডক্টর সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটা ডিগ্রী সম্মানের সহিত অধিকার করে সাত বৎসর ইউরোপে বাসের ফলে নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত হয়ে সে দেশে ফিরেছে। কিন্তু শুধু সুপণ্ডিত হয়েই ফেরে নি, পাণ্ডিত্যের চেয়েও দুর্লভ বস্তু, নির্ভুল তীক্ষ্ণ সাহিত্যবোধ আর তীব্র সাহিত্যপ্রীতি নিয়ে ফিরেছে।

ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবেদনে সমরেশ লিখেছিল, হিন্দুশাস্ত্র মতে ধূমকেতু অশুভ গ্রহ; কিন্তু অশুভকে বাদ দিয়ে জগৎ চলে না, আমাদের জীবনও চলে না। অশুভ হলেও ধূমকেতু তামস নয়, জ্যোতিষ্মান্। তা ছাড়া, ধূমকেতুর ন্যায় অকস্মাৎ একদিন আবির্ভূত হয়ে ধূমকেতু এক দিক দিয়ে তার নাম কতকটা সার্থক করেছে, আবার ভবিষ্যতে কোনও একদিন সে যদি অকস্মাৎ দৃষ্টিপথের অন্তরালে চ'লে যায়, সে দিনও তার নাম অসার্থক হবে না।

সমরেশ নিষ্ঠাবান কড়া সম্পাদক। প্রত্যেক লেখাটি সে নিজে পড়ে, আর 'ক' 'খ' 'গ' তিন শ্রেণীতে লেখাগুলি চিহ্নিত করে। 'ক'-চিহ্নিত লেখা ফেরত যাবে না, সময়মতো ধূমকেতুতে প্রকাশিত হবে; 'খ'-চিহ্নিত লেখা ফেরত যাবে, কিন্তু অপর পত্রে ব্যবহৃত হতে পারে; 'গ'-চিহ্নিত লেখা অব্যবহার্য পদার্থ, রদ্দি মাল।

সমরেশের এই শ্রেণী বিভাগের কথা, যে-রকম করেই হোক, বাজারে প্রচারিত হয়ে গেছে। 'খ'-চিহ্নিত করার মধ্যে যে ঔদ্ধত্য নিহিত আছে, সে জন্য অপর পত্রের সম্পাদকেরা তার ওপর বিশেষ খাপ্পা। কোনও লেখাকে সমরেশ 'খ'-চিহ্নিত করেছে জানতে পারলে তারা কিছুতেই সে লেখা নিজেদের কাগজে প্রকাশিত করে ধূমকেতুর নিম্নবর্তী হতে চায় না।

দুই

অন্য স্থানে স্বতন্ত্র কার্যালয় থাকলেও, সমরেশের গৃহে একতলার এক কক্ষে একটি ক্ষুদ্র সম্পাদকীয় অফিস আছে। লোকের ভয়ে সাধারণত সমরেশ একতলার ঘরে বসে কাজ করে না, দোতলাতেই করে। যে এসে একবার বসে, সে তো সহজে ওঠবার নাম করে না, সুতরাং দু ঘণ্টা একতলার ঘরে বসলে তার দেড় ঘণ্টাই বোধ হয় বৃথাই অপচয়িত হয়।

একদিন সকাল নটা আন্দাজ সে নিচের ঘরে একটা পাণ্ডুলিপি নিতে এসেছে, এমন সময়ে কক্ষে প্রবেশ করল এক যুবক, দক্ষিণ হস্তে খবরের কাগজ মোড়া সম্ভবতঃ পাণ্ডুলিপি। আয়তন ভীতিপ্রদ নয়।

সমরেশকে যুক্তকরে নমস্কার করে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি—"

কথা শেষ হতে না দিয়ে সমরেশ বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সম্পাদক।"

"একটা লেখা এনেছিলাম।"

"রেখে যান। কী পদার্থ ওতে আছে?"

স্মিতমুখে যুবক বললে, "উপন্যাস।"

"আপনার নিজের লেখা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কী নাম আপনার?"

"সুধাকর চট্টোপাধ্যায়।"

"প্রথম উদ্যম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"রেখে যান। দিন দশেক পরে খবর নেবেন।"

পাণ্ডুলিপিখানা টেবিলের উপর স্থাপন করে ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে সুধাকর বললে, "একটা কথা বলব সম্পাদক মশায়?"

ঈষৎ গম্ভীর স্বরে সমরেশ বললে, "সংক্ষেপে যদি বলেন, আপত্তি নেই।"

সুধাকর বললে, "সংক্ষেপেই বলব! বাজারে আপনার একটু দুর্নাম আছে ডক্টর ব্যানার্জি।"

সমরেশ বললে, "লোক যখন অসৎ তখন দুর্নাম থাকা আশ্চর্য নয়,—তবু কী দুর্নাম শুনি?"

সুধাকর বললে, "অসৎ লোকের দুর্নাম আপনার নয়; আপনার দুর্নাম খ্যাতনামা লেখক ভিন্ন আর কোনও লেখা আপনি প্রকাশ করেন না।"

সমরেশ বললে, "তার জন্যে দুর্নাম অখ্যাত লেখকদেরই হওয়া উচিত। তারা যদি প্রকাশ করবার উপযুক্ত লেখা লিখতে না পারে, তার জন্যে আমার দুর্নাম কী করে, হয় তা বলুন"

এ তর্কে প্রবৃত্ত না হয়ে সুধাকর বললে, "আমার লেখা আপনি সবটা পড়বেন তো ডক্টর ব্যানার্জি?"

সমরেশ বললে, "সবটা পড়বার মতো যদি লিখে থাকেন তা হলে সবটা অবশ্যই পড়ব। কিন্তু পাতা দুই পড়বার পর যদি বুঝতে পারি বাকি অংশে অসম্ভব ঘটবার কোনও সম্ভাবনা নেই, তা হলে সবটা পড়ার কোনও মানে থাকবে কি?... কিন্তু এ প্রশ্ন আপনার মনে উদয় হলো কেন?"

সুধাকর বললে, "প্রথমত, আমার নাম জিজ্ঞাসা করে দেখলেন কোনও বিখ্যাত নাম নয়; দ্বিতীয়ত, এইটে যে আমার প্রথম উদ্যম, সে কথাও জেনে নিলেন। এই দুই কারণে ও-প্রশ্ন আমার মনে উদয় হয়েছিল।"

যে পাণ্ডুলিপিখানা নিতে এসেছিল সেটা, আর সুধাকরের পাণ্ডুলিপি—দুখানা পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সমরেশ বললে, "এর পরও যদি আমরা আলোচনা চালাই তা হলে সংক্ষেপের সীমা নিশ্চয়ই পেরিয়ে যাবে।"

"তা নিশ্চয় যাবে।" বলে সমরেশকে নমস্কার করে সুধাকর প্রস্থান করলে।

তিন

দিন দশেক পরে খবর নেওয়ার কথা ছিল, ঘটনাক্রমে ঠিক দশম দিনে সুধাকরকে ধূমকেতু অফিসের কাছাকাছি আসতে হয়েছিল। হিসাবমতো 'দিন দশেক পরে' তখনও ঠিক হয় নি। কিন্তু 'দিন দশেক' আর 'দশ দিন' একেবারে এক বস্তু নয়। ন' দিনকে দিন দশেক বললে খুব বেশি অন্যায় করা হয় না।

মনে মনে এইরূপ যুক্তি করে সুধাকর ধূমকেতু অফিসের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো। দ্বার খোলাই ছিল, অফিস-ঘরে প্রবেশ করে দেখলে, কেউ নেই। টেবিলের উপর কলিং বেল ছিল, বেল বাজিয়ে শব্দ করলে।

একটি বিশ-বাইশ বৎসর বয়সের যুবক এসে উপস্থিত হলো।

সুধাকর বললে, "ডক্টর ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমার একটা লেখা তাঁর কাছে আছে।"

যুবকটি বললে, "কিন্তু তিনি তো এখন বাড়ি নেই। অন্য কোনদিন আসবেন।"

"কখন ফিরবেন, তা কিছু বলতে পারেন?"

"না, তার কোন স্থিরতা নেই। বৈকালের দিকে অফিসে গেলে দেখা হতে পারবে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুধাকর বললে, "আপনার নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

যুবকটি বললে, "আমার নাম অমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"সম্পাদক মহাশয়ের পুত্র?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"অফিসে যাওয়ার সুবিধা হবে না, দিন তিনেক পরে আবার একদিন আসব।" ব'লে যুক্তকরে অমরেশকে নমস্কার ক'রে সুধাকর প্রস্থান করলে।

পথে পদার্পণ ক'রেই কিন্তু ক্রোধে তার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্ব'লে উঠল। ডক্টর ব্যানার্জি বাড়ি নেই. ব'লে অমরেশ তাকে তাড়ালে, অথচ দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং ডক্টর ব্যানার্জি পথের একজন লোকের সঙ্গে কথা কইছে। শিক্ষিত লোক হয়ে এই ঘৃণিত প্রতারণা, এই নির্লজ্জ মিথ্যাচারিতা!

একবার মনে হলো, ফিরে গিয়ে অমরেশকে ডাকিয়ে এনে আচ্ছা ক'রে একটা ঝগড়া বাধিয়ে আসে, কিন্তু এরূপ উত্তেজনার মুহূর্তে মাত্রা হয়তো ঠিক বশীভূত থাকতে পারবে না সেই বিবেচনায় গৃহের দিকে অগ্রসর হলো।

কতকটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে আলগা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে একবার মাত্র সে দোতলার জানলার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। অপরিসীম ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে আর দ্বিতীয়বার সে-দিকে দৃষ্টিপাত করলে না,—নমস্কার অথবা অপর কোনপ্রকার অভিবাদন ইঙ্গিত তো দূরের কথা।

ধূমকেতুতে সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নবীন লেখকদের লেখা প্রকাশিত করে না, তজ্জনিত সুধাকরের মনের মধ্যে যে বিদ্বেষ-ইন্ধন বর্তমান ছিল, তার উপর নূতন ক্রোধের স্ফুলিঙ্গপাত হয়ে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলতে জ্বলতে সুধাকর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হলো।

চার

দিন তিনেক পরে একদিন আসবে ব'লে সুধাকর অমরেশকে জানিয়ে এসেছিল, কিন্তু তিন দিন অপেক্ষা করবার ধৈর্য সে খুঁজে পেলে না। পরদিন সকালেই যুযুৎসু মন নিয়ে সমরেশের গৃহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

সম্পাদকের কক্ষ পর্যন্ত পথ অবারিত ছিল। অফিস-ঘরে প্রবেশ ক'রে সুধাকর থমকে গেল। যে সৈনিকের সঙ্গে তাকে প্রথমে যুদ্ধ করতে হবে, তার অস্ত্র-শস্ত্র একেবারে স্বতন্ত্র ধরনের; তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার রণকৌশলে সে ঠিক অভ্যস্ত নয়। মাথায় তার একরাশ ভ্রমরকৃষ্ণ শিরস্ত্রাণ।

তথাপি নিজের সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে নিয়ে ঈষৎ গম্ভীর স্বরে সে বললে, "নমস্কার।"

সম্পাদকের টেবিলের সামনে ব'সে সতের-আঠার বৎসর বয়সের একটি সুশ্রী সুন্দরী মেয়ে কয়েকখানা চিঠি লিখছিল, মুখ তুলে চেয়ে দেখে বললে, "নমস্কার। বসুন।"

চেয়ারে উপবেশন ক'রে সুধাকর জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি ধূমকেতুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?"

পিন দিয়ে দুটো কাগজ আঁটতে আঁটতে মেয়েটি বললে "একটু।"

"আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

"আমার নাম অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়; আমি ডক্টর ব্যানার্জির কন্যা।" তারপর একটা কাগজ চাপা দিয়ে পিনে আঁটা কাগজ দুটো চেপে রেখে সুধাকরেব প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সে প্রশ্ন করলে, "কী চাই আপনার?"

"একটা অকপট সংবাদ।"

"কী বলুন?"

"ডক্টর ব্যানার্জি বাড়ি আছেন কি না, সেই সংবাদ।"

"আছেন।"

"আছেন? পরম সৌভাগ্য আমার!"

ডক্টর ব্যানার্জীকে বাড়িতে পাওয়া যার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা, এমন লোক থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু তেমন লোকের কথার সুর আলাদা, বলার তাল অন্যরূপ। সুধাকরের কথার মধ্যে যেন টিটকারির সূক্ষ্ম গিটকিরি। সেটুকু উপলব্ধি করতে অমিয়ারও ভুল হলো না; চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে সে বলল, "পরম সৌভাগ্য কেন বলুন তো?"

সুধাকর বললে, "বাড়িতে থেকেও তিনি কোনোও কোনোও দিন থাকেন না কি-না, তাই বলছি।"

"এমন অভিজ্ঞতা আপনার আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। কাল সকালে এসেছিলাম ডক্টর ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে, অমরেশ বাবু বললেন, তিনি বাড়ি নেই। পর-মুহূর্তে পথে বেরিয়ে দেখি, পথের একজন লোকের সঙ্গে আপনার বাবা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছেন। ভাগ্যক্রমে আজ আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আসল কথাটা জানতে পারলাম; অমরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হলে তিনি হয়তো বলতেন, বাড়ি নেই।"

অমিয়া বললে, না, আজ দাদাও বলতেন, বাড়ি আছেন; আর কাল আমার সঙ্গে দেখা হলে আমিও বলতাম, বাড়ি নেই।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুধাকর বললে, "কেন বলুন তো?"

"কাল শেষ রাত্রি থেকে বাবা একটা লেখা পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। সে লেখাটা তাঁর এত ভালো লেগেছিল যে, নিরুপদ্রবে যাতে শেষ করতে পারেন সেই জন্যে আমাদের সকলকে বলে দিয়েছিলেন, কেউ দেখা করতে এলে যেন বলা হয়—বাড়ি নেই। এ 'বাড়ি নেই'য়ের অর্থ, বাড়িতে কারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার মতো অবসর নেই, কতকটা ইংরেজী নট-অ্যাট-হোমের মতো। কাজ করতে গেলে, মাঝে মধ্যে এই 'বাড়ি নেই'য়ের সাহায্য নেওয়া ভিন্ন অন্য উপায়ও থাকে না।"

সুধাকরের মন থেকে তখনও গতকল্যকার অপমানবোধ ও গ্লানি অপসৃত হয় নি। দৃঢ়স্বরে সে বললে, "ওরূপ ক্ষেত্রে বাড়ি নেই, এই মিথ্যা ভাষণ না করে, বাড়ি আছেন কিন্তু দেখা করবেন না—এই কথা বলাই উচিত।"

সুধাকরের কথা শুনে অমিয়ার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল; বললে, "তাতে জাত যাবে, কিন্তু পেট ভরবে না। একতলা থেকে দোতলায় এত স্লিপ যেতে থাকবে যে, তার উত্তর আর প্রত্যুত্তর দিতে দিতে বাবার লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যাবে। অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝা গেছে, 'বাড়ি নেই' ছাড়া উপায়ান্তর নেই। 'বাড়ি নেই' বললেও অবশ্য স্লিপ লেখা চলে, কিন্তু বাবার পক্ষে সে সব স্লিপের উত্তর দেওয়ার উপায় থাকে না।"

দৃঢ়কণ্ঠে সুধাকর বললে, "সে যাই হোক, যে অসত্য ভাষণ কাল আমার ওপর চালিয়েছিলেন, তা কোনও দিক দিয়েই সমর্থন করা যায় না।"

অকস্মাৎ অমিয়ার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সুধাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, "রসুন, রসুন, আপনি কাল এসেছিলেন, আপনার লেখার খবর নিতে?"

সুধাকর বললে, "হ্যাঁ।"

"আপনার নাম কী বলুন তো?"

"সুধাকর চট্টোপাধ্যায়।"

"আপনার লেখার নাম?"

"নূতন দিক।"

অমিয়ার মুখমণ্ডলে কৌতুকের মিষ্ট হাসি ফুটে উঠল। কতকটা যেন আপন মনেই সে বললে, "বেশ। যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর—এ ঠিক তাই হলো।"

তীব্র কৌতূহলে সুধাকর বললে, "তার মানে?"

"তার মানে, আপনারই উপন্যাস শেষ করবার জন্যে বাবা কাল ওই আদেশ দিয়েছিলেন।"

"শেষ করেছেন?"

"না করে উপায় ছিল কি?"

"কেমন লেগেছে ওঁর?"

"কেমন আবার লাগবে? 'ক'-চিহ্নে চিহ্নিত করেছেন,—একেবারে সর্বোচ্চ চিহ্ন।"

আগুনে সহসা জল পড়ল। সমস্ত অবয়ব, যা এ পর্যন্ত তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ ছিল, ভিজে ভিজে হয়ে এল। আর দৃষ্টিভঙ্গি এমন দ্রুত-পরিবর্তনশীল হয়ে উঠল, যা একমাত্র চক্ষুলজ্জার অবর্তমানেই হওয়া সম্ভব।

অমিয়া বললে, "এখন, অব্যাহতভাবে আপনার উপন্যাস যদি শেষ করতে হয় তা হ'লে ও-পন্থা অবলম্বন না ক'রে আর কী উপায় থাকতে পারে, বলুন?"

প্রথম মুহূর্তে মুখে বাধল; কিন্তু ঘরে তো তৃতীয় ব্যক্তির বালাই ছিল না,

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুধাকর বললে, "কোনও উপায় নেই। আমি যদি আপনাকে অসত্য কথা বলতে বাধ্য করি, তা হ'লে আপনার অপরাধ কোথায় বলুন ?"

অমিয়া বললে, "ঠিকই তো।"

সুধাকর বললে, "তা ছাড়া, কী সত্য আর কী যে অসত্য তা নির্ণয় করা অনেক সময়ে ভারি কঠিন ব্যাপার। আমার মনে হয়, যে-বস্তু শুভ ফল প্রসব করে, তাই সত্য; আর যা অশুভ করে তা মিথ্যা।"

অমিয়া বললে, "তা ছাড়া আর কী হতে পারে ? সুধাকরবাবু, আমি আপনার উপন্যাস পড়েছি।"

উল্লসিত মুখে সুধাকর বললে, "পড়েছেন ? সবটা ?"

স্মিতমুখে অমিয়া বললে, "খানিকটা প'ড়ে ফেলে রাখবার মতো আপনি লিখেছেন কি ? আগাগোড়া সব পড়েছি, কাল রাত দুটো পর্যন্ত জেগে। অদ্ভুত হয়েছে আপনার উপন্যাস। আপনার 'নূতন দিক' উপন্যাসে যে নূতন দিকের সন্ধান আপনি দিয়েছেন, সে দিকে চলা তো দূরের কথা, এতদিন নজরে পর্যন্ত আমাদের পড়ে নি। আপনার নায়িকা দুহিতার জন্যে ভারি দুঃখ হয়।"

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না। ব্যস্ত হয়ে সমরেশ কক্ষে প্রবেশ করলে। তাকে দেখে সুধাকর ও অমিয়া তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

সুধাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সমরেশ বললে, "এই যে আপনি এসেছেন। বসুন, বসুন।" তারপর অমিয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, "এঁকে বলেছ অমিয়া ?"

"বলেছি বাবা।"

সুধাকরকে সম্বোধন ক'রে সমরেশ বললে, "নূতন দিক' আমাদের কাছে রইল, নতুন লেখকের প্রথম উদ্যম ধূমকেতুতে প্রকাশিতও হয় সেই কথা প্রমাণ করবার জন্যে। আর একদিন আসবেন, আলাপ করা যাবে। আজ আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে,—কিছু দেরি হয়ে গেছে।"—ব'লে দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

সুধাকর দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমিও চললাম অমিয়া দেবী।"

দাঁড়িয়ে উঠে অমিয়া বললে, "একটু চা খেয়ে যান সুধাকরবাবু।"

সুধাকর বললে, "আজ নয়। এবার যেদিন আসব সেদিন খাব। আজ বাড়ি গিয়ে সোজা শয্যা নোব।"

বিস্মিত কণ্ঠে অমিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "ঘুমুবেন এখন ?"

"না, ঘুমুব না;—চিন্তা করব।"

"কিসের চিন্তা ?"

"এমনি, এদিক ওদিক সেদিক এলোমেলো,—যার না থাকবে মাথা না থাকবে মুণ্ডু। অর্থাৎ সোজা কথায় চিন্তাবিলাস।"—ব'লে সুধাকর হেসে উঠল।

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করব অমিয়া দেবী ?"

"করুন।"

"আপনি কী করেন ?"

"আমি ?—আমি ফিলসফিতে এম. এ. পড়ি।"

"আর তার সঙ্গে অবসরমতো ধূমকেতুর কাজ ?"

স্মিতমুখে অমিয়া বললে, "একটু একটু।" তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার কী পরিচয় সুধাকরবাবু ?"

সুধাকর গমনোদ্যত হয়েছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "আমার পরিচয় ? আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় আমি নতুন লেখক,—আর নিষ্ফল নতুন লেখক নই। আমার গাছে ফল ফলেছে, পাখি ডেকেছে। আচ্ছা, আসি।"

দ্বার পর্যন্ত অমিয়া সুধাকরকে এগিয়ে দিলে, এমন কি ক্ষণকাল তার গমনপথের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

বড় রাস্তায় প'ড়ে দেখা হয়ে গেল বাল্যবন্ধু রমেশের সঙ্গে।

সুধাকরের হাত চেপে ধ'রে উল্লসিত মুখে রমেশ বললে, "অভিনন্দিত করছি তোকে সুধাকর।"

হাসিমুখে সুধাকর বললে, "নতুন লেখককে ?"

মাথা নেড়ে রমেশ বললে, "নতুন লেখক-টেখক জানি নে, বিলেত থেকে ফিরেই দিল্লীতে অত বড় চাকরি পেলি, তাই।"

বেচুলাল

এক

তের শো যোল সালের আশ্বিন মাসের সকাল।

উমানাথ স্মৃতিরত্ন চলেছেন গৌরীদীঘির জমিদার-বাড়িতে গৃহদেবতা রাধা-বল্লভজীর নৈত্যিক পূজার জন্য। বংশানুক্রমে উমানাথরা গৌরীদীঘির জমিদারদের কুল-পুরোহিত।

জমিদার-বাড়ি যাওয়ার সোজা পথ পরিত্যাগ করে উমানাথ আজ একটু ঘুরে চলেছেন কৈবর্তপাড়ার পথ ধ'রে। গত ভাদ্র মাসের শেষের দিকে দিন-দুইব্যাপী নিরবসর ঝড়বৃষ্টির ফলে তাঁর গোহাল-বাড়ির একটা ঘর একেবারে পড়-পড় হয়েছে। বিপিন কৈবর্তের দ্বারা অবিলম্বে সেটার মেরামতের ব্যবস্থা করা দরকার।

বিপিনের গৃহ-সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উমানাথ দেখলেন, পনেরো-ষোল বৎসর বয়সের একটি নধর কৃষ্ণবর্ণ বালক উবু হয়ে বসে নিবিষ্ট মনে একটা বৃহৎ বাঁশের

ডালার দুই পাশে দড়ি বাঁধবার কার্যে রত। মনে হলো, গত বৎসর বর্ষাগমের পূর্বে ঘর ছাইবার সময়ে এই ছেলেটিই যেন একদিন বিপিনের সঙ্গে তাঁর গৃহে গিয়ে নানা প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি করেছিল।

বালকটির দিকে অল্প একটু অগ্রসর হয়ে উমানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ রে, তুই তো বিপিনের ছেলে?"

নিমেষের জন্য মুখ তুলে আগন্তুককে এক চাহন দেখে নিয়ে পুনরায় নিজের কার্যে নিবিষ্ট হয়ে বালক বললে, "তাই।"

"তাই মানে?"

"তাই মানে—এ তাই নয়।" ব'লে বালকটি দুই হাতে তালি দিয়ে কোন্ তাই নয়, তা দেখিয়ে দিলে।

বালকটির ধরণ-ধারণে মনে মনে ঈষৎ পুলকিত হয়ে উমানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে, তাই মানে কী?"

"তাই মানে বিপিনের ছেলে।"

মৃদু স্বরে উমানাথ বললেন, "বাপ রে! দুর্দান্ত নৈয়ায়িকের পাল্লায় পড়লাম দেখছি!"

উমানাথের কথা বুঝতে না পেরে বালকটি বললে, "কী বলছ, বুঝতে পারছি নে। জোরে বল।"

উমানাথ বললেন, "বলছি, কী নাম তোর?"

"আমার নাম বিন্দে।"

"বিন্দে, মানে বিনোদ তো?"

"তা বলতে পারি নে, সবাই বলে বিন্দে।"

"আচ্ছা বিন্দেই সই। বাড়ি থেকে তোর বাপকে ডেকে নিয়ে আয় দেখি শীগ্‌গির।"

দুই দিকের বাঁধনের দড়ি সমান দীর্ঘ হলো কি না পরীক্ষা ক'রে দেখতে দেখতে বিনোদ বললে, "বাপ বেরিয়ে গেছে, বাড়ি নেই।"

বিপিন বাড়ি নেই শুনে ঈষৎ দুঃখিত হয়ে উমানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় বেরিয়েছে রে?"

"জানি নে।"

"কোন্ দিকে গেছে?"

"জানি নে।"

"কখন আসবে?"

"জানি নে।"

নিরবচ্ছিন্ন "জানি নে"র পাষাণ-প্রাচীর ভেদ ক'রে কোন পরমার্থ লাভের আশা নেই বুঝে উমানাথ স্থির করলেন, উপস্থিত প্রস্থান করাই শ্রেয়—প্রত্যাবর্তনের সময়ে না-হয় এই পথে আর একবার বিপিনের সন্ধান ক'রে যাবেন।

উমানাথকে প্রস্থানোদ্যত দেখে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বিনোদ বললে, "ও ঠাকুর, চ'লে যাচ্ছ কেন? সকালবেলা এসেছ, আমার বেচুলালকে আশীর্বাদ ক'রে যাও।"

ফিরে দাঁড়িয়ে কতকটা বিরক্তিসংকারে উমানাথ বললেন, "কে তোর বেচুলাল?"

বিনোদ বললে, "বা রে! আমার বেচুলালকে জান না? ডাকছি, দেখ, কে আমার বেচুলাল।" তারপর দু হাতের দু জোড়া আঙুল মুখের মধ্যে পুরে সজোরে শিস্ দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলে, "আয় বেচু-উ-উ! আয়, আয়, আয়!"

পর-মুহূর্তে শোনা গেল, বহু দূর হতে, বিপিনের গৃহের পিছন দিকের বাগান থেকেই হয়তো বা, কি যেন একটা কিছু উঠি-তো-পড়ি ক'রে অতি দ্রুতগতিভবে খড়বড়-খড়বড় রবে ছুটে আসছে। গৃহের অন্তরালে থেকে দৃষ্টিপথে নির্গত হ'লে বোঝা গেল, সেটা মিশ কালো রঙের ক্ষুদ্রকায় কোনোও এক পশু;—বিনোদের নিকট উপস্থিত হয়ে তার চতুর্দিকে ঘিরে ঘিরে লাফাতে লাফাতে যদি না বার-দুই ব্যা-ব্যা ক'রে ডাক ছাড়ত, তা-হ'লে ছাগলছানার পরিবর্তে কুকুরছানা ব'লে ভুল করলে উমানাথের পক্ষে খুব বড় রকমের ভুল হতো না।

দু হাত দিয়ে ছাগল-ছানাটাকে কোলে তুলে নিয়ে উমানাথের দিকে এগিয়ে ধ'রে বিনোদ বললে, "এই আমার বেচুলাল। এখন বুঝলে বেচুলাল কে?" তারপর সামনের পা দুটো দিয়ে বেচুলালকে বাগিয়ে ধরে নীচু হয়ে উমানাথের দিকে অগ্রসর হলো।

সভয়ে হাত-দুই পিছিয়ে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে উমানাথ বললেন, "ওরে, ছুঁস নে, ছুঁস নে। চান করে পূজোয় চলেছি।"

উমানাথের সম্মুখে ভূমির উপর বেচুলালের মাথাটা চেপে ধরে বিনোদ বললে, "নে, বামুন মানুষকে গড় কর্ বেচু,—ভালো হবে তোর।" তার পর উমানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলতে লাগল, "আশীর্বাদ করছ না কেন ঠাকুর? আশীর্বাদ কর। বলো—বেচু তুই সুখে থাকবি, রাজা হবি, তোর একশো বছর পেরমাই হবে। বলো।"

অনেকবার অনেককে উমানাথ আশীর্বাদ করেছেন, কিন্তু ছাগলছানাকে "রাজা হবি" বলে আশীর্বাদ করবার প্রস্তাব জীবনে এই প্রথম। কখনও যদি ছাগলছানাকে আশীর্বাদ করে থাকেন তো স্বর্গে যাবার আশীর্বাদই করেছেন,—এবং তা কেবলমাত্র বলিদানের মন্ত্রপাঠের কালে।

উমানাথকে নির্বাক থাকতে দেখে ব্যগ্রকণ্ঠে বিনোদ বললে, "কী ঠাকুর, চুপ করে রইলে কেন? আশীর্বাদ করো!"

বিরক্তি-মিশ্রিত স্বরে উমানাথ বললেন, "আরে, করেছি, করেছি। থাম্ তুই।"

ছাগলটাকে কোলে তুলে নিয়ে ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে বিনোদ বললে, "করেছ? কই, শুনতে পেলাম না তো! মনে মনে করেছ বুঝি? আচ্ছা, তা হলেও হবে। হাজার হোক, বামুন মানুষ তো!"

"বিনুদে !"

উমানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বিনোদ বললে, "কী ?"

"ছাগলটা বেচবি ?"

"কাকে ?"

"ধর্, আমাকে ?"

উমানাথের দিকে ছাগলটা একটু দুলিয়ে বিনোদ বললে, "মাইরি চাঁদ। আমি বেচুলালকে বেচি, আর তুমি ওকে কেটে ওর মাংস রেঁধে খাও!" তার পর পূর্বোল্লিখিত ডালাটার প্রতি ইঙ্গিত করে বললে, "এটা কী জান ? এটা বেচুলালের গাড়ি। এতে চড়ে বেচুলাল হাওয়া খেয়ে বেড়াবে।" তারপর বেচুলালকে চেপে ডালার ভিতর বসিয়ে দিয়ে বললে, "চুপটি করে বসে থাক্ বেচু, কোনও ভয় নেই। চল্, তোকে একটু হাওয়া খাইয়ে আনি।"

কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল, এ অভয়-প্রাপ্তি কোনও উপকারেই এল না। দড়ি ধরে বিনোদের একবার একটু টান দেওয়া, আর, ভয়েই হোক অথবা উৎসাহেই হোক, টপ করে দাঁড়িয়ে উঠে পরিষ্কার একটি লাফ দিয়ে বেচুলালের উমানাথের পায়ের কাছে গিয়ে পড়া !

এই অতর্কিত বিপদের কোন হিসেব উমানাথ মনের মধ্যে রাখেন নি। তিনি হিসেব করেছিলেন, ডালার ছাগল ডালাতেই থাকবে। চমকে উঠে "এই" বলে সহসা পিছন হটতে গিয়ে একটা খালে পা পড়ে পড়তে-পড়তে কোন রকমে সামলে গেলেন। রোস-প্রজ্বলিত নেত্রে বিনোদের প্রতি দৃষ্টপাত করে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন "অর্বাচীন ! বেল্লিক কোথাকার !" তার পর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে দ্রুতবেগে জমিদার-বাড়ির দিকে পদচালনা করলেন। একটা আধ-ক্ষেপাটে ছেলে এবং একটা আহ্লাদে ছাগলের গুণে যে-স্থান মারাত্মকরূপে অনিশ্চিত, সেখানে আর মুহূর্ত মাত্র অবস্থান করা নিরাপদ মনে করলেন না।

পিছনে শোনা যাচ্ছিল বিনোদের সহাস্য উল্লাস,—"হি-হি-হি ! আর একটু হলে বেচু ছুঁয়ে দিয়েছিল ঠাকুরকে ! হি-হি-হি ! আর একটু হলে ঠাকুর পড়ে, যেত হোঁচট খেয়ে ! বেশ হতো তা হলে ! বেরিয়ে যেত বেচুর মাংস খাবার লোভ ! হি-হি-হি !"

ক্রোধের সঙ্গে একটা বিস্ময়জনক হীনতার বোধ যুক্ত হয়ে উমানাথকে বিহ্বল করে রেখেছিল। কী আশ্চর্য ! তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর ধর্মপরায়ণতা, তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি তাঁর বয়সের প্রাচীনতা ও পবিত্র বেশ, কিছুতেই রক্ষা করতে পারলে না তাঁকে একটা অভদ্র অশিষ্ট বালকের এমন লঘু আচরণ থেকে !

দ্রুতপদে খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পর উমানাথ দেখলেন, সম্মুখে বিপিন আসছে।

নিকটে এসে আভূমি নত হয়ে উমানাথকে প্রণাম করে বিপিন বললে, "ঠাকুর মশাই আজ যে এদিকের পথে চলেছেন ?"

কালো মেঘে বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় উমানাথের গম্ভীর মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল,—"তোর বাড়িই গিয়েছিলাম বিপিন। সেখানে এক জোড়া আজব জিনিস দেখে এলাম।"

গভীর কৌতূহলে বিপিন জিজ্ঞাসা করলে, "কী বলুন তো?"

"একটা ছাগল আর একটা পাগল।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে বিপিন বললে, "ছাগল তো বুঝলাম বেচুলাল, কিন্তু পাগল?"—তারপর সহসা মুখমণ্ডলে সমস্যামোচনের নিশ্চিন্ততা ফুটিয়ে বলে উঠল, "ও-হো-হো! বুঝেছি। বিন্দুকে বলছেন। তা ঠিকই ধরেছেন ঠাকুর মশাই,—পাগলই বটে। ভাই-বোন তো কেউ আর নেই, বেচুলালকেই ও ভাইয়ের মতো ভাবে। দুজনে কথা কয় ঠাকুর মশাই। ছাগলে ঘাড় নেড়ে 'না' বলে, 'হ্যাঁ' বলে—এ কখনও শুনেছেন? কিন্তু সে কথা যাক্, আপনার ছিচরণের ধুলো পড়ে আমার বাড়ি পবিত্তির হয়েছে। কোনও আদেশ আছে না কি?"

উমানাথ তাঁর প্রয়োজন ব্যক্ত করলেন। ঝড়-বৃষ্টিতে তাঁর গোয়ালের একটা অংশ বে-মেরামত হয়েছে; অপরাহ্ণে উমানাথের গৃহে গিয়ে দেখেশুনে বলতে হবে, মেরামতের জন্য কটা বাঁশ এবং অপরাপর কোন্ কোন্ উপকরণ সংগ্রহ করা দরকার।

বিপিন প্রতিশ্রুত হলো, উমানাথের আদেশমতো যথাকালে সে উপস্থিত হবে।

দুই

গৌরীদীঘির তরুণ জমিদার বিজয়নারায়ণ টাইফয়েড রোগের দুর্দান্ত আক্রমণ থেকে সম্প্রতি সেরে উঠেছে। তিন মাস যাবৎ যমে-মানুষে টানাটানির পর শেষ পর্যন্ত যমরাজকেই পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে। রোগের বাড়াবাড়ির মুখে যে বড় ডাক্তার এবং দুজন অভিজ্ঞ নার্স চিকিৎসা ও সেবার জন্য কলিকাতা থেকে গৌরীদীঘিতে এসেছিল, নিরাপত্তার এলাকায় রোগী প্রবেশ করবার পর তারা কলিকাতায় ফিরে গেছে। এখন শুধু রোগীকে চাঙ্গা করে তোলবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় চিকিৎসকের দ্বারা যৎসামান্য চিকিৎসা এবং পথ্য নিয়ন্ত্রণের পালা চলেছে।

সকালে পূজা-আহ্নিকের পর বিজয়নারায়ণের বিধবা মাতা ভুবনেশ্বরী সদ্য-রোগমুক্ত পুত্রের মাথায় নির্মাল্যের ফুল-বিল্বপত্র স্পর্শ করিয়ে সবে মাত্র একতলায় নেমেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকা মানদা সংবাদ দিলে, উমানাথ স্মৃতিরত্ন দর্শনপ্রার্থী।

হাতের ফুল-বিল্বপত্র যথাস্থানে স্থাপন করে ভুবনেশ্বরী বললেন, "এখনও পুজোয় বসেন নি তিনি?"

মাথা নেড়ে মানদা বললে, "না, বসেন নিকো। বোধ করি আগে আপনকার সাথে কথা কইবার চান।"

বহিঃপ্রাঙ্গণের উত্তর ভাগে রাধাবল্লভজীর মন্দির। তথায় উপস্থিত হয়ে ভুবনেশ্বরী প্রথমে মন্দিরে প্রবেশ করে সাষ্টাঙ্গে বিগ্রহকে প্রণাম করলেন; তার পর এসে যুক্তকরে উমানাথকে নমস্কার করে বললেন, "কিছু বলবেন স্মৃতিরত্ন মশায় ?"

প্রতিনমস্কার করে উমানাথ বললেন, "এবার ঋণচ্ছেদ করবার সময় উপস্থিত হয়েছে, সেই কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মা-জননী।"

বিজয়নারায়ণের পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যুর পর থেকে গৌরীদীঘির আবালবৃদ্ধ জনসাধারণ ভুবনেশ্বরীকে 'মা-জননী' বলে সম্বোধন করে।

উমানাথের কথা ভুবনেশ্বরী সহসা ঠিক ধরতে পারলেন না। প্রচুর শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রভূত চারিত্রিক গুণগ্রামের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে উমানাথের মনের মধ্যে অপারমার্থিক বস্তুনিচয়ের প্রতি ঈষৎ লোভাতুরতাও যে একটু জায়গা দখল করেছিল, সে কথা তাঁর অবিদিত ছিল না। মনে করলেন, উমানাথ বুঝি নিজের পাওনা-গণ্ডা সম্বন্ধেই একটু ঘোরালো ধরনের গৌরচন্দ্রিকা করেছেন। ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের ঋণ বলুন তো ?"

সহাস্য মুখে উমানাথ বললেন, "দেবতার ঋণ। বিজয়নারায়ণের আরোগ্যলাভের ব্যাপারে কলকাতা থেকে যে ডাক্তার এসেছিলেন, তাঁর কৃতিত্বকে একটুও খর্ব করছিনে, কিন্তু তিনি নিমিত্ত মাত্র, হেতু নন। হেতু দেবতার অনুগ্রহ।"

কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে ভুবনেশ্বরী বললেন, "তা আর বলতে! হাজার বার সে কথা সত্যি।"

উমানাথ বললেন, "প্রচুর পারিশ্রমিক দিয়ে আপনি ডাক্তারদের সন্তুষ্ট করেছেন, এবার দেবতাকে সন্তুষ্ট করুন। বিজয়নারায়ণের আরোগ্য কামনায় আপনি রক্ষাকালী-মাতার পূজার মানত করেছিলেন,—আগামী অমাবস্যার রাত্রে সেই পূজার ব্যবস্থা করবার কথা বলছিলাম।"

বিজয়নারায়ণের অসুখের সংকটাপন্ন মুহূর্তে, যখন ব্যাধির অগ্রগতির বিরুদ্ধে মানুষের চেষ্টা প্রবল বন্যার সামনে বালির বাঁধের মতো নিষ্ফল হতে আরম্ভ করেছিল, উমানাথের পরামর্শেই ভুবনেশ্বরী রক্ষাকালী পূজার মানত করেছিলেন। তাঁর, নিজের মনের গুপ্ত প্রদেশে কিন্তু এ বিষয়ে দ্বিধার একটা সামান্য গাঁট বর্তমান ছিল। ভুবনেশ্বরীর পিতৃবংশ শাক্তমতাবলম্বী। বিবাহের কালে শ্বশুরও ছিলেন তাই। কিন্তু বিবাহের কয়েক বৎসর পরে বৃন্দাবনে তীর্থ করতে গিয়ে দৈবক্রমে একজন বৈষ্ণব সাধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হরিনারায়ণ সস্ত্রীক বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং গৌরীদীঘিতে প্রত্যাবর্তনের পর মন্দির নির্মাণ ক'রে রাধাবল্লভজী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে হরিনারায়ণ কঠিন রোগে পীড়িত হ'লে ভুবনেশ্বরী রক্ষাকালী পূজার মানত করবার জন্য প্রলুব্ধ হন। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। কুমারী অবস্থায় একবার তাঁর পিতা, এবং আর একবার তাঁর এক পিতৃব্য-কন্যা কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। উভয় ক্ষেত্রেই রোগের চরম অবস্থায় রক্ষাকালী পূজা মানত করবার পর রোগীরা আরোগ্য লাভ করে।

হরিনারায়ণ কিন্তু এসকল যুক্তি এবং নজিরে আদৌ কর্ণপাত করেন নি। ভুবনেশ্বরীর হাত ধ'রে বলেছিলেন, "ধর্মমতের জন্যে প্রাণত্যাগ করা যায় ভুবন, কিন্তু প্রাণের জন্যে ধর্মমত ত্যাগ করা যায় না। তা ছাড়া, রাধাবল্লভজী কি দিশী ডাক্তার, আর রক্ষেকালী সাহেব ডাক্তার যে, বিপদ দেখলে রাধাবল্লভজীকে ত্যাগ করে রক্ষেকালীর শরণাপন্ন হতে হবে? বাঁচবার যদি হয়, রাধাবল্লভজীই আমাকে রোগমুক্ত করবেন।"

রাধাবল্লভজী অবশ্য হরিনারায়ণকে মুক্ত করেছিলেন, তবে রোগ থেকে নয়, ভব-যন্ত্রণা থেকে।

এ সকল ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সংযোগের কোনও সত্য স্বীকার করতে হয়তো মন ঠিক চায় না, তথাপি রক্ষাকালী পূজা মানতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়া ও স্বামীর মৃত্যু,—এই দুই অনতিবর্তনীয় ঘটনা মাঝে মাঝে একত্রে মিলিত হয়ে ভুবনেশ্বরীর মনে ক্ষোভ উৎপাদন করতে ছাড়ে না। তাই বিজয়নারায়ণের জীবনের সংকটকালে পুনরায় রক্ষাকালী পূজা মানতের প্রস্তাব হ'লে, সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে ভুবনেশ্বরীর দ্বিধা হয়তো কিছু হয়েছিল, কিন্তু বিলম্ব হয় নি। ধর্মমত রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করা যত সহজ, একমাত্র পুত্রের প্রাণ বিপন্ন করা তত সহজ নয়।

উমানাথের প্রস্তাবের উত্তরে ভুবনেশ্বরী বললেন, "কিন্তু অমাবস্যার তো আর মোটে দিন আষ্টেক বাকি, এর মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে উঠবে তো?"

ভুবনেশ্বরীর কথা শুনে উমানাথ হাসতে লাগলেন; বললেন, "লক্ষ্মীর ঘরে আবার ব্যবস্থার ভাবনা! এক, প্রতিমা আর পাঁঠা ছাড়া আপনার সংসারে আর কোন্ জিনিসের ব্যবস্থা নতুন ক'রে করতে হবে বলুন তো? নিতাই কুমোরকে বলে দিলে দিন-চারেকের মধ্যে প্রতিমা গ'ড়ে দেবে, আর পাঁঠার ব্যবস্থা? সে যেন মা নিজেই ক'রে রেখেছেন বিপিন কৈবর্ত্তের ঘরে। কালো রঙের নধরদেহ একটা ছাগ-শাবক এইমাত্র দেখে এলাম। সারা দেহ খুঁজলে বোধ হয় একটা সাদা লোম পাওয়া যাবে না।"

ছাগ শাবকের প্রসঙ্গে ভুবনেশ্বরীর মুখমণ্ডলে একটা অতি ক্ষীণ ছায়া দেখা গেল, বললেন, "ছাগ-বলি কি কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না স্মৃতিরত্ন মশায়?"

স্মিতমুখে উমানাথ বললেন, "এ বিষয়ে আলোচনা তো পূজা মানত করবার সময়েই আপনার সঙ্গে বিশদভাবে হয়ে গেছে মা-জননী। যে দেবতার যা আহার তা সে দেবতাকে দিতেই হবে। ছাগল ঘাস খায় বলে বাঘকে ঘাস খেতে দিলে বাঘ সন্তুষ্ট হবে কি? আপনাদের বাড়িতে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে দিশী হাকিম এলে লুচি-মণ্ডা খাইয়ে সন্তুষ্ট করা হয়। কিন্তু ইংরেজ হাকিম এলে তাঁকে তো মদ-মাংস দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হয় মা-জননী।"

যুক্তি জোরালো। এক মুহূর্ত নীরবে চিন্তা করে ভুবনেশ্বরী বললেন, "তা হলে ব্যবস্থাই করুন। নিতাইকে প্রতিমা গড়তে বলে দিন।"

খুশী হয়ে উমানাথ বললেন, "আজই তাকে ডাকিয়ে পাঠাব। বিপিনও আজ

ও-বেলা আমার কাছে আসবে, পাঁঠাটার কথাও বলে রাখতে হবে।"

"যে দাম বিপিন চাইবে, তার ওপরও কিছু তাকে পাইয়ে দেবেন। সে যেন অসন্তুষ্ট না হয়।"

"বিপিন অসন্তুষ্ট হবে না। তবে তার একটা পনের-ষোল বছরের আধ-পাগলা ছেলে আছে, সেটা একটু গোল না বাধায়।"

"কেন ?"

"ওই ছাগলটা নিয়ে সে পাগল হয়ে আছে।"

শুনে ভুবনেশ্বরীর মুখে ঈষৎ কাতরতার চিহ্ন দেখা দিল ; বললেন, "আহা ! তা হলে নাই-বা নিলেন ছেলেমানুষের আদরের জিনিস। অন্য ছাগলের সন্ধান করলেই তো হয়।"

ভুবনেশ্বরীর কথা শুনে উমানাথ হাসতে লাগলেন ; বললেন, "এখনও তো গোল বাধায় নি। যদি গোল বাধায় তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে। এ সামান্য কথার জন্যে আপনি ভাববেন না মা-জননী।"

তিন

অপরাহ্ণে কিন্তু বিপিনের কাছে কথাটা পেড়ে উমানাথ নিজেই একটু ভাবিত হলেন। ধীরে-ধীরে মাথা নাড়তে-নাড়তে বিপিন বললে, "বিন্দে কিছুতেই রাজি হবে না ঠাকুর মশাই। এ কথা শুনলে সে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করবে। তা নইলে, দেবতার ভোগে লাগবে, আপনি আদেশ করছেন, মা-জননীকে কথাটা জানানো হয়েছে, ছাগল তো আমার বিনা পয়সাতেই দেওয়া উচিত। কিন্তু ও তো শুধু ছাগলই নয়, ও যে বেচুলাল।"

অপ্রসন্ন সুরে একটু তিরস্কারের ভঙ্গিতে উমানাথ বললেন, "তোর যেমন বুদ্ধি, তেমনই কথা! বেচুলাল নাম দিলে ছাগল যদি ছাগলের বাড়া আর কিছু হয়, তা হলে হীরালাল নাম দিলে মানুষ মানুষের বাড়া আর কিছু হবে না কি ?"

এই কূট তর্কের ঘোরালো যুক্তির মর্মভেদ করতে অসমর্থ হয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিপিন বললে, "সে কথা একশ' বার সত্যি।"

"তবে ?"

"কী বলি বলুন দেবতা! আমি তো বুঝি, কিন্তু ছেলে যে বেজায় অবুঝ। সে বুঝবে কি ?"

"অবুঝ ছেলের অন্যায় আবদারের কাছে দেবতার মাহাত্ম্যকে ছোট করবি ? ছেলের আবদারই শুধু দেখবি, আর তার কল্যাণ-অকল্যাণ দেখবি নে ?"

ছেলের কল্যাণ-অকল্যাণের কথায় বিপিনের মনে একটা যেন আতঙ্কের ছায়া

দেখা দিলে। ওই তো একমাত্র ছেলে, সবে বস নীলমণি। শেষ পর্যন্ত কি ওই ছেলে নিয়ে দেবতার রোষে পড়বে! এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থানের পর আভূমি নত হয়ে উমানাথকে প্রণাম করে বললে, "আচ্ছা ঠাকুর মশাই, ছেলেকে রাজি করাতেই হবে। কাল আপনার গোয়ালের বাঁশ ফেলবার সময়ে পাকা খবর দিয়ে যাব।"

বিপিনের মনে দ্বিধার যেটুকু অবশেষ থাকতে পারে অর্থের দ্বারা সেটুকুকেও অপসারিত করবার উদ্দেশ্যে উমানাথ বললে, "ছাগলটা কত দিয়ে কিনেছিলি বিপিন?"

"হরিপুরের হাট থেকে আট আনায় কিনেছিলাম ঠাকুর মশাই। মাস খানেকের ছানা। তখন এই এতটুকু ছিল।" বলে বিপিন বাঁ হাতের অল্প একটু উপরে ডান হাত রেখে আকারের ক্ষুদ্রত্ব নির্দেশ করলে। "দুধ আর দুধ-ভাত খাইয়ে-খাইয়ে বিন্দে মাস সাতেকে কী চেহারা ওর করেছে, তা তো সকালে আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। অমন লক্ষণযুক্ত পশু হাজারে একটা পাওয়া যায় না ঠাকুর মশাই। কী সুডোল দেহ, কী চমৎকার রঙ! অতখানি শরীরে একটা সাদা রোঁয়া কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না,—না কপালে, না ল্যাজে।"

"এখন ওর দাম কত হতে পারে?"

"যদি বেচি?"

"যদি বেচিস?"

এক মুহূর্ত গভীর ভাবে হিসাব করে মাথা নাড়া দিয়ে বিপিন বললে, "তা, টাকা আড়াই বে-ওজোর।"

ট্যাঁক থেকে কয়েকটি টাকা বার করে উমানাথ বিপিনের হস্তে অর্পণ করলেন। বোধ করি বিপিনকে দেবার উদ্দেশ্যেই টাকাগুলো ট্যাঁকে ছিল।

সামনের দিকে হাত একটু কাত করে ধরে টাকাগুলোর সংখ্যা দেখে নিয়ে সবিস্ময়ে বিপিন বললে, "এ কী?"

উমানাথ বললেন, "ছাগলের দাম।"

"এখন কেন?"

"তা হলেই বা। তুই তো আর টাকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিস নে!"

"আর এতই বা কেন? পাঁচ টাকা?"

"মা-জননীর হুকুম, তোকে বেশি করে দেবার।"

যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে ভুবনেশ্বরীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বিপিন বললে, "তাঁর দয়া। কিন্তু এখন থাক্ ঠাকুর মশাই,—আগে হুজুরে ছাগল জমা করি, তার পর যা-হয় দেখা যাবে।" বলে টাকাগুলো উমানাথের সম্মুখে ভূমির উপর স্থাপন করলে।

মাথা নেড়ে উমানাথ বললেন, "তা হবে না বিপিন, টাকা তোল।"

কোনও উত্তর না দিয়ে বিপিন হাত জোড় করে দাঁড়াল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু উমানাথের নির্বন্ধাতিশয্যে টাকাগুলো তুলতেই হলো। তার

মতো গরিবের পক্ষে পাঁচ-পাঁচ টাকার লোভ সংবরণ করা সহজ কথা নয়। তখনকার দিনের পাঁচ টাকা আজকালকার কুড়ি টাকার সমান।

আর একবার উমানাথকে প্রণাম করে বিপিন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করলে। কোমরে তখন তার টাকার গরম, আর মনের মধ্যে বিনোদকে কেন্দ্র করে একটা মন-দমানো অস্বস্তির গ্লানি।

চার

বিপিন যখন গৃহে পৌঁছল, তখনও বিনোদ বেড়িয়ে বাড়ি ফেরে নি।

সুযোগ বুঝে সেই অবকাশে সে তার স্ত্রী শুকতারাকে সকল কথা বলে মতামত জানতে চাইলে, "তুই কী বলিস তারা ?"

নগদ পাঁচ টাকা মূল্য শুকতারাকে যথেষ্ট আলোড়িত করেছিল, কিন্তু তদপেক্ষা তার কাছে গুরুতর মনে হয়েছিল পুত্রের অকল্যাণের আশঙ্কার কথা। বললে, "মা-কালীর পুজোর জন্যে পুরুত ঠাকুর চেয়েছে, কী বলব বল! দিতেই হবে।"

"ছেলেকে সামলাতে পারবি ?"

"সামলাতেই হবে।"

ক্ষণকাল পরে বেচুলালকে নিয়ে বিনোদ যখন বাড়ি ফিরল তখন শুকতারা ভাত চড়িয়েছে; আর মুক্ত অঙ্গনে একটা চেটাই পেতে বিপিন নিদ্রা ও জাগরণের সীমান্তরেখা অতিক্রম করবার চেষ্টায় আছে।

"বাবা!"

বেচুলালের খুর-ধ্বনিতেই চট্‌কা ভেঙে গিয়েছিল। চক্ষু উন্মীলিত করে বিপিন বললে, "কী বাবা ?"

"আজ বেচু আর একটা কথা বলেছে।"

"কী কথা ?"

"আমি বললাম, বেচু বাড়ি যাবি ? আমার দিকে তাকিয়ে বেচু বললে, বো-বো। বো-বো মানে কী জানিস ? যাব।"

সহসা বিপিনের মাথায় একটা বুদ্ধি দেখা দিলে। কপট আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করলে, "পাঁটো বললে না কি রে ?"

"পাঁটো বললে।"

এবার বিপিনের কণ্ঠস্বরে একটা যেন ভীতির আমেজ ফুটে উঠল; বললে, "তা হ'লে, এ তো ভালো কথা নয় বিনদে।"

"কেন ?"

"ও ছাগল কার ?"

"কার আবার ? আমার।"

"ছাগলে কথা কইলে যার ছাগল তার বাবা মারা যায়।"

মনে মনে এক মুহূর্ত চিন্তা করে বিনোদ বললে, "তুই তা হলে মারা যাবি ?"

বিনোদের কথার ভঙ্গিতে সুবিধার কিছু সম্ভাবনা আশা করে যথাসম্ভব করুণ কণ্ঠে বিপিন বললে, "তা মারা যাব বইকি।"

"মারা যাবি, না, হাতী হবি !"

বেচুলালকে তার খোঁয়াড়ে রেখে এসে বিপিনের পাশে উপবেশন করে বিনোদ বললে, "আগে তো জানতাম না, আজই শুনলাম।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কী ভেবে বিনোদ বললে, "বেচুলাল কথা কয় না, ভাকে। কখনও বো-বো করে, কখনও ব্যা-ব্যা করে। ব্যা-ব্যা কি কথা ? কথা না।"

বিপিন বললে, "আর কখনও কখনও যে উহু উহু করে, তার কী ? উহু-উহু তো কথা।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে বিনোদ চুপ করে রইল। বেচুলাল যে সময়ে সময়ে উহু-উহু করে কথা কয়, একাধিক বার তার প্রমাণ সে বেচুলালকে দিয়ে অনেকের কাছে দিইয়েছে।

বিনোদের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করে উৎসাহিত হয়ে বিপিন বললে, "এক কাজ করলে হয় বিনদে।"

"কী ?"

"সগগো কাকে বলে জানিস ?"

"জানি।"

"কী বল্ দেখি ?"

উর্ধ্ব দিকে হাত দেখিয়ে বিনোদ বললে, "আকাশ।"

"আকাশ সগ্গোর পাঁচিল। আকাশের আড়ালে সগগো আছে। অনেক পুণ্যি করলে তবে সগগে যাওয়া যায়। সগগো ভারি ভালো জায়গা, দুঃখ-কষ্ট কিছুই সেখানে নেই। এ তুই জানিস বিনদে ?"

"জানি।"

"আচ্ছা, বেচুলালকে সগ্গে পাঠালে কেমন হয় ? তা হলে আমিও বেঁচে থাকি, আর বেচুলালও সগগে গিয়ে সবুজ-সবুজ ঘাস আর নধর-নধর লতাপাতা খেয়ে খুশী হয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়।"

"কী করে সগগে পাঠাবি ?"

প্রশ্ন কঠিন। কিন্তু বিপিন জানত এ প্রশ্নের উত্তর কোন এক সময়ে তাকে দিতেই হবে। বললে, "আমাদের রাজাবাবুর অসুখ ভালো হয়েছে বলে অমাবস্যার রেতে রক্ষাকালী-মার পুজো হবে। সেই পুজোর জন্যে হিঁতিরয়ে রুপাই ছাগলটা চেয়েছে।"

"কী করবে ছাগল নিয়ে ? বলি দেবে ?"

"তা না দিলে বেচুলাল সগগে যায় কেমন করে তা বল্ ! মা-কালীর কাছে

বলি দিলে তবে তো তার পুণ্যি হবে।"

"ছাগল কথা কইলে বাপ মারা যায়, এ কথা তোকে কে বলেছে?"

বলে নি তো কেউই। বিনোদকে ভয় দেখাবার জন্য কথাটা বিপিনের নিছক মিথ্যা রচনা। কিন্তু কথাটার সঙ্গে একজন বিশিষ্ট লোকের নাম যোগ করতে পারলে কথাটা অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে এই লোভে বিপিন বললে, "ছিঁতিরত্নো মশাই বলেছে।"

সহসা একটা সংশয়ের তাড়নায় বিনোদের চক্ষু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, "ছিতিরত্নো মশাই কে?"

একটু বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে বিপিন বললে, "সে কি রে? ছিঁতিরত্নো মশাই তো আজ সকালে আমাদের বাড়ি এসে তোর সঙ্গে কত কথা কয়ে গেছে।"

আর যায় কোথায়। সংশয়ের নিরসন মাত্র ঠিক যেন একটা বোমার মতো অকস্মাৎ বিনোদ ফেটে পড়ল।

"ঐ আঁটকুড়ীর বেটা ছিঁতিরত্নো বেচুর মাংস খাবার লোভে তোকে মিথ্যে কথা বলে ভয় দেখিয়েছে।

সকালবেলা ও বেচুকে কেনবার কথা বলছিল। এবার কোনদিন সে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে ওকে ঢিল-পেটা করব।"

বিনোদের পিঠে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে বোলাতে বিপিন বললে, "ছি বাবা, বামুন মানুষ,—ও-কথা বলতে নেই। আমরা আট আনা দিয়ে ছাগলটা কিনেছিলাম, আর দেখ্ দেখি ছিঁতিরত্নো মশাই তোকে কত দাম দিয়েছে।—পাঁচ টাকা।" বলে দক্ষিণ করতলে টাকাগুলো স্থাপন করে বিনোদের দিকে আগিয়ে ধরলে।

"ও আঁটকুড়ীর পো। তুই তা হলে ছাগল বিক্রি করেই এসেছিস?" বলে ছোঁ মেরে টাকাগুলো বিপিনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দূরে পেয়ারা-তলায় সজোরে ছুঁড়ে ফেলে বিনোদ উচ্ছলিত হয়ে লাফিয়ে উঠল।

উদ্বিগ্ন হয়ে বিপিন বললে, "রাগ করিস নে বিনদে, কোথায় যাচ্ছিস? আমার কাছে একটু বোস্।"

ফিরে দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে বিনোদ বললে, "গলা টিপে বেচুকে মেরে ফেলব, তবু বলি দিতে দেব না।" তারপর অস্থির পদে শুকতারার নিকট উপস্থিত হয়ে বললে, "শুনছিস মা। বাবাটা বেচুলালকে বিক্রি করতে চায়!"

শুকতারা তখন ভাত সম্পূর্ণ সিদ্ধ হলো কি না পরীক্ষা করে দেখছিল। কোমল স্বরে বললে, "বামুন মানুষ, পুজোর জন্যে চেয়েছে, না বিক্রি করে কী করা যায় বাবা!"

ক্ষণকাল নির্বাক থেকে সতর্জনে বিনোদ বললে, "ওরে মুখপুড়ি। তুইও তা হলে ওদের দলে? দাঁড়া, একটা লাঠি এনে হাঁড়ি ভেঙে তোর ভাত রাঁধার নিকুচি করছি।"

"কস্ না নিকুচি। আর আমি তা বলে এই রেতে হাঁড়ি কিনে এনে ভাত রাঁধছি নে। তোর বেচুলালই না খেতে পেয়ে সারা রাত ব্যা-ব্যা করে চেঁচিয়ে মরবে।"

হাঁড়ি-ভাঙার পরিণাম যদি সেইরূপই হয়, তা হলে কার দণ্ড কে ভোগ করবে, সে এক সমস্যা। ঈষৎ দমিত কণ্ঠে বিনোদ বললে, "রাঁধ না তুই ভাত, কে তোর ভাত খায় দেখে নেব।"

উদগতপ্রায় হাসি কোন প্রকারে রোধ করে শুকতারা বললে, "আগে তুই পেট ভরে ভাত খাবি, তারপর তোর বেচুলালের কথা। তুই খাবার আগে ওকে একটি দানা খেতে দিচ্ছি নে।"

বিনোদ বুঝতে পারলে তার হাঁড়ি-ভাঙা অস্ত্র ভোঁতা হয়েছে—আর তার দ্বারা বিশেষ কিছু উপকার পাবার আশা নেই। গভীর স্বরে "আচ্ছা দেখা যাবে" বলে স্থান ত্যাগ করে সে সরাসরি উপস্থিত হলো বেচুলালের খোয়াড়ে। বাঁ হাত দিয়ে বেচুকে কাছে টেনে নিয়ে মৃদু স্বরে বললে, "বেচু, শুনেছিস ?"

সান্ধ্য-ভ্রমণের ফলে বেচুর বোধ হয় তখন কিছু ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। অকস্মাৎ জিভ বার করে বিনোদের নাকটা একবার চেটে দিয়ে বললে, "উহুঁ হুঁ হুঁ !"

"এরা তোকে ভালোবাসে না, বলি দিতে চায়। আজ রাত্তির হয়ে গেছে, আজ আর কাজ নেই, কাল সকালে তোতে আমাতে এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাব। কী বলিস ?"

সামনের দু পা তুলে বিনোদের দেহের উপর খানিকটা ওঠবার চেষ্টা করে বেচুলাল বললে, "হুঁ হুঁ হু হুঁ !"

পাঁচ

পরদিন প্রত্যুষে বহির্বাটির অঙ্গনে পায়চারি করতে করতে উমানাথ দাঁতন করছেন, এমন সময়ে বিপিন উপস্থিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললে, "একটু পিছিয়ে দাঁড়ান দেবতা।

দু-তিন পা উমানাথ পিছিয়ে গেলে যেখানে উমানাথ পূর্বে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানকার ধুলি নিয়ে মস্তকে বক্ষে ও মুখে দিয়ে বিনোদ পাঁচটি টাকা উমানাথের সম্মুখে স্থাপন করলে; তারপর উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললে, "হলো না ঠাকুর মশাই।"

চকিত কণ্ঠে উমানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হলো না ?"

"বিনোদে রাজী হলো না ছাগল বেচতে। কাল গভীর রাত পর্যন্ত কী যে

অনথথো করেছে তা আর কী বলব। আমি আর তার মা দুজনে মিলে কত বোঝালুম,—বলে, বেচুলালকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাব। পাঁচটা টাকা দিতে গেলুম, ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে পেয়ারা-তলার এমন ছুঁড়ে ফেলে দিলে যে, রেতের বেলা খুঁজে দুটো টাকা খুঁজে পাই। বাকি তিনটে আজ সকালে খুঁজে পেতে নিয়ে এসেছি।"

বিপিনের কথা শুনতে শুনতে একটা পরাজয়ের গ্লানিতে উমানাথের মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। কাল থেকে মনের গভীরতম প্রদেশে বিনোদের সঙ্গে তাঁর কল্পধারার ন্যায় গোপন এবং সূক্ষ্ম যে রহস্যময় সংঘর্ষ চলেছিল এ পরাজয় সেই সংঘর্ষেরই অন্তর্গত। মনে পড়ল, ছাগলটাকে তাঁর দিকে ঈষৎ দুলিয়ে দিয়ে 'মাইরি চাঁদ' বলে ইতর ভাবে সম্বোধন। মনে পড়ল, পড়তে পড়তে কোন রকমে তিনি সামলে গেলে পশ্চাৎ হতে উল্লাসের বিকট হাস্যলীলা। একটা দুর্মদ আক্রোশের তাড়নায় উমানাথের আকৃতি কঠিন হয়ে উঠল।

সেই নিঃশব্দ রুষ্ট মূর্তি দেখে ভীত হয়ে বিপিন বললে, "আমার অপরাধ নেই ঠাকুর মশাই, ছেলে ভারি অবুঝ।"

এবার কঠিন আবরণ বিদীর্ণ করে নির্গত হলো ক্রুদ্ধ উত্তপ্ত বাষ্প।

"অবুঝ তোর ছেলে নয়, তুই নিজেই অবুঝ। একটা ব্যাদড়া ছেলের অন্যায় আবদারের জন্যে দেবতাকে যে অবহেলা করে অবুঝ সেই-ই। ও টাকা আমি নেব না। টাকা তোর, আমার ছাগল। তুই যদি নিতান্তই না দিস, দেবতাকে বলব—মা, আমাকে ক্ষমা ক'র, আমি নিরুপায়।" তার পর হাতের দাঁতনটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "দিন-কাল ক্রমশ এমন হলো যে, দাম দিয়েও একটা ছাগল পাওয়া যায় না। পুজো-পাঠ আর করব না বিপিন, এবার এখানকার পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় গিয়ে জুতোর দোকান খুলব।"

মুহূর্তের জন্য দু কানে আঙুল দিয়ে টাকাগুলো তুলে নিয়ে বিপিন বললে, "হ্যাঁ ঠাকুর মশাই, সত্যি কথা, টাকা আমার, ছাগল আপনার। ছাগল আপনি পাবেন। তবে দয়া করে এই কটা দিন আমাদের বাড়িতেই থাকতে দিন, আপনি নিশ্চিন্তি থাকুন, পুজোর রেতে বিনোদ ঘুমালে আমি আপনাকে ছাগল দিয়ে আসব। কোনও অসুবিধে হবে না, সন্ধ্যে হতেই বিনদে ভাত খায়, আর সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রে যায়।"

বিপিনের মতি-পরিবর্তনে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হয়ে উমানাথ এক মুহূর্ত কী চিন্তা করলেন, তার পর বললেন, "এক কাজ করলে হয় বিপিন।"

করজোড়ে বিপিন বললে, "আদেশ করুন।"

"আজ তো হাটবার, হরিপুরে গিয়ে তুই একটা ছাগল-ছানা কিনে আন। যদি সেটা তোর বেচুলালের মতো নিখুঁত কালো হয়, তা হলে তাইতেই আমি কাজ চালাব, বেচুলাল বিনোদেরই থাকবে। আর, তেমন যদি না পাস, তা হলে কয়েক দিনে নতুন ছাগলটা বিনোদের একটু নেওটা হয়ে গেলে বেচুলালের

অভাবেও এমন কিছু গোল করবে না।"

উমানাথের কথা শুনে বিপিনের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বললে, "সাধে কি বলে, পণ্ডিত আর মুখখু আকাশ আর পাতাল? খাসা পরামর্শ"

পরামর্শ কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে ফলপ্রসূ হলো না। সেদিন হরিপুরের হাটে মাত্র তিনটে ছাগল-ছানা বিক্রয়ের জন্য এসেছিল, তন্মধ্যে নিখুঁত কালো কোনটাই ছিল না। একটা ছিল নিখুঁত সাদা, অর্থাৎ বেচুলালের ঠিক বিপরীত। অগত্যা বারো আনা মূল্য দিয়ে সেইটে কিনে বিপিন যখন বাড়ি ফিরল তখন দিবা দ্বিপ্রহর।

"বিনদে, কে এসেছে, দেখবি আয়।" উচ্চৈঃস্বরে বিপিন ডাক দিলে।

অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হলো বিনোদ এবং সঙ্গে সঙ্গে বেচুলাল।

বিস্মিত নেত্রে হাসি-হাসি মুখে ক্ষণকাল নবাগতের প্রতি চেয়ে থেকে বিনোদ বললে, "এটা আবার কে রে?"

বিপিন বললে, "বেচুলালের ভাই।"

"নাম কী?"

"হীরেলাল।"

ঈষৎ উল্লাস সহকারে বিনোদ বললে, "হ্যাঁ!" হীরেলাল, না কচুলাল!" তার পর সহসা বেচুলাল এবং কচুলালের মধ্যে ধ্বনিগত মিল লক্ষ্য ক'রে খুশী হয়ে উঠল, "ঠিক হয়েছে, বেচুলালের ভাই কচুলাল,—বেচু আর কচু।"

কিন্তু বর্ণের অকলঙ্ক শুভ্রতার জোরে বেচুলালের ভাইয়ের নাম কিছুক্ষণ আলোচনার পর হীরালালই বজায় রইল।

স্নানের জন্যে বিপিন মিত্তিরদের পুকুর-ঘাটে প্রস্থান করেছিল। বেচুলালের গলায় বাঁ হাতখানা জড়িয়ে দিয়ে বিনোদ বললে, "বেচু, হীরেলাল কে জানিস?"

বিনোদের গালের কাছে মুখটা এনে নিম্ন স্বরে বেচু বললে, "উহুঁ হুঁ হুঁ।"

"হীরেলাল আমাদের সৎভাই। বাপ আমাদের এক, মা আলাদা।"

মুখখানা উঁচু করে বেচুলাল বললে, "হুঁ হু হুঁ হুঁ!"

অদূরে শুকতারা মুখে কাপড় দিয়ে হাসলে; তারপর কতকটা নিজ মনেই মৃদুস্বরে বললে, "বাঁচলুম। একটা ছাগল-ছেলে নিয়ে অস্থির, আর একটা হলে গেছলুম আর কি!"

দু হাতে কান দুটো ধরে হীরালালকে নিজের কাছে টেনে বিনোদ বললে, "শোন্ হীরেলাল, দু ভাইয়ে মিলে-মিশে থাকবি,—খবরদার ঝগড়া করবি নে। বুঝলি?" তারপর হাত দিয়ে তার পিঠটা একটু চাপড়ে দেখে বললে, "উঃ কী ধুলো রে তোর গায়ে! হরিপুর থেকে এতটা পথ এসেছিস কিনা ভাই। দাঁড়া, বেচুর বুরুশটা এনে তোর গা ঝেড়ে দিই।" বলে প্রস্থান করলে।

বুরুশ নিয়ে ফিরে এসে বিনোদ হেসে গড়িয়ে পড়ল।

"মা, মা! শীগগির আয়। দু ভাইয়ের কাণ্ড দেখে যা!"

তখন বেচুলাল আর হীরালাল সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে পরস্পরে কপাল-ঠোকাঠুকি লাগিয়েছে। সামনের দু পা গুটিয়ে পিছনের দু পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে দুজনে দুজনের কপালের উপর ভেঙে পড়ছে, তারপর সোজা হয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে পুনরায় সামনের দু-পা গুটিয়ে উঁচু হয়ে উঠছে।

দূর থেকে দেখে শুকতারা বললে, "সে কি রে! এরই মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি লেগে গেল! হাজার হোক, সৎভাই কিনা!"

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে বিনোদ বললে, "মারামারি নয়, মারামারি নয়, ভাব। দুজনে খেলা করছে।"

মৃদু হেসে শুকতারা বললে, "তবু ভালো। ওদের দুজনের তো ভাব হলো। এখন হীরেলালের সঙ্গে তোর ভাব হলে বুঝি। তুইও তো হীরেলালের সৎভাই।"

কিন্তু এ কথার নিষ্পত্তির জন্য অধিকক্ষণ অপেক্ষা করবার প্রয়োজন হলো না, সেই দিন সন্ধ্যার মধ্যেই হীরালাল বুঝতে পারলে, বিনোদ তার সৎভাই হলে কি হয়, তাই বলে অসৎ ভাই নয়।

ছয়

অমাবস্যার জমাট ঘন অন্ধকারের রাত্রি।

মুক্ত আকাশতলে একটা দড়ির খাটিয়ার উপর শয়ন করে বিনোদ গভীর নিদ্রায় অভিভূত। অদূরে শুকতারাও নিদ্রা যাচ্ছে।

দ্রুতবেগে অথচ সন্তর্পণে প্রবেশ করল বারো-তেরো বৎসর বয়সের এক বালিকা। বিনোদের পার্শ্বে উপস্থিত হয়ে ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ডাক দিলে, "বিনুদা! বিনুদা!"

অতি-গভীর ঘুম ঈষৎ তরল হওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু সুবিধা হলো না। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু মাথাটা অপর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বিনোদ পুনরায় ঘুমুতে আরম্ভ করলে।

অগত্যা গায়ে অল্প-অল্প ঠেলা দিয়ে বালিকা ডাকলে, "বিনুদা! বিনুদাদা!"

এবার মাথা তুলে বিনোদ বললে, "কে?"

"আমি রাজি।"

"রাজি!"—ধড়মড়িয়ে খাটিয়ার উপর বসে বিনোদ প্রশ্ন করলে, "কী বলছিস?"

"ওরা তোমার বেচুলালকে বলি দিচ্ছে।"

মুহূর্তের মধ্যে চটকা গেল ভেঙে। "সত্যি?" বলে খাটিয়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে খোঁয়াড়ের কাছে উপস্থিত হয়ে বিনোদ দেখলে, বেচুলাল নেই,

একাকী হীরালাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। অকারণে অনভ্যস্ত কালে সঙ্গীহারা হয়ে একটা অনির্ণেয় অস্বস্তিতে বোধ করি তার ঘুম আসছে না।

দুদ্দাড় করে বিনোদ বেরিয়ে গেল।

মিনিট আষ্টেকের পথ মিনিট তিনেকে অতিক্রম করে সে যখন জমিদার-বাড়ি পৌঁছল, তখন সেখানে সজোরে বলিদানের প্রাথমিক বাজনা বাজছে। দূর থেকে ডিঙি মেরে বিনোদ দেখলে, পুরোহিতের পাশে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে বেচুলাল তার ইহজীবনের শেষ খাদ্যের সুস্বাদু উপকরণসমূহ, যথা—কলা, শসা, দূর্বা, ছোলা, আতপ চাল প্রভৃতি চিবুচ্ছে, আর মাঝে মাঝে ঘাড় উঁচু করে খাড়া-কানে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

দু হাতের দু জোড়া আঙুল মুখের মধ্যে পুরে বিনোদ তীক্ষ্ণ স্বরে একটা শিস দিলে; তার পর উচ্চৈঃস্বরে ডাকলে, "আয় বেচু-উ-উ! আয়, আয়, আয়—"

নিমেষের মধ্যে একটা অচিন্তিত কাণ্ড ঘটে গেল। বিনোদের ডাকও শোনা আর চক্ষের পলকে বেচুলাল তার নিশ্চিন্ত রক্ষকের অসতর্ক হাত থেকে গলার অদীর্ঘ দড়িটা এক টানে ছিনিয়ে নিয়ে পূজা-বেদীর সিঁড়ি ভেঙে খড় বড়-খড় বড় শব্দে দে ছুট!

বেদীর উপরকার লোকজন এবং পূজামণ্ডপের জনতা হৈ-হৈ করে উঠল, বাজনা গেল থেমে এবং পুরোহিত স্মৃতিরত্ন আসনের উপর দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করতে লাগলেন। পর-মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে এলে দেখা গেল, বিনোদের কোলে চড়ে বেচুলাল নিতান্ত সহজভাবে ভুক্তাবশিষ্ট আতপ চাল, যা মুখের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল, চর্বণ করছে,—আর প্রস্থানোদ্যত হয়ে বিনোদলাল পিছন ফিরেছে।

নিকটেই একজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে ছিল। সে ছুটে গিয়ে বিনোদের গালে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বেচুলালকে কেড়ে নিলে।

চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ প্রশ্ন উঠতে লাগল, "কে ওটা?" "কে ও শয়তানটা?"

পূর্বোক্ত ভৃত্য বললে, "ও বিপিন কৈবর্তোর ছেলে।"

গোমস্তা বেণীমাধব চিৎকার করে উঠল, "সে হারামজাদা গেল কোথায়? বিপনে?"

জনতার ভিতর হতে কে একজন উত্তর দিলে, "সে ওস্তাদ লোক, সময় বুঝে সটকে পড়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে উমানাথ বেদী থেকে গোটা দুই সিঁড়ি নেমে এসে কাঁপছিলেন; স্খলিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, "তাকে পিঠ-মোড়া করে নিয়ে আয়।"

দুর্মদ ক্রোধে বিনোদের সমগ্র দেহ আগুন হয়ে উঠছিল, আর দুঃসহ তেজে সেই আগুন নির্গত হচ্ছিল তার শুষ্ক হিংস্র দুই চক্ষু-গহ্বর দিয়ে। একটা কিছু নিদারুণ ধরনের করবার জন্য তার দুই বাহুর সমস্ত স্নায়ু স্ফীত হয়ে উঠে লাফালাফি লাগিয়েছিল। উমানাথের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে সে বললে, "তুমি

না ছি তিরত্নো, সেদিন একশো বছর পেরমাই হোক বলে বেচুকে আশীর্বাদ করেছিলে? আর, আজকে তাকে বলি দিচ্ছ? এস না একদিন আমাদের পথে, ঢিল-পেটা করে সাবাড় করব তোমাকে।"

তার পর, কাউকে কিছু বলবার বা করবার মুহূর্ত মাত্র অবসর না দিয়ে অদূরবর্তী হাড়কাঠের উপর উচ্ছলিত হয়ে লাফিয়ে পড়ে দুই বাহু দিয়ে দুই পাশের কাঠ সজোরে আঁকড়ে ধরে দেহটাকে ভূমির সঙ্গে কঠিনভাবে সংযুক্ত করে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল।

পুনরায় একটা হৈ-চৈ আরম্ভ হলো। হাঁ-হাঁ করে চতুর্দিক থেকে লোকজন ছুটে এসে কেউ বিনোদের হাত ধরে টানে, কেউ পা ধরে; কিন্তু মরিয়া মানুষের অবুঝ শক্তিকে পরাজিত করে এমন কোনও শক্তি সেখানে কারও দেহে আছে বলে মনে হলো না। মনে হলো, হাড়কাঠ আর বিনোদ এমন দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে এক হয়ে গেছে যে, বরং হাড়কাঠ মাটি থেকে উৎপাটিত হয়ে বেরিয়ে আসবে, তথাপি বিনোদকে হাড়কাঠ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

একজন বললে, "মার আজ নরমাংস খাবার ইচ্ছে হয়েছে, দাও ওর গলায় এক কোপ বসিয়ে।"

আর একজন বললে, "স্মৃতিরত্ন মশাইকে হারামজাদা ঢিল-পেটা করছিল,—এবার ওকে ঢিল-পেটা করে সাবড়াও।"

বোধ হয় এই প্রস্তাবের অনুসরণেই বিনোদের দেহের উপর অজস্র ধারায় কিল, চড়, পদাঘাত, এমন কি দু-চারটে ঢিল-পাটকেলও পড়তে লাগল; কিন্তু যে-পরিমাণ চেতনা হাড়কাঠে ছিল তার চেয়ে অধিক বিনোদের দেহে ছিল তার লক্ষণ দেখা গেল না।

"ওরে, মারিস নে, মারিস নে! ছেড়ে দে—"

সকলে চেয়ে দেখলে, বেদীর উপর দাঁড়িয়ে ভুবনেশ্বরী হাত তুলে বিনোদকে প্রহার করতে নিষেধ করছেন। পার্শ্বে দাঁড়িয়ে উমানাথ;—আকৃতি বিশেষ উৎসাহদীপ্ত বলে মনে হয় না।

উমানাথের সঙ্গে দু-চারটে কথা কয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে ভুবনেশ্বরী বিনোদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললে, বিনোদ, উঠে এস।"

কোনও কথা না বলে বিনোদ উপুড় হয়ে পড়ে থেকেই প্রবল বেগে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানালে। তার পিঠের চামড়ার টান দেখে মনে হলো, সে যেন নূতন করে আরও দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে ধরেছে।

"ভয় নেই, তোমার ছাগল বলি দেওয়া হবে না। চেয়ে দেখ, আমি মা-জননী।"

একটু আড় হয়ে তাকিয়ে ভুবনেশ্বরীকে দেখে বিনোদ হাড়কাঠ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে সোজাসুজি দৃষ্টি-বিনিময় হওয়া মাত্র অতর্কিতে একরাশ তপ্ত অশ্রু ঝরঝর করে তার দুই চক্ষু হতে ঝরে পড়ল। যে দুঃসহ

নির্যাতন তার দেহের উপর এই মাত্র সাধিত হয়েছে, এ অশ্রু তার বেদনার নয়; যে দুর্মদ প্রতিবাদের তাড়নায় তার সমস্ত দেহ-মন কঠোর হয়ে উঠেছিল, সেই তাড়নার শ্লথন-জনিত এই অশ্রু।

কাপড়ের খুঁটে তাড়াতাড়ি চক্ষু মার্জিত করে বিনোদ বললে, "নিয়ে যাই ?"

বেচুলালের দড়ি ধরে পূর্বোক্ত ভৃত্য নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল, ভুবনেশ্বরীর ইঙ্গিতে সে বিনোদের হস্তে রজ্জু প্রদান করলে।

ফাঁস খুলে দড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিনোদ বেচুলালকে কোলে তুলে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হলো।

"বিনোদ !"

ফিরে দাঁড়িয়ে বিনোদ ভুবনেশ্বরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"ছাগল তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম, কিন্তু এ ছাগল দেবতাকে উচ্ছুগগু করা হয়ে গেছে, একে যত্নে রেখো।"

ঘাড় নেড়ে বিনোদ সম্মতি জানালে।

পূজা-মণ্ডপ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিনোদ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হলো।

"বিনুদা !"

পাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বিনোদ বললে, "কে রে ? রাজি ?"

বিনোদের কাছ ঘেঁষে এসে রাজি বললে, "হ্যাঁ। আমার কোলে একটু দেবে ?—বেচুলালকে ?"

বেচুলালের মুখ ধ'রে একটু নাড়া দিয়ে বিনোদ বললে, "কী রে বেচু ? রাজির কোলে যাবি ? রাজি ভারি ভালো মেয়ে, তোকে আজ ও-ই বাঁচিয়েছে। যাবি ?"

বেচু তখনও বলিদানের নৈবেদ্যের শেষ আতপ-কণাগুলি মনোযোগ সহকারে চর্বণ করছিল,—কোনও উত্তর দিলে না।

"যা বেচু, রাজির কোলে যা।"—ব'লে বেচুলালের মুখে একটা চুমু দিয়ে বিনোদ বেচুকে রাজবালার কোলে দিলে।

"আমি একটা চুমু খাব বিনুদা ?"

"কাকে রে ?"

"শোন কথা ! কাকে আবার ? বেচুকে।"

"তাই বল্।"

"তা-ই তো বলছি।" ব'লে রাজি, তা ছাড়া আর যে কিছুই বলছিল না, তা সুস্পষ্ট করবার জন্য সশব্দে বেচুলালকে চুম্বন করলে।

"রাজি।"

"কী ?"

"তুই আমার বেচুকে চুমু খেলি, তোকেই আমি বিয়ে করব। তোকে আজ আমার ভারি ভালো লাগছে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা ক'রে রাজি বললে, "তোমার তো দুগগোর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দুগ্‌গোরা বড়মানুষ, কত জিনিসপত্তোর তোমাদের দেবে।"

"ছাই জিনিসপত্তোর!—দুগগো কী করেছিল জানিস?"

"কী করেছিল?"

"পাঁঠা-বলি দেখবার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি গিয়েই ওকে দেখতে পেয়েছিলাম—আর তুই আমাকে বলবি?

"কী বলব?"

"দুগগোকে বিয়ে করতে?"

কিছু না ব'লে রাজি চুপ করে রইল।

এক মুহূর্ত রাজির উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে বিনোদ বললে, "দুগগোকে আমি বিয়ে করছি না। কে ওকে বিয়ে করবে জানিস?"

এ প্রসঙ্গে উৎসাহিত হয়ে রাজবালা বললে, "কে করবে?"

রাজবালার কোল থেকে বেচুলালকে নিজের কোলে নিয়ে আর একবার চুমু খেয়ে বিনোদ বললে, "দুগগোকে বিয়ে করবে আমাদের বেচুলাল।" তার পর হাত দিয়ে বেচুলালের মুখখানা নেড়ে দিয়ে বললে "কী রে বেচু, দুগগোকে বিয়ে করবি?"

আতপ চাল বোধ হয় শেষ হয়েছিল, বেচু বললে "হুঁহুঁহুঁহুঁ!"

যুগল কণ্ঠের মিলিত হাস্যে পল্লীগ্রামের নিশীথ আকাশ চকিত হয়ে উঠল।

আশ্বিন ১৩৫১

অভিনয়

এক

১৯৪২ সনের কথা। তখন সমারোহের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে। জাপানী বোমার ভয়ে সারা কলিকাতা শহর মনে মনে মাথায় হাত দিয়ে নিরতিশয় উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করছে। সেই সময়ে একদিন সন্ধ্যার পর প্রবীরকুমার রায় নামে একটি যুবক তার বন্ধু সুরেশের সন্ধানে বেনেটোলা লেনের এক মেসে এসে হাজির হলো। তার দিন দুই আগে হাতীবাগানের বাজারের পাশে বোমা পড়েছে।

সুরেশ মেসেই ছিল, হঠাৎ প্রবীরকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললে, "এ কি প্রবীর! এ সময়ে তুমি কলকাতায়? বোমার ভয়ে আমরা কলকাতা ছেড়ে

ময়মনসিং পালাতে পারলে বাঁচি, আর তুমি কিনা ময়মনসিং থেকে কলকাতায় এসে হাজির হলে!"

প্রবীরের মুখে একটা নিষ্প্রভ হাসি ফুটে উঠল; বললে, "ময়মনসিং-এর চেয়েও দূরে যাওয়ার পথে আমি কলকাতায় এসেছি সুরেশ। তবে ময়মনসিং গেলে তোমরা বাঁচবে, কিন্তু আমি যেখানে যাবার চেষ্টায় আছি সেখানে যেতে হ'লে বাঁচা চলে না।"

সবিস্ময়ে সুরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "যুদ্ধে যাচ্ছ না কি হে?"

হাসিমুখে প্রবীর বললে, "যুদ্ধেই বটে; তবে রণক্ষেত্রের যুদ্ধে নয়,—জীবন-যুদ্ধে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে সুরেশ বললে, "হেঁয়ালির ভাষা ত্যাগ করে, কী হয়েছে বল দেখি?"

"টি. বি. হয়েছে।"

চমকে উঠল সুরেশ; বললে, "টি. বি. হয়েছে? কার টি. বি. হয়েছে হে?"

প্রবীর বললে, "অবশ্য আমার।"

"তোমার?"—সুরেশ হাসতে আরম্ভ করলে।

স্মিতমুখে প্রবীর জিজ্ঞাসা করলে, "হাসছ যে?"

সুরেশ বললে, "হাসছি টি. বি.'র বাসাখানি দেখে। পরিপুষ্ট, নধর, মসৃণ! এমন বাসা বড়লোক ব্লাড্‌প্রেসারের হলে মানায়; গরিব টি. বি.'র এ রকম বাসা হয় না।"

প্রবীর বললে, "তা হয় সুরেশ। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা অসম্ভব নয়। ভবনদীর পরপারে আমাকে পৌঁছে দেবার জন্যে যাঁরা আমার ফুসফুসের মধ্যে তৎপর হয়েছেন, এখন তাঁদের উদ্যোগপর্ব। এখন তাঁরা নিজেদের জন্যে ঘাঁটি বাঁধতে ব্যস্ত; সে কার্য শেষ হলে ধ্বংসের কার্যে প্রবৃত্ত হবেন। তখন দিন-দিন এই বপু তনুতে পরিণত হতে থাকবে; যে বাসার কথা বলছিলে, তার কাঠে ধরবে ঘুণ, চুন-বালিতে নোনা; তার এলামটির চাঁপাফুলের রঙ দেখতে দেখতে ফ্যাকাসে মেরে আসবে!" বলে হাসতে লাগল।

প্রবীরের কথা শুনতে শুনতে সুরেশ ঈষৎ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। প্রবীর তার বাল্যবন্ধু, এক গ্রামবাসী। উভয়ে একসঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতায় এক বাসায় বাস করে লেখাপড়া শেষ করে। এম. এ. পাশ করে সুরেশ মোটা মাহিনায় একটা সওদাগরী অফিসে চাকরি করছে। প্রবীর এম. এস্‌-সি. পাশ করে দেশসেবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনা নিয়ে গ্রামে ফিরে গেছে। চাকরি সে করবে না, জমিদারি চালাবারও বিশেষ ইচ্ছে তার নেই; সুবিধা মতো দাম পেলে জমিদারি বিক্রয় করে দেবে। তার মনের একমাত্র বাসনা গাছ-পালা, জড়ি-বুটি, ফল-মূল, অম্ল-ক্ষার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জননী ধরিত্রী যে অপরিমিত কল্যাণ দান করবার জন্য সতত উদ্যতহস্ত, পরিপূর্ণভাবে

তা গ্রহণ করবার জন্য গ্রামের পাশে এক বিরাট ভেষজ-কারখানা প্রতিষ্ঠিত করবে। এই কারখানায় যে-সকল রাসায়নিক সামগ্রী প্রস্তুত হবে, তা বাংলা দেশের চাহিদা মিটিয়ে সারা ভারতবর্ষে, এমন কি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। এ যদি সে করতে পারে, তবেই তার রসায়নশাস্ত্রে এম. এস-সি. পাশ করা সার্থক; অন্যথা ভস্মে ঘি ঢালা হবে।

সুরেশ জানে, প্রবীর বাজে কথা বলবার মানুষ নয়; অকারণ ভয় পাবার মতো দুর্বলতাও তার নেই। তাই তার কথায় ঈষৎ চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে বললে তোমাকে, তোমার টি. বি. হয়েছে ?"

স্মিত মুখে প্রবীর বললে, "দুজন। প্রথমত আমার অনুমান-শক্তি, দ্বিতীয়ত কানাই ডাক্তার।"

হেসে উঠে সুরেশ বললে, "তোমার অনুমান শক্তি! তুমি একজন ডাক্তার নাকি প্রবীর ?"

প্রবীর বললে, "মেডিক্যাল কলেজের ডিপ্লোমা পাওয়া ডাক্তার নই, কিন্তু বিধাতার হাত থেকে রোগ-নির্ণয়ের ক্ষমতা-পাওয়া ডাক্তার। সে কথার প্রমাণ কয়েকবারই দিয়েছি। কিন্তু আমার কথা না-হয় বাদই দিলাম, কানাই ডাক্তার তো এম. বি. পাশ করা ডাক্তার! আমার পূর্ব ইতিহাস আর রোগের লক্ষণ শুনে বহুক্ষণ ধরে আমাকে পরীক্ষা করে দেখে, তার আর বিশেষ কিছু সন্দেহ নেই। তবে সে বলে, একেবারে সূত্রপাত।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "পূর্ব ইতিহাস কী তোমার ?"

প্রবীর বললে, "আমার বড় মাসিমার ছোট জামাই হরিপদর বাড়াবাড়ি অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। আমার মাসতুত বোন প্রতিভা আমাকে যাবার জন্যে কান্নাকাটি করে লিখেছিল। শুনেছিলাম হরিপদ অনেক দিন ধরে কালাজ্বরে ভুগছে। গিয়ে দেখি, কালাজ্বর নয়, যক্ষ্মা; প্রতিদিন ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে। কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করাতে কবিরাজ বললে, অনেক আগে কালাজ্বর বলে সন্দেহ হয়েছিল, গত ছ মাস যক্ষ্মার চিকিৎসা চলছে। আমার যাবার দিন সাতেক পরে হরিপদ মারা গেল। মারা যাবার আগের দিন সে আমার দু হাত চেপে ধরে বলেছিল—'প্রবীর, তোমার ওপর অনেক বোঝা চাপিয়ে গেলাম ভাই।' বাড়ি ফিরে আসবার চার-পাঁচ দিন পরেই বুঝতে পারলাম, হরিপদ আমার ওপর শুধু প্রতিভাদের ভারই চাপিয়ে যায় নি, তার ব্যাধির ভারও চাপিয়ে গেছে।"

"কী করে বুঝলে ?"

"লক্ষণ দেখে। শরীর ম্যাজম্যাজ করে, কোনও জিনিসে উৎসাহ পাই নে, দুর্বলতা বোধ করি, খিদে কমে গেল, প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা জ্বরভাব-জ্বরভাব মনে হয়।"

"এখনও হয় ?"

"হ্যাঁ, এখনও হয়।"

"কতটা করে জ্বর ওঠে?"

"থার্মোমিটারে জ্বর ওঠে না, অথচ মাথা টিপ-টিপ করে, চোখ জ্বালা করে, ঘন-ঘন হাই ওঠে। একেই তো বলে সর্বনেশে চোরা-জ্বর, যা ভেতরে ভেতরে শরীরকে খাক্ করে দেয়।"

"গয়েরের সঙ্গে কখনো রক্ত-টক্ত দেখতে পেয়েছিলে?"

"তা পাই নি, তবে গয়েরে আমি রক্তের গন্ধ পাই সুরেশ।"

গম্ভীর মুখে সুরেশ বললে, ও রক্তর গন্ধ নয়।"

"তবে?"

"ভয়ের গন্ধ।"

হো-হো করে প্রবীর উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। বললে, "ও ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, পরীক্ষা করে দেখার পর কানাই ডাক্তার যখন পনেরো আনা সন্দেহ প্রকাশ করলে, তখন বাকি এক আনাকে সান্ত্বনার এক আনা মনে করে মনটা একটু বিচলিত হয়ে উঠেছিল। যখন মনে হলো অবিলম্বে ছেড়ে যেতে হবে এই বাইশ বছরের যৌবনোজ্জ্বল স্বপ্নভরা জীবন, এই দুঃখময় বাংলা দেশ আর দুঃখের নাগপাশ থেকে তাকে মুক্ত করবার দুর্বার সংকল্প, এই আকাশ-বাতাস গন্ধ-গানভরা পৃথিবী—"

সুরেশ যোগ করে বললে, "আর—"

স্মিতমুখে প্রবীর বললে, "হ্যাঁ, আর,—তখন অকস্মাৎ এমন একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম যা সত্যিই অদ্ভুত। চন্দ্র-সূর্য ছাড়া আর একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যে আমাদের অগোচরে পৃথিবীর কোনও এক জায়গায় জ্বলে, আগে তা জানতাম না। ফস করে কে সেটা নিবিয়ে দিলে। শুধু চতুর্দিকই নয়, চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত ঝাপসা হয়ে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙবার পর চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। মরতে যদি একান্তই হয় তো হাসিমুখে বীরের মতো মরাই ভালো। ভাবলাম, ময়মনসিং শহরে গিয়ে কোন ভাল ডাক্তারের পরামর্শ নিই। কানাই ডাক্তার বললে, কোন লাভ হবে না তাতে। সে ডাক্তারের পরামর্শের ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকা চলবে না, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যেতেই হবে। সুতরাং অনর্থক সময় নষ্ট না করে অবিলম্বে কলকাতায় গিয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করাই বিধেয়।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এখানে?"

কলিকাতার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের নাম করে প্রবীর বললে, "এঁরা যা বিধান দেবেন বিধিমতে তা পালন করব। যদি কোন যক্ষ্মা-নিবাসে গিয়ে চিকিৎসা করাতে বলেন তা হলে অবিলম্বে সেখানে চলে যাব। অর্থাৎ একজন honest soldier-এর মতো একটা good fight দেব; তাতেও যদি পরাজিত হই, হাসিমুখে যমরাজের সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করব।" বলে হাসতে লাগল।

"লক্ষ্মীবাবু।"

সুরেশের ঘরটি ডবল-শয্যার ঘর। কামরার অপর প্রান্তে তক্তপোশের ওপর আপাদমস্তক গায়ের কাপড়ে আবৃত হয়ে প্রবীরের অগোচরে একটি লোক শুয়ে ছিল, সে-ই লক্ষ্মীনারায়ণ। গায়ের কাপড়ের ভিতর থেকে সে উত্তর দিলে, "বলুন।"

"জেগে আছেন ?"

"দাঁড়ান, একটু ভেবে দেখে বলি।"

অল্প একটু হেসে উঠে সুরেশ বললে, "তা-ও বটে। প্রবীর নামে আমার এক বন্ধু এসেছে।"

"তা বুঝেছি।"

"আমাদের কথাবার্তা শুনেছেন ?"

"শুনেছি।"

"সব ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সব। জাপানী বোমা থেকে আরম্ভ করে যক্ষ্মা-নিবাস পর্যন্ত।"

এবার সুরেশ ও প্রবীর উভয়েই হেসে উঠল। সুরেশ বললে, "এ বিষয়ে আপনি কী বলেন ?"

"আমি বলি, ওসব বড় বড় ডাক্তার আপাতত জিইয়ে রেখে প্রথমে বিনোদ চাটুজ্জেকে দেখানো উচিত।"

সুরেশ বললে, "আমিও তাই বলি। দয়া করে আলোয়ানের ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে একবার বেরিয়ে আসুন তো। বোমা পড়বার ভয় আপাতত নেই। একটু পরামর্শ করা যাক।"

"তাই করা যাক।" বলে দু হাত দিয়ে গায়ের কাপড়টা পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে সুরেশদের নিকটে এসে ব'সে লক্ষ্মীনারায়ণ বললে, "নমস্কার প্রবীরবাবু!"

দু হাত যুক্ত করে ব্যস্ত হয়ে প্রবীর বললে, "নমস্কার।"

লক্ষ্মীনারায়ণ বললে, "আপনি যখন আপনার কাহিনী বলছিলেন, তখন আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন আমার কাহিনীই আপনার মুখ থেকে শুনছি। আপনার কাহিনী আর আমার কাহিনী অবিকল এক; তফাত শুধু আপনি দিন সাতেক যক্ষ্মা-রোগীর সেবা করেছিলেন, আর আমি করেছিলাম মাস সাতেকেরও বেশি। বিনোদ চাটুজ্জেকে দেখিয়ে শিশি চারেক ওষুধ খেয়ে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছি মশায়। আপনি যে-সব ডাক্তারের নাম করছিলেন, বিদ্যেতে বিনোদ চাটুজ্জে তাঁদের কারোর চেয়ে কম নন; তবে বয়সে কম বলে অভিজ্ঞতায় হয়তো কিছু কম। কিন্তু অভিজ্ঞতা বেশি হলেই যে ডাক্তার মারাত্মক হয় না, তার দুর্দান্ত প্রমাণ আমাদের গ্রামের রাজকুমার ডাক্তার।" বলে হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ তিনজনে মিলে একটা গভীর পরামর্শ চলল। লক্ষ্মীনারায়ণের মুখে

তার নিজের কথা এবং আরও কয়েক জন রোগীর বিষয়ে বিনোদ ডাক্তারের বিস্ময়জনক রোগনির্ণয় এবং সুচিকিৎসার কাহিনী শুনে বিনোদ ডাক্তারকে দেখানোই প্রবীর স্থির করে ফেললে। একই ব্যাধিতে পীড়িত রোগী নিজমুখে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তার চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কিছু হতে পারে না।"

সুরেশ বললে, "স্বচক্ষেই তো দেখলাম লক্ষ্মীনারায়ণবাবুর দিন দিন তলিয়ে যাওয়া, আর দেখতে দেখতে কয়েক দিনে ভেসে ওঠা। সুতরাং ডক্টর বিনোদ চ্যাটার্জি—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কাল শনিবার সকাল সকাল ছুটি। কালই আপনি প্রবীরকে ডক্টর চ্যাটার্জির চেম্বারে নিয়ে যান লক্ষ্মীবাবু।"

গাত্রোত্থান করে লক্ষ্মীনারায়ণ বললে, "যথা আজ্ঞা,—তাই হবে। দুই বন্ধুতে আপাতত আড্ডা জমান।"

সহাস্যমুখে প্রবীর বললে, "এখন কিন্তু আমরা তিন বন্ধু।"

লক্ষ্মীনারায়ণ বললে, "নিঃসন্দেহ। তৃতীয় বন্ধু কিন্তু উপস্থিত চলল আলোয়ানের ট্রেঞ্চের মধ্যে আশ্রয় নিতে। জাপানী বোমার ভয় না থাকতে পারে, কিন্তু আবহাওয়া-রাজ যে দুর্দান্ত শৈত্যের বাষ্প ছাড়তে আরম্ভ করেছেন, তাও কম মারাত্মক নয়।"

লক্ষ্মীনারায়ণের কথা শুনে প্রবীর ও সুরেশ হাসতে লাগল।

দুই

পরদিন অপরাহ্নে প্রবীরকে নিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ ডক্টর চ্যাটার্জির চেম্বারে উপস্থিত হলো। বেয়ারাকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে উভয়ে অপেক্ষা-কক্ষে গিয়ে উপবেশন করল।

প্রশস্ত ঘর। রোগী এবং রোগীর সঙ্গীদের বসবার জন্য অনেকগুলি সোফা এবং চেয়ার আছে। মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ গোলাকার টেবিল। অপেক্ষকদের অবসর-বিনোদনের জন্য তার উপর মাসিক, পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক সচিত্র পত্রসমূহ স্তূপাকারে সজ্জিত।

অপেক্ষকদের মধ্যে নানা লোকের নানা প্রকারের অবস্থা। আত্মীয়ের আরোগ্য সম্বন্ধে যে প্রায় হতাশ হয়েছে, বিমর্ষমুখে নতমস্তকে সে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে; যে সৌভাগ্যবান নিশ্চিত আরোগ্যের অভয়বাণী পেয়েছে, সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য সে ব্যস্ত, যুদ্ধে জাপানের জয়-পরাজয় সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট অভিমত শোনাবার ব্যগ্রতা তার আছে; সংশয়ের অনিশ্চয়তার দোলায় যে দোলায়িত, দ্রুতগতিতে সে ছবির পাতা উল্টে যাচ্ছে, চোখে আর ছবিতে কতটা বোঝাপড়া হচ্ছে, তা বোধ করি সে নিজেও ঠিক বলতে পারে না; আর

প্রবন্ধের মর্মকথার মধ্যে যে নিবিষ্ট হয়েছে সে সম্ভবত এসেছে আরোগ্যের পর fitness-এর সার্টিফিকেট নিতে।

আধ ঘণ্টাটাক পরে লক্ষ্মীনারায়ণ ও প্রবীরের ডাক পড়ল। লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখে বিনোদ চাটুজ্জে চিনতে পারলেন; বললেন, "কী খবর আপনার? কেমন আছেন?"

লক্ষ্মীনারায়ণ বললে, "আমি ভালো আছি।" প্রবীরকে দেখিয়ে বললে, "অসুখ আমার বন্ধুর।"

"কী অসুখ?"

"অনেকটা আমারই মতো।"

সহাস্য মুখে ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "তা হলে তো কোনও অসুখই নয়।"

প্রবীর বললে, "দেশে যে ডাক্তার আমাকে দেখছিলেন, এখানকার ডাক্তারকে দেখাবার জন্যে তিনি একটা রিপোর্ট দিয়েছেন।" বলে পকেট থেকে একটা খাম বার করে ডক্টর চ্যাটার্জির হাতে দিলে।

নিবিষ্টচিত্তে রিপোর্ট পাঠ করে ডক্টর চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার ভগ্নীপতির সঙ্গে খাবার-দাবারের ছোঁয়াছুঁয়ি কিছু হতো না তো?"

প্রবীর বললে, "জানত তো হতো না; অজ্ঞাতসারে যদি হয়ে থাকে, বলতে পারি নে।"

"তেষ্টা পেলে রোগীর ঘরের গেলাসে জল-টল খেতেন?"

"না, তা খেতাম না।"

"কাছাকাছি মুখোমুখি হয়ে কথাবার্তা বলতেন?"

ঈষৎ চিন্তা করে প্রবীর বললে, "সাধারণত বলতাম না, তবে খুব যখন কষ্টের অবস্থায় কাছে ডেকে কিছু বলত, তখন বলতে হতো।"

"রাত্রে রোগীর ঘরে শুতেন?"

"পাশের ঘরে শুতাম; কিন্তু অবস্থা যখন সংকটাপন্ন হতো তখন দু-চার ঘণ্টাও রোগীর ঘরে কাটাতে হতো।"

আরও দু-চারটে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "আসুন, এবার আপনাকে পরীক্ষা করে দেখি।"

ঘরের এক কোণে একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে রোগী-পরীক্ষার শয্যা। তথায় প্রবীরকে নিয়ে গিয়ে শয্যার উপর শুইয়ে ডক্টর চ্যাটার্জি পরীক্ষা-কার্যে প্রবৃত্ত হলেন। প্রথমে তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টির দ্বারা ক্ষণকাল রোগীর আকৃতি পর্যবেক্ষণ করলেন; তারপর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আপাদমস্তক সকল স্থান সযত্নে পরীক্ষা করে দেখলেন। সর্বশেষে স্টেথোস্কোপের সাহায্যে রোগীর ফুস্‌ফুসের নিভৃততম প্রদেশে উপনীত হয়ে সুদূরপ্রসারী অনুসন্ধান-কার্যে সমাহিত হলেন। গভীর অভিনিবেশ-সহকারে কান পেতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কথোপকথন শুনতে লাগলেন; বুক পিঠ পাঁজরা সকল প্রদেশের সংবাদ আহরণ শেষ হলে প্রবীরকে

নিয়ে পূর্বস্থানে ফিরে এসে বললেন, "নাঃ, ও-সব কিছু নয়। ওষুধ লিখে দিচ্ছি, দু-চার শিশি খেলেই ভালো হয়ে যাবেন।"

চিঠির কাগজের দুই পৃষ্ঠা ভরে প্রেসক্রিপশন ও উপদেশাদি লিখে প্রবীরের হাতে দিয়ে সহাস্যমুখে ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "ভয় নেই, ঠিক আছেন।"

উৎফুল্লমুখে প্রবীর জিজ্ঞাসা করলে, "এক্স-রে করতে হবে কি ডক্টর চ্যাটার্জি ?"

ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "নিশ্চয় হবে। ঐতে সব লিখে দিয়েছি। আপনার ক্ষেত্রে তো একজন ডাক্তার সন্দেহ করছেন, এ রোগের কেউ স্বপ্ন দেখলেও আমরা এক্স-রে করাই।"

প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ করে ডাক্তারকে দক্ষিণা দিয়ে প্রবীর ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রস্থান করলে।

তিন

দিন ছয়েক পরে প্রবীর একাই ডক্টর চ্যাটার্জির চেম্বারে এসে উপস্থিত হলো।

প্রবীরকে দেখে ডক্টর চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছেন ?"

প্রফুল্লমুখে প্রবীর বললে, "ভালো আছি।"

"এক্স-রে তো করিয়েছেন দেখছি।"

হাতের বৃহৎ খাম থেকে এক্স-রে প্লেট বার করতে করতে প্রবীর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, করিয়েছি। তাঁরা বললেন, কোথাও কিছু চিহ্ন নেই। দেখবেন তো আপনি ?"

স্মিতমুখে ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "খরচপত্র করে করালেন, একবার দেখতে হবে বই কি।" তারপর এক্স রে প্লেটখানা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে দেখে প্রবীরের হাতে প্রত্যার্পণ করে বললেন, "তবে আর কি! এখন নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরে যান। দেহে একটু শক্তি সামর্থ্য পেয়েছেন তো ?"

"তা পেয়েছি।"

সহাস্যমুখে বিনোদ ডাক্তার বললেন, "এক্স-রে প্লেট পাবার পর থেকে ?"

ব্যগ্র কণ্ঠে প্রবীর বললে, "আজ্ঞে না, তার আগে থেকেই, আপনার অভিমত পাবার পর থেকে। ডক্টর চ্যাটার্জি!"

"বলুন।"

"দেশ থেকে আপনাকে এক-আধখানা চিঠি লেখবার দরকার হতে পারে হয়তো।"

কিসের জন্যে ?"

"যদি কোন উপদেশ অথবা পরামর্শ নেবার দরকার ঘটে।"

"তা লিখবেন।"

"আপনার সময় অতিশয় মূল্যবান, চিঠির উত্তর দিতে সে সময়ের খানিকটা অপব্যয় নিশ্চয়ই হবে, সে জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ যৎসামান্য আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি।" বলে কুণ্ঠিতভাবে প্রবীর একখানা এক শ' টাকার নোট টেবিলের উপর দিয়ে ডক্টর চ্যাটার্জির সম্মুখে চালিয়ে দিলে।

যে পথে নোটখানা এসেছিল ঠিক সেই পথে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে হাসিতে হাসতে ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "ফিজ নিই, বকশিস নিই নে।"

ব্যগ্র অপ্রস্তুত কণ্ঠে প্রবীর বললে, "না না, ডক্টর চ্যাটার্জি, আমি তেমন কিছু নিশ্চয়ই mean করি নি ; তেমন কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না।"

তেমনই হাসতে হাসতে ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "ঠিক আছে, দরকার পড়লে চিঠি লিখবেন। আপনার বিয়ে হয়েছে প্রবীরবাবু?"

স্মিতমুখে প্রবীর বললে, "আজ্ঞে না, হয় নি।"

"দেশে ফিরে গিয়ে ঘটক লাগান,—বিয়ে করুন।"

"বিয়ে আমি করতে পারি?"

"নিশ্চয় পারেন। না পারবার মতো কোনও অপরাধ তো আপনি করেন নি।"

সহসা প্রবীরের চক্ষের সম্মুখে ধরিত্রী পুনরায় নূতন আলোক, নূতন গীতি, নূতন গন্ধ, নূতন অনুভূতি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চন্দ্র-সূর্যের অতিরিক্ত যে তৃতীয় জ্যোতিষ্ক ভীষণ ব্যাধির আশঙ্কায় একদিন নিবে গিয়েছিল, দ্বিগুণ প্রভায় তা আবার জ্বলে উঠল। তবে আর কি!

অমিয়া, তবে আর কি! তোমার আমার মিলনের পথে আর কোন বাধা রইল না। তোমার দুর্বার প্রেম নিষ্ফল হবার নয়। সেই প্রেমেরই কল্যাণে দুঃসহ সংশয়ের হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছি।

"বাড়ি ফিরবেন কবে?"

ডক্টর চ্যাটার্জির কণ্ঠস্বরে প্রবীর ক্ষণকালের চিন্তাস্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে উঠল ; বললে, "গিরিডিতে আমার এক মামা থাকেন, আমাকে যাবার জন্যে বিশেষ করে লিখেছেন। এত কাছাকাছি যখন এসে পড়েছি, ভাবছি দিন দশ-পনেরো সেখানে কাটিয়ে যাই। অন্য পরিবারের মধ্যে বাস করায় আমার পক্ষে আর কোনও আপত্তি নেই তো ডক্টর চ্যাটার্জি?

ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "কিছু মাত্র না।"

ডক্টর চ্যাটার্জিকে ফিজ এবং সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিয়ে প্রসন্ন অন্তঃকরণে প্রবীর প্রস্থান করলে।

চার

দশ-পনেরো দিনে গিরিডি থেকে ফেরা হয়ে উঠল না। মাসের শেষের দিকে একদিন প্রবীর নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করলে।

গৃহে পৌঁছে সে অবগত হলো, কাশীধামে কানাই ডাক্তারের মায়ের মৃত্যু হওয়ায় কানাই কাশী গেছে, তথায় শ্রাদ্ধাদি সমাপন করে তারপর দেশে ফিরবে।

সন্ধ্যার পর প্রবীর উৎফুল্ল হৃদয়ে অমিয়াদের গৃহাভিমুখে রওয়ানা হলো। কানাই ডাক্তার ছাড়া একমাত্র অমিয়াই তার অসুখের কথা জানে। কলিকাতা রওয়ানা হবার আগের দিন প্রবীর এই দুঃসংবাদ তাকে জানায়। শুনে অচিন্তিত বিপদের উৎকট আতঙ্ক ও নৈরাশ্যে অমিয়া একেবারে ভেঙে পড়েছিল। আজকের শুভ সংবাদে অমিয়ার সেই দুশ্চিন্তা-মলিন মুখ আবার কিরূপ উৎফুল্ল হয়ে উঠবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে প্রবীর পথ চলছিল।

একই গ্রামে বাস বলে বাল্যকাল হতেই অমিয়ার সহিত তার পরিচয়। উভয়ের কলিকাতায় অধ্যয়নকালে এই পরিচয় ক্রমশ অন্তরঙ্গতায়, এবং অন্তরঙ্গতা থেকে শেষ পর্যন্ত সুগভীর প্রেমে পরিণতি লাভ করে। প্রবীর যে-সময়ে এম. এস-সি. পড়ে, সেই সময়ে অমিয়া গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতায় তার মাতুলালয়ে আই. এ. অধ্যয়ন করতে আসে। রূপে, গুণে, অর্থে, বিদ্যায়, চরিত্রে প্রবীরের মতো দুর্লভ পাত্রের সহিত অমিয়ার বিবাহ শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, পরন্তু সুনিশ্চিত ব্যাপার জানা থাকায়, অমিয়ার মামার বাড়িতে উভয়ের মেলামেশার সুযোগ হতে পেরেছিল অবাধ।

কিন্তু গোল বেধেছিল একটু, এই মাতুলালয়েই কমলা নামে একটি পরমা সুন্দরী এবং সপ্রতিভ মেয়েকে নিয়ে। অমিয়ার এক মামাতো বোনের, সে ছিল সহপাঠিনী। সর্বদাই সে এই গৃহে বেড়াতে আসত, এবং দৈবযোগে এক-আধ দিন প্রবীরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও হয়ে যেত। এই দৈবযোগের আবর্তন ক্রমশ এরূপ অবিলম্বিত হতে লাগল যে এর মধ্যে মানুষের ইচ্ছাযোগের অস্তিত্বও সন্দেহ করলে বিশেষ-কিছু অন্যায় হয় না দেখা-সাক্ষাতের আনুকূল্যে পরিচয়ও হয়ে চলল ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর। পরিচয় স্থাপন করবার বিষয়ে কমলা মেয়েটির শুধু যে একটা সহজ দক্ষতা ছিল তাই নয়, বর্তমান ক্ষেত্রে সে একটা বিশেষ সুযোগও খুঁজে পেয়েছিল। সে ছিল আই. এস-সি. ক্লাসের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী, সুতরাং একজন প্রথম শ্রেণীর আর্টসের ছাত্রীকে পিছনে ফেলে রেখে এম. এস-সি. ক্লাসের বিজ্ঞানের ছাত্রের সঙ্গে সে অবলীলাক্রমে আলাপ জমাত। তার আচরণের দ্বারা প্রকাশ পেত, বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসাবে প্রবীরের উপর তার একটা অগ্রাধিকার থাকা স্বাভাবিক।

কমলার এইরূপ প্রবল আবির্ভাবের দাপটে অমিয়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল।

তার অন্তঃকরণ অনুদার ছিল না, কিন্তু প্রণয়ের ক্ষেত্রে ঔদার্যেরও কোনও অর্থ হয় না। দিনে দিনে কমলার প্রতি তার মন বিরূপ হয়ে উঠছিল। কিন্তু মনের এই অনতি-উগ্র বৈরূপ্য সহসা সে-দিন তিক্ত বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিল, যেদিন সে প্রথম জানতে পারে প্রবীরের সঙ্গে কমলার বিবাহ-প্রস্তাবের কথা। সেদিন শান্ত ভালো মানুষ অমিয়া তার মনের স্থৈর্য ধরে রাখতে পারে নি। আশ্বাস দিয়ে প্রবীর তাকে বলেছিল, ভয় পাও কেন অমিয়া ? সত্যি সত্যিই তুমি যে আমার স্ত্রী, শুধু মন্ত্রপাঠ করি নি বলেই সে বিশ্বাস হারাও কেন ? এ আশ্বাসে অমিয়াঃ মনের সন্ত্রাস হয়তো খানিকটা অপসৃত হয়েছিল, কিন্তু বিদ্বেষ এত সহজে যায় না।

অমিয়াদের গৃহে পৌঁছে প্রবীরের প্রথম দেখা হলো অমিয়ার মা সুরবালার সহিত। প্রবীরকে দেখে সাদরে তাকে আহ্বান করে সুরবালা বললেন, "কবে এলে বাবা, মামার বাড়ি থেকে ?"

সে কথার উত্তর দিয়ে প্রবীর বললে, "মেসোমশাই কোথায় মাসিমা ?"

সুরবালা বললেন, "তিনি নন্দীপুরে গিয়েছেন।"

"আজই ফিরবেন তো ?"

"হ্যাঁ, আজই ফিরবেন। তবে বেশি রাত হতে পারে।"

"অমিয়া কোথায় ?"

সুরবালা বললেন, "তুমি মাঝের ঘরে গিয়ে বস, আমি অমিয়াকে ডেকে দিচ্ছি।"

মাঝের ঘরে প্রবেশ করে একটা চেয়ারে বসে প্রবীর একখানা ছবির বই নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে, এমন সময়ে অমিয়া প্রবেশ করলে। প্রবীরের কাছে এসে নত হয়ে করজোড়ে প্রণাম করে একটা চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করলে, "কবে এলে প্রবীরদা ?"

সহাস্যমুখে প্রবীর বললে, "কাল সন্ধ্যায়। দুঃসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলাম অমিয়া, সুসংবাদ এনেছি তোমার জন্যে।"

অমিয়ার মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। "সুসংবাদ এনেছ ? তা হলে ও-সব কিছু নয় তো ?"

"একেবারে কিছু নয়। মস্ত বড় ডাক্তার বিনোদ চাটুজ্জে,— পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে তিনি বলেছেন, ফুসফুস একেবারে নির্দোষ ; এক্স-রে করিয়েও তাই প্রতিপন্ন হয়েছে। তোমারই পুণ্যে অত বড় সাংঘাতিক রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি অমিয়া।"

প্রফুল্ল মুখে অমিয়া বললে, "বাঁচা গেল।" তারপর দু হাত যুক্ত করে ঈষৎ নতমস্তকে প্রবীরের অলক্ষিতে কী একটা করলে। হয়তো প্রণামই করলে কোন ঠাকুরদেবতার উদ্দেশে।

স্মিতমুখে প্রবীর বললে, "বিনোদ ডাক্তার কী বলছিলেন জান অমিয়া ?

বলছিলেন, দেশে ফিরে গিয়ে ঘটক লাগিয়ে বিয়ে করুন। মনে মনে উত্তর দিয়েছিলাম, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ ঘটক হয়ে যার বিয়ে দিয়েছেন, সে আবার ঘটক লাগাবে কেন ?" বলে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

"অমিয়া!"

জিজ্ঞাসু নেত্রে অমিয়া প্রবীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"এবার তা হলে চল।

"কোথায় ?"

"আমাদের বাড়ি।"

মৃদু হাস্যের একটা ক্ষীণ আভা অমিয়ার অধরপ্রান্তে দেখা দিলে; বললে "বিয়ের কথা বলছ প্রবীরদা ?"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রবীর বললে, "অতি অবশ্য বলছি। আজই মাসিমার সঙ্গে কথা কয়ে বিয়ের দিন স্থির করে যাব। সামনের ফাগুন মাসেই কোন শুভদিনে বাড়িতে লক্ষ্মীপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

এক মুহূর্ত নীরবে কি চিন্তা করে অমিয়া বললে, "আমি বলি প্রবীরদা, বিয়ে এখন কিছু দিন থাক।"

বিস্মিত কণ্ঠে প্রবীর বললে, "কেন ?"

নিমেষের জন্য প্রবীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অমিয়া বললে, "রোগটা তো বিশ্রী প্রবীরদা,—এ রোগে বিয়ে—"

অমিয়ার বাক্যের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে অধীরোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রবীর বললে, "রোগ তো বিশ্রী নিশ্চয়ই; কিন্তু রোগ কোথায়, অমিয়া! রোগ তো আমার ফুসফুসে ছিল না—ছিল আমার মস্তিষ্কে। ডাক্তার নিশ্চিত হয়েছেন, আমি নিশ্চিত হয়েছি, তুমি হতে পারছ না কেন ?"

অমিয়া বললে, "কানাই ডাক্তার বলেন, এ রোগে যত সাবধানই কেউ হোক না কেন, অতি-সাবধানী তাকে বলা চলে না।"

এবার প্রবীর প্রচণ্ড ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, "চুলোয় যাক তোমার কানাই ডাক্তার। এ সাবধান তুমি কার জন্যে হতে বলছ ?—আমার জন্যে ?—না, তোমার নিজের জন্যে ?"

মৃদু কণ্ঠে অমিয়া বললে, "তুমি রাগ করছ প্রবীরদা, কিন্তু নিজের জন্যে সাবধান হওয়া কি খুব একটা গর্হিত কাজ ? লোকে কথায় বলে, সাবধানের বিনাশ নেই।"

প্রবীর বললে, "খুব ভালো কথা। অতিসাবধানী হয়ে তুমি অবিনশ্বর হও। একটা কথা তোমাকে বলি অমিয়া, প্রবীর রায় সব কিছু করতে পারে, পারে না শুধু বিয়ের জন্যে সাধাসাধি করতে। সুতরাং বিদায়।" বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

তারপর পুনরায় চেয়ারে বসে পড়ে বললে, "আরও একটা কথা বলে যাই।

যে আঘাত অনর্থক তুমি আমাকে দিলে, তার প্রতিশোধ আমি নোব। কেউটে সাপকে বর্শা দিয়ে বিঁধলে কেউটে সাপ কী করে জান? নিজের দেহ নিজে দংশন করে। আমিও তাই করব। এই ফাগুন মাসেই বিয়ে করব। কাকে, বলতে পার?"

স্খলিত মৃদু কণ্ঠে অমিয়া বললে, "বোধ হয় কমলাকে।"

প্রবীর বললে, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, কমলাকে। তাতে প্রতিশোধটা একটু বেশি রকম রঙিন হয়ে উঠবে না কি অমিয়া?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে অমিয়া বললে, "মনে তো হয় না। আমি যখন হাতে পেয়ে তোমাকে ছেড়ে দিলাম, তখন কমলাকেই বিয়ে কর আর অমলাকেই কর, তাতে আমার এমন কী এসে যায়?"

প্রবীর বললে, "যায় বইকি অমিয়া, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলে কিছু ইতর-বিশেষ হয়ই।" এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ নেত্রে অমিয়ার প্রতি চেয়ে থেকে পুনরায় বললে, "কোনও জায়গায় তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে কি অমিয়া?"

নতনেত্রে অমিয়া নিঃশব্দে বসে রইল।

"বল না, লজ্জা কিসের!"

মৃদুস্বরে অমিয়া বললে, "এক জায়গায় হচ্ছে।"

"পাকাপাকি হয়ে গেছে?"

"প্রায়।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রবীর বললে, "বাঃ। বাঃ! তবে আর দুঃখ কিসের? তা হলে তো অমিয়া-নাটক শেষ পর্যন্ত মিলনান্ত নাটকেই দাঁড়াবে। প্রবীরের কিন্তু সে নাটকের চতুর্থ অঙ্কেই নিষ্ক্রমণ।" বলে প্রস্থানোদ্যত হলো।

"প্রবীরদা!"

ফিরে দাঁড়িয়ে প্রবীর বললে, "আবার পেছু ডাক কেন?"

"একটু দাঁড়াও, একটা প্রণাম করি।"

অমিয়ার কথা শুনে হেসে উঠে প্রবীর বললে, "ওহো-হো। তাও তো বটে! এও যে অভিনয়ের একটা দস্তুর! ছেড়ে যাচ্ছিল।"

প্রণাম করে উঠে মৃদু হেসে অমিয়া বললে, "অমিয়া-নাটক ভারি কঠিন নাটক প্রবীরদা। অনেক শক্ত অভিনয় এতে আমাকে করতে হলো।"

"আর, করেছও চমৎকার। একটা স্বুবর্ণপদক দাবি করতে পার। প্রেম নেই, প্রণয় নেই, ভালোবাসা নেই; অথচ আছে তার পরিচ্ছন্ন অভিনয়!"

প্রজ্বলিত হুতাশনের মতো প্রবীর সবেগে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

পাঁচ

সে রাত্রে এক মুহূর্তও প্রবীর চোখের পাতা বুজতে পারলে না। সারা রাত্রি অনিদ্রায় কেটে গেল অগ্নিগর্ভ চিন্তার দহনে। কী স্থূল আর ক্লেদাক্ত এই নিষ্প্রাণ পৃথিবীখানা! প্রবীরের ইচ্ছা হচ্ছিল, দু হাতে চেপে ধরে এই নির্মম পৃথিবীটাকে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দেয়।

সহসা এক সময়ে মনে পড়ে গেল কমলাকে। ঘন লালসার মতো একটা-কোন আঠালো বস্তু তার মনকে অধিকার করে বসল। অধীরোচ্ছ্বত হৃদয়ের মধ্যে চপল সুরে ধ্বনিত হতে লাগল,—এস, এস, কমলা। তোমার দেহ আর রূপ নিয়ে এস। মন কিন্তু সযত্নে আবৃত করে রেখো রূপের স্বর্ণপেটিকার মধ্যে। মনের কারবারে দ্বিতীয় বার দেউলে হবার আশঙ্কায় আর কিছুতেই প্রবেশ করা নয়। অপমানকর অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানের ক্ষোভে ভাবপ্রবণ প্রবীরের সমস্ত অন্তঃকরণ বিষাক্ত হয়ে উঠল।

সকালে উঠেই সে আত্মনিয়োগ করলে প্রতিশোধের ব্যবস্থা-বিধানে। হিংসা-কঠিন মনকে শান্ত হবার অবকাশ দেওয়া হবে না। প্রতিশোধের যে নিষ্ঠুর অস্ত্র আঘাত করবার জন্য উদ্যত হয়েছে, তার দু দিকে দুই ফলক; এক দিকের ফলক বিদীর্ণ করবে অমিয়াকে, অপর দিকের নিজেকে। প্রেম পুড়ে গিয়ে তার ভস্ম থেকে হিংসার যে তীক্ষ্ণ অঙ্কুর উদ্গত হয়েছে, সযত্নে বর্ধিত করতে হবে তাকে।

প্রবীরের যে আত্মীয়ের দ্বারা কমলার পিতা প্রবীরের সহিত কমলার বিবাহের চেষ্টা করেছিল, তার কাছে লোক মারফৎ প্রবীর চিঠি পাঠালে। সে চিঠির উত্তরে অবিলম্বে প্রবীরের কর্মচারীর সহিত কমলার পিতা, প্রবীরের আত্মীয় এবং আরও কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত হলো প্রবীরকে আশীর্বাদ করবার জন্যে।

জমিদার-বাড়ির পাকা নহবৎখানায় নহবৎ বেজে উঠল। গ্রামের আকাশকে পরিব্যাপ্ত করে সানাইয়ের করুণ-মিষ্ট সুর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জমিদার-গৃহের সংস্কারকার্যে রাজমিস্ত্রি নিযুক্ত হলো। প্রজাদের বসবার জন্য বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রশস্ত চন্দ্রাতপ নির্মিত হবে; তার জন্য বাঁশ, শালের খুঁটি প্রভৃতি উপকরণ এসে পড়তে লাগল। বিবিধ কর্তব্যের ভার গ্রহণ করবার জন্য জমিদার-গৃহে হাজির হতে আরম্ভ করলে বিভিন্ন প্রজার দল। সমস্ত গ্রামখানা আনন্দ-কোলাহলে চকিত হয়ে উঠল। উৎসব-আয়োজনের এই গোলমালের মধ্যে আলো-অন্ধকার-মাখা এক ধূসর সন্ধ্যায় একদিন ছই-ঘেরা একখানা গরুর গাড়িতে আরোহণ করে অমিয়ার পিতা-মাতা ও অমিয়া কলিকাতার পথে রওয়ানা হলো।

কথাটা প্রবীরের অগোচর রইল না। তার অধরপ্রান্তে একটা নির্মম হাস্যের

অস্পষ্ট রেখা ঝিলিক মেরে গেল। মনে মনে সে বললে, পালিয়ে পরিত্রাণ পাবে মনে করেছ অমিয়া? ডাকঘরের কল্যাণে যথাসময়ে আমার মর্মন্তুদ বাণ তোমার কাছে উপস্থিত হবে।

বিবাহের দিন পাঁচেক পূর্বে প্রবীর অমিয়ার মামার বাড়ির ঠিকানায় সাদা খামে ভরে একখানা জমকালো-ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র অমিয়ার নামে পাঠিয়ে দিলে। চিঠির তলদেশে নিজহস্তে যোগ করলে,—"পালিয়ে গেলে অমিয়া? গ্রামে থাকলে কমলার বাসর-ঘরে তোমাকে টেনে নিয়ে এসে গান গাইয়ে ছাড়তাম। —প্রবীর।"

এই প্রবীরের মর্মন্তুদ বাণ।

এই চিঠির উত্তর অবশ্য প্রবীর প্রত্যাশা করে নি। এক মাসের অধিক হলো কমলার সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গেছে, এর মধ্যে অমিয়ার কোন সংবাদও সে পায় নি। একদিন কলিকাতার চিঠিপত্র দেখতে দেখতে হাতে পড়ল একটা খামে-মোড়া চিঠি। উপরের ঠিকানা অমিয়ার হাতের অক্ষরে। খাম থেকে চিঠি বার করে প্রবীর পড়তে লাগলে—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

প্রবীরদা, তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। তুমি যে শুধু লিখেছ, আমি সেখানে থাকলে কমলার বাসর-ঘরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে গান গাইয়ে ছাড়তে,—নাচিয়ে ছাড়তে, সে কথাও যে লেখ নি, তার জন্যে আমি সত্যিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। নির্মম হতে গিয়েও তুমি আমার প্রতি খানিকটা করুণা করেছ।

তোমার বিয়ে তো হয়ে গেল। আমিও ফাঁকি পড়ছি নে; আমার বিয়ের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। রাজরাজড়ার ঘরে আমার বিয়ে। পাত্র কে জান? দণ্ডপাণি শ্রীশ্রীযমরাজ। বাসর কোথায় হবে জান? গঙ্গার উপকূলে নিমতলার ঘাটে। তোমার বিয়েতে তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছ; আমি কিন্তু তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে সাহস পেলাম না। যা sentimental তুমি, আমার বাসর-ঘরে বসে হয়তো এমন শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়তে আরম্ভ করবে যে, আমার শ্বশুর-বাড়ি যাওয়ার সমস্ত পথটা তার বাষ্পে বিষিয়ে উঠবে।

তুমি সেদিন বলছিলে—এ সংসারে প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই। আছে প্রবীরদা, নিশ্চয় আছে। না যদি থাকত, সেদিন কি তোমার সামনে অমন 'পরিচ্ছন্ন' অভিনয় করতে পারতাম? যে দিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, তার আগে আমার তিন দিন রক্ত-বমি হয়ে গেছে। কানাই ডাক্তার আমাকে সংসারের সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। ভগবানের অসীম দয়ায় তুমি এই ভীষণ রোগের সম্ভাবনা থেকে মুক্তি লাভ করেছ; আমি কি তোমার সঙ্গে মাখামাখি করে আবার তোমাকে বিপদের মুখে টেনে আনতে পারি?

সুতরাং এখন বুঝতে পারছ, সে দিন যা-কিছু বলেছিলাম, সবই নিজের অসুখের কথা ভেবেই বলেছিলাম। তোমার অসুখের কথা ভেবে সাবধান হয়ে অবিনশ্বর হবে, এত সামান্ত তোমার অমিয়া নয়।

কমলাকে তুমি বিয়ে করায় আমি সত্যিই অতিশয় সুখী হয়েছি। এর দ্বারা আমার প্রতি তোমার গভীর প্রেমের মাপ জানতে পেরেছি। কমলার পরিবর্তে তুমি যদি অন্ত কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে, তা হলে ভারি গোলে পড়ে যেতাম। এ আমার অন্তরের কথা। মনে যেন ভেবো না, যাবার সময়ও চিঠিতে অমিয়া আর-একটা অভিনয় করে গেল।

এ জন্মে তোমাকে পেলাম না, পরজন্মে যেন পাই, এ রকম নাটুকেপনার আবদার তোমার কাছে করলাম না। এ জন্মেই তোমাকে পেয়েছি, তাই আমার এ-জন্মের দেবতার পদে প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছি।

লাবণ্যদিদি আমার অনুরোধ মতো এ চিঠিখানা মৃত্যুর পরদিন ডাকে ফেলবেন। সুতরাং তুমি যখন আমার এ চিঠি পাবে, তখন আমি ইহলোকের কেউ নই।

আমার শেষ অনুরোধ, এ চিঠিখানা প'ড়ে ছিঁড়ে ফেলে কার্বলিক সাবান দিয়ে বেশ ক'রে দু হাত ধুয়ে ফেলো। ইতি

তোমাব অমিয়া

* * *

প্রবীরের জীবনে চন্দ্র-সূর্যের অতিরিক্ত তৃতীয় জ্যোতিষ্ক আবার একবার নিবে গেল।

আশ্বিন ১৩৬০

বন্যার জল

কান্তিভূষণের বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর।

এই বয়সে সে যদি হেসে খেলে ইয়ার্কি মেরে দিন কাটাত, তা হলে অসঙ্গত কিছুই হতো না; বরং বয়োধর্ম পালন করাই হতো। কিন্তু সর্বপ্রকার চাপল্যের পথ সর্বতোভাবে পরিহার করে গুম্ফশ্মশ্রুপরিকীর্ণ সমস্ত মুখমণ্ডলে সে এমন নির্বিকল্প গাম্ভীর্যের জমাট বাঁধিয়েছে যে, তার ডিপার্টমেন্টের বড়বাবুর উদ্ধত বড়বাবুয়ানা পর্যন্ত কান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাতজোড় করে।

বস্তুত, কান্তিভূষণের প্রতি বড়বাবুয়ানা ফলাবার কোনও ফাঁকই বড়বাবু খুঁজে পায় না। কান্তি অফিসে আসে সকলের আগে; যায় সকলের শেষে এক মনে ঘাড় গুঁজে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে বুদ্ধিদীপ্ত নিপুণতার সঙ্গে দশটা-পাঁচটা কাজ করে; ছুটি নেই, কামাই নেই, লেট্ নেই। অফিসের বড় সাহেব

ড্রেকব্রকম্যান থেকে আরম্ভ করে ছোট সাহেব চেস্টারটন পর্যন্ত ইংরেজ কর্মচারিগণ 'ক্যান্টি' বলতে অজ্ঞান।

গলাবন্ধ কোট, কোঁচা-তোলা ধুতি ও ভোজপুরী নাগরা পরিধান করে কান্তি অফিস যাতায়াত করে। তার মাথায় ঘাড়ের দিকের চুল বেশি লম্বা অথবা সামনের দিকের চুল বেশি লম্বা, তা কাঁচি দিয়ে কেটে পাশাপাশি না রাখলে নির্ণয় করা কঠিন।

বাগবাজার স্ট্রীটের উপর একটা পুরাতন বাড়ির ক্ষুদ্র এক অংশে কান্তি বাস করে। গোকুল নামে ঠিকা এক চাকর সকালে এসে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে একটি মানুষের সংসারের সামান্য যা-কিছু কাজ সেরে দিয়ে যায়। কান্তি অকৃতদার; সুতরাং পুত্র-কন্যার কথাই ওঠে না। বছর তিনেক পূর্বে তার শেষ আত্মীয় গর্ভধারিণীর মৃত্যু হয়েছে। তার পর থেকে সে একান্তভাবেই একা। পিতৃকুলের ধার ধারে না, মাতৃকুলের খোঁজ রাখে না।

কান্তিভূষণ ভাত খায় এক বেলা। সকালে আধ পাউণ্ড পাউরুটি, খানিকটা মাখন, সামান্য কিছু ফল ও গোটা দুই সন্দেশ খেয়ে অফিস যায়। অফিস থেকে ফিরে গোটা দুই রসগোল্লার সঙ্গে এক গ্লাস জল খেয়ে কুকারে চড়িয়ে দেয় ডাল ভাত, কিছু আনাজ ও হাঁসের ডিম। অফিসে মাহিনা পায় পঁচাত্তর টাকা। তখনকার ঘোড়ায়-টানা ট্রাম আর মানুষে-টানা পাখার সুলভ দিনের পক্ষে এ টাকা সামান্য নয়; সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার চালিয়েও প্রতি মাসে তার হাতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।

কান্তি কঠিনভাবে সভ্যভাষী, কঠোরভাবে সদাচারী। কোনও প্রকার মানসিক অশান্তির কারণ না থাকলেও সে হাসে কদাচিৎ, কথা কয় অতি অল্প, গল্প বলে না কখনও, শোনে না বাধ্য না হলে। কানাই দে নামে ওর এক সহকর্মী আছে,—অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এমন কি অফিসে বসেও সে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা দু-পয়সা উপার্জন করে। সে একদিন দু-চার জন বন্ধুর কাছে বললে, "কান্তির অসুখের নিদান শুনবে? আপাতত মনোম্যানিয়া, পরে ইন্‌স্যানিটি।"

দুই

নেশা বলতে সাধারণত যে সকল ব্যাপার বোঝায়, যেমন পান, তামাক, মদ, আফিম, উপন্যাস পাঠ, থিয়েটার দেখা, সঙ্গীত চর্চা, কান্তির সে সব কিছুই ছিল না; থাকবার মধ্যে একমাত্র ছিল প্রতি বৎসর একখানা করে ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের দশ টাকার ডার্বি ঘোড়-দৌড়ের লটারির টিকিট কেনার নেশা। গত আট বৎসর নিয়মিত ভাবে সে কিনে আসছে, আর নিয়মিতভাবেই কিছু হচ্ছে না। এই একটানা নিষ্ফলতার বিরুদ্ধে তার কোনও অভিযোগ ছিল না, অদৃষ্টের প্রতিও সে

এজন্য কিছুমাত্র দোষারোপ করত না। যে কারবারের যে ধর্ম তা তো মানতেই হবে। দশবার টোপ ফেললে তবে তো একবার মাছ ওঠে।

কান্তির কিন্তু দশবার টোপ ফেলতে হলো না, নবমবারের টোপেই টিকিট উঠল, আর সে সাধারণ যে-সে টিকিট নয়, রীতিমত নামী ঘোড়ার রুইমেছো টিকিট।

কথাটা প্রকাশ করবার কান্তির আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু টার্ফ ক্লাবে অফিসের ঠিকানা দেওয়া ছিল বলে কথাটা দিন দুয়েকের মধ্যেই রাষ্ট্র হয়ে গেল। তখনকার দিনে সারা পৃথিবী ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের ডার্বির টিকিট কিনত বলে প্রথম পুরস্কার চল্লিশ লক্ষ টাকা ছুঁই-ছুঁই করত। কান্তির টিকিটের ঘোড়া 'সোরিং ঈগল' এত নামজাদা ঘোড়া যে, দৌড়ে সে যদি প্রথম স্থান অধিকার করে তা হলে বিস্ময়ের কিছুই হবে না।

একজন ফিরিঙ্গী অফিসে এসে কান্তিকে খুঁজে বার করে কোনও এক ইউরোপীয় ক্লাবের পক্ষ থেকে কান্তির টিকিট ক্রয় করবার প্রস্তাব করলে। সমস্ত টিকিটটা কান্তি যদি বিক্রয় করে তা হলে বিশ হাজার টাকা; আর, অর্ধেক বিক্রয় করলে আট হাজার।

মাথা নেড়ে কান্তি বললে, "না, ধন্যবাদ।"

ফিরিঙ্গী দালাল বললে; "শুনুন। পুরো টিকিটের জন্য আপনাকে ত্রিশ হাজার পর্যন্ত পাইয়ে দিতে পারি, কিন্তু তা হলে আমাকে টু-হাফ পারসেণ্ট কমিশন দিতে হবে।"

কান্তি বললে, "না, ধন্যবাদ।"

ভজাবার জন্য কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করে অবশেষে দালাল বললে, "আমার প্রস্তাবের কথা বাড়ি গিয়ে ভালো করে ভেবে দেখবেন।—কাল আসব?"

"আজ্ঞে না। তাতে আপনার আর আমার দুজনেরই সময় নষ্ট হবে।"

পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে কান্তির সামনে রেখে দালাল বললে, "দরকার মনে করলে আমাকে জানাবেন।"

কার্ডখানা দালালকে ফিরিয়ে দিয়ে কান্তি বললে, "এ আমার কোনও দরকারেই লাগবে না। আপনার দরকারে লাগবে।"

অফিসে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটে নি। বিশেষত দালালকে প্রত্যাখ্যান করার পর ব্যাপারটা প্রগাঢ় হয়ে উঠল। কান্তির বড়বাবু কান্তিকে বললে, কাজটা ভালো করলে না কান্তি। শাস্ত্র বলেছেন, ধ্রুবকে পরিত্যাগ করে যে অধ্রুবর সেবা করে, ধ্রুব তো গেলই—অধ্রুবও যাবার দাখিল।"

কান্তি বললে, "বড়বাবু, ধ্রুব তো ত্রিশ হাজার টাকা, যার অভাবে আমার বেশ চলে যাচ্ছে। কিন্তু অধ্রুব ত্রিশ লক্ষ টাকা। এ অধ্রুবের জন্যে ত্রিশ হাজার টাকা রিস্ক্ করা উচিত। No risk, no gain."

"তুমি কি ফার্স্ট প্রাইজ পাবে ঠিক করেছ?"

"ঠিক করি নি, হিসেব করেছি। যেখানে ফার্স্ট প্রাইজ আর সেকেণ্ড প্রাইজ

তুইই অধ্রুব, সেখানে ফার্স্ট প্রাইজের হিসেব করাই উচিত।"

এ যুক্তির পর বড়বাবু আর কথা খুঁজে পায় নি।

কান্তির টিকিট অথবা টিকিটের অংশ কেনবার জন্যে কয়েকদিন ধরে নানা জাতির নানা লোক যাতায়াত করলে। কান্তির কিন্তু সকলেরই প্রতি এক দৃঢ় উত্তর; না।

অবশেষে একদিন স্বয়ং বড় সাহেব ড্রেক্‌ব্রক্‌ম্যান পর্যন্ত ওই প্রস্তাবই করলে; বললে, "আমার একটি পরিচিত লোক পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তোমার টিকিটের অর্ধাংশ কিনতে ইচ্ছুক আছেন। আমার তো মনে হয় ক্যান্টি, এ প্রস্তাব তোমার রাজি হবার উপযুক্ত।"

জোড় হস্ত করে কান্তি বললে, "প্রস্তাব অতিশয় উত্তম, সন্দেহ নেই। কিন্তু স্যার, আমি একটু অন্য হিসেবের মানুষ। আমার ঘোড়া non-starter হ'য়ে আমি যদি মাত্র হাজার তিন-চার টাকা পাই, আমি সেটা এ খেলার প্রত্যাশিত পরিণতি বলেই মনে করব। কিন্তু উপস্থিত পঞ্চাশ হাজার টাকা নেওয়ার ফলে পরে যদি দেখা যায় আমি পনের লক্ষ টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তা হলে সেটা নিজের কৃতকর্মের ফল বলে আঘাত পাব। অদৃষ্টে যে দোর খুলেছে আমি তার আধখানা নিজ হাতে বন্ধ করে দিতে চাই নে।"

ড্রেক্‌ব্রক্‌ম্যান বললে, "ঠিক আছে ক্যান্টি, তুমি ফার্স্ট প্রাইজ লাভ কর, এ আমি একান্ত মনে কামনা করি।"

তিন

ড্রেক্‌ব্রক্‌ম্যানের কামনা কিন্তু ষোল আনা পূর্ণ হলো না। সোরিং ঈগল প্রথম স্থান অধিকার করতে পারলে না। দ্বিতীয় স্থানও না; অধিকার করলে তৃতীয় স্থান।

তৃতীয় পুরস্কারের তায়দাদও অবশ্য কম নয়, প্রায় ন' লক্ষ টাকা। প্রথম পুরস্কার না পাওয়ার নৈরাশ্য, অথবা নন-স্টার্টারের গহ্বর থেকে পরিত্রাণ লাভের উল্লাস, উভয়েরই দ্বারা অবিচলিত কান্তিভূষণ এই বিপুল সৌভাগ্যকে গীতোক্ত অস্পৃহতার সঙ্গে গ্রহণ করলে।

যেদিন কান্তি শুভ সংবাদ পেলে সেদিন অফিসের ছুটি। সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক থেকে শ দুয়েক টাকা তুলে সে কাথ্‌বার্টসন্‌ হার্পারের দোকানে গিয়ে পেটেন্ট লেদারের মূল্যবান পাম্প-শূ খরিদ করলে। তারপর বহু দোকান ঘুরে ঘুরে ক্রয় করলে শান্তিপুরী ও ঢাকাই ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি, মূল্যবান গেঞ্জি ও রুমাল, পিয়ার্স সাবান, অ্যাট্‌কিন্‌স্‌ ট্রিপল এক্সট্র্যাক্ট হোয়াইট্‌ রোজ্‌, পমেটম, আরও কত কী!

পরদিন প্রাতে নামজাদা সেলুনে গিয়ে দাড়ি গোঁফ একেবারে মসৃণ করে চাঁচিয়ে

ফেললে, চুল ছাঁটালে একেবারে তের-আনা-তিন-আনা হিসাবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে নূতন সাজগোজ করে অফিস যেতে এই প্রথম বিলম্ব হয়ে গেল আধ ঘণ্টাটাক।

অ্যাট্‌কিন্‌সন্স হোয়াইট রোজের সুমিষ্ট সৌরভ বিকীর্ণ করে কান্তি যখন অফিস-ঘরে প্রবেশ করলে তখনও বাবুদের মধ্যে তার অভাবিত সৌভাগ্য সংক্রান্ত আলোচনা একেবারে শেষ হয় নি। এক মুহূর্ত কাটল উৎকট বিস্ময়ে; তারপর উঠল অবারিত উল্লাসের বিপুল হর্ষধ্বনি। সাধু কান্তি রাতারাতি একেবারে জামাইবাবু ব'নে গেছে!

বড়বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে কান্তি বললে, "বড়বাবু, নমস্কার।"

বড়বাবু বললে, "নমস্কার। কিন্তু তুমি আমাদের সেই কান্তিই বটে তো?"

বিনীত কণ্ঠে কান্তি বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ বড়বাবু, আমি আপনাদের সেই কান্তিই বটে।"

কান্তির ওষ্ঠাধরে এক অপূর্ব পাতলা রসিকজনোচিত হাসি, যা ইতিপূর্বে কোনদিন দেখা যায় নি। হয় এ হাসি তৃতীয় প্রাইজের গর্ভ হতে একেবারে সদ্যোদ্ভূত বস্তু, নয় গুম্ফশ্মশ্রুর ঘন অরণ্যের মধ্যে এতদিন আত্মগোপন করে ছিল।

বড়বাবুকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে কান্তি বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

হোমিওপ্যাথ কানাই দে বললে, "কান্তি মনোম্যানিয়ার স্টেজ পেরিয়েছে।"

বড় সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ সেলাম করে কান্তি যুক্তকরে দাঁড়াল।

দক্ষিণ হাত দিয়ে সেই যুক্তকর চেপে ধরে সজোরে নাড়া দিয়ে ব্রেক্‌ব্রুকম্যান বললে, "আমি তোমাকে অন্তরের সঙ্গে অভিনন্দিত করছি ক্যান্টি। তোমার সৌভাগ্যে আমরা সকলেই অতিশয় আনন্দিত।"

দু-চারটে কথাবার্তার পর বড় সাহেব বললে, "যেমন করছ, তুমি নিশ্চয় আমাদের অফিসে তেমনি কাজ করবে?"

হাত জোড় করে কান্তি বললে, "আর কেন স্যার! আমার জায়গায় আর একজন প্রোভাইডেড হতে পারবে। আমি আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। যে দয়া স্নেহ আপনার কাছে পেয়েছি তা কোনদিন ভুলতে পারব না।"

কান্তি কর্মনিষ্ঠ পরিশ্রমী বুদ্ধিমান কর্মচারী, তাকে ছাড়তে বড় সাহেবের মন চাচ্ছিল না। কিন্তু বিপুল অর্থের অধীশ্বরকে কী ক'রেই বা দশটা-পাঁচটা কেরানী-গিরির কঠিন আসনে বসিয়ে রাখা যায়?

বড় সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে অন্য সাহেবদের সঙ্গে দেখা করে গৃহ থেকে লিখে-আনা রেজিগ্‌নেশন-লেটার বড়বাবুর কাছে দাখিল করে কান্তি গৃহে ফিরল।

ন লক্ষ টাকার তাল একা সামলানো কঠিন হবে, সে বুদ্ধি কান্তির ছিল। কলিকাতার এক নামজাদা অ্যাটর্নি-অফিসের একজন পার্টনার ছিল তার বাল্যবন্ধু। তার নাম শরৎকুমার সেন। শরতের সঙ্গে অফিসে দেখা করে কান্তি নিম্নপ্রকার ব্যবস্থা করলে। কান্তির নিকট থেকে আমমোক্তারনামা নিয়ে অ্যাটর্নী ফার্ম

ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব থেকে টাকাটা আদায় করে বিশ্বস্ত ব্যাঙ্কে জমা দেবে; তারপর টাকাটা নিম্নলিখিতভাবে ব্যয় করবে: এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা নেবে কান্তি নিজে; পারিশ্রমিক বাবদ অ্যাটর্নী ফার্ম পাবে পাঁচ হাজার টাকা; আর বাকি টাকাটা কান্তির নির্দেশমতো বাংলা দেশের কয়েকটি জনমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে ভাগ করে দিতে হবে।

কান্তি বললে, "যে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আমাকে দিতে হবে, টার্ফ ক্লাবের ড্রাফ্‌ট্‌ ব্যাঙ্কে জমা হওয়ার পর যেমন যেমন আমি চাইব পাঁচ হাজার টাকার কিস্তিতে এক শো টাকা থেকে পাঁচ টাকার পর্যন্ত নোটে দিয়ে যাবেন।"

কাজটা জটিল নয়, আর অল্পদিনের মধ্যে শেষ হবার উপযুক্ত; সুতরাং শরৎকুমারের সুপারিশে পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিকে অ্যাটর্নী ফার্ম এ কাজের ভার নিতে স্বীকৃত হলো।

চার

মাসখানেক পরের কথা।

বেলা তখন চারটে। কান্তিকে চা খাইয়ে গোকুল বাজারে গিয়েছে। মোটা বেতনে সে এখন দিন-রাত্রির চাকর। একজন ঠিকা পাচকও আছে। সে দু বেলা রান্না করে খাইয়ে যায়।

সদর-দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

হুড়কো খুলে কান্তি দেখলে, দীর্ঘকার এক দারোয়ান দাঁড়িয়ে। তার খাকি রঙের কোটের বাম বুকের ওপর চকচক্‌ করছে দুটি রুপালি অক্ষর: M. S। বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে স্ট্র্যাপে ঝুলছে চামড়ার ব্যাগ।

কান্তিকে দেখে নত হয়ে অভিবাদন করে দারোয়ান বললে, "মুখার্জি-সেন থেকে আসছি।

কান্তি বললে, "টাকা এনেছ?"

"জী হুজুর।"

"পাঁচ হাজার টাকা?"

"জী হুজুর।"

"আচ্ছা, ভেতরে এস।"

দারোয়ান ভিতরে এলে কান্তি হুড়কো লাগিয়ে দিলে।

কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপ নামিয়ে ব্যাগ খুলে দারোয়ান পাঁচ হাজার টাকার নোট কান্তিকে বুঝিয়ে দিয়ে রসিদ নিয়ে চলে গেল।

দোর লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে নোটের তাড়াগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখে কান্তি

সেগুলোকে আলমারির বইয়ের সারের পিছনে রেখে দিলে।

যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে সে শুয়ে পড়ল। প্রথমে একচোট অল্প-একটু ঘুম হলো; কিন্তু তার পর আর ভালো ঘুম হয় না—থেকে থেকে চটকা ভেঙে যায়, জানলার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে, ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে কি-না! নিদ্রা-জাগরণের তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে মাঝে মাঝে মনে পড়ে রামকৃষ্ণদেবের কথা—টাকা মাটি মাটি টাকা। ঠিক বুঝতে পারে না, এ কথা সে মুখে আওড়াচ্ছে, অথবা মনে?

মনে হয়, আলমারির ভিতর সাদা সাদা নোটগুলোর পাখা গজিয়েছে, দোর খুলে দিলেই তারা উড়ে যায়।···কী মজা! এর গায়ে ওর গায়ে গিয়ে বসবে, আর চমকে চমকে উঠে লোকে ভাববে—এ আবার কী পাখি রে বাবা! জাল নয় তো?

শেষের দিকে কান্তি খানিকটা ঘুমিয়ে পড়ল। উঠতে একটু দেরি হয়েই গেল। তাড়াতাড়ি সকালের কাজকর্ম সেরে নিয়ে সে বার হবার জন্য প্রস্তুত হলো। ফরমাশ দিয়ে সে ফতুয়া করিয়েছিল। তার ওপর দিকে তিনটে পকেট, ভিতর দিকে থলের মতো দুটো। ফতুয়াটা গায়ে চড়িয়ে পকেটগুলো বিভিন্ন মূল্যের নোটে ভরিয়ে নিয়ে তার উপর পাঞ্জাবি পরে সে বেরিয়ে পড়ল।

সদর-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান্তি চলনশীল পথিকদের নিরীক্ষণ করতে লাগল। একটি লোক গঙ্গাস্নান সেরে গৃহে ফিরছিল, কান্তি ডেকে বললে, "ও মশায়, শুনুন।"

লোকটি কাছে এসে বললে, "কী বলুন?"

"গঙ্গাস্নান করে ভারি সাত্ত্বিক চেহারা বাগিয়ে চলেছেন তো!" পকেট থেকে একশো টাকার নোট বার করে লোকটির হাতে দিয়ে কান্তি বললে, "এটা রাখুন।"

নোটখানা ভালো করে দেখে লোকটি বললে, "ছেলেদের খেলবার নোট বুঝি?"

"না, খেলবার নোট নয়, আসল নোট, দোকানে সওদা করলে জিনিস পাবেন।"

"এর জন্যে দিতে হবে নাকি কিছু?"

"দিতে হলে একশো টাকা দিতে হয়। কিছু দিতে হবে না।"

বাদানুবাদ করার চেয়ে বিনা পয়সার জাল জিনিসও নিয়ে সরে পড়া ভালো বিবেচনা করে লোকটি দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ছোকরা জমা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে বললে, "আমাকে একখানা দিন না মশায়!"

হাসিমুখে কান্তি বললে, "এ জিনিস চেয়ে পাওয়া যায় না বাবা; ভাগ্যে থাকলে জোটে।" ব'লে ধীরে ধীরে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগল। দু-চার পা এগিয়ে হাঁক দিলে, "এই ঝাঁকা!"

সামনে একটা ঝাঁকা মুটে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কিয়া বাবু?"

কান্তি বললে, "আরে বাবা! খানে বিনা তো ভুখমে মরতে হো। এত্তা বড়া ভুঁড়ি বাগায়া কৈ সে?" বলে তার ভুঁড়িতে একটা চিমটি কেটে হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিলে।

চিমটি কাটার জন্য আপত্তি করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাতে নোট পেয়ে লোকটা সামলে গেল। বললে, "ইয়া কিয়া হোগা?"

"তোমারা ভুঁড়িকা সেবা হোগা।"

"ঈ চলেগা বাবু?"

"খালি চলেগা নহি, দৌড়েগা।"

খানিকটা এগিয়ে কান্তি একটা লোককে বললে, "ওহে, তুমি তো বেশ তড়াক করে জলটা ডিঙিয়ে গেলে! এই ধর, দশ টাকার নোট।"

তারপর কাউকে তার কণ্ঠস্বরের জন্য পঞ্চাশ টাকার নোট। তখনকার দিনে পঞ্চাশ টাকার নোটের চলতি ছিল।, কাউকে তার নাসিকার বক্রতার জন্য পাঁচ টাকার নোট, কাউকে তার গতিভঙ্গির জন্য এক শত টাকার নোট দিতে দিতে সে এগিয়ে চলল।

যে জনতা এতক্ষণ কান্তিকে অনুসরণ করছিল, তারা উপলব্ধি করলে পিছন দিকে থেকে লাভের উপায় নেই; কান্তির দৃষ্টিপথে থাকবার জন্যে তারা কান্তির সম্মুখে এসে পিছন হাঁটতে লাগল।

এইরূপে দু-হাতে নোট বিতরণ করতে করতে এবং সম্মুখে এক পশ্চাদ্গামিনী জনতার বিরাট বাহিনী বহন করে কান্তি যখন গ্রে ষ্ট্রীট কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটের মোড়ে উপস্থিত হলো, বেলা তখন সাড়ে দশটা। মোড়ে দাঁড়িয়ে মিনিট পাঁচেক নোট বিতরণ করে কান্তি গৃহে প্রত্যাগমন করলে। প্রত্যাগমন-পথের কাহিনীও ঠিক একই রকম। বেলা বারোটার সময়ে কান্তি যখন গৃহে প্রবেশ করলে, তখন পাঁচটি পকেটের পাঁচটিই রিক্ত।

দ্বিতীয় দিন প্রায় একই ভাবে গেল।. তৃতীয় দিন থেকে ব্যাপারটা কিন্তু গুরুতর আকার ধারণ করলে। সকাল তখন সাড়ে চারটে হবে, সবেমাত্র কাক কোকিল ডাকতে আরম্ভ করেছে; দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে দ্বার খুলে কান্তি বললে, "কী রে গোকুল?"

নিম্নকণ্ঠে গোকুল বললে, "বাবু, আমাদের বাড়ির সামনে বোধ হয় পাঁচ শো লোক জড় হয়েছে!"

"বলিস কী রে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হবে।"

ছটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে পাঁচটা পকেট নোটে ভর্তি করে নিয়ে কান্তি বেরিয়ে পড়ল। তাকে দেখে বিশাল জনতা বিপুলভাবে উল্লাসধ্বনি করে উঠল। তারপর কেউ হাসতে লাগল, কেউ কাঁদতে লাগল, কেউ গান গাইতে লাগল, কেউ মুখ 'ও' করে রইল, কেউ 'ঈ' করে রইল, কেউ ডিগবাজি খেতে লাগল, কেউ বা পা উঁচু মাথা নিচু করে হাতে হাঁটতে লাগল; আর এই জটিল ও বিপুল জনতাকে পুরোবর্তী করে দক্ষিণে ও বামে নোট বিতরণ করতে করতে কান্তিভূষণ ধীর মন্থর গতিভরে এগিয়ে চলল। শোভাযাত্রা যখন সারকুলার রোড কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটের

মোড়ে পৌঁছল তখন জনতা স্ফীত হয়ে অন্তত হাজার পাঁচেকে দাঁড়িয়েছে। যান চলাচল গেল বন্ধ হয়ে, লুঠতরাজের ভয়ে অনেকে দোকানপাট বন্ধ করে ফেললে, পঞ্চ সহস্র কণ্ঠের উল্লসিত জয়ধ্বনি শুনে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একজনকে পা উঁচু করে হাতে হাঁটতে দেখে ট্রামের দুই ঘোড়া ক্ষেপে উঠে লোহার শিকল ছিঁড়ে ফেলে লাইন ছেড়ে পাশের দিকে সরে গেল।

দশজন কন্‌স্টেবল নিয়ে একজন ইন্সপেক্টার মব কন্‌ট্রোল (mob control) করছিল। ইন্সপেক্টার এসে কান্তিকে চোখ রাঙিয়ে বললে, "বন্ধ করুন এ সব।"

ধীরভাবে কান্তি বললে, "কী বন্ধ করব ? এই দান ?—তার চেয়ে আপনি বন্ধ করুন না দানের চেয়ে মন্দ জিনিস জনতার এই উচ্ছৃঙ্খলতা।"

কঠোর স্বরে ইন্সপেক্টার বললে, "এ রকম পথে পথে নোট ছড়িয়ে বেড়ানো অবৈধ।"

কান্তি বললে, "কালও আসব। কাল যদি দেখাতে পারেন আমার আচরণ আইন-কানুনের বিরুদ্ধে, নিশ্চয়ই বন্ধ করব।"

দিনের পর দিন চলল এই নোট-বিতরণের খেলা—নোট-কাগজ কাগজ-নোটের লীলা। কল খোলা আছে, বেলা চারটে আন্দাজ মুখার্জি-সেনের অফিস থেকে অর্থস্রোত পাইপ বয়ে আসে, পরদিন শত শত লোকের হাতে তা ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু সব জিনিসের শেষ আছে; এক লক্ষ ষাট হাজার টাকারও। মাস দেড়েক পরে অ্যাটর্নির বাড়ির কল বন্ধ হলো। একটা কাগজে বড় বড় অক্ষরে কান্তি লিখলে: নোট ফুরিয়েছে, বাড়ি যাও। তারপর সেটা পেস্টবোর্ডে আটা দিয়ে এঁটে পথের ধারে সদর-দরজার মাথায় লটকে দিলে। মৌমাছির দল দু-চারদিন সকালবেলায় ভনভন করলে; তারপর বুঝতে পারলে, সত্যিই মধু ফুরিয়েছে।

সকাল সকাল আহারাদি সেরে গলাবন্ধ কোট, কোঁচাতোলা ধুতি ও নাগরা জুতা পরে কান্তিভূষণ অফিসে উপস্থিত হলো। বড় সাহেবের ঘরের বারান্দায় উপস্থিত হয়ে চাপরাশিকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল।

ঘরে প্রবেশ করে কান্তি দীর্ঘ সেলাম করে দাঁড়াল।

সহাস্য মুখে ড্রেকব্রক্‌ম্যান বললে, "কী খবর ক্যান্টি ?"

কান্তি বললে, "আমার আর কিছু নেই, স্যার। বাইরের উৎপাত বাইরেই বেরিয়ে গেছে।"

"ন লক্ষ টাকাই ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ন লক্ষ টাকাই। যত টাকা তত worry স্যার। না থাকলেই শান্তি।"

ড্রেকব্রক্‌ম্যান হাসতে লাগল; বললে, "এ হিসেব করতে পারলে তো আর কোনও কথাই বলবার থাকে না।"

আরও দু-চারটে কথার পর কান্তি মাথা চুলকাতে লাগল।

"কিছু বলবে, ক্যান্টি ?"

"যদি স্যার সম্ভব হয়—"

"চাকরি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমার আসন তোমার জন্যে খালিই আছে। খবরের কাগজে যখন তোমার নোটবিতরণের কাহিনী পড়তে লাগলাম, তখনই বুঝেছিলাম, তুমি একদিন ফিরে আসবে। আমি বড়বাবুকে লিখে দিচ্ছি,—আজ থেকেই তুমি কাজে বসে যাও।"

বিনীত প্রসন্নকণ্ঠে কান্তি বললে, "কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে, স্যার।

বড় সাহেবের নোট নিয়ে কান্তি তার অফিস-কক্ষে উপস্থিত হলে তাকে দেখে সকলেই খুশি হলো। বড় সাহেবের নোট পড়ে বড়বাবু বললে, "তুমি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এলে, এ খুবই আনন্দের কথা কান্তি।"

মৃদু হেসে কান্তি বললে, "যা হারিয়েছিলাম তা পেয়ে আমিও খুব সুখী হয়েছি বড়বাবু।"

কান্তি তার পরিত্যক্ত চেয়ারে গিয়ে বসল।

কানাই দে চুপি চুপি তার পাশের সহকর্মীকে বললে, কান্তির মুখে হাসির পরিবর্তন লক্ষ্য করছ? আর, আবার গোঁফ-দাড়ি গজাতে আরম্ভ করেছে? এ ইনস্যানিটি আরোগ্য হবার অবস্থা। দু ডোজ স্ট্রামোনিয়ম ২০০ খেলে একেবারে পাকা ভাবে সেরে যায়।"

বড়বাবুর কাছ থেকে একটা ফাইল পেয়ে তখন কান্তি অতি প্রসন্ন মনে ঘাড় গুজে কাজ করছে।

আশ্বিন ১৩৬০

রামের সুমতি

এক

মহানিদ্রায় নিদ্রিত হবার কিছু পূর্বে পুত্রবধূ সুভদ্রার প্রতি ক্লান্ত চক্ষুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্বিজেন মিত্র একান্তে বলেছিল, "বউমা, বরেনকে সহ্য কোরো;"

ঘাড় নেড়ে সুভদ্রা বলেছিল, "নিশ্চয় করব বাবা।"

বরেন তখন অষ্টাদশ বর্ষীয় স্বাধীন যুবক, বছর চারেক লেখাপড়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে মাতব্বর ব'নে বসেছে; আর, তার একমাত্র সহোদর, জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ এম. এ. ও আইন পাশ ক'রে বছর তিনেক আলিপুরে ওকালতি করছে। অনিশ্চিত ওকালতি ব্যবসায়ের সুদুর্লভ ভাগ্যলক্ষ্মী এই অল্প সময়ের

মধ্যেই হরেন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হতে আরম্ভ করেছেন। তিন বৎসরে যে পসার সে জমিয়েছে, অনেকের ভাগ্যে সারাজীবনেও তেমন জমে না।

চেতলা থেকে মাইল দেড়েক দক্ষিণে আতরপুরে হরেন্দ্রনাথদের বাস। যে সময়ের কথা বলছি, কলিকাতা নগর তখনও স্থাবরতার নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে দেহসম্প্রসারণের জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করতে আরম্ভ করে নি। সুতরাং পথঘাটের অভাবে যানবাহনের সুযোগ থেকে দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র নগণ্য আতরপুর গ্রাম, তার নামমাহাত্ম্য সত্ত্বেও, পচা গোবরের দুর্গন্ধ, মশা-মাছির ভন্‌ভনানি, ভেকের মক্‌মকানি আর শৃগালের প্রহর গণনার অপকৃষ্টতার মধ্যে তখনও জড়ীভূত। এমন বিশ্রী জায়গায় শুধু প্রাণটা কোনও রকমে দেহে বজায় রাখবার জন্যেই জীবনযাপন চলে।

কলিকাতার ধনীকন্যা তখনকার দিনের পক্ষে উচ্চশিক্ষিতা আই. এ.-পাশ সুন্দরী সুভদ্রা এ-হেন আতরপুরে মাত্র মধ্যবিত্ত এক সংসারের বধূ হয়ে যেদিন প্রথম এসেছিল, সেদিন সকলেই, মায় হরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত, এই দুষ্পাচ্য অসামঞ্জস্য উপলব্ধি করে একটু উদ্বিগ্ন বোধ করেছিল; করে নি শুধু সুভদ্রা। তখন আবার শ্রাবণ মাস; চতুর্দিক বর্ষার জলে থই থই করছে, কাঁচা উঠানে কেঁচো আর কেন্নোর অবারিত কিলিবিলি, নিরবসর ব্যাঙের কলরবে আর বৈকাল থেকে শৃগালের ডাকে গ্রাম্য নীরবতা বিপর্যস্ত।

দু-চার দিন পরে একদিন একটু ভয়ে ভয়েই হরেন সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আতরপুর তোমার কেমন লাগছে সুভদ্রা?"

সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল সুভদ্রা, "ভালো লাগছে।"

"এই ব্যাঙ ডাকা শেয়াল ডাকা সত্ত্বেও?"

"কিন্তু শুধু ব্যাঙ আর শেয়ালই তো এখানে ডাকে না—তুমিও তো ডাকো।"

সুভদ্রার উত্তর শুনে চক্ষু বিস্ফারিত করে হরেন্দ্র বলেছিল, "বল কী সুভদ্রা! আমিও ডাকি?—হাম্বা রবে না-কি?"

হরেনের কথায় হেসে ফেলে সুভদ্রা বলেছিল, "না না, হাম্বারবে ডাকো না; —কিন্তু ইশারায় ইঙ্গিতে, এমন কি, গলা-খাঁকরি দিয়েও ডাকো। তোমার গলা-খাঁকরির ডাকের সঙ্গে মিশে ব্যাঙের ডাক সুরেলা হয়ে ওঠে।"

সাহস পেয়ে হাসিমুখে হরেন বলেছিল, "তোমার বদান্যতার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু ধর, তোমার যদি—"

হরেনকে কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে সুভদ্রা বলেছিল, "তা হলে এতটা খুশি হতাম না। আচ্ছা, তোমার এ কুণ্ঠা কতদিনে যাবে বল তো? সম্মুখসমরে সমীর ঘোষকে পরাজিত করে সুভদ্রাহরণ করেছ—তুমি তো অর্জুন। তোমার এত সংকোচ কিসের?

দুই

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে সুভদ্রাহরণের একটু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে।

হরেন্দ্র যখন কলিকাতায় মেসে থেকে এম. এ এবং ল অধ্যয়ন করে, তখন প্রবোধ বসু তার সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রবোধ সর্বদাই মেসে এসে হরেন্দ্রের সঙ্গে আড্ডা দিত ও তাকে নিজেদের গৃহে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করত। কিন্তু ধনীগৃহের আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলা সহজ হবে না আশঙ্কা করে নানা ছল-ছুতোয় হরেন্দ্র তার উপরোধ-অনুরোধ কাটিয়ে দিত। অবশেষে একদিন যখন প্রবোধচন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ বহন করে জোর আহ্বানলিপি এল, তখন আর ধনীগৃহের নিঃশ্বাসরোধক আবহাওয়ার আপত্তি বজায় রাখা গেল না।

রোগীর কক্ষে উপনীত হয়ে হরেন দেখলে, শয্যার উপর সোজা হয়ে বসে প্রবোধ একটি যুবক আর একটি তরুণীর সঙ্গে বাক্যালাপে রত। লক্ষণ দেখে রোগটা সাংঘাতিক মনে হলো না।

পরিচয় পেয়ে জানলে তরুণীটি প্রবোধের ছোট বোন সুভদ্রা, আই. এ.-পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রী এবং যুবকটি প্রবোধের বন্ধু সমীর ঘোষ—ধনকুবের শিশির ঘোষের একমাত্র পুত্র, আই. এস-সি. পরীক্ষায় বার দুই ফেল করে তিন পুরুষের পৈতৃক কারবারে বসতে আরম্ভ করেছে। উপস্থিত অফিস তাকে মাসিক ভাতা দিচ্ছে সাড়ে সাত শো টাকা—কথায় কথায় সে কথাও জানা গেল।

বিলম্বিত পরিচয়ে হরেন আরও জানতে পেরেছিল, পৈতৃক কারবার থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে সমীর প্রায় প্রতিদিন প্রবোধদের বাড়িতে হাজিরা দেয়—বলা যেতে পারে, সেও অপর এক কারবারেরই তাগিদে। এ পর্যন্ত সে কারবারে সমীর ঢেলেই চলেছে, প্রত্যাগমের বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তবে সুভদ্রার বাপ ও মার, বিশেষত মার, এ বিষয়ে জোর পৃষ্ঠপোষকতা আছে বলে ভরসা হয় শেষ পর্যন্ত কারবারে লক্ষ্মীলাভ হতে পারবে।

ঘণ্টা দুই অবস্থানের পর হরেন বিদায় চাইলে প্রবোধ জিজ্ঞাসা করেছিল, "কাল আসছিস তো হরেন ?"

অকারণ একটু বিবেচনা করার অভিনয় করে হরেন উত্তর দিয়েছিল, "কাল ? আচ্ছা, আসব।"

পরদিন বৈকালে কথামতো হরেন ঠিক উপস্থিত হয়েছিল। সমীর কিন্তু সেদিন আসতে পারে নি। দ্বিতীয় দিনে তিন জনের আড্ডা দেখতে দেখতে যেমন জমে উঠেছিল, প্রথম দিনে চার জনেও তেমন জমাতে পারে নি। বিদায় গ্রহণের জন্য হরেন উঠে দাঁড়ালে দেখা গিয়েছিল, আড্ডার চাকার মসৃণতার গুণে তিন ঘণ্টা কাল অজ্ঞাতসারেই অতিবাহিত হয়েছে।

হরেনকে এগিয়ে দিতে গিয়ে সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করেছিল, "কাল বৈকালে আসছেন তো ?"

হরেন উত্তর দিয়েছিল, "আসছি নে বলবার ঠিক জোর পাচ্ছি নে।"

সুভদ্রা বলেছিল, "আপনাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসবার জন্যে দাদা তো সর্বদা টানাটানি করতেন, তখন কেন আসতেন না বলুন তো?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে হরেন বলেছিল, "সুভদ্রা এ বাড়িতে থাকে জানতাম না বলেই বোধ হয়।"

হাসিমুখে সুভদ্রা উত্তর দিয়েছিল, "আমি কিন্তু জানতাম আপনি মেসে থাকেন। আপনার বিষয়ে দাদার মুখে আমার এত কথা শোনা আর জানা ছিল যে, কাল যখন আপনি এসেছিলেন, আপনাকে একটুও অজানা মনে হয়নি।"

এরপর এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

তিন

সুভদ্রার শ্বশুর দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিল একজন সেকেলে নামজাদা হেডমাস্টার। সুভদ্রার বিবাহের কিছু পূর্বে পত্নীহারা হয়ে সে অবসর গ্রহণ করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ শুধু বিদ্বানই ছিল না, সাংসারিক জ্ঞান এবং মনুষ্য-চরিত্রবোধে সে ছিল প্রবীণ মানুষ। বরেন যে সুভদ্রাকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারছে না, এ কথা উপলব্ধি করতে তার বেশি বিলম্ব হয়নি। তাই মৃত্যুকালে সহ্য করবার ভার সুভদ্রার উপরই দিয়ে গিয়েছিল। সুভদ্রার উদারচিত্ততা এবং কর্তব্যপরায়ণতার যে পরিচয় সে পেয়েছিল, তার দ্বারা সে বিশ্বাস করত উদ্ধত এবং দুর্দম বরেনকে মানিয়ে নিয়ে চলবার তিতিক্ষা সুভদ্রার আছে।

সুভদ্রার প্রতি বরেনের বিদ্বেষের কারণ ছিল একাধিক। প্রথমত: তার চেয়ে মাত্র তিন বৎসরের বড় একটা মেয়ে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ করার প্রভা নিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে লোকচক্ষুর সম্মুখে তার মূর্খতার কালিমাকে আরও খানিকটা প্রকট করে দিয়েছিল; দ্বিতীয়ত: ঐ ঘৃণিত বিদ্যাবত্তার প্রভাবেই সে তার পিতার অনেকখানি স্নেহ অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল; এবং তৃতীয়ত:, শুধু স্নেহই নয়, পিতার দৈনিক সংসার-খরচের হিসাবপত্র টাকাকড়িও অধিকার করেছিল পিতার ধর্মগ্রন্থ পাঠের সময় ও সুবিধা বাড়িয়ে দেবার কৌশলের দ্বারা পিতার হাতে খরচ থাকার সময়ে চুরুটটা-আসটার জন্য চার আনা পয়সা থেকে চার পয়সা উপার্জন করা কতকটা সহজেই চলত। সুভদ্রার আমলে একটা পূর্ণ টাকা থেকে চার পয়সার সুবিধা করতে ঘাম ছুটে যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে কেমন যেন একটা হীনতাবোধের প্রভাবে বরেনের কেবলই মনে হয়, সুভদ্রার কর্তৃত্ব ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠেছে। তার ফলে তার মন ওঠে বিষিয়ে,উচ্ছৃঙ্খলতা যায় বেড়ে।

একদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর বরেন বেরিয়ে যাবার উপক্রম করছে।

সুভদ্রা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরপো, কোথায় যাচ্ছ?"

কিছু আগে একটা কোনও প্রসঙ্গ নিয়ে একটু তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। ভ্রূকুঞ্চিত করে বরেন বললে, "যেখানে যাচ্ছি, সেখানে।"

"আচ্ছা, সেখানেই যেয়ো। কিন্তু লক্ষ্মী ভাই, যাবার আগে একটা কথা শোন।"

"কথা, না, হুকুম?"

"না, হুকুম নয়, কথাই। বুদ্ধির তো অভাব নেই তোমার, আচ্ছা, এই উদ্দেশ্যহীন জীবন ছেড়ে দিয়ে একটু লেখাপড়ায় মন দাও না।"

বরেন হেসে উঠল, "লেখাপড়ায় মন দোব! লেখাপড়া হবে আমার বলে তুমি বিশ্বাস কর?"

"কেন হবে না। তোমার দাদার কেমন করে হয়েছে?"

"দাদার কথা ছেড়ে দাও, দাদার মাথার ওপর বাপ-মা ছিল। আমার কে আছে?"

"কেন, তোমার দাদা আছেন, আমি আছি। লোকে কথায় বলে বড় ভাই বাপের মতো।"

বরেনের মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। বললে, "বড় ভাই বাপের মতো না-হয় মানলাম, কিন্তু, কিছু মনে করো না, সঙ্গে যে সৎমার মতো বড় ভাজও আছে।"

শান্ত কণ্ঠে সুভদ্রা বললে, "পরীক্ষাই করে দেখ না একবার সৎমাকে, বোধ হয় সৎমাকে খুব অসৎ বলে মনে হবে না। কখনও কখনও সৎমা আপন মার চেয়েও সৎ হয়।"

কোনও উত্তর না দিয়ে বরেন মুখ গোঁজ করে রইল।

সুভদ্রা বললে, "তোমাকে আমি ইস্কুলে ক্লাস সেভেনে নাম লিখিয়ে পড়তে বলছি নে। তোমার দাদা ব্যস্ত মানুষ, সময় নেই—আমি তোমাকে যত্ন করে পড়াতে পারি ঠাকুরপো।"

"তুমি! তুমি পড়াবে! যদি পড়তেই হয় এম. এ. পাশ কোনও লেখাপড়া জানা লোকের কাছে পড়ব। তুমি আই. এ.-পাস মেয়েছেলে, তুমি কী পড়াবে?"

সুভদ্রার মনে পড়ে গেল, রবীন্দ্রনাথের কাঁসার ঘটির অনুযোগ, 'কূপ, তুমি কেন খুড়া হলে না সাগর!' বললে, "আমি তো সব সাবজেক্ট পড়াব না তোমাকে—শুধু ইংরিজী, বাংলা আর সামান্য একটু অঙ্ক। আমার কাছে এক-আধখানা বই শেষ কর, তারপর এম. এ.-পাশ মাস্টারের সন্ধান করা যাবে।"

"কিন্তু এ লেখাপড়া শেখার ফল কী হবে শুনি? মোটা ভাত মোটা কাপড় আর পনেরো টাকা মাস মাইনের তোমাদের মুহুরিগিরি তো?"

চকিত স্বরে সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের মুহুরিগিরি মানে?"

বরেন বললে, "আচ্ছা, তোমার স্বামীরই না হয় হলো।"

"কিছু মনে ক'রো না ঠাকুরপো, তোমার কথার উত্তরে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার স্বামীকে বাদ দিয়ে এই মোটা ভাত মোটা কাপড় আর মাসিক পনেরো টাকা মাইনে উপার্জন করবার মতো শক্তি তোমার আছে তো?"

"আছে। এই বাড়ির অর্ধেক অংশ বিক্রি করে আমি ব্যবসা করতে পারি।"

"এর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু সে সব কথা উপস্থিত বাদ দিয়ে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। এই ভদ্রাসন বাড়ি, মায় জমি বাগান পুকুর সমস্ত তিন হাজার টাকায় ছোটঠাকুরঝির বিয়ের দেনায় বাঁধা আছে তা জান?

"সে টাকা দাদা শোধ করবে।"

"সে টাকা দাদা শোধ করলে সমস্ত বাড়িটা দাদার হয়ে যাবে। অর্ধেক অংশ তোমার হতে হলে দেড় হাজার টাকা তোমাকে শোধ করতে হবে।"

বরেন খেঁকিয়ে উঠল, "আইন দেখাচ্ছ আমাকে? তোমাদেরও আইন দেখাবার লোক আমার আছে।"

সুভদ্রা বললে, "তা-ও জানি। মহা আইনজ্ঞ বিষ্টু হাজরা তোমার পরামর্শদাতা। সাবধান ঠাকুরপো! সর্বনেশে লোক ঐ বিষ্টু হাজরা। গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেবে। কী দরকার ভাই, বিষ্টু হাজরার পরামর্শে, বাড়ির মধ্যে এমন একজন উদারহৃদয় আইনজ্ঞ থাকতে?"

চক্ষু কুঞ্চিত করে বরেন বললে, "ও! তুমি বুঝি তা হলে আজ রঙ চড়িয়ে এ সব কথা দাদাকে লাগাবে?"

সুভদ্রা হেসে ফেললে, "এত কম বোঝ ঠাকুরপো? এটুকু বুদ্ধিও তোমার নেই? আমি যদি লাগাতাম তা হলে তোমাকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু কৈফিয়ৎ দাদার কাছে দিতে হতো।—একদিনও দিয়েছ কি?"

বরেন বললে, "লাগাও তুমি, কিন্তু দাদা তোমার কথা বিশ্বাস করে না।"

"খোকাকে দুধ খাওয়াবার সময় হলো, আমি চললাম ঠাকুরপো।" ব'লে সুভদ্রা প্রস্থান করলে।

দু-চারদিন অন্তর এই রকম একটা-না-একটা খিটিমিটি চলতেই লাগল।

চার

মাস তিনেক পরের কথা।

ছুটির দিন। সন্ধ্যার পরে হরেন বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছে। বিষ্ণু হাজরা তার বাড়ির দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল, হরেনকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললে, "হরেন, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল বাবা।"

বিষ্ণু হাজরা যে তার বিরুদ্ধে বরেনকে উত্তপ্ত করার সৎকার্যে আত্মনিয়োগ

করছে, সে কথা হরেনের অবিদিত ছিল না; নীরস অনুৎসুক কণ্ঠে বললে, "কী কথা?"

"একটু দাওয়ায় গিয়ে বসবে?"

"আজ্ঞে না; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনি।"

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে অকারণ কণ্ঠস্বর খানিকটা নিচু করে নিয়ে বিষ্ণু হাজরা বললে, "ছোঁড়াটার যা হয় একটা গতি কর বাবা।"

রুক্ষকণ্ঠে হরেন বললে, "ছোঁড়াটা কে?"

"তোমার ভাই বরেনের কথা বলছি।"

"তা, ছোঁড়া বলছেন কেন?"

এই বেমক্কা অসুবিধাজনক প্রশ্নে একটু বিব্রত হয়ে এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে বিষ্ণুচরণ বললে, "আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করে, মায়া হয় ওর ওপর—তাই বলছি।"

"দেখুন, আপনার মায়া হয়, আমার কিন্তু হয় না। সুতরাং আপনিই ওর গতি করুন।"

প্রস্তাব শুনে চকিত কণ্ঠে বিষ্ণুচরণ বললে, "আমি! আমি কী গতি করব?"

সহজ সুরে হরেন বললে, "কেন, পার্টিশন সুট আর অ্যাকাউন্ট সুট দায়ের করা থেকে আরম্ভ করে সম্পত্তি আর টাকা পাইয়ে দেওয়া পর্যন্ত সব। শুনুন হাজরা মশায়, একটা স্পষ্ট কথা আপনাকে বলি। আতরপুর থেকে আলিপুরে ওকালতি করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। মাঝে মাঝে মনে করি ভবানীপুরে কিংবা কালীঘাটে বাসা ভাড়া নিয়ে উঠে যাই; শুধু গ্রামটার প্রতি মায়াবশত পারি নে। কিন্তু আর নয়, কালই আমি ভবানীপুরের দিকে বাড়ি ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করছি। বাসা পেলেই বরেনকে এখানকার বাড়ি ঘর-দোর বাগান জমি-জমা সব ছেড়ে দিয়ে মাস দুয়েকের খরচা দিয়ে, আর আপনাকে ওর মুরুব্বি হবার পরিপূর্ণ সুযোগ দান করে সপরিবারে আমি চলে যাব।"

বিষ্ণুচরণ খ্যাঁক করে উঠল, "আমি ওর মুরুব্বি হতে যাব কেন?"

"আপনার ওর প্রতি মায়া পড়েছে, আর আপনি ওর গতি করবেন বলে।"

"কিন্তু আমিও তোমাকে বলছি—"

বিষ্ণুচরণকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হরেন বললে, "আগে আমাকে কথা শেষ করতে দিন। দু মাস পরে যখন দেখবে শ্যাম ভবানীপুরে সরে পড়েছে, আর কুল রাখবার কোনো ব্যবস্থাই আপনি করছেন না, তখন সাংঘাতিকভাবে ও আপনার ওপর চড়াও হবে।···একটা হিতকথা শুনবেন হাজরা মশায়?"

কোনও উত্তর না দিয়ে বিষ্ণু হাজরা তীক্ষ্ণনেত্রে হরেনের প্রতি তাকিয়ে রইল।

"আমাদের আতরপুরের সম্পত্তি এখন বাঁঝরা মৌচাক, এক কৌটা মধু এ থেকে নিঙড়ে বার করবার উপায় নেই।"

কর্কশকণ্ঠে বিষ্ণু বললে, "কেন ?"

"কানায় কানায় দেনায় ভরা।"

"তুমি সম্পত্তি দেনা থেকে মুক্ত কর নি কেন ?"

"সেটা একান্ত ভাবে আমার খুশি বলে।"

"কিন্তু বাবা, শহরে নিজের স্ত্রীর নামে জমি কিনছ, আর এ দিকে নাবালক ভাইয়ের সম্পত্তি দেনায় ডুবিয়ে রেখেছ, এ খুশি তো ভালো খুশি নয়, আর এ কাজও পাকা কাজ নয়।"

"আইনের উপদেশ আমি আপনার কাছ থেকে পরে নোব—আপাতত একটা কথা বলি। ধর্মগ্রন্থ পড়বেন ? কিছু বই পাঠিয়ে দোব ? রামায়ণ ?—মহাভারত ?—গীতা ?"

ফোঁস করে উঠল বিষ্ণু, "তুমি আমাকে অপমান করছ হরেন।"

"এ কথা আপনি ঠিকই বলেছেন। ধর্মগ্রন্থ পড়বার অনুরোধ করলে আপনাকে অপমান করাই হয়।" বলে হরেন দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

গৃহে পৌঁছে একটু উত্তেজিত ভাবেই সে সুভদ্রাকে বললে, "না সুভদ্রা, আর এখানে আমাদের থাকা চলবে না। কালই আমি ভবানীপুরে কিংবা কালীঘাটে বাসা দেখে দেবার জন্য বন্ধুদের অনুরোধ করে আসব।"

ঈষৎ চিন্তিত হয়ে সুভদ্রা বললে, "কেন, আবার কী হলো ?"

পথে বিষ্ণু হাজরার সঙ্গে যা ঘটেছিল আনুপূর্বিক সকল কথা বলে হরেন বললে, "না, এ অসহ্য হয়েছে। এ দূষিত হাওয়া ছেড়ে যেতেই হবে।"

"কিন্তু তাই বলে ঠাকুরপোকে এখানে ফেলে রেখে ?"

"তোমার ঠাকুরপোর অশিষ্টতাও ক্রমশ অসহ্য হয়েছে। ওর একটু শিক্ষা হওয়া দরকার।"

"ওকে দূরে রাখলে শিক্ষা হবে না, কাছে রাখালেই হয়তো হতে পারবে।"

"তা হলে কাছেই রাখ। ধন্য তোমার সহ্যশক্তি সুভদ্রা। আমার আগে তোমারই ওটাকে অসহ্য হওয়া উচিত ছিল। ওর কত উৎপীড়ন তোমাকে সহ্য করতে হয়, গোলাপের কাছে তা জানতে আমার বাকি নেই।"

গোলাপ সংসারের পুরনো ঝি।

রুষ্টকণ্ঠে সুভদ্রা বললে, "গোলাপ বুঝি ঠাকুরপোর নামে তোমার কাছে লাগায় ?"

মাথা নেড়ে হরেন বললে, "না না, ঠাকুরপোর নামে লাগাবে কেন ? তোমার দুঃখের কথা আমাকে জানায়।"

"আমার দুঃখের কথা গোলাপ কী জানে যে তোমাকে জানাবে ?"

হাসিমুখে হরেন বললে, "সে কথা সত্যি। আমি যখন জানি নে, গোলাপ কী করে তা জানবে ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সুভদ্রা বললে, "বাবার এত সাধের বাগান

পুত্রের উত্তরাসন—এ আমি সহজে ছেড়ে যাব না—বাবার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে তো কোনও বিষ্টু হাজরার জন্তেই নয়।···তা ছাড়া, যে চমৎকারভাবে বিষ্টু হাজরার জ্ঞানচক্ষু তুমি আজ খুলে দিয়েছ, এ পথ ও নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে।"

সুভদ্রার এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি। বিষ্ণু হাজরার কোনও ক্রিয়াশীলতার কথা আর শোনা যায় না, এমন কি বরেনের মুখেও নয়।

পাঁচ

বিষ্ণু হাজরার জটিলতা শেষ হলেও, বরেনের মতি-গতির বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল না; এমন কি, দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছর দেড়েক পরে তার উচ্ছৃঙ্খলতা পুনরায় এক নূতন পথ ধরে সজোরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

বেলা দশটা। আদালত যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে হরেন সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করলে, "বরা এসেছে?"

মাথা নেড়ে সুভদ্রা বললে, "না।" তারপর কতকটা যেন নিজেকেই বলতে লাগল, "সেই কাল দুপুরে দুটো ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়েছে, আর আজ এতটা বেলা পর্যন্ত দেখা নেই। যাত্রা শুনতে হবে তো দুপুরবেলাই বা যাওয়া কেন, আর আজ এখন পর্যন্ত না আসবারই বা কী কারণ আছে।"

বিরক্তিসূচক কণ্ঠে হরেন বললে, "ইদানীং ও আবার বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে। তুমি ওকে ভালো করে শাসন কর সুভদ্রা।"

সুভদ্রা বললে, "আমি শাসন করলে ও মানবে কেন? তোমাকে ভয় করে, তুমি কর।"

হরেন বললে, "আমাকে হয়তো ভয় করে, কিন্তু যতই খিটিমিটি করুক তোমার সঙ্গে, তোমাকে ও ভালোবাসে। তোমার কথায় ও সহজে বশীভূত হবে।" তারপর ব্যস্ত হয়ে বললে, "দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি চললাম।"

"এস।"

হরেন চলে গেলে হরেনের কথা ভেবে সুভদ্রা মনে মনে একটু হাসলে—উদার হৃদয় তোমার, কত ভুল-ভ্রান্তিই না করতে পার। শ্বশুর ছিলেন বিচক্ষণ মানুষ, তিনি বুঝেছিলেন কোথায় গলদ। তাই শেষ সময়ে অনুরোধ করে গেছেন ঠাকুরপোকে সহ্য করতে। প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছি, শেষ পর্যন্ত সহ্য করব। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তার কিছুটাও যদি জানতে, তা হলে অমন করে ভালোবাসার কথা তুলতে পারতে না।

হরেন প্রস্থান করবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বাড়ির ভিতরে বরেনের কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "গোলাপ, তেল দে।" বোধ হয় হরেনের বেরিয়ে যাওয়ার

অপেক্ষায় কাছেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে ছিল।

বরেনের কাছে উপস্থিত হয়ে সুভদ্রা বললে, "এ কি কাণ্ড ঠাকুরপো। কাল দুপুরে গেছ, আজ দশটা বেলায় ফিরলে?"

বরেন বললে, "কাণ্ড আবার কী হলো শুনি? যাত্রা হবার পর চা-টা খেয়ে তারপর আসছি, বেহালা থেকে আতরপুর পথটাই কি কম?"

এ কথার উত্তর দেওয়া হলো না। হঠাৎ বরেনের মুখ ভালো করে লক্ষ্য করে চকিত কণ্ঠে সুভদ্রা বললে, "এ কি ঠাকুরপো! যাত্রায় তুমি সেজেছিলে না-কি!"

"কী করে জানলে?"

"ঠোঁটে লাল রঙ লেগে রয়েছে, আর কানের পাশে পাউডারের ছোপ। ছি-ছি, তুমি যাত্রায় সেজে এলে ঠাকুরপো!"

কাপড়ের খুঁট দিয়ে ওষ্ঠাধর ঘ:ষ দেখে রুক্ষস্বরে বরেন বললে, "ছি-ছি কী রকম? সেজে এসেছি বটে, কিন্তু তা বলে হনুমান সাজি নি, দস্তুরমতো রাম সেজে এসেছি—অযোধ্যাপতি দশরথের তনয় রাম।"

তিক্ত বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে সুভদ্রা বললে, "রাম সাজলেও আসলে তুমি হনুমানই সেজে এসেছ। এত বড় সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হয়ে তুমি নিজের মুখে এতটা কালি মাখালে?"

"কালি মাখালে মানে?"

বরেনের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করে সুভদ্রা বললে, "মাখালে বইকি। বাবা অতবড় নামজাদা হেডমাস্টার ছিলেন, তোমার দাদা এম. এ., বি. এল. পাশ করে বড় উকিল হয়ে উঠছেন—আর, তুমি কি-না একটা পেশাদার যাত্রার দলে পার্ট করে এলে?"

দৃঢ়স্বরে বরেন বললে, "শুধু পার্ট করেই আসি নি, পথ করেও এসেছি।" বরেনের মুখের মধ্যে একটা হিংস্র উল্লাসের চাপা হাসি।

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করলে, "কিসের পথ করে এলে?"

"তোমার সংসার থেকে বেরিয়ে পড়বার পথ। পরশু বিকেল থেকে যাত্রাদলের রামের কলেরার মতো হাওয়ায় ওরা বিপদে পড়ে গিয়েছিল। কাকে রাম করবে ভেবে পায় না, সকলেরই হনুমান সাজবার মতো চেহারা। আমি বললাম—আমি সাজব। আমাকে দেখে বললে, চেহারায় মানাবে বটে, কিন্তু কাল রাত আটটায় যাত্রা আরম্ভ—এত অল্প সময়ে তৈরী হতে পারবে কি? বললাম—আলবাৎ পারব। দু দিন চার ঘণ্টা আর চার ঘণ্টা মোট আট ঘণ্টা রিহার্সাল দিয়ে হিরোর পার্টে কাল যা অভিনয় করেছি, ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে। সোজা দলে অভিনয় করি নি—শশাঙ্ক অধিকারীর দল! শশাঙ্ক অধিকারী বলেছে, আমি যদি ওর দলে ভর্তি হই তিরিশ টাকা মাইনে দেবে, আর ওর মেয়েকে যদি বিয়ে করি, দেড় আনার বখরাদার করবে। পথ করে আসি নি?

তোমার সংসারে থাকলে তোমার বাজার-সরকার হয়ে তোমার ছেলেমেয়েদের কাঁধে-পিঠে করে মানুষ করে জীবন কাটাতে হবে তো!"

সুভদ্রা বললে, "না, তা হবে না। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তাও তোমার যাত্রাদলের রামচন্দ্রের চেয়ে ভালো। তোমার মঙ্গল যদি কোথাও থাকে, এই সংসারেই তা আছে। আমাকে বিশ্বাস কর ঠাকুরপো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

"তুমি আমাকে ভালোবাস?" হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বরেন বললে, "তোমার যেমন ভালোবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষা! তোমার ভালোবাসার কথা আমি এক বিন্দু বিশ্বাস করি নে।" তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "গোলাপ, তেল দে।"

অন্তরাল থেকে গোলাপ বললে, "তেল গামছা কাপড়—সব রেখেছি।"

সুভদ্রা বললে, "আমিও একবিন্দু বিশ্বাস করি নে ঠাকুরপো, তোমার দাদার কথা। আজ এইমাত্র কাছারি যাওয়ার আগে তিনি একটা ভারি অদ্ভুত কথা বলছিলেন,—বলছিলেন তুমি নাকি আমাকে ভালোবাস। শুনে আমি মনে মনে হেসে বাঁচি নে; যে আমাকে সৎমা মনে করে, যে মনে করে আমি তাকে মুহুরি বানাবার চেষ্টায় আছি, শোন কথা, সে আমাকে ভালোবাসে! সে তো অহরহ আমার মৃত্যু কামনা করে; আমি মারা গেলে মুখে একগাল পান ঠুসে যে আমাকে খাটে তুলে পুড়িয়ে এসে বলবে—আপদ বিদেয় হলো; তোমার দাদা বলেন, সে আমাকে ভালোবাসে!"

সহসা ঝরঝর করে একরাশ জল সুভদ্রার দুই চক্ষু থেকে বৃষ্টিধারার মতো ঝরে পড়ল। তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে অপ্রতিভ ভাবে সে বললে, "তুমি কিছু মনে করো না ঠাকুরপো। এ চোখের জল তোমার কোনও কথার জন্যে নয়—এ তোমার দাদার কথার জন্যে। কী অদ্ভুত কথাই না বলে গেলেন তিনি!—যাও, তুমি স্নান করগে।"

ধীরে ধীরে সুভদ্রা অন্য দিকে চলে গেল।

বেলা তখন দুটো। একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে নিয়ে সুভদ্রা তার ঘরে শুয়ে আছে, দরজায় ধাক্কা পড়ল।

তাড়াতাড়ি উঠে দোর খুলে সুভদ্রা দেখে, বরেন দাঁড়িয়ে আছে।

"কী ঠাকুরপো?"

বরেন বললে, "বেহালায় চললাম। ওদের সঙ্গে ব্যবস্থা যদি হয়ে যায়, মাস চার-পাঁচ না আসতেও পারি।"

"ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাবে না?"

"না, তুমিই বলে দিয়ো।"

সুভদ্রা বললে, "এই যে তোমার অন্যায় আচরণ—অকারণে আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়া—এও আমি সহ্য করব, কারণ বাবা তোমাকে সহ্য করবার আদেশ

দিয়ে গেছেন আমাকে।"

চকিত কণ্ঠে বরেন বললে, "বাবা তোমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন? কবে?"

"শেষ দিনে।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বরেন বললে, "বাবা তা হলে তোমাকে চিনতে পেরেছিলেন?"

"হাঁ, পেরেছিলেন।—একটু মিষ্টি আর জল খেয়ে যাও ঠাকুরপো।"

মাথা নেড়ে বরেন বললে, "না, খাবার এখন কোনও দরকার নেই।" বলে গমনোদ্যত হলো।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে খপ করে বরেনের একটা হাত ধরে ফেলে সুভদ্রা বললে, "লক্ষ্মী ভাই, একটা কথা আমার রাখো—একটু মিষ্টি আর জল খেয়ে যাও।"

"দাও, দাও।"

একটা রেকাবে চারটে সন্দেশ আর এক গ্লাস জল নিয়ে এসে সুভদ্রা বরেনের সামনে রাখলে।

একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে খেয়ে জলটা ঢক ঢক করে পান করে বরেন বেরিয়ে গেল।

ছয়

বেলা চারটে বেজে গেছে। আর অলস হয়ে বসে থাকা চলে না। বিষণ্ণ-গম্ভীর মন নিয়ে হাতের গোটা কাজ সেরে সুভদ্রা পুকুরে যাবে, এমন সময় কানে প্রবেশ করল, "বউদি!"

সুরের নূতনত্বে চমকিত হয়ে চেয়ে দেখে সুভদ্রা বললে, "কী ঠাকুরপো?"

বরেনের মুখে লজ্জা ও হাসির একটা মিশ্রিত রসায়ন।

"ফিরে এলাম, বেহালার অর্ধেক পথ থেকে।"

"কেন?"

"রামচন্দ্রের পার্ট আর করব না, এবার থেকে করব লক্ষ্মণের পার্ট।"

"ওদেরই দলে?"

ব্যগ্রকণ্ঠে বরেন বললে, "না না, শশাঙ্ক অধিকারীর দলে নিশ্চয়ই আর নয়; এবার তোমাদের দলে।"

"তার মানে?"

"তার মানে, দাদা হবে রামচন্দ্র, তুমি হবে সীতা, আমি লক্ষ্মণ, আর

আমাদের এই সংসার হবে অযোধ্যা নগর।”

সুভদ্রার মুখ উল্লসিত হয়ে উঠল।

“সত্যি?”

“সত্যি।...আচ্ছা বউদি, তুমি লেখাপড়া-জানা পাশ-করা শক্ত মেয়ে—তুমি বকবে-ঝকবে, তর্ক করবে। তখন তুমি অমন করে কাঁদলে কেন বল দেখি? বেহালার পথে যেতে যেতে যতবার তোমার কথা মনে পড়ে, দেখি তুমি কাঁদছ।...আবার! আবার! আবার সেই কাণ্ড। নাঃ! আজ তুমি কেঁদেই মাত করলে দেখছি!”

আকাশে মাঝে মাঝে রৌদ্র-বৃষ্টির একত্র খেলা দেখা যায়। সুভদ্রার মুখের মধ্যেও অশ্রু-হাসির সেই একত্র খেলা।

আশ্বিন ১৩৬০

লালীর প্রেম

লালীর প্রেম সম্বন্ধে গল্প লেখা সম্ভব হলেও লালীকে কোনও তরুণবয়সী লাবণ্যময়ী মানবী মনে করলে ভুল করা হবে। যদিও লালী মানুষের মতো দু হাত ঝুলিয়ে সোজা হয়ে বসতে পারে, আর তার গায়ের রঙ তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ না হলেও কাঞ্চনবর্ণের কাছাকাছি, তবু তার লেজ আছে। সুতরাং সে কুকুর।

আমাদের সংসারে লালী ছাড়া আর একটি মানবেতর প্রাণী আছে। নব-দুর্বাদলের চেয়েও গাঢ় সবুজ রঙের টিয়াপাখি ফুলী। লালীর গায়ের রঙ গাঢ় পীতবর্ণ। ও রঙ কালো রঙয়ের চেয়ে লাল রঙের নিকটতর বিবেচনা করেই বোধ হয় লালী নামকরণ হয়েছে।

একটি মেম সাহেব কর্তৃক উপহৃত হয়ে পাঞ্জাবির পকেটে অবস্থান করে লালী যে দিন আমাদের সংসারে প্রবেশ করে, তখন তার চোখ ফোটে নি। কাচের নল মুখে ঢুকিয়ে অতি কষ্টে তাকে দুধ খাওয়াতে হতো। নিরতিশয় যত্ন এবং সাবধানতার সঙ্গে ‘মানুষ’ করে তোলার পর লালী মানুষের মতো কথা কইতে পারলে না বটে, কিন্তু মানুষের মতোই কথা বুঝতে শিখলে। তার কিছু পরে কথা বোঝাতেও শিখলে।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলে তৎক্ষণাৎ ঘেউ ঘেউ করে ডাক দিয়ে লালী জানিয়ে দেয় লোক এসেছে, দরজা খোল। দরজা খোলার পর যদি দেখা

যায় আগন্তুক বাড়ির লোক অথবা পরিচিত ব্যক্তি, তা হলে এক-আধটা ডাক দিয়ে লালী চুপ করে যায়। যদি দেখা যায় আগন্তুক নবাগত অপরিচিত মানুষ, তা হলে অপরিচ্ছন্ন বেশের ইতর লোকের ক্ষেত্রে লালী তারস্বরে অবিরাম চিৎকার করতে থাকে; অর্থটা— আগন্তুক ভালো লোক মনে হচ্ছে না, কেউ অবিলম্বে এসে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন কর।

আর অপরিচিত আগন্তুক যদি সুবেশ ভদ্রলোক হয়। তা হলেও লালী চিৎকার করে, কিন্তু সে চিৎকারের ব্যঞ্জনা অন্য প্রকারের। এটুকু সে বুঝে নিয়েছে যে, অপরিচিত ভদ্রলোক যারা আমাদের গৃহে আসে, তাদের শতকরা পঁচানব্বই জন আমারই সঙ্গে দেখা করতে আসে। সুতরাং তেমন কেউ এলে দোতলার সিঁড়ির নিম্নপ্রান্তে গিয়ে সে ডাকতে আরম্ভ করে; এবং সিঁড়ি ভেঙে আমাকে নামতে দেখলেই ডাকের সুরটা অনুযোগের সুরে পরিবর্তিত করে নিয়ে যেন বলতে থাকে, কী আশ্চর্য! এত দেরি করতে হয়? ভদ্রলোক অনেকক্ষণ বসে রয়েছেন যে!...তারপর আমার পিছনে পিছনে বৈঠকখানায় প্রবেশ করে আগন্তুকের দেহ শুঁকতে আরম্ভ করে।

মেয়েদের প্রতি লালী সাধারণতঃ একটু কম কঠোর। সে এখনও মেয়ে এবং পুরুষকে সমদৃষ্টিতে দেখতে শেখে নি। সর্ববিষয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের সমকক্ষ বিবেচিত হবার দাবি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত অজ্ঞ থাকায় এখনও সে মেয়েদের পুরুষের চেয়ে কিছু কম অনিষ্টকর প্রাণী বলে মনে করে—তাই তার ডাকের মধ্যে মৃদুতার একটা বিশেষ আভাস পেলে আমরা কোন অপরিচিতার শুভাগমনের ইঙ্গিত লাভ করি।

লালীর মাস আষ্টেক বয়স কালে একদিন হঠাৎ দেখা গেল সে সামনের দিকের বাঁ পা পাততে পারছে না, তিন পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। কেউ তার পায়ে আঘাত ক'রে থাকবে মনে করে আমরা বাড়িসুদ্ধ সকলে ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম, সর্বজনপ্রিয় লালীকে কে আঘাত দিতে পারে তার দূরতম অনুমান করতে অসমর্থ হয়ে তেমনই আমরা দুশ্ছেদ্য সমস্যাজালে জড়িয়ে পড়লাম।

খানিকটা সমাধান দেখা দিলে মাস খানেক পরে। একদিন দেখা গেল, লালী তার সামনের দিকের ডান পা-ও পাততে পারছে না,—আর, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা বন্ধ করে কোনও প্রকারে বসে বসে ঘেঁসটে ঘেঁসটে চলার কাজ সারছে।...তা হলে লাঠির ঘা নয়, বাত কিংবা ঐরকম আর কিছু।

পিছনের দুই পায়েও বাত সংক্রামিত হলে লালী ব্যাঙের মতো থপ থপ করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলবে, অথবা আর কী করবে ভেবে আমরা আকুল হয়েছি, এবং আর নিশ্চিন্ত না থেকে চিকিৎসার একটা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবার সংকল্প করছি, এমন সময়ে গৃহে দেখা দিলেন এক ব্যক্তি, পশু পক্ষী— বিশেষতঃ কুকুর সম্বন্ধে যাঁর কিছু জ্ঞান আছে। তিনি বললেন, "লাঠির আঘাতও নয়, বাতের আক্রমণও নয়, লালী এক বিশেষ জাতীয় জার্মান কুকুর যাদের

সামনের পায়ের বাঁকা গঠনই স্বাভাবিক গঠন।"

সে যাই হোক না কেন, লালী যে সত্যই এক বিশেষ জাতের কুকুর একদিন ও তার প্রমাণ দিলে মানুষের মতো খাড়া হয়ে বসতে পারা দেখিয়ে। দেখা গেল, হনুমান অথবা ক্যাঙ্গারু যেমন সোজা হয়ে বসতে পারে ঠিক তেমনিভাবে সামনের দিকের পা দুটোকে একেবারে নড়বড়ে হাতে পরিণত করে শূন্যে ঝুলিয়ে টেবিলের ওপর মাংসাহারে রত ব্যক্তির দিকে লোলুপ নেত্রে চেয়ে ঊর্ধ্বমুখে লালী খাড়া হয়ে বসে আছে। সোজা হয়ে বসবার উপযোগী তার পাছার গড়ন বিশেষভাবে প্রশস্ত এবং সমতল।

সুদীর্ঘ জীবনে কুকুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিতান্ত অল্প নয়; কিন্তু সামনের দিকের পায়ের সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষের মতো সোজা হয়ে বসতে-পারা কুকুরের অভিজ্ঞতায় লালীই প্রথম এবং বোধ করি শেষ।

তারের তাঞ্জামে আসীন হয়ে ফুলী যেদিন আমাকে গৃহে প্রবেশ করলে, তখন লালী পনেরো মাসের তাগড়া কুকুর। তার সম্মুখে পায়ের বিকৃতি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। লুব্ধ, ক্রুদ্ধ অথবা উৎসাহিত হলে সে তীরবেগে চার পায়ে ছুট মারতে পারে। আহার বিষয়ে তার পছন্দ-অপছন্দ যথেষ্ট। সাত্ত্বিক আহারের মধ্যে দধিতে এবং রাজসিকের মধ্যে মাংসে তার প্রচুর রুচি। তবে দধি এবং মাংসের মধ্যে যদি নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে, তা হলে অবশ্যই মাংস। রান্নাঘর থেকে যখন মাংস রাঁধার গন্ধ নির্গত হয় তখন লালীর উৎসাহের অন্ত থাকে না।

ফুলীর প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতে লালী তিনবার ডাক দিলে—ঘেউ ঘেউ ঘেউ। আমরা সকলে তার অর্থ করলাম, তুই আবার কোথা থেকে এ বাড়িতে মরতে এলি ?

তৎক্ষণাৎ ফুলী উত্তর দিলে, চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ !—অর্থাৎ তুই একাই যে এ বাড়িতে মরবি, সে কথা তোকে কে বললে ?

লালী বললে, ভেউ !—অর্থাৎ, দূর হ।

ফুলী উত্তর দিলে, চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ !—অর্থাৎ, দূর হব তোর কথায় নাকি ?

লালীর এলাকা গৃহের একতলা। ফুলী স্থান পেলে দোতলার বারান্দার দক্ষিণ কোণে, যার নিচে একতলায় লালী সাধারণতঃ বসে রোদ পোয়ায়। সেখান থেকে লালী হুঙ্কার ছাড়ে, ঘেউ ঘেউ ঘেউ !

উপর থেকে ফুলী উত্তর দেয়, চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ !

বোঝা গেল দুজনে দুজনকে ভারি অপছন্দ করছে।

ফুলীর ওপর একটু মনোযোগী হলাম। সে যাতে সুপুষ্ট বাছাই-করা ছোলা পায়, প্রতিদিন যাতে তার খাঁচা ধোওয়া হয়, সেই সঙ্গে যাতে তাকে স্নান করানো হয়, ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে লাগলাম।

টিয়াপাখী কথা কয়। মাস-খানেক ধরে সকাল সন্ধ্যা দু বেলা অধ্যবসায়ের সহিত ফুলীকে পড়াতে লাগলাম, কিষ্টো-রাধা, কিষ্টো-রাধা, কিষ্টো-রাধা! পড় ফুলু—কিষ্টো-রাধা!

কিন্তু অত কষ্ট করে পড়িয়েও কোনো ফল হলো না। মিনিট দশেক ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে আমার মুখে কিষ্টো-রাধা শুনে হঠাৎ কোনও এক মুহূর্তে গলাটা সরু করে এগিয়ে দিয়ে ফুলী চিৎকার করে ওঠে,—টিয়া টিয়া টিয়া!

হতাশ হয়ে আমি বলি, ছিয়া ছিয়া ছিয়া! ওরে পাপিষ্ঠ, ছোলা খাবার যম! পাপ মুখ দিয়ে একবারও কি কিষ্টো নাম বেরোল না?

সময়ে সময়ে ফুলী যেন আমার বেদনা বুঝতে পারে। ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে দুই ঠোঁট ফাঁক করে ক্ষণকাল নিঃশব্দে কাটিয়ে হঠাৎ একটা শব্দ বার করবার উপক্রম করে। যেটুকু বেরোয় তাতে মনে হয়, সে শব্দ যেন মানুষের ভাষার বর্ণমালার অন্তর্গত। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। হঠাৎ এক সময়ে গলা সরু করে চিৎকার করে ওঠে,—টিয়া টিয়া টিয়া!

নিম্নে ক্রুদ্ধ লালীর ডাক শোনা যায়—ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

যদিও ফুলী কিষ্টো-রাধা নামে সাড়া দিতে অসমর্থ হলো, মনে হয় লালীর ঘেউ ঘেউ ডাকে সে বিভিন্ন অর্থে সাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। পশুর ডাক পক্ষী বুঝেছে। লালীর ডাকের মধ্যে কি অর্থভেদ ফুলী উপলব্ধি করে তা বোঝা যায় না, কিন্তু প্রতিবাদে কখনও সে করে চ্যা-চ্যা, কখনও চর্-চর্, কখনও টিয়া-টিয়া, কখনও বা আর কিছু। বোধ করি ওগুলো শাপশাপান্তরের বিভিন্ন মাত্রার ব্যঞ্জনা।

সে যাই হোক, লালী এবং ফুলীর মধ্যে এই প্রকাশ বৈর-সম্ভাষণ ক্রমশঃ সংখ্যায়, দৈর্ঘ্যে এবং প্রাবল্যে এতটা বেড়ে উঠল যে, সংসারে যৎপরনাস্তি অশান্তি দেখা দিলে। উভয়ে যখন বচসা শুরু করে তখন অমানবীয় কোলাহলের দাপটে বাড়ির লোক অস্থির হয়ে ওঠে। একতলায় লালীর কাছাকাছি যারা থাকে তাদের তো পরস্পরের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য কথোপকথন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

বোঝা গেল, উভয়ের মধ্যে কোথাও একটা তীব্র জাতিবিদ্বেষ থাকার জন্য বনিবনাব সম্ভাবনা নেই, সুতরাং দুজনকে একত্র রাখা চলবে না। লালী আমাদের গৃহের পুরনো অধিবাসী, তাই সে আমাদের কাছেই রয়ে গেল। ফুলীকে নিকটস্থ এক আত্মীয়-গৃহে অন্তরিত করা হলো। সুদৃশ্য খাঁচার মধ্যে সুরূপ টিয়াপাখী পেয়ে আত্মীয়রা খুশী হয়ে সেরখানেক ছোলা কিনে এনে মহা উৎসাহে বাছতে বসে গেল।

এদিকে শত্রু-নির্বাসনের কল্যাণে লালীর হাঁক-ডাক অনেক কমে গেল। কমে যাওয়ার চেয়ে থেমে যাওয়ারই কাছ-বরাবর হলো। কড়া-নাড়ার শব্দ হলে তেমন কোন সাড়া দেয় না। নূতন লোক সামনে পড়লে এক-আধবার ডাক দিয়েই

থেমে যায়।

আমরা মনে করি, ফুলীর সঙ্গে চেঁচামেচি করে প্রশ্বাসের অনেক অপব্যয় হয়েছে, তাই দম নিচ্ছে। কিন্তু পাঁচ-সাত দিন পরে খেয়াল হলো, শুধু দম নিচ্ছেই না, খাওয়াও অনেক কমিয়ে দিয়েছে। খাদ্যের জন্য বাড়ির গৃহিণীর শাড়ি কামড়ে টানাটানি করা বন্ধ করেছে, দই-মাখা ভাত তো শুঁকেও দেখে না, মাংস দিলে একটুখানি চেটে-চুটে ফেলে রাখে। অধিকাংশ সময়ই তক্তপোশের তলায় আত্মগোপন করে থাকে। কেউ ডাকাডাকি করলে গোঁ-গোঁ শব্দ করে হয় ভয় দেখায়, নয় বিরক্তি প্রকাশ করে। কারও কারও চোখে লালীর চোখ সময়ে সময়ে জবাফুলের মতো লাল মনে হয়।

বিবরণ শুনে একজন বন্ধু বললেন, হাইড্রোফোবিয়ার পূর্বলক্ষণ; অপর একজন বললেন, ডিস্‌টেম্পারের।

দুটোই খারাপ। চিন্তিত হয়ে বিলিতী পাশ পশু-চিকিৎসক আমাদের এক নাত-জামাইকে তলব করলাম। লালীকে দেখেশুনে যথাসম্ভব পরীক্ষা করে তিনি বললেন, "শারীরিক কোন রোগ মনে হচ্ছে না, সম্ভবতঃ মানসিক ব্যাপার। দুঃখ, অভিমান, ক্রোধ, কিংবা ঐ ধরনের কিছুর কোন ইতিহাস আছে কি?"

একটু ভাবতেই ফুলীর কথা মনে হলো। সবিস্তারে তার ইতিহাস জানালাম।

হাসিমুখে নাতজামাই বললে, "তা হলে ঠিক তাই।"

সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী ঠিক?"

"কিছু মনে করবেন না তো দাদামশায়?"

"না না, মনে আবার করব কী?"

"অল্পবয়সে দিদিমণি বাপের বাড়ি গেলে আপনার যা হতো ফুলী যাওয়াতে লালীর তাই হয়েছে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করে বললাম, "বল কি ভায়া!—বিরহ?"

"নির্ঘাৎ। ফুলীকে ফিরিয়ে আনুন, লালী আবার দই-ভাত খেতে আরম্ভ করবে।"

"তবে যে দুজনে দিনরাত ঝগড়া করত?"

"সেটা ঝগড়া, না ওদের ভাষায় প্রেমালাপ, তা কেমন করে জানবেন?"

যথার্থ।

সেই দিনই ফুলীকে আনতে পাঠালাম।

ভেবেছিলাম, আত্মীয়রা হয়তো একটু দুঃখিত হবে। কিন্তু দেখা গেল, ফুলীকে ফেরত পাঠাবার জন্য তারা নিজেরাই ব্যস্ত হয়েছে। ফুলী ভালো করে ছোলা খায় না, ভালো করে ডাকে না, কিষ্টো-রাধা পড়াতে গেলে চ্যাঁ শব্দ করে খাঁচার মধ্যে তেড়ে আসে। এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, দাঁড়ের উপর বসতে পারে না, তলায় বসে চোখ বুজে ঝিমোয়।

ফুলীকে এনে বৈঠকখানার মেঝেয় বসানো হলো। লালী বসে ছিল

তক্তপোশের তলায়। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে খাঁচার পাশে উপবেশন করল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলী টপ করে দাঁড়ের ওপর উঠে বসল। তারপর তাদের সম্ভাষণ আরম্ভ হয়ে গেল।

এখন যেন আমরা ওদের ভাষা কতকটা বুঝতে আরম্ভ করেছি।

লালী ডাকলে, ঘেউ ঘেউ ঘেউ
অর্থ যেন, তোমারে ছাড়িয়া
থাকিতে পারে কি কেউ!
ফুলী উত্তর দিলে, টিয়া টিয়া টিয়া!
অর্থাৎ, তাই তো আবার
ফিরিয়া এসেছি প্রিয়া!

লালীর প্রতি প্রিয়া অপপ্রয়োগ নয়। কারণ লালী গোত্রে কুকুর হলেও জাতিতে কুক্কুরী,—অর্থাৎ মাদী। আর হিন্দীতে একটা প্রবচন আছে—বুড্ঢা তোতা নহি পঢ়তা হ্যায়; অর্থাৎ বৃদ্ধ পাখী পড়া পড়ে না। ফুলী যখন কিষ্টো-রাধা পড়লে না তখন সে বুড্ঢা তোতা, সুতরাং মদ্দা।

আশ্বিন ১৩৬১

সাত দিন

এক

বেলা তখন এগারোটার কাছাকাছি।

উগ্র খেয়ালী সুধানাথ মুখুজ্জে দক্ষিণ কলকাতার এক জনবিরল গলি দিয়ে বাঁ হাত অল্প নাড়তে নাড়তে, বোধ করি কোন এক খেয়ালেই মশগুল হয়ে পথ চলছিল।

সুধানাথরা উত্তর-প্রদেশের ক্ষুদ্র এক শহরের তিন পুরুষের অধিবাসী। আর্থিক অবস্থা ভালো। জোত আছে, জমি আছে; তা ছাড়া, পৈতৃক আমলের মহাজনী মোটা কারবার আছে। উত্তর-প্রদেশের বাড়িতে সুধানাথের বড় ভাই উমানাথ সপরিবারে বাস করে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করে।

অল্পবয়সে পিতামাতা হারিয়ে সুধানাথ পাটনায় মাতুলালয়ে থেকে কলেজের লেখাপড়া শেষ করেছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে উজ্জ্বল রত্ন। পদার্থবিদ্যায় এম্. এস্-সি. পরীক্ষায় যে নম্বর পেয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পর্যন্ত আর কেউ তার কাছাকছিও যেতে পারে নি।

এম্. এস্-সি. পরীক্ষা পাশ করার পর দিল্লীতে আই. এ. এস. পরীক্ষা দিয়ে নিছক আড্ডা দেবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় ফার্ন রোডে তার বন্ধু বিজয়লালের বাসায় এসে উঠেছে।

একটা কিছু চিন্তা করতে করতে কতকটা অন্যমনস্ক হয়েই সুধানাথ পথ চলছিল; এমনি সময়ে গলির বাঁকের মাথায় বই হাতে উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের একটি অপরিচিত সুন্দরী মেয়ে আবির্ভূত হলো। সম্ভবতঃ কলেজ থেকে প্রত্যাগমনের পথে ট্রাম থেকে নেমে বাড়ি ফিরছে।

মেয়েটির মুখে চোখে, কুঞ্চিত অলকে, দেহভঙ্গীর ছন্দে এক অনির্বচনীয় অতিদাহ্য ইন্ধনের জোগান পেয়ে সহসা সুধানাথের মনের মধ্যে খেয়ালের বহ্নি প্রজ্জলিত হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে বহুবার বহু প্রকারের খেয়ালের খেলা সে খেলেছে; কিন্তু এবারকার চূর্ণকুন্তলের জটিলতাকে আশ্রয় করে খেয়ালের যে লীলা, শুধু তা অভূতপূর্বই নয়,—যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি বিপজ্জনক।

মেয়েটি কাছাকাছি এলে অতর্কিতে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সুধানাথ প্রশ্ন করলে, "কলেজ থেকে ফিরছ?"

'তুমি' সম্বোধনের পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্যেও মেয়েটি অতি-অবশ্যই সুধানাথকে চিনতে পারলে না,—তবু সত্য ঘটনাকে অস্বীকার করা গেল না; বললে, "হ্যাঁ।"

"আশুতোষ কলেজ থেকে তো?"

এ কথাও স্বীকার করে বলতে হলো, "হ্যাঁ।"

"এই পাড়াতেই থাকো?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও কাছাকাছি থাকি।"

"ও!"

"আচ্ছা, ধীরেন এখন কোথায় আছে?"

"কে ধীরেন?"

মনে মনে সুধানাথ বললে, তা কি ছাই আমিই জানি? প্রকাশ্যে বললে, "আমার বন্ধু ধীরেন বোস, তোমার পিসতুতো দাদা,—যার বাড়িতে দিন দুই তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

মেয়েটি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তা হলে চিনতে না পারার অস্বস্তিতে এতক্ষণ যে পীড়িত হচ্ছিল, তার কোনও কারণ ছিল না, অচেনাই। বললে, "ধীরেন নামে আমার কোন পিসতুত দাদা নেই। আপনি আমাকে ভুল করছেন,।"

এক মুহূর্ত বিস্মিত অপলক নেত্রে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে সুধানাথ বললে, "তোমাকে নিশ্চয় ভুল করছি নে; ভুল করছি তা হলে ধীরেনকে। ধীরেনের বাড়িতে তোমাকে না দেখে অন্য কোথাও দেখে থাকব। আচ্ছা, তোমার নাম কী বল তো?"

এ প্রশ্নে মেয়েটি বিরক্ত বোধ করলে। সে যখন অপরিচিত যুবকের বন্ধুর মামাতো বোন নয়, তখন কথাবার্তা ঐখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল; বিশেষতঃ তার পরও তাকে 'তোমার' শব্দের দ্বারা সম্বোধিত করা একেবারেই মার্জিতরুচির পরিচায়ক নয়; তথাপি নামটা জানালে প্রসঙ্গটা একেবারে শেষ হতে পারে মনে করে বললে, "আমার নাম বাসন্তী চাটুজ্জে।"

চাটুজ্জে শুনে সুধানাথের মন উল্লাসিত হয়ে উঠল। তা হলে প্রথম অঙ্কেই যবনিকা-পাত হয়ে নাটকটা নিতান্তই মাঠে মারা যাবে না, তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া চলবে; এমন কি, সৌভাগ্যের সহায়তা থাকলে, পঞ্চমাঙ্ক পর্যন্তও। তার পর শেষ দৃশ্যের যবনিকা-পাত আনন্দান্ত হবে, অথবা বিষাদান্ত—খেলোয়াড়ী অভিনেতা তার জন্যে মাথা ঘামায় না, ভাগ্যের উপরই সে-অনিশ্চয়তাকে সে ফেলে রাখে।

বাসন্তী পাশ কাটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছে দেখে হাসিমুখে সুধানাথ বললে, "যাবার আগে একটা কথা শুনে যান।"

'শুনে যান'। তা হলে শিষ্টতার বোধ একেবারে নেই তা নয়। একটুখানি খুশী হয়েই বাসন্তী বললে, "কী কথা?"

সুধানাথ বললে, "দেখুন, মানুষের মন ভারি অদ্ভুত জিনিস। কত চিন্তা আমাদের মনে সর্বদা উদয় হচ্ছে, অথচ আমরা মানুষেরা চিন্তা চাপতে অভ্যস্ত বলে সে সব চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে চাপা থেকেই মারা যায়। আজ কিন্তু আমি আমার মনের একটা চিন্তা কিছুতেই চেপে না রাখবার পরীক্ষা করব স্থির করেছি। মনের খাঁচার দোর খুলে আমার এখনকার চিন্তাকে আকাশে উড়িয়ে দেবার জন্যে আজ আমার মনে কৌতূহলের অন্ত নেই।…ধীরেন বসু আর তার মামাতো বোন মিথ্যের সৃষ্টি। রুইমাছ ধরবার জন্যে পুঁটিমাছদের সৃষ্টি করে টোপ ফেলেছিলাম। আসল কথা, আপনি যখন আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন তখন আপনার অপরূপ মূর্তির মধ্যে কিসের যেন সন্ধান পেয়ে মনে হচ্ছিল, আপনার মতো একটি মেয়ে যদি অদৃষ্টে জোটে, তা হলে বহু অনুরোধে-উপরোধে এ পর্যন্ত যে কাজ করি নি, তাই করি। রাগ করবেন না, আপনার মতো মেয়ে বলেছি, আপনাকে বলি নি।"—বলে সুধানাথ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

অপরিচিত ব্যক্তির এই অমার্জনীয় ধৃষ্টতা দেখে ক্রোধে বাসন্তীর মন উত্তপ্ত হয়ে উঠে তার মুখমণ্ডলকে আরক্ত করে তুললে। এই দুর্বিনীত দুঃসাহসিকতাকে নীরবে পরিপাক করে চলে যাওয়ার পরাজয় মেনে নিতে মন অস্বীকার করছিল, অথচ এর প্রতিবাদের যথোচিত কঠোর ভাষাও মুখে জোগাচ্ছিল না। এমন সময়ে সুধানাথই সংকট মোচন করলে। বললে, "আমি তো আমার মনের চিন্তা আকাশে ওড়ালাম। এর ফলে আপনার মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছে আপনিও তা যদি আকাশে ওড়ান, তা হলে কৃতার্থ হই।"

বদ্ধগভীর স্বরে বাসন্তী বললে, "অকপটে ওড়াব ?"

ব্যগ্রকণ্ঠে সুধাকর বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, অকপটেই ওড়াবেন। এখন তো আমাদের অকপটের পালাই চলেছে।"

এক মুহূর্ত কী চিন্তা করে আরক্তমুখে বাসন্তী বললে, "দেখুন, আপনার সমস্যা আমার মতো একটি মেয়ের; আমাদের সংসারে কিন্তু উপস্থিত গুরুতর সমস্যা চাকরের। আপনাকে মনের চিন্তা ওড়াতে দেখে আমার মনে হচ্ছে, যদি আপনার মতো একটি চাকর পাওয়া যায়, আপনার মতো হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ, আপনার মতো এমনি ঠোঁটকাটা, তা হলে সংসারের সত্যিই উপকার হয়। রাগ করবেন না, আপনার মতো চাকর বলেছি, আপনাকে বলি নি।"

বাসন্তীর কথা শুনে সুধানাথের দুই চক্ষু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল; প্রসন্ন-ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "না না, নিশ্চয়ই রাগ করব না। আপনার মতো মেয়ের সন্ধান আপনি তো দিলেন না; অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে হয়তো কোনদিন দয়া করে দিতেও পারেন। আমি কিন্তু ঠিক আমার মতো চাকর আপনাকে দেব। এতই আমার মতো যে, যখন সে আপনাদের বাড়ি গিয়ে দাঁড়াবে, মনে হবে আমিই যেন গেছি। দুর্দান্ত কাজের লোক। আপনার নিজের সমস্ত কাজ এমন প্রাণ দিয়ে করবে যে, বাড়ির লোকের কাছে আপনি অপ্রতিভ হয়ে থাকবেন।" তার পর পকেট থেকে নোটবুক বার করে বললে, "বলুন, কী আপনাদের ঠিকানা। কাল সকালেই লোক পাঠাব।"

"না, আপনাকে পাঠাতে হবে না।—বলে বাসন্তী দ্রুতপদে এগিয়ে চলল।

খানিকটা গিয়ে পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখলে। মনে হলো, গতি পরিবর্তিত করে লোকটা যেন পথচারীদের আড়ালে আড়ালে তাকে অনুসরণ করে এগোচ্ছে। তার দীর্ঘ দেহের মাথার খানিকটা অংশ যেন পথিকদের মাথা ছাড়িয়ে মাঝে মাঝে প্রকাশ পাচ্ছে। গৃহের সম্মুখে এসে আর একবার তাকিয়ে দেখে মনে হলো, লোকটা যেন আরও কাছাকাছি এসে পড়েছে। গৃহে প্রবেশ করে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে গিয়ে বাসন্তী জানলার ঝিলমিলি সামান্য একটু ফাঁক করে চোখ পেতে তাকিয়ে রইল। বেশি দেরি হলো না, মিনিট খানেকের মধ্যে লোকটা তাদের বাড়ির সামনে এসে শুধু বাড়িটাই দেখলে না, দরজার মাথার ওপর বাড়ির নম্বরটাও যেন লক্ষ্য করে গেল।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল বাসন্তী। যা দুঃসাহসী লোক, ঠিকানা নিয়ে চিঠি-চাপাটি আরম্ভ না করে!

প্রথমে বাসন্তী মনে করেছিল, বাড়ি পৌঁছেই পথের এই বিচিত্র কাহিনী তার মাকে সবিস্তারে গল্প করে শোনাবে। কিন্তু ভেবে দেখলে, সেটা নিরাপদ হবে না। মেয়েদের বেশি উচ্চশিক্ষার অবিশ্বাসী তার মাকে অনেক সাধাসাধি করে তবে বি. এ. ক্লাসে নাম লেখাতে সে সক্ষম হয়েছিল। সমর্থ বয়সের মেয়েরা একা পদব্রজে

কলেজ যাতায়াত করে এ তার মার আদৌ পছন্দ নয়,—তার ওপর কলেজ-যাতায়াতের পথে কন্যার পিছনে চিন্তা ওড়াবার লোক জুটেছে শুনলে আর রক্ষা থাকবে না।

কাজেই কথাটা শুধু তার নিজের মনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে সারাদিন তাকে মাঝে মাঝে বিদ্ধ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলে যে সংসারে কত রকমই তো পাগল থাকে, এও হয়তো এক রকম চিন্তা-ওড়ানো পাগল।

দুই

পরদিন বেলা এগারটার পর কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে বাসন্তী দেখলে, তার মা বিজয়া পূজার জায়গায় বসে চন্দন ঘষছে। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ কি মা, এখনও তোমার পুজো হয় নি?"

বিজয়া বললে, "কী করে হবে? নতুন চাকর এল, তার পেছনে এতক্ষণ লেগে থেকে তারপর পুজোয় বসেছি।"

শুনে বাসন্তীর বুকটা ধড়াস করে উঠল। সন্ত্রস্ত মনে বললে, "কে দিলে মা চাকর?"

"বোধ হয় ভগবানই দিলেন,—এখন বরাতে টেঁকলে বাঁচি! তুই কলেজ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এল। উনি বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছেন, এসে বললে—চাকর রাখবেন বাবু?"

বিজয়ার বিবৃতির মধ্যে বাধা দিয়ে বিরক্তিব্যঞ্জক কণ্ঠে বাসন্তী বললে, "আর অমনিই তোমরা রেখে দিলে? চোর, না ডাকাত, না মতলববাজ, কোনো সন্ধান নিলে না? আজকালকার দিনে চাকর অমনই রাখলেই হলো? কেন, জানাশোনা লোক পাওয়া না যাওয়া পর্যন্ত পাঁচীকে দিয়েই কষ্টে-সৃষ্টে চালিয়ে নিলেই তো হতো।"

পাঁচী সংসারের ঠিকা ঝি।

বাসন্তীর উৎকণ্ঠা দেখে কৌতুক অনুভব করে হাসিমুখে বিজয়া বললে, "কোনও ভয় নেই তোর,—খুব বিশ্বাসী লোক। ওর সঙ্গে কার্নি রোডের কোন্ বিজয়লাল-বাবুর পরিচয়পত্র ছিল, তোর দাদা তখনই সেই চিঠি নিয়ে গিয়ে বিজয়লালবাবুর সঙ্গে মোকাবিলা করে এসেছে। বিজয়লালবাবু মস্ত লোক—নিজের বাড়ি, গভর্মেণ্টের বড় অফিসার। বলেছেন, ওঁর দেশের প্রজা, খুব বিশ্বাসী লোক, স্বভাবচরিত্রেও খুব ভালো। ওর হাতে গয়নার আলমারির চাবি দিয়ে সিনেমা দেখা চলে।"

এ কথা শুনে বাসন্তী একটু আশ্বস্ত বোধ করলে। বিজয়লালবাবু যখন চাকরের

পরিচয় দিয়েছেন, তখন অপর লোকও হতে পারে। বললে, "সাড়াশব্দ কিছু পাচ্ছি নে, আছে কোথায়?"

"সমস্ত কাজকর্ম সেরে আমার পুজোর জল আনতে গঙ্গায় গেছে। দুর্দান্ত কাজের লোক। কাজের টুঁটি টিপে ধরে, আর দেখতে দেখতে শেষ করে, ভাঙে না, চোরে না, অথচ পরিচ্ছন্ন কাজ। সাবান চেয়ে নিয়ে তোর শাড়ি সায়া জামা ধোপার বাড়ির মতো ধবধবে করে কেচে দিয়েছে। বলেছে, কাল তোর ঘরের ঝুল ঝাড়বে। তোর ঘরের আসবাবপত্র ঝেড়ে-ঝুড়ে খাটের তলা পর্যন্ত ঢুকে সমস্ত ঘর পরিচ্ছন্ন করে ঝাঁট দিয়েছে। তোর জুতো দু-জোড়া ঝেড়ে-মুছে কি রকম ঝকঝকে করেছে দেখ্‌গে যা। বলছিল—দিদিমণি এলে ও-জোড়াও পরিষ্কার করে রাখব।"

শুনে বাসন্তীর মন আবার দ'মে গেল। নাঃ! প্রথম দিন আবির্ভূত হয়েই অপ্রতিভ করবার এতটা ব্যবস্থা যে করেছে, সে আর অন্য কেউ নয়,—সে-ই!

প্রস্থানোদ্যত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বাসন্তী বললে, "কী নাম মা চাকরের?"

"নিমাই। নিমাই দাস। শোন বাসু, নিমাই তেতেপুড়ে আসবে, এলে একটু জল খেতে দিস।"

কোনও উত্তর না দিয়ে বাসন্তী গম্ভীর চিন্তিত মনে প্রস্থান করলে। মনে মনে বললে, তুমি তো কাজের চাকর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পুজোয় বসলে মা,—কিন্তু ঐ ধড়িবাজ লোককে নিয়ে তোমার মেয়ের জীবন যে এ বাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে, তা তো জানো না!

তিন

দড়ির আলনায় শাড়ি সায়া ব্লাউজের ধপধপানি দেখে বাসন্তীর মনে প্রায় ক্রোধের সঞ্চার হলো, মনে হলো, ধৌতকারীর পরিচয় যেন তার মধ্যে দাঁত বার করে হাসছে। ঘরে ঢুকে কক্ষের সর্বত্রব্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতা দেখে মন হলো মলিন; আর জুতো দু-জোড়ার ঝকঝকে নির্মলতা দেখে একটা অনির্ণেয় সন্ত্রাসে চকিত হয়ে হয়ে উঠল চিত্ত। মনে হলো, যে মানুষ এত নিম্নে এমন করে হাত চালাতে পারে, তার হাতে কোন কিছুই আটকাবে না।

দৈনন্দিন নিয়ম অনুযায়ী তার জন্যে টেবিলের উপর একটু খাবার ঢাকা রয়েছে, আজ তা খেতে ইচ্ছা করল না। কুঁজো থেকে জল ঢেলে খানিকটা খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে পড়তে বসল, কিন্তু মন বসে না। একটু পরে কড়ানাড়ার শব্দ থেকে যে জটিল সময়াভিপাত আরম্ভ হবে, তার দুশ্চিন্তায় চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হতে লাগল।

খুট-খুট-খুট-খুট-খুট।

বুকটা ধড়াস করে উঠল। তা হলে এসে গেছে।

কিন্তু দুর্বল হলে আরও পেয়ে বসবে। মনকে কঠোর এবং অক্ষমাশীল করে নিয়ে সদর-দরজায় উপস্থিত হয়ে হুড়কো খুলে বাসন্তী দেখলে, মূর্তিমানই বটে! খালি পা, খালি গা, মালকোঁচা মারা, কোমরে একখানা লাল গামছা বাঁধা, কাঁধে গঙ্গাজলের কলসীর ভারে অবনত মুখের ঊর্ধ্ব দৃষ্টিতে পিত্তি-জ্বালানো দীপ্তি।

পাশে সরে গিয়ে বাসন্তী সুধানাথের যাবার পথ করে দিয়ে দাঁড়াল। তারপর হুড়কো লাগিয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে পুনরায় খবরের কাগজের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করে বিচলিত মনের স্থৈর্য ফেরাতে নিযুক্ত হলো।

মিনিট দুই পরে সুধানাথ কক্ষে প্রবেশ করলে। নিমেষের জন্য একবার তাকে তাকিয়ে দেখে বাসন্তী দৃষ্টি নত করলে।

যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে খানিকটা নত হয়ে প্রণাম করে বিনীত কণ্ঠে সুধানাথ বললে, "আপনিই তা হলে এ বাড়ির দিদিমণি?"

মুখ তুলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাসন্তী বললে, "কেন, সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ আছে নাকি?"

সুধানাথ বললে, "আজ্ঞে দিদিমণি, আমি তো আপনাকে আগে কখনও দেখি নি, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"ও! আগে কখনও দেখ নি! আর, কাল যে আমাকে পথ আটকে পনেরো মিনিট ধরে মনের চিন্তা আকাশে ওড়ালে, সে বুঝি তোমার ভূত?"

সুধানাথের মুখে সমস্যাভঙ্গের নিঃশব্দ নিশ্চিন্ত হাস্য ফুটে উঠল। বললে, "তাই বলুন! সে আমার ভূত হতে যাবে কেন দিদিমণি, সে আমার যমজ দাদা—নিতাই দাস। সেই তো আমাকে আজ আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে। তা আপনার দোষই বা কেমন করে দিই? নিতাই দাস আর নিমাই দাস তো অনেকটা এক রকমই দেখতে।"

ধমকে উঠল বাসন্তী, "অনেকটা একরকম?"

চমকে উঠে সুধানাথ বললে, "এই দেখুন, রেগে যাচ্ছেন আপনি! আচ্ছা, অনেকটা একরকম নয়, প্রায় একরকম।"

"প্রায়ও নয়।"

"তবে?"

"ঠিক একরকম,—কারণ নিতাই দাস আর নিমাই দাস একই লোক।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে ক্ষণকাল বিহ্বল নেত্রে বাসন্তীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে সুধানাথ বললে, "এই দেখুন, খামকা বখেড়া লাগাবার চাইছেন। নিতাই দাস আর নিমাই দাস যদি একই লোক হবে, তা হলে তাদের মা দুজনের এক নাম না রেখে আলাদা আলাদা কেন রেখেছেন, তা বলুন! নিতাই যদি নিমাই-ই হয়, তা হলে আমি ক্যামনে নিমাই হলাম, তাও কন!"

বাসন্তীর দুই চক্ষু শ্লেষে কুঞ্চিত হলো। বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললে, "ওঃ!

আবার ন্যাকা-ন্যাকা কথা কওয়া হচ্ছে। কাল তো তোমার মুখ দিয়ে খুব চোখা-চোখা কথা বেরুচ্ছিল।"

বিমূঢ় মুখে সমস্যাপীড়িত স্বরে সুধানাথ বললে, "হেই দেখ, আবার সেই কথা! সে কি আমি দিদিমণি? সে তো নিতাই দাস। ম্যাটিক ফেল, বেঁজায় পণ্ডিত! চোখা-চোখা কথা সে কইবে না তো কি মুরুখ্যু মানুষ আমি কইব?"

"কেন, তুমি আবার কী-ফেল করে মুরুখ্যু হয়েছ?"

এবার সুধানাথের মুখে একরাশ হাসি ফুটে উঠল; বললে, "আমি ফেল্ করিনি দিদিমণি। আমি ফোৎ কেলাসে উঠে পরীক্ষেই দিই নি।"—বলে হেসে উঠল।

ফোৎ কেলাস শুনে বাসন্তীর অঙ্গ গেল জ্বলে। উঃ! কী ত্যাঁদোড় মানুষ! ম্যাটিকের সঙ্গে ফোৎ কেলাস ঠিক মিলিয়ে দিয়েছে! হঠাৎ খেয়াল হলো, ওর র-ফলা আর রেফের উচ্চারণ-বিভ্রাটের সততার বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখলে হয়। বললে, "গঙ্গাজল কিসে নিয়ে এলে তুমি?"

উৎফুল্ল মুখে সুধানাথ বললে, "কলসীতে বটে।"

"সে কথা জিজ্ঞাসা করছি নে। জল তো এল কলসীতে, তুমি এলে কিসে?"

সুধানাথের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল, "তাই বলেন! এনু ট্যাম গাড়িতে, গেছনু বাসে। বাস লাফায়, জল উছলে পড়ে। ট্যাম গাড়ি লাফায় না।"

ট্যাম গাড়ি! নাঃ! জ্বালালে দেখছি! একটা অতি কৃশ সংশয়ে বাসন্তীর মন দোলায়িত হলো—তা হলে কি সত্যি-সত্যিই কালকের সে আজকের এ নয়? এমন অসম্ভাব্য ঘটনাসংঘাত—

"খবরদার!"—শট করে বাসন্তী তার দুটো পা চেয়ারের ভিতর দিকে সরিয়ে নিলে।—"খবরদার! পায়ে হাত দেবে না।"

থপ করে চেয়ারের সামনে বসে পড়ে সুধানাথ বাসন্তীর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিল; হাত সরিয়ে নিয়ে কপট কাতরতার স্বরে বললে, "পায়ে হাত দেব কেন দিদিমণি, এতক্ষণ কলেজ থেকে এসেছেন, এখনও জুতো খোলেন নি, তাই ফিতে আলগা করে জুতো দু-পাটি আলতো-আলতো খুলে নিতে যাচ্ছিলাম।"

"না! খুলবে না!"

"তবে আপনিই খুলুন, সাফ করে দিয়ে যাই।"

"না, সাফ করতে হবে না!"

হতাশভাবে সুধানাথ বললে, "তবে থাক।" উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন কাজ আছে দিদিমণি?"

টেবিলের উপরে রাখা আধ-খাওয়া জলের গ্লাসটা দেখিয়ে বাসন্তী বললে, জলটা ফেলে দিয়ে গেলাসটা ধুয়ে রাখ।"

টেবিল থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে দু-চার পা এগিয়ে গিয়ে সুধানাথ বললে, "বেঁজায় পিপাসা লেগেছে।" তারপর মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে সমস্ত জলটা খেয়ে গভীর-তৃপ্তিসূচক কণ্ঠে বললে, "আঃ।"

চিৎকার করে উঠল বাসন্তী, "এঁটো জল কেন খেলে?"

ফিরে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন মুখে সুধানাথ বললে, "আপনার এঁটো? তাই অত—"

আরও উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করল বাসন্তী, "তাই অত কী? বল! বলতে হবে!"

একটু বিহ্বল ভাবে বাঁ হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে সুধানাথ বললে, "কাজ নেই আর ও-কথায়। যা রাগী মানুষ আপনি। খামখা আরও খানিকটা রেগে যাবেন।" বলে প্রস্থানোদ্যত হলো।

"শোন।"

ফিরে দাঁড়িয়ে সুধানাথ বললে, "বলুন।"

"ঐ খাবার ঢাকা রয়েছে। ওটা নিয়ে গিয়ে দয়া করে একটু জল খাও।"

ঢাকা খুলে খাবার তুলে নিয়ে সুধানাথ জিজ্ঞাসা করল, "এও কি পেসাদী?— বাপ রে! চোখ নয় তো যেন অগ্নিকুণ্ড!" বলে সুধানাথ ধীরে ধীরে প্রস্থান করলে। মনে মনে বলে গেল, অগ্নিকুণ্ড তো নয়, যেন লালপদ্ম।

পরিপাটি করে সমস্ত কাজকর্ম চুকিয়ে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে রাত দশটার সময় সুধানাথ বাড়ি গেল। সারাদিনের বুদ্ধিবিবেচনাদীপ্ত নিরলস নিরবসর পরিচর্যার দ্বারা বাড়ির সকলকে সে গেল খুশী করে; শুধু একটি প্রাণীকে গেল একটু বিস্মিত করে;—আর তার সঙ্গে যেন অতি সূক্ষ্ম আরও একটা কিছু করে, যার ঠিকমতো শব্দরূপ অভিধানে খুঁজে বার করা কঠিন। একটু দুঃখিত করে গেল কি?—না না, নিশ্চয়ই নয়।...তবে কি একটু হতাশ করে গেল? উঁহু, তাও মনে হয় না।

কিন্তু বিস্মিত কেন করে গেল, সে কথা অস্পষ্ট নয়। সকালবেলাকার অস্বাভাবিক অসংযত প্রগল্‌ভতার শেষে সেই যে বলে গিয়েছিল—চোখ নয় তো যেন অগ্নিকুণ্ড, বাড়ি যাবার মুহূর্ত পর্যন্ত সেই অগ্নিকুণ্ডের উপর সুধানাথ আর একটি বারও দৃষ্টিপাত তো করেই নি, উপরন্তু বাসন্তীর সঙ্গে সমস্ত দিনে একটি কথাও কয় নি, এমন কি, দিদিমণি সম্বোধন পর্যন্ত নয়। অথচ তার সমস্ত কাজগুলি এমন একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে খুঁটিয়ে করে গেছে যে, বাসন্তীর দিক থেকেও কথা বলবার কোনও কারণ ঘটে নি।

মনে মনে বাসন্তী একটু হাসলে, বাবু সায়েবের আবার অভিমান হলো নাকি?

একটু সকাল সকালই বই বন্ধ করে আলো নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

আশ্চর্য কাণ্ড! সংসারের আকাশে এ ধূমকেতু অকস্মাৎ কোথা থেকে এল কে জানে!

চার

পরদিন বাসন্তী কলেজ থেকে এলে বিজয়া বললে, "নিমাই আজ আসে নি বাসু।"

এ সংবাদে হিসেবমতো যতটা খুশী হওয়ার কথা, বাসন্তী ঠিক ততটা হলো না ; বললে, "একদিনেই তা হলে লীলাখেলা শেষ হলো ?"

"তা নয় রে। শরীর খারাপ হয়েছে, তার দাদাকে পাঠিয়েছে।"

"কী নাম দাদার ?"

"নিতাই।"

নাম শুনে বাসন্তী মনে মনে হাসলে। আজ তা হলে প্রভু নিত্যানন্দের পালা অভিনীত হবে। বললে, "নিমাইয়ের দাদার বয়েস কত মা ? বুড়ো মানুষ ?"

"বুড়ো মানুষ কী রে ? একই বয়েস, ওরা দুই যমজ ভাই।"

বাসন্তীর মুখে শ্লেষসূচক হাসি দেখা দিলে ; বললে, "আচ্ছা মা, এই যমজ ভাইয়ের গল্প তোমার বিশ্বাস হয় ?"

বিজয়া বললে, "কেন, বিশ্বাস না হবার কী আছে ? মানুষের যমজ সন্তান কি হয় না ? তোর বাবা খুঁতখুঁতে মানুষ, সতীশকে আজও বিজয়বাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বিজয়বাবু বলেছেন—নিতাই আর নিমাই দুজনে যমজ ভাই-ই বটে।"

এক মুহূর্ত পরে বললে, "আচ্ছা বাসু, আমাদের সকলেরই তো মন পরিষ্কার,—তোর মনেই বা এত সন্দেহ কেন ?"

বাসন্তী মুখে বললে, "বোধ হয় বাবার মতো আমিও খুঁতখুঁতে বলে।" মনে মনে বললে, সন্দেহ কেন, সে কথা খুলে বললে নিমাইকে যদি বা বাড়ি-ছাড়া না কর, আমাকে কলেজ-ছাড়া নিশ্চয়ই করবে।

ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বাসন্তী দেখলে, দরজা ভিতর থেকে হুড়কো-লাগানো। বাসন্তীর বাবা শশাঙ্কশেখর আর দাদা সতীশ দুজনেই অফিসে, ছোট বোন হৈমন্তী স্কুলে, বউদি সুলেখা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিছুদিন থেকে বাপের বাড়ি আছে, সুতরাং সরল হিসাবে ঘরের ভিতর প্রভু নিত্যানন্দ ভিন্ন আর কারোরই থাকার কথা নয়।

খুটখুট করে কড়া নেড়ে বাসন্তী ডাক দিলে, "নিত্যানন্দ !"

ভিতর থেকে সুধানাথ বললে, "আজ্ঞে দিদিমণি।"

"দোর খোল।"

হড়াৎ করে হুড়কো খোলার শব্দ হয়ে দোর খুলে গেল। দেখা গেল, সুধানাথের নাক-মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা, হাতে লম্বা ঝুলঝাড়া।

সুধানাথ বললে, "দোরটা হাওয়ার খালি খুলে যাচ্ছিল বলে হুড়কো লাগিয়ে দিয়েছিলাম। আপনি মিনিট দশেক অন্য কোথাও বসুন দিদিমণি, আমি ঝেড়েঝুড়ে সব সাফ করে দিচ্ছি।"

মিনিট দশেক পর সুধানাথই বাসন্তীকে ডেকে নিয়ে এল। ঘরে প্রবেশ করে বাসন্তীকে প্রশ্ন করলে, "কেমন দিদিমণি, ঘর আপনার পছন্দমতো পরিষ্কার হয়েছে ?"

অস্বীকার করলে কেউ বিশ্বাস করবে না। ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত, যাবৎ আসবাবপত্র ঝকঝক করছিল। বাসন্তী স্বীকারও করলে না, অস্বীকারও করলে না; বললে, "কিন্তু আমার বই-খাতাপত্র উল্‌টে-পাল্‌টে রাখ নি তো ?"

সুধানাথ নিঃশব্দে অল্প একটু হেসে বললে, "না, তা রাখি নি। বরং আপনার যা উল্‌টে-পাল্‌টে ছিল, সাবজেক্ট (subject) মিলিয়ে ঠিক করেই রেখেছি। কিন্তু সে আপনি পরে দেখবেন অখন। একটা কথা বলি আপনাকে। মাকে বলেছি, নিমাইয়ের শরীর খারাপ,—কিন্তু আসলে সে কথা ঠিক নয়। আসবার তার অত্যন্ত আগ্রহ, কিন্তু ভয় পায় আসতে।"

"কেন ?"

"বলে—দিদিমণি চেহারায় তো খাসা দেখতে, কিন্তু ভারি রাগী মানুষ, কথায় কথায় ফোঁস করে রেগে ওঠেন।"

মাথা নেড়ে বাসন্তী বললে, "না নিতাই, আসল কথা তা নয়। মাকে তুমি যে কথা বলেছ, আসলে সেই কথাই ঠিক। কাল গঙ্গা থেকে এক কলসী জল এনে নিমাইয়ের কাঁধ টাটিয়েছে।"

সুধানাথ হাসতে লাগল। বললে, "রীতিমতো ডন-বৈঠক-কুস্তি করা শরীর, চার কলসী জল আনলেও কাঁধ টাটায় না।"

বাসন্তী বললে, "টাটিয়েছে কি টাটায় নি, একবার নিমাইয়ের কাঁধ ভালো করে টিপে দেখলেই বুঝতে পারবে। ব্যথা থাকলে 'উঃ' করে উঠবে।"

সুধানাথ বললে, "আচ্ছা, আজ রাত্রে বাড়ি গিয়ে টিপে দেখে কাল এসে আপনাকে জানাব।"

বাসন্তীর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল ; বললে, "এ পরীক্ষার জন্যে বাড়ি যাবার দরকার নেই। আমার সামনেই নিতাইয়ের ডান হাত আর নিমাইয়ের কাঁধ দুই-ই রয়েছে, নিতাই টিপলে নিমাই যদি 'উঃ' করে ওঠে, তা হলেই বোঝা যাবে টাটিয়েছে।"

সুধানাথ হাসতে লাগল। বললে, "ধন্য দিদিমণি, ধন্য আপনার বাক্‌পটুতা। আসলে কিন্তু এ বাক্‌পটুতার মূল্য এক কানাকড়িও নয়। নিমাইয়ের মুখে শুনেছি, নিতাই আর নিমাই একই লোক—এই ভুল ধারণা আপনাকে পেয়ে বসে আছে। কিন্তু আজ তো আর সে ধারণা থাকা উচিত নয়,—আজ তো বিজয়লাল-বাবুর কাছ থেকে দাদাবাবু জেনে এসেছেন, নিতাই আর নিমাই আমরা

দুজন যমজ ভাই।”

বাসন্তী বললে, “তোমার বিজয়লালবাবু একটি বুজরুক।”

“কিন্তু কোনদিন যদি অবিকল একরকম মূর্তি নিয়ে আমরা দুই যমজ ভাই আপনার সামনে এসে দাঁড়াই, সেদিন বিজয়লালবাবুর সম্বন্ধে এ মন্তব্য প্রত্যাহার করবেন তো ?”

“শুধু প্রত্যাহারই করব না, ঘাট স্বীকার করে নাক-কান মলব।”

সুধানাথের মুখে উল্লাসের নিঃশব্দে হাস্য ফুটে উঠল ; দৃঢ়স্বরে বললে, “বেশি সময় নিচ্ছি নে, মাত্র পাঁচ দিন। আজ বৃহস্পতিবার,—আসছে মঙ্গলবারের মধ্যে, আপনাকে ঘাট স্বীকার করাব তা নিশ্চয় বলছি নে, আপনার ভুল ভাঙাব।”

“আর, ভুল ভাঙাতে যদি না পার, তা হলে ?”

“তা হলে যে দণ্ডই আপনি দেবেন মাথা পেতে নোব, যার প্রাণদণ্ডর চেয়ে মর্মান্তিক—এ বাড়ি থেকে অন্তরিত হওয়ার দণ্ড।”

“কিন্তু শোন, তুমি তো নিতাই দাস, আকাশে চিন্তা ওড়াবার অভ্যাস তোমার আছে। ওড়াবার উপক্রমও করছ। কিন্তু দোহাই তোমার, মঙ্গলবার পর্যন্ত এ অভ্যাস স্থগিত রাখ।”

সুধানাথের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল ; বললে, “ক্ষেপেছেন ! এখন তো আপনি আমার মনিব, মনিবের সম্বন্ধে কখনও আকাশে চিন্তা ওড়াতে আছে ? মনের গহনে ছেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়।”

বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীপূজা বলে পূজা সারতে বিজয়ার কিছু বিলম্ব হয়েছিল,—ডাক শোনা গেল, “নিতাই !”

“যাই মা।”—বলে সুধানাথ তীরবেগে প্রস্থান করলে।

সুধানাথ প্রস্থান করার পর ক্ষণকাল বাসন্তী চিন্তানিমগ্ন মনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; তারপর মনে মনে বললে, তুমি যে নিতাই দাস অথবা নিমাই দাস নও, সে কথা তোমার গেঞ্জির কল্যাণে বিশ্বাস করি ;—আর তোমার মতো দুর্দান্তভাবে দুঃসাহসী মানুষ যে বাজে লোক হবে না, সে কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

সুধানাথের গেঞ্জির ঘাড়ে মার্কিং ইংক্ দিয়ে একটা ‘সু’ অক্ষর লেখা ছিল। অনেক সময়ে এমনি সু-যোগেই ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। নিতাই দাস নামের মধ্যে সুধানাথ নিজের নামকে লুকিয়ে রেখে আত্মগোপনের কৌশল করেছিল, কিন্তু মহকৌশলী দৈব যে তার কাঁধে একটি ক্ষুদ্র ‘সু’ অক্ষর চাপিয়ে তার সমস্ত কৌশলকে বানচাল করবার ব্যবস্থা করেছিল, তা সে খেয়াল করে নি।

পাঁচ

বৃহস্পতি এবং শুক্র—দু দিনই নিতাই দাসের জোর পালা চলল। এ আসরে নিমাই দাস একেবারে অচল। নিতাই দাস মাঝে মাঝে এমন পালা গায় যে, অত-যে দুর্ধর্ষ বাসন্তী চ্যাটার্জি, তারও হৃদয় অজানা আতঙ্কে দুরদুর করতে থাকে। নিতাইয়ের বচনে-বাচনে কথায়-বার্তায় অব্যর্থ ইঙ্গিত, অথচ না করা যায় তার প্রতিবাদ, না করা চলে তাকে পরিপাক। এমনই অদ্ভুত তার বাঁধন-ছাদন যে তর্ক তুললে কিছুতেই দাঁড় করানো যাবে না যে, বাসন্তীই সে সমস্ত ইঙ্গিতের লক্ষ্য।

শুক্রবার। বেলা তখন তিনটে। গা-ধোবার জন্যে বিজয়া স্নানঘরে প্রবেশ করেছে; হৈমন্তী স্কুল থেকে ফেরে নি; এক রাশ বাসন নিয়ে পাঁচী ঝি কলতলায় ব্যস্ত। ঝাঁটা হস্তে বাসন্তীর ঘরে প্রবেশ করলে সুধানাথ।

একটা বইয়ের ওপর চোখ রেখে বাসন্তী বোধ করি তারই জন্য অপেক্ষা করছিল; বললে, "ঝাঁটা রাখো।"

বিস্মিতকণ্ঠে সুধানাথ বললে, "কেন বলুন তো?"

"আগে রাখো, তারপর বলছি।"

অগত্যা ঝাঁটাটা মেঝেতে রেখে উৎসুক কণ্ঠে সুধানাথ বললে, "বলুন।"

তীক্ষ্ণ নেত্রে সুধানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বাসন্তী বললে, "দেখ, তুমি নিতাই দাসও নও, নিমাই দাসও নও, তা আমি নিঃসংশয়ে জানি। কে তুমি, খুলে বল। কিসের জন্যে এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম? বুঝতে পারি, এ পরিশ্রমে তুমি অভ্যস্ত নও। কিসের জন্যে তোমার এই তপস্যা?"

সুধানাথ বললে, "তপস্যা তো মানুষ বর পাবার জন্যে করে।"

অধীর কণ্ঠে বাসন্তী বললে, "দেখ, কথা দিয়ে কথা ঢাকবার মতলব ছাড়। কে তুমি সত্যি করে বল। তুমি সামান্য নও, সাধারণ নও, তা আমি শপথ করে বলতে পারি। তুমি আমাকে বিপন্ন করবে না, বিড়ম্বিত করবে না, তা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। তোমার পরিচয় দাও।"

বিমূঢ়কণ্ঠে সুধানাথ বললে, "এই দেখুন! নিজেই নিষেধ করে আবার নিজেই চিন্তা ওড়াবার হুকুম দিচ্ছেন।"

"হ্যাঁ, হুকুম দিচ্ছি। ওড়াও তোমার মনের চিন্তা আকাশে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে সুধানাথ বললে, "ধরুন, যদি বলি, আমি এক রাজপুত্র, অচিন দেশের রাজকন্যার সন্ধান পেয়ে অচিনপুরীতে নোকরি নিয়েছি;—তা হলে?

"তা হলে অচিনপুরীর রাজকন্যা তার মহামান্য অতিথির যথাসাধ্য একটু সেবা করবে।" চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাসন্তী বললে, "বস আমার আসনে।"

কুণ্ঠিত কণ্ঠে সুধানাথ বললে, "সেটা কি রাজপুত্রের পক্ষে বীরোচিত হবে ?"

"বস, বস—বস।"

চেয়ারে ধীরে ধীরে বসতে বসতে সুধানাথ বললে, "বাপ রে ! সাধে কি নিমাই কাছে আসতে ভয় পায় !"

কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে সুধানাথের হাতে দিয়ে বাসন্তী বললে, "খাও।"

করুণনেত্রে বাসন্তীর দিকে চেয়ে সুধানাথ বললে, "শুধু জল ?"

"আচ্ছা, একটু মিষ্টি নিয়ে আসি।"—বলে বাসন্তী দোরের দিকে অগ্রসর হয়েছে, এমন সময়ে সদর-দরজায় কড়া বেজে উঠল। সুধানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সে বললে, "হৈমন্তীর কড়া নাড়া।"

সুধানাথ চিৎকার করে উঠল, "আসি ছোড়দিমণি।" তারপর এক নিঃশ্বাসে গ্লাসের জলটা শেষ করে বললে, "যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি মিষ্টি।"—তারপর দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে।

ছয়

শনিবারে বাসন্তী কলেজ থেকে ফিরলে সুধানাথ বললে, "বিধাতার বিচার দেখেছেন দিদিমণি ?"

টেবিলের উপর বই রাখতে রাখতে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন বিধাতা আবার কী বিচার করলেন ?"

"তপস্যা করলাম আমি, আর বর পেলেন আপনি। চমৎকার বিচার নয় ?"

কৌতূহলী হয়ে বাসন্তী বললে, "তার মানে ?"

"তার মানে, আজ সকালে দুজন লোক এসে আপনার বরের ব্যবস্থা পাকা করে গেছে, মায় চব্বিশ তারিখে বিয়ের দিন পর্যন্ত।"

বাসন্তী কোন কথা না বলে বইগুলো জায়গায় জায়গায় গুছিয়ে রাখতে লাগল।

সুধানাথ বলে চলল, "আগ্রহ দেখে রাগও হয়, খুশীও হই। আপনার ফোটো দেখেই কাত; বলে—মেয়ে আর না দেখলেও চলে।...পাত্রের নাম অমৃতনাথ চাটুজ্জে। এক পয়সা পণ নেবে না। সেটা এমন কিছু বাহাদুরির কথা নয়,—যে বস্তু পাচ্ছে, হাজার দশেক টাকা সেলামি দিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।...দিদিমণি !"

কোন কথা না বলে বাসন্তী চেয়ে দেখলে।

"খাবার আর জল খেয়ে নিন।"

"এখন যাব না।"

"তা হলে জুতো জোড়া খুলে দিন, সাফ করে রাখি।"

"ও-কাজ তোমাকে আর করতে হবে না।"

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে দুঃখিত স্বরে সুধানাথ বললে, "ওই কাজটাতেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেতাম ; আজ না হয় শেষ বারের মতো ওটা করতে দিন।"

সুধানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বাসন্তী বললে, "শেষ বারের মতো কেন ?"

"রাজকন্যা এ বাড়ি থেকে চলে গেলে, কী নিয়ে এ বাড়িতে রাজপুত্র থাকবে, বলুন ?"

এ কথার পর আর কোন কথা হতে পারলে না, সদর-দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সুধানাথ দ্রুতপদে প্রস্থান করলে এবং ক্ষণকাল পরে হৈমন্তীর সঙ্গে ফিরে এল।

হৈমন্তীকে দেখে বিস্মিত হয়ে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলে, "এরই মধ্যে এলি যে হৈম ?"

হৈমন্তী বললে, "কাল রাত্রে সেক্রেটারি মারা গেছেন, ছুটি হয়ে গেল।" তারপর উৎফুল্ল মুখে বললে, "সুখবর শুনেছ দিদি ? চব্বিশে তোমার বিয়ে।"

সুধানাথ এগিয়ে এসে বললে, "মা পুজো করছেন, আমি দিদিমণিকে সব বলেছি।"

হৈমন্তী বললে, "পাত্রের তুলনা নেই। যেমন রূপে, তেমনি গুণে, তেমনি অর্থে। ম্যাট্রিক থেকে এম. এস-সি. পর্যন্ত সব পরীক্ষায় প্রথম। আই. এ. এস. পরীক্ষা দিয়েছে। ওরা বলছিল—সে পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার না যদি করে, তার একমাত্র কারণ হবে প্রথম স্থান অধিকার করা।"

সুধানাথ বললে, "সবই ভালো, নামটা কেমন যেন বুড়োটে বুড়োটে— অমির্‌তি মুখুজ্জে।"

হৈমন্তী বললে, "অমির্‌তি মুখুজ্জে, না, অমির্‌তি জিলিপি !"

সুধানাথ ও হৈমন্তী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

শনিবার। সকাল সকাল অফিস থেকে শশাঙ্কশেখর ও সতীশ ফেরার পর একটা প্রবল আনন্দের হিল্লোলে সমস্ত বাড়িটা হিল্লোলিত হতে লাগল। আজ বাড়িতে সত্যই রূপকথার এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী অভিনীত হয়েছে।

পরদিন বাসন্তীর সঙ্গে দেখা হতে সুধানাথ বললে, "নিতাই আজ এল না দিদিমণি— আমাকে পাঠিয়ে দিলে।"

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ?"

"ওর মন ভালো নেই। ও বোধ হয় আর কাজ করবে না। কিন্তু আমি করব। মাঝে মাঝে তো আপনাকে এ বাড়িতে দেখতে পাব। আর, দেখুন—"

সুধানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বাসন্তী বললে, "কী ?"

"আপনার বিয়েতে আমি কিন্তু একজোড়া ধুতি, একটা জামা, আর এক-জোড়া জুতো নোব—হুঁ! তা কিন্তু বলে রাখছু।"

পরদিন সন্ধ্যার পর টেবিল-ল্যাম্প জেলে একটা বই খুলে বাসন্তী সবেমাত্র পড়তে বসেছে, এমন সময় হৈমন্তী এসে বললে, "সুখবর আছে দিদি। পাটনা থেকে পাত্রের মামার চিঠি এসেছে।"

হৈমন্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বাসন্তী বললে, "কী সুখবর?"

"অমৃতনাথ সত্যিই একটু বুড়োটে নাম। পাত্রের কিন্তু ওঠা ডাকনাম—আসল নাম সুধানাথ।"

সুধানাথ! বাসন্তীর মুখে কেউ যেন সহসা আনন্দের সুইচ নীচু ক'রে দিলে।

"সুখবর নয়?"

প্রসন্নমুখে বাসন্তী বললে, "হ্যাঁ ভাই, সত্যি সুখবর।"

এই সু-খবর পাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সুধানাথকে একান্তে পেয়ে বাসন্তী বললে, "শোন নিমাই।"

"বলুন দিদিমণি।"

"কাল যেন নিতাই দাস নিশ্চয়ই আসে।"

"কেন বলুন তো?"

"তার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।"

সুধানাথ বললে, "আচ্ছা, তাকে আসতে বলব।…কিন্তু দিদিমণি, কাল মঙ্গলবার,—কাল তো আমাদের দু ভাইয়েরই আসবার কথা আছে।"

হাসি চেপে বাসন্তী বললে, "আচ্ছা, দু ভাইয়েই এস।"

সাত

মঙ্গলবার। বাসন্তী কলেজ থেকে ফেরার পর সুধানাথ তার কক্ষে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে আজ আসতে বলেছিলেন দিদিমণি?"

বাসন্তী বললে, "হ্যাঁ। কই, নিমাই আসে নি?"

কপট বিষণ্ণতার সুরে সুধানাথ বললে, "না, আসে নি। ভেবে দেখলাম তার না আসাই ভালো। আমরা দু ভাই আজ না এলে আপনি তো আমাকে দণ্ড দেবেন। ভেবে দেখলাম, দণ্ড পেয়ে বাসন্তীহীন বাড়ি থেকে নির্বাসিত হওয়াই ভালো।"

বাসন্তী বললে, "আচ্ছা, দণ্ড দেওয়া না-দেওয়ার কথা পরে ভাবলে চলবে, উপস্থিত তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে।"

"কী কথা বলুন।"

"চব্বিশ তারিখে আমার বিয়ে, জান তো ?"

"জানি।"

"সেদিন তোমার আসা চাই-ই।"

বিমূঢ় কণ্ঠে সুধানাথ বললে, "আমি সেদিন কেমন ক'রে আসব ?—আমি তো সেদিনের পাল্লায় কেউই নই।"

মাথা নেড়ে দৃঢ়স্বরে বাসন্তী বললে, "তা আমি জানি নে। অনাহূত, রবাহূত, বরের বন্ধু, বরের চাকর—যে ভাবেই হোক, তোমার আসা চাই। সুধানাথ মুখুজ্জে অমৃতনাথ মুখুজ্জে, ও-সব আমি বুঝি নে,—আমি সেদিন তোমার গলাতেই মালা দোব।"

বিস্ময়ের কণ্ঠে সুধানাথ বললে, "আমার গলাতে মালা দেবেন ?"

বাসন্তী বললে, "হ্যাঁ, দোব। তুমি যে শেষ পর্যন্ত আমাকে বিপদে ফেলবে না, সে বিশ্বাস আমার ছিল—আর তোমার গেঞ্জির পিছন দিকে লেখা 'সু'-অক্ষর বরাবর সে বিষয়ে আমাকে ভরসা দিয়েছে।"

একটা উৎকট কৌতুকের তাড়নায় সুধানাথের মুখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল; স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বললে, "আচ্ছা বাসন্তী, চব্বিশ তারিখে তুমি আমাকে মালা দিয়ো—উপস্থিত আজ তোমার দক্ষিণ হাতখানি আমাকে দাও।"

আরক্তিম মুখে বাসন্তী তার ডান হাতখানা সুধানাথের দিকে এগিয়ে দিলে।

আশ্বিন—১৩৬০